সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কাকাবাবু সমগ্র ৪

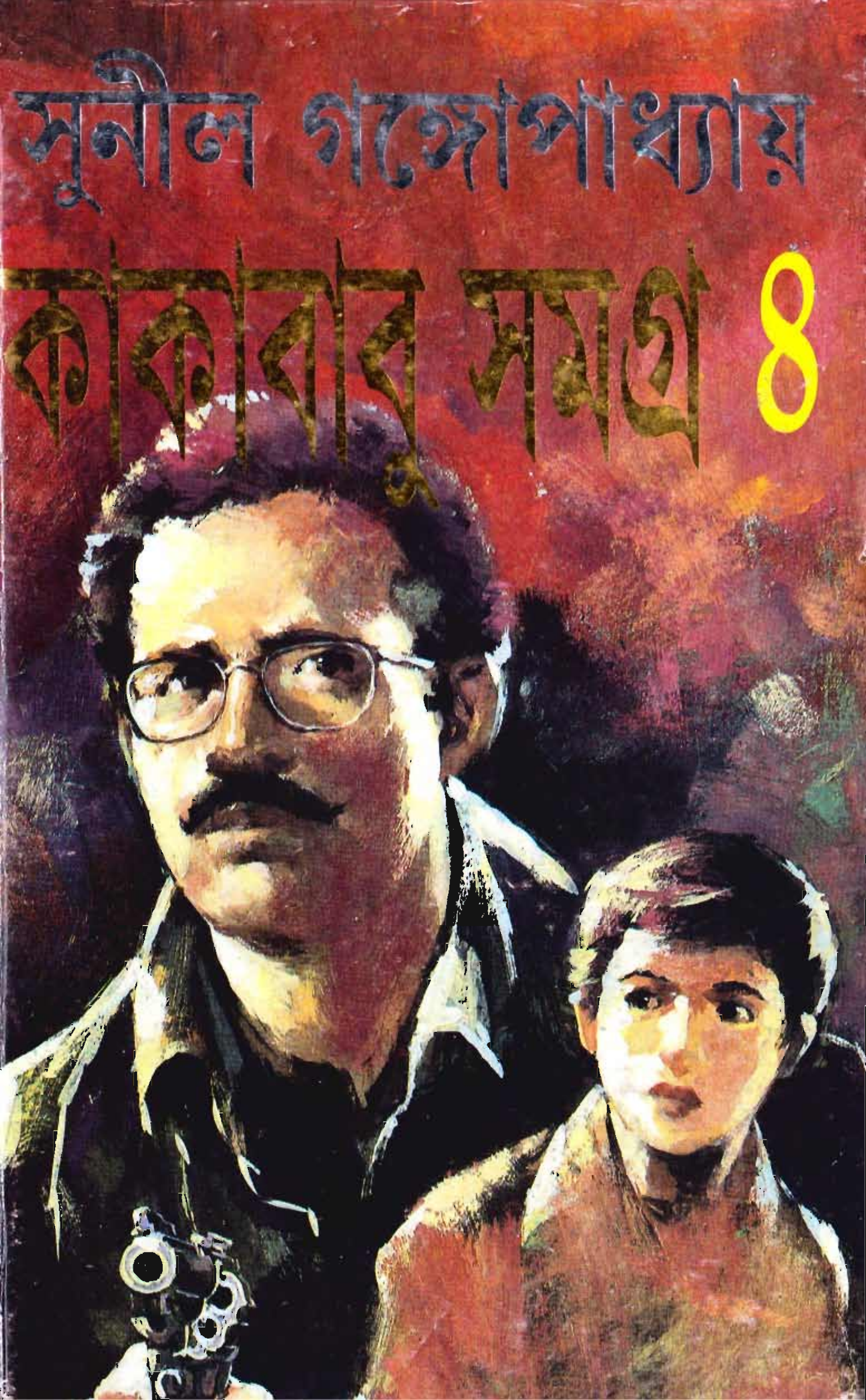

কাকাবাবু সমগ্র ৪

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

http://banglaebooksclassics.blogspot.co

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮ **মুদ্রণ সংখ্যা** ৫০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯৮ **মুদ্রণ সংখ্যা** ৫০০০

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7215-758-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১২০·০০

মোহর চট্টোপাধ্যায়কে
স্নেহের উপহার

এই লেখকের অন্যান্য বই

আঁধার রাতের অতিথি
আগুন পাখির রহস্য
আ চৈ আ চৈ চৈ
উদাসী রাজকুমার
উল্কা রহস্য
কলকাতার জঙ্গলে
কাকাবাবু ও বজ্রলামা
কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি
কাকাবাবু সমগ্র ১
কাকাবাবু সমগ্র ২
কাকাবাবু সমগ্র ৩
কাকাবাবু হেরে গেলেন ?
কাকাবাবুর প্রথম অভিযান
কালোপর্দার ওদিকে
খালি জাহাজের রহস্য
জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ
জলদস্যু
জোজো অদৃশ্য
ডুংগা
তিন নম্বর চোখ
পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক
বিজয়নগরের হিরে
ভয়ংকর সুন্দর
মিশর রহস্য
রাজবাড়ির রহস্য
সত্যি রাজপুত্র
সন্তু ও একটুকরো চাঁদ
সন্তু কোথায়, কাকাবাবু কোথায়
সবুজ দ্বীপের রাজা
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি

ভূমিকা

কাকাবাবু কেন খোঁড়া কিংবা কী ভাবে তাঁর পায়ে আঘাত লেগেছিল, এ নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আছে। আগের কয়েকটি বইতে কাকাবাবুর এক পা খোঁড়া হবার কারণ বিভিন্ন রকম দেওয়া আছে, যা পরস্পর বিরোধী। আসলে কাকাবাবু ওই ঘটনাটা কখনও পরিষ্কার করে খুলে বলতেন না, তাঁর একটা সঙ্কোচ ছিল। এই খণ্ডে 'কাকাবাবুর প্রথম অভিযান'-এই আসল ঘটনা দেওয়া আছে, সেটা পড়লেই বোঝা যাবে, কেন তিনি এতদিন নিজের মুখে তা বলতে চাননি।

'জোজো অদৃশ্য' বেরুবার পর অনেকে জানতে চেয়েছে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজারে গরিবদের বাড়িতে কিংবা ফাঁকা কোনও দ্বীপে বড় বড় সাদা রঙের চারতলা বাড়ি সত্যিই আছে, না আমার বানানো। বানানো নয়, ওই রকম স্টর্ম সেন্টার বা ঝড়ের আশ্রয় সত্যিই আছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচী

আগুন পাখির রহস্য ১১
কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি ৮৩
সন্তু কোথায়, কাকাবাবু কোথায় ১৭৩
কাকাবাবুর প্রথম অভিযান ২৮১
জোজো অদৃশ্য ৩৭৭

গ্রন্থ পরিচয় ৪৭৯

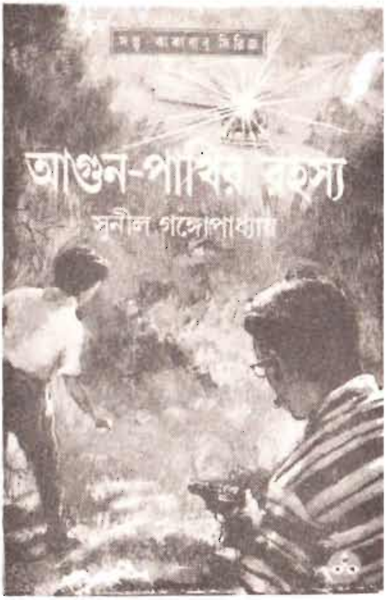

আগুন পাখির রহস্য

http://banglaebooksclassics.blogspot.co

সকালবেলা রেডিয়ো খোলা থাকে, কাকাবাবু দু-তিনখানা খবরের কাগজ পড়েন। কাগজ পড়তে-পড়তে কখনও রেডিয়োতে ভাল গান হলে শোনেন কিছুক্ষণ, আবার কাগজ-পড়ায় মন দেন। বেলা ন'টার আগে তিনি বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। কাকাবাবুর মতে, সকালবেলা প্রত্যেক মানুষেরই দু-এক ঘণ্টা আপনমনে সময় কাটানো উচিত। জেগে ওঠার পরেই কাজের কথা শুরু করা ঠিক নয়।

কাকাবাবু ওঠেন বেশ ভোরেই। হাত-মুখ ধুয়ে ময়দানে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি বোবা সেজে থাকেন, চেনা মানুষজন দেখলেই চলে যান অন্যদিকে। লোকদের সঙ্গে অপ্রয়োজনে এলেবেলে কথা বলার বদলে গুন্‌গুনিয়ে গান করা অনেক ভাল।

বাড়ি ফিরে কয়েক কাপ চা-পান ও খবরের কাগজ পড়া। রেডিয়োতে লোকসঙ্গীত আর রবীন্দ্রসঙ্গীত হলে কাগজ সরিয়ে রাখেন। আর বাংলা খবরটাও শুনে নেন কিছুটা।

বাংলা কাগজের তিনের পাতায় একটা ছোট খবর বেরিয়েছে, রেডিয়োতে ঠিক সেই খবরটাই শোনাচ্ছে : "উত্তরবঙ্গের বনবাজিতপুর গ্রামে আবার একটি রহস্যময় বিমান দেখা গেছে বলে গ্রামবাসীরা দাবি করেছে। মাঝরাত্তিরে বিমানটি ভয়ঙ্কর শব্দ করতে-করতে খুব নিচুতে এসে গ্রামের ওপর দিয়ে ঘোরে। গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়...পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে..."

এই সময় রঘু এসে বলল, "কাকাবাবু, আপনার কাছে সেই দু'জন ভদ্রলোক আবার এসেছেন !"

কাকাবাবু টেবিলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখনও ন'টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি না ?"

রঘু কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "কী করব, ওনারা যে আরও অনেকক্ষণ আগে এসে বসে আছেন। চা খাবেন কি না জিজ্ঞেস করলাম, তাও খেতে চাইছেন না,

ছটফট করছেন !”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “সেই দুই বাবু মানে কোন দুই বাবু ?”

রঘু বলল, “কালকেও যাঁরা এসেছিলেন। একজন বৃদ্ধ ধুতি পাঞ্জাবি পরা, আর একজন মাঝারি কোট-প্যান্ট।”

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, “আবার এসেছে! জ্বালাতন! সন্তু কোথায় ?”

রঘু বলল, “খোকাবাবু তো পড়তে বসেছিল, তারপর জোজোবাবু এসে তাকে ম্যাজিক শেখাচ্ছে !”

কাকাবাবু বললেন, “ম্যাজিক একটু পরে শিখলেও চলবে। সন্তুকে গিয়ে বল ওদের সঙ্গে দেখা করতে। সন্তুই যা বলবার বুঝিয়ে দেবে। আমার এখন সময় নেই।”

রঘু চলে যাওয়ার পরেও কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে রইলেন। এখন প্রায় প্রত্যেকদিন তাঁর কাছে নানারকম লোক আসে। কারও বাড়ির গয়না চুরি গেছে, কারও বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে, কোনও বাড়িতে খুন হয়েছে, সেইসব সমস্যা কাকাবাবুকে সমাধান করে দিতে হবে। কেউ-কেউ এজন্য কাকাবাবুকে অনেক টাকাও দিতে চায়।

এসব প্রস্তাব শুনলেই কাকাবাবু রেগে যান। তিনি বলেন, “আমি ডিটেকটিভও নই, ভূতের ওঝাও নই। ওসব কি আমার কাজ ? ওসব তো পুলিশের কাজ।”

তবু লোকেরা শোনে না, ঝুলোঝুলি করে। কাকাবাবু হাত জোড় করে বলেন, “মশাই, আমি খোঁড়া মানুষ, চোর-ডাকাতদের পেছনে ছোটাছুটি করার ক্ষমতা আমার আছে ? আমি বাড়িতে বসে বই-টই পড়ি, শান্তিতে থাকতে চাই। আমায় ক্ষমা করবেন !”

কাকাবাবু আর সন্তুর কয়েকটা অভিযানের কথা অনেকে জেনে গেছে, তাই লোকের ধারণা হয়েছে যে, কাকাবাবু অসাধ্যসাধন করতে পারেন ! কাল এই দুই ভদ্রলোক এসেছিলেন একটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার নিয়ে। ওঁদের বাড়ির উনিশ বছরের একটি ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তাকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায়নি, সে নিজেই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। সেই ছেলেকে খুঁজে বের করতে হবে, কাকাবাবুকে ওঁরা প্রথমেই পঁচিশ হাজার টাকা ফি দিতে চেয়েছিলেন। ছেলেকে পাওয়া গেলে আরও পঁচিশ হাজার।

কাকাবাবু বলেছিলেন, “আপনারা পঁচিশ লাখ টাকা দিলেও এ-ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে রাজি নই। একটা কলেজে পড়া উনিশ বছরের ছেলে, তার নিজস্ব ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞান নেই ? সে যদি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে বম্বেতে ফিল্‌ম স্টার হতে চায় কিংবা হিমালয়ে গিয়ে সাধু হতে চায় কিংবা দেশের কাজে প্রাণ দিতে চায়, তাতে আমি বাধা দেব কেন ?”

তবু নাছোড়বান্দা লোকদুটি আজ আবার এসেছেন !

রেডিয়োর খবরটা পুরোপুরি শোনা হল না। রহস্যময় বিমানটির কথা বাংলা কাগজে ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু রেডিয়োতে পুলিশের বক্তব্য শোনানো হচ্ছিল, সেটা কাগজে নেই। বাংলা কাগজে লিখেছে যে, বিমানটির গা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছিল। নিজস্ব সংবাদদাতার ধারণা, সেটা সাধারণ বিমান নয়। মহাকাশযান !

কাকাবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, "ইউ এফ ও !"

রঘু সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে গেল সন্তুকে ডাকতে। সন্তুকে সে খুব বাচ্চা বয়েস থেকে দেখছে বলে সে এখনও তাকে খোকাবাবু বলে। বন্ধুদের সামনে ওই ডাক শুনলে সন্তু রেগে যায়। শুধু খোকা বললে আপত্তি ছিল না, অনেক বয়স্ক লোকেরও ডাকনাম হয় খোকা, কিন্তু খোকাবাবু শুনলেই মনে হয় না বাচ্চা ছেলে ? গত বছর নেপাল থেকে ফেরার পর রিনি ইয়ার্কি করে বলেছিল, "'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' হল তা হলে ?"

তিনতলায় একটাই মাত্র ঘর, এই ঘরখানা সন্তুর নিজস্ব। পাশে অনেকখানি খোলা ছাদ। খুব গরমকালে রাত্তিরে সন্তু একটা মাদুর পেতে এই ছাদে শুয়ে থাকে। মেঘের খেলা দেখে, কিংবা নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে কোটি-কোটি মাইল দূরে তার মন চলে যায়।

এখন ঘরের মধ্যে জোজো তাকে তাস অদৃশ্য করার ম্যাজিক দেখাচ্ছে।

রঘু দরজার কাছে এসে খোকাবাবু বলে ডাকতে গিয়েও চেপে গেল। বলল, "এই যে, একবার নীচে যাও ! কাকাবাবুর সেক্রেটারি হয়েছ যে। কালকের সেই দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন, তাদের মিষ্টিমুখে বিদায় করতে হবে !"

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো বলল, "লোক বিদায় করতে হবে ? আমি ওই কাজটা দারুণ পারি। তুই মুখ খুলবি না, সন্তু, যা বলার আমি বলব !"

বসবার ঘরে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ম্লান মুখ করে বসে আছেন সোফায়। আর অন্য লোকটি দাঁড়িয়ে আছেন জানলার কাছে, তাঁর মুখে একটা ছটফটে ভাব।

জোজো ঘরে ঢুকে বলল, "নমস্কার। আমি মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীর ফার্স্ট সেক্রেটারি, আর এ ডেপুটি সেক্রেটারি ! আপনাদের কী দরকার বলুন ?"

মাঝবয়েসী লোকটি বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী, মানে, কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না ?"

জোজো বলল, "উনি তো রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন, ব্যস্ত আছেন। তা ছাড়া, আমাদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করলে তো ওঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না !"

ভদ্রলোক সন্তু আর জোজোর মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর জোজোর চোখে চোখ রেখে বললেন, "তুমিই নিশ্চয়ই সন্তু ? তোমার কথা অনেক শুনেছি। তুমি ভাই কাকাবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলবে ? আমরা খুব বিপদে পড়েছি।"

সন্তু বাড়িতে হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে থাকে, জোজোর তুলনায় তাকে ছোট দেখায়। তা ছাড়া এমনিতেও সে শান্তশিষ্ট আর লাজুক ধরনের। জোজোর চেহারা সুন্দর, সে পরে আছে ফুল প্যান্ট, ফুল শার্ট, মাথার চুল ওলটানো আর কথা বলে চোখে-মুখে। সন্তু যে কতটা সাহসী আর জোজো যে কতটা ভিতু, তা ওদের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই।

জোজো সন্তু সেজে বলল, "হ্যাঁ, আপনাদের কেসটা কী বলুন!"

ভদ্রলোক বললেন, "ইনি আমার দাদা বীরমোহন দত্ত আর আমার নাম রামমোহন দত্ত। কলেজ স্ট্রিটে আমাদের কাগজের দোকান। আমার দাদার সাত মেয়ে, একটিও ছেলে নেই। আমার তিন মেয়ের পর একটিমাত্র ছেলে। উনিশ বছর বয়েস, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে। তিনদিন আগে সে তার মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। টাকা-পয়সা নিয়ে যায়নি, কিচ্ছু নিয়ে যায়নি, সে কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে, ভেবে ভেবে আমরা মরে যাচ্ছি। তুমি ভাই কাকাবাবুকে বলো..."

জোজো বলল, "ছেলেটির কী নাম?"

রামমোহন দত্ত বললেন, "তপন, তপনমোহন দত্ত।"

জোজো এবার হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "ছবি? ছবি এনেছেন?"

রামমোহন দত্ত বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ এনেছি। কালার, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট চারখানা ছবি। এই যে..."

সন্তুও উঁকি মেরে ছবিগুলো দেখল। বেশ ভালই দেখতে ছেলেটিকে। রোগা-পাতলা, বড়-বড় চোখ, থুতনিতে একটা আঁচিল। একটা ছবিতে তার হাতে একখানা ক্রিকেট-ব্যাট।

রামমোহন দত্ত বললেন, "তা হলে কি পঁচিশ হাজারের চেকটা..."

জোজো পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে বলল, "সতেরো থেকে পঁচিশ তারিখ নেপাল, তারপর জয়পুরের মহারাজার চব্বিশখানা হিরে, মানস সরোবরের তিনটে চোখওয়ালা অদ্ভুত প্রাণী, প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়ার ফাইল চুরি, এর মধ্যে আবার মস্কো যেতে হবে দু'বার, কী করে যে এত ম্যানেজ করবেন... হ্যাঁ, আপনাদের কেসটা মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী নিতে পারে দু' মাস সতেরো দিন পর।"

রামমোহন দত্ত বললেন, "অ্যাঁ?"

জোজো বলল, "তার আগে উনি সময় দিতে পারবেন না!"

রামমোহন দত্ত বললেন, "অতদিন ছেলেটা নিরুদ্দেশ হয়ে থাকবে? খাবে কী? ওর মা-ও কিছু খাচ্ছেন না এই তিনদিন। তুমি ভাই প্লিজ কাকাবাবুকে বলে ব্যবস্থা করো, যাতে আমাদের কেসটা আগে নেন।"

জোজো ভুরু তুলে বলল, "আপনাদের জন্য কাকাবাবু নেপালের মহারাজা, জয়পুরের মহারাজা, ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে মিথ্যে কথা বলবেন? দু' মাস

সতেরো দিন পর্যন্ত আপনারা যদি অপেক্ষা করতে না পারেন...”

বীরমোহন দত্ত এতক্ষণ পর বললেন, “তবে আর এখানে বসে থেকে লাভ কী ? রামু, চল, পুলিশের কাছেই যাই।”

এই সময় আরও দু'জন ভদ্রলোক দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “রাজা রায়চৌধুরী আছেন ? আমাদের বিশেষ দরকার।”

জোজো বলল, “আপনাদের কী কেস ? খুন ? নিরুদ্দেশ ? চুরি ?”

ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, “কাল রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে একটা খুন হয়েছে, সে আমাদের বাড়ির কেউ নয়, ছাদে পড়ে আছে ডেডবডি।”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “ছেলে, না মেয়ে ?”

ভদ্রলোক বললেন, “মেয়ে।”

জোজো বলল, “আপনাদের বাড়ির কেউ নয়, তা হলে ডেড বডি ছাদে কী করে এল ?”

ভদ্রলোক বললেন, “সেইটাই তো রহস্য ! আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।”

জোজো বলল, “দু' মাস সতেরো দিন।”

বীরমোহন আর রামমোহন দত্ত চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে এঁদের কথা শুনছিলেন। এই নতুন ভদ্রলোকও রামমোহন দত্তর মতনই বললেন, “অ্যাঁ ?”

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, “আপনাদের বাড়ির ওই রহস্যের সমাধান যদি মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীকে দিয়ে করাতে চান, তা হলে দু' মাস সতেরো দিন অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে পর্যন্ত উনি বুক্‌ড। একটুও সময় নেই। এই দত্তবাবুদের জিজ্ঞেস করে দেখুন !”

সবাই চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে জোজো বলল, “ভাবছি আমি নিজেই একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলব।”

সন্তু বলল, “সেটা বোধ হয় তুই ভালই পারবি !”

জোজো বলল, “আমি যদি কাকাবাবু হতাম, তা হলে দত্তদের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার অ্যাডভান্সটা নিয়ে নিতাম। ও ছেলেটা তো দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে বোঝা যাচ্ছে।”

সন্তু বলল, “তুই কোনওদিন কাকাবাবুর মতন হতে পারবি না। সেইজন্য কেউ তোকে আগে থেকেই পঁচিশ হাজার টাকা দিতেও চাইবে না।”

এ-কথাটা গায়ে না মেখে জোজো কথা ঘুরিয়ে বলল, “দশ-দশটা দিদি। ওরে বাপ রে ! আমি তপন দত্ত হলে আমিও বাড়ি ছেড়ে পালাতাম।”

সন্তু হেসে বলল, “বেশি দিদি থাকা তো ভালই। ঘুরে-ঘুরে সব দিদিদের বাড়িতে খাওয়া যায়।”

জোজো বলল, “দশটা দিদি মানে দশখানা জামাইবাবু, সেটা ভুলে যাচ্ছিস ?

সবাই মিলে কত উপদেশ দেবে।"

সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠে এল দোতলায়। কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চলে গেছে তো ?"

জোজো বলল, "শুধু ওরা নয়, আরও নতুন ক্লায়েন্ট এসেছিল, কাকাবাবু। তাদেরও বিদায় করে দিয়েছি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি জোজোকে তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখতে পারো। দারুণভাবে ম্যানেজ করল।"

জোজো সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "টেকনিকটা বুঝলি তো ? কাউকেই মুখের ওপর না বলতে নেই। কাকাবাবু পারবেন না কিংবা রাজি নন, তাও বলতে হল না।"

কাকাবাবু জোজোর মুখে সব শুনে খুব হাসতে লাগলেন।

ড্রয়ার খুলে দুটো চকোলেট বের করে দু'জনকে দিয়ে বললেন, জোজো আমাকে এরকমভাবে রোজ বাঁচালে তো ভালই হত। কিন্তু পড়াশুনো ফেলে রোজ সকালে তো আর এখানে এসে বসে থাকতে পারবে না। আমি ভাবছি কয়েক দিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে পালাব। সন্তু, তোর এখন পড়াশুনোর চাপ কীরকম ? আমার সঙ্গে কোচবিহার যাবি !"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কোচবিহারের মহারাজা আপনাকে নেমন্তন্ন করেছেন বুঝি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না হে জোজোবাবু, কোনও মহারাজা-টহারাজার সঙ্গে আমার আলাপ নেই। আমাকে তাঁরা নেমন্তন্ন করবেনই বা কেন ? আমি যাচ্ছি বেড়াতে। সেইসঙ্গে খানিকটা কৌতূহলও মিটিয়ে আসা যাবে। তুমি ইউ এফ ও কাকে বলে জানো ?"

জোজো এমনভাবে সন্তুর দিকে তাকাল, যেন এইসব সহজ প্রশ্নের উত্তর সে নিজে দেয় না, তার সহকারীর ওপর ভার দেয়।"

সন্তু বলল, "আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট।"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীর নানা জায়গায় নাকি এগুলো দেখা যায়। কেউ-কেউ বলে, উড়ন্ত চাকি। চৌকো, লম্বা, গোল— অনেক রকমের হয়, আকাশে একটুক্ষণ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। অনেকের ধারণা ওগুলো পৃথিবীর বাইরে থেকে আসে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ একটারও ছবি তুলতে পারেনি। ওরকম যে সত্যিই কিছু আসে, তার কোনও নিশ্চিত প্রমাণও পাওয়া যায়নি। অথচ প্রায়ই শোনা যায়। কোচবিহার জেলার বনবাজিতপুর নামে একটা গ্রামে নাকি সেইরকম একটা ইউ এফ ও দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।"

সন্তু বলল, "এত জায়গা থাকতে হঠাৎ এইরকম একটা গ্রামে কেন ইউ এফ ও আসবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও একটা প্রশ্ন তো বটেই। সে-গ্রামের লোক নাকি

দু-তিনবার দেখেছে, সেটার বর্ণনাও দিয়েছে। সে-কথা ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে, রেডিয়োতেও বলেছে। সুতরাং এত কাছাকাছি যখন ব্যাপার, তখন চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে এলেই তো হয়। তা হলে কিন্তু আজই যেতে হবে, দেরি করার কোনও মানে হয় না। বউদির মত আছে কি না জিজ্ঞেস কর।"

মা স্নান করতে গেছেন, সন্তু উঠে এল নিজের ঘরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। মা-বাবা আপত্তি করবেন না, তা সন্তু জানে।

জোজো তার সঙ্গে-সঙ্গে এসে নিচু গলায় বলল, "কাকাবাবু কীরকম মানুষ রে, সন্তু ? পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে লোকে সাধাসাধি করছে সামান্য একটা কেস সল্‌ভ করার জন্য, সেটা না নিয়ে উনি নিজের পয়সা খরচা করে চললেন উড়ন্ত চাকি দেখতে কোচবিহার ?"

সন্তু বলল, "একটু আগেই তো বললাম, তুই জীবনেও কাকাবাবুর মতন হতে পারবি না, তাই এসবের মর্মও বুঝবি না।"

জোজো বলল, "কোচবিহার এমন কিছু বেড়াবার মতন জায়গা নয়। আর উড়ন্ত চাকি-ফাকি দেখবারই বা কী আছে ?

সন্তু কোনও উত্তর দিল না।

জোজো বলল, "সরি সন্তু, এবারে আমি তোদের সঙ্গে যেতে পারছি না। জাপানের সম্রাট বাবাকে নেমন্তন্ন করেছেন, আমাকেও যেতে বলেছেন বিশেষ করে। কালই আমরা জাপান রওনা হচ্ছি। টোকিয়োতে হোটেল বুক করা হয়ে গেছে।"

সন্তু এবার হাসিমুখে তাকাল। জোজোকে সঙ্গে নেওয়ার কথা কাকাবাবু একবারও বলেননি, তাই জোজোর অভিমান হয়েছে।

সন্তু বলল, "তোর পায়ে ধরে সাধলেও যাবি না ?"

জোজো বলল, "জাপানের সম্রাটের বোনের বিয়ে। বাবাকে দিয়ে কোষ্ঠী পরীক্ষা করাবেন। আমাদের না গেলে চলবে কী করে ?"

সন্তু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। জাপানের রাজবাড়ির নেমন্তন্ন ফেলে কি কোচবিহার যাওয়া যায় ? ফিরে এসে তোর কাছে জাপানের গল্প শুনব।"

জোজো বলল, "তুই ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছিস তো ! যদি উড়ন্ত চাকির ছবি তুলে আনতে পারিস, তা হলে তোকে আমি টোরা-টোরা-ফ্লোরা খাওয়াব।"

সেটা যে কী জিনিস, তা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না সন্তু।

॥ ২ ॥

কোচবিহার শহরে প্লেনেও যাওয়া যায়। আগেকার আমলের ডুর্নিয়ের প্লেন, এতই ছোট যে, সতেরো-আঠারো জনের বেশি যাত্রী আঁটে না। প্লেনটার কোথাও ফুটোফাটা আছে কি না কে জানে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে সন্তুকে একেবারে শীতে কাঁপিয়ে দিল। কাকাবাবুর অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরে।

এক সময় হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বল তো সন্তু, এই লাইন দুটো কোন কবিতায় আছে ?

নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি..."

সন্তু থতমত খেয়ে গেল। লাইন দুটো তার মুখস্থ, রবীন্দ্রনাথের লেখা তাও জানে, রচনা লেখার সময় এই লাইন দুটো কোটেশান হিসেবেও ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোন কবিতার লাইন, তা তো মনে পড়ছে না !

কাকাবাবু বললেন, "পারবি না ? 'বাবু কহিলেন বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।' এটা কোন কবিতায় আছে ?"

সন্তু লজ্জা পেয়ে বলল, "দুই বিঘা জমি।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের এই বাংলা দেশকে নিয়ে কী-কী কবিতা আছে বলতে পারিস ?"

সন্তু আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। কেউ জিজ্ঞেস করলে মনে পড়ে না। অথচ এরকম অনেক কবিতা পড়েছে সে।

হঠাৎ মুখ-চোখ উজ্জ্বল করে সে বলল, "ধনধান্যপুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা। তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা..."

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ডি এল রায়ের এই গানটা আছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে বাংলা কিংবা বাংলাদেশ নামটা কোথাও নেই। আমাদের ছেলেবেলায় আর-একটা গান খুব জনপ্রিয় ছিল, বঙ্গ আমার জননি আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ, কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !"

কাকাবাবু প্রায় জোরে-জোরে গাইতেই শুরু করে দিলেন গানটা। প্লেনের মধ্যে সবাই চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকে, কিংবা পাশের লোকের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। কেউ গান গায় না। অনেক যাত্রী ঘাড় তুলে এদিকে তাকাচ্ছে। সন্তুর অস্বস্তি বোধ হল। কিন্তু কাকাবাবুর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। খানিকটা গাইবার পর তিনি বললেন, "প্লেন থেকে যতবার নিজের দেশটাকে দেখি, আমার কেমন যেন একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব আসে মনের মধ্যে। এমন সুন্দর আমাদের দেশ, অথচ মানুষ কত কষ্টে আছে, কত দারিদ্র্য।"

ককপিটের দরজা খুলে মাথায় টুপি-পরা সুন্দর চেহারার একজন লোক এই

দিকে এগিয়ে এল। কাকাবাবুর দিকে দৃষ্টি। সন্তু ভাবল, এই রে, লোকটি নিশ্চয়ই কাকাবাবুর গান গাইবার জন্য আপত্তি জানাতে আসছে !

লোকটি ওদের কাছেই এসে থামল। তারপর নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে লাগল কী যেন।

কাকাবাবু নিজের ভাবে বিভোর হয়ে ছিলেন, চমকে গিয়ে বললেন, "আরে ? কে ? ওহো, অরিন্দম, তুমি এই প্লেনের পাইলট বুঝি ? থাক, থাক, পায়ে হাত দিতে হবে না।"

অরিন্দম তবু কাকাবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, "অনেক দিন পর আপনাকে দেখলাম, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "এ প্লেন তো আর কোচবিহারের পরে যাবে না। কোচবিহারেই যাচ্ছি। তুমি ককপিট ছেড়ে উঠে এলে কী করে ?"

অরিন্দম বলল, "কো-পাইলট আছে, ভয় পাবেন না। কোচবিহারে যাচ্ছেন, ওখানকার রাজা নেমন্তন্ন করেছেন বুঝি ?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "দেখছিস, আমি যে-সে লোক নই। সবাই ভাবে, রাজা-মহারাজারা আমাকে হরদম ডাক পাঠায়।"

তারপর অরিন্দমের দিকে ফিরে বললেন, "না হে, সেসব কিছু না। এমনই যাচ্ছি কোচবিহারে বেড়াতে। তা ছাড়া আমি যতদূর জানি, কোচবিহারের রাজা-রানিরা এখন সবাই থাকেন কলকাতায়। ওখানকার দারুণ সুন্দর রাজবাড়িটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

অরিন্দম বলল, "এই যে একেবারে সামনের সিটে যিনি বসে আছেন, তিনি এখানকার বড় রাজকুমার। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, কোনও দরকার নেই। আমি নিরিবিলিতে দু-চারটে দিন এদিকে কাটিয়ে যেতে চাই।"

অরিন্দম ফিরে গেল ককপিটে। তার একটু পরেই প্লেনটা নামতে লাগল নীচের দিকে। বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাটি স্পর্শ করল।

জিনিসপত্র ফেরত পেতে বেশি সময় লাগল না। অরিন্দম নিজে কাকাবাবুর সুটকেসটা বয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বলল, "ইস, আগে জানলে আমি ছুটি নিয়ে আপনার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে পারতাম এখানে। আমাকে এই প্লেন নিয়েই ফিরে যেতে হবে একটু বাদে।"

এয়ার স্ট্রিপের বাইরে একটা বাস আর দু-একখানা গাড়ি রয়েছে, আর একঝাঁক পুলিশ।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে এত পুলিশ কেন ?"

অরিন্দম বলল, "আজ একজন মন্ত্রীর ফেরার কথা আছে শুনেছি। মন্ত্রী থাকলে পুলিশ থাকবেই।"

একটা জিপ গাড়ির বনেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ

অফিসার। কপালের ওপর একটা হাত রেখে রোদ আড়াল করেছে। হাতখানা সরিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, "মিঃ রায়চৌধুরী ?"

কাকাবাবু ঠিক চিনতে পারলেন না। লোকটির দিকে হাত তুলে নমস্কার করলেন।

লোকটি সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "আমায় চিনতে পারছ ? সেই যে সেবারে তোমরা বজ্র লামার গুম্ফায় ঢুকে বিপদে পড়েছিলে ? আমি তখন ছিলাম দার্জিলিং জেলার এস. পি.। সেই সময় দেখা হয়েছিল, মনে নেই ? এখন কোচবিহারে বদলি হয়ে এসেছি।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে। আপনিই তো অনির্বাণ মণ্ডল।"

অনির্বাণ মণ্ডল বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এসে পড়েছেন, খুব ভাল হয়েছে। এখানে পর-পর দুটো রহস্যময় খুন হয়েছে। খুনি ধরা পড়েনি, কাউকে সন্দেহও করা যাচ্ছে না। আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, ওসব খুনটুনের মধ্যে আমি নেই। রক্তারক্তির কথা শুনলেই আমার গা গুলোয়। আমি আর সন্তু এখানে বেড়াতে এসেছি। মিঃ মণ্ডল, আপনি সেবারে শেষদিকে আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন, সেজন্য ধন্যবাদ।"

অনির্বাণ মণ্ডল বললেন, "আমাকে 'মিঃ মণ্ডল' আর 'আপনি' বলছেন কেন ? শুধু অনির্বাণ বলে ডাকবেন। আমি আপনার ভক্ত। কোচবিহারে বেড়াতে এসেছেন, উঠবেন কোথায় ?

"সার্কিট হাউসে।"

"আগে থেকে বুক করা আছে ?"

"না, তা নেই। কেন, সেখানে জায়গা পাওয়া যাবে না ?"

"অনেক আগে থেকে সব ঘর বুক্‌ড থাকে। আমার সঙ্গে চলুন, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেখানে না হয়, আমার বাংলোতে থাকবেন। তাতে আমি বেশি খুশি হব।"

অরিন্দম বলল, "তা হলে কাকাবাবু আর সন্তুকে আমি মিঃ মণ্ডলের হাতে সমর্পণ করলাম। আমি এবার চলি।"

ওদের সুটকেস দুটি এস. পি. সাহেবের জিপে তোলা হল। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে একজন বডিগার্ড। সন্তু আর কাকাবাবু বসলেন পেছনে। গাড়ি চলতে শুরু করার পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বজ্র লামার গুম্ফায় যে ফুটফুটে ছোট্ট ছেলেটি ছিল, ওখানে সবাই বলত তার বয়েস নাকি তিনশো বছর, সেই ছেলেটি এখন কেমন আছে ?"

অনির্বাণ বলল, "সে ভালই আছে। তাকে একবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে শেষ যা খবর পেয়েছি, ওই ছেলেটির যে বিশেষ

একটা শক্তি ছিল, মাঝে-মাঝে ওর শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ বইত, ওকে ছুঁলে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতন মনে হত, সে-শক্তিটা ওর নষ্ট হয়ে গেছে। আর ও কাউকে ছুঁয়ে দিলে কিছুই হয় না। ও এখন গুম্ফার পাঠশালায় পড়াশুনো করছে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে।"

সন্তু বলল, "সত্যিই কি কেউ তিনশো বছর বাঁচতে পারে?"

অনির্বাণ বলল, "বাইবেলে ম্যাথুসেলা নামে একজনের কথা আছে। সে কিছুতেই মরতে চায়নি, তিনশো বছর আয়ু চেয়েছিল!"

কাকাবাবু বললেন, "মহাভারতেও তো যযাতির কথা আছে। রাজা যযাতি চেয়েছিলেন অনন্ত যৌবন! খুব বেশিদিন বেঁচে থাকাটা মোটেই ভাল না। নতুন-নতুন যেসব ছেলেমেয়ে জন্মাবে, তাদের জন্য এই পৃথিবীতে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে না?"

সার্কিট হাউসে পৌঁছে দেখা গেল সত্যিই কোনও ঘর খালি নেই। শুধু সবচেয়ে ভাল ঘরখানি কোনও মন্ত্রী-টন্ত্রি ধরনের ভি. আই. পি.-র জন্য বন্ধ করা থাকে। অনির্বাণ মণ্ডলের আদেশে সেই ঘরখানাই খুলে দেওয়া হল। খাবারদাবারেরও সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অনির্বাণ বলল, "তা হলে আপনারা এখন বিশ্রাম নিন। এদিকে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান আছে? তা হলে আমি গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "কাছাকাছি কোনও জঙ্গলে ঘুরে আসতে চাই। একটা গাড়ি পেলে তো ভালই হয়!"

অনির্বাণ বলল, "বিকেলেই গাড়ি পাঠাব। চিলাপাতা ফরেস্টের দিকে যদি যান, পথেই পড়বে পায়রাডাঙ্গা নামে একটা জায়গা। সেখানে পরশু রাতেই একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে একটা মস্ত বটগাছের ওপরের দিকের ডালে। লোকটি ওই গ্রামের এক দোকানদার। কোনও কারণে রাত্তিরবেলা একা বাইরে বেরিয়েছিল, গাছে উঠে কিন্তু আত্মহত্যা করেনি। সেরকম কোনও চিহ্ন নেই। কিছু একটা জিনিস দেখে সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছিল মনে হয়, তাই গাছে উঠে পড়েছিল। কী দেখে সে অত ভয় পেতে পারে? বাঘ বা হাতি বা সাপ যদি হয়, ওসব দেখতে এখানকার মানুষ অভ্যস্ত, গাছে উঠতে আর তেমন ভয় নেই। কিন্তু লোকটা সেখানে বসেও ভয়েই মরে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আবার ওই কথা? খুন, জখম আর অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তোমাদের মতন পুলিশদেরই কাজ এইসব সমস্যার সমাধান করা।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "লোকটি ইউ এফ ও দেখে ভয় পায়নি তো?"

অনির্বাণ মণ্ডল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ভেতরে এসে একটা সোফায় বসে পড়ে বলল, "ইউ এফ ও? ওহো, এবার বুঝেছি, সন্তু-কাকাবাবুর

হঠাৎ কেন কোচবিহারে আগমন ! ইউ এফ ও রহস্য ?"

তারপর সে হা-হা করে জোরে হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "এখানকার ইউ ওফ ও'র খবর কাগজে ছাপা হয়েছে, রেডিয়োতেও বলেছে। এ-ব্যাপারে তোমাদের পুলিশের বক্তব্য কি শুধু অট্টহাসি ?"

অনির্বাণ বলল, "না কাকাবাবু, সত্যিকারের ইউ এফ ও দেখা গেলে তো আমিই ছবি তুলতাম। জানেনই তো, গ্রামের লোক একটা কিছু হুজুগ পেলেই মেতে ওঠে। তিলকে তাল করে। ওটা একটা আর্মির হেলিকপটার। আমি নিজে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বনবাজিতপুরের মতন একটা নগণ্য গ্রামে আর্মির হেলিকপটার প্রায়ই মাঝরাত্তিরে এসে চক্কর দেয় কেন ?"

অনির্বাণ বলল, "ওই হেলিকপটার চালায় কর্নেল সমর চৌধুরী। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, বেশ মজার মানুষ। অনেক ব্যাপারে উৎসাহ আছে। টোবি দত্তর বাড়িতে নীল আলোটা কেন জ্বলে সেটা উনি দেখতে যান।"

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্তটাই বা কে ? আর নীল আলোর ব্যাপারটার কথাও তো কিছু কাগজে লেখেনি !"

অনির্বাণ বলল, "আসল কথাটাই তো লেখেনি ! টোবি দত্তকে নিয়েই যত কৌতূহলের সৃষ্টি। টোবি দত্তের অন্য একটা নাম আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সবাই টোবি দত্ত বলেই জানে। এই টোবি দত্তর বয়েস হবে পঞ্চাশ-বাহান্ন, বেশ লম্বা আর শক্ত চেহারার মানুষ। এককালে এই টোবি দত্তের বাড়ি ছিল দিনহাটায়, সেখানকার ইস্কুলে পড়ত, সাধারণ গরিবের ছেলে, ক্লাস নাইনে পড়তে-পড়তে হঠাৎ সে একদিন উধাও হয়ে যায়। নিরুদ্দেশ। তারপর পঁয়তিরিশ বছর কেটে গেছে, কেউ তার কোনও খোঁজখবর পায়নি। হঠাৎ গত বছর সে ফিরে এসেছে এখানে। এর মধ্যে তার বাবা-মা মারা গেছেন, আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। টোবি দত্ত এখন দারুণ বড়লোক। বিদেশের কোনও জায়গা থেকে অনেক টাকা রোজগার করেছে।"

সন্তু বলল, "এন আর আই ?"

কাকাবাবু বললেন, "আজকাল সব কিছুর সংক্ষেপে নাম দেওয়া চালু হয়ে গেছে। কোনটা যে কী, তা অনেক সময় বোঝা যায় না। এন আর আই মানে, যে-ভারতীয়কে বিশ্বাস করা যায় না, তাই না ! নন রিলায়েব্‌ল ইন্ডিয়ান !"

অনির্বাণ হেসে বলল, "এন আর আই মানে সবাই জানে নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান, যে-ভারতীয় বিদেশে থাকে। তবে এ-ক্ষেত্রে আপনার দেওয়া মানেটাই বোধ হয় ঠিক। টোবি দত্তর রকমসকম কিছুই বোঝা যায় না। পুলিশকেও সে নাজেহাল করে দিতে পারে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "পুলিশের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ? সে কোনও অপরাধ-টপরাধ করেছে নাকি ?"

অনির্বাণ বলল, "না, সেরকম কিছু করেনি। টোবি দত্ত অনেক টাকা খরচ করে বনবাজিতপুর গ্রামে মস্ত বড় একটা বাড়ি বানিয়েছে। বাড়িটা প্রায় দুর্গের মতন। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "লোকে ইচ্ছেমতন বাড়ি বানাবে, তাতে পুলিশের কী বলার আছে ?"

অনির্বাণ বলল, "একটা অতি সাধারণ গ্রামে অত বড় একটা বাড়ি বানাবার কোনও মানে হয় ? সে-বাড়িতে সে একা থাকে। গ্রামের কোনও লোকের সঙ্গে সে মেশে না। কাউকে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেয় না। এতে কৌতূহল তো হবেই। দিনহাটার সুনীল গোপ্পী নামে একজন লোক ওই টোবি দত্তের সঙ্গে ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়ত। সেই সুনীল গোপ্পী একদিন রাস্তায় টোবি দত্তকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী রে টোবি, এতদিন কোথায় ছিলি ?' টোবি দত্ত তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেছিল, 'কে আপনি ? আপনাকে আমি মোটেই চিনি না। আমার ডাকনাম ধরে ডাকার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে ?'"

কাকাবাবু বললেন, "এতে বোঝা যাচ্ছে লোকটির স্বভাব রুক্ষ ধরনের। তা হলেও তো পুলিশের মাথা গলাবার কোনও কারণ নেই।"

অনির্বাণ বলল, "সেটাও মেনে নিচ্ছি। আমি এমনই সাধারণ ভদ্রতার সঙ্গে ওর সঙ্গে একদিন কথা বলতে গিয়েছিলাম। আমাকেও পাত্তা দেয়নি। তবু পুলিশের মাথা গলাবার একটা কারণ আছে। টোবি দত্তর বাড়িতে মাঝে-মাঝে রাত্তিরবেলা একটা অদ্ভুত নীল রঙের আলো জ্বলে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অদ্ভুত নীল আলো ! ব্যাপারটা কী ?"

অনির্বাণ বলল, "আলোটা জ্বলে ওপরের দিকে, আকাশের দিকে। দারুণ জোর আলো। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, একটা নীল আলোর শিখা মেঘ-টেঘ ফুঁড়ে একেবারে মহাশূন্যে চলে গেছে। এমন তীব্র আলো কী করে জ্বালে তা কে জানে !"

কাকাবাবু খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বললেন, "হুঁ, কী করে জ্বালে এবং কেন জ্বালে। আকাশে আলো দেবার দায়িত্ব তাকে কে দিয়েছে ?"

অনির্বাণ বলল, "ঠিক এই প্রশ্নগুলোও আমার মাথাতেও এসেছিল। সেইজন্য আমি দ্বিতীয়বার টোবি দত্তর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ওর বাড়িতে। দরজা খুলেই আমাকে কী বলল জানেন ?"

একটু থেমে, সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে অনির্বাণ আবার বলল, "টোবি দত্ত আমাকে দেখেই বলল, গেট আউট !"

সন্তু হেসে ফেলল।

কাকাবাবু বললেন, "লোকটার সাহস আছে স্বীকার করতেই হবে। তুমি এই জেলার পুলিশের বড় কত্তা, তোমাকে গ্রাহ্যই করল না ?"

অনির্বাণ বলল, "আমারও হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আমার মুখের ওপর কেউ এরকম চোটপাট করে না। আমি বললাম, 'মশাই রেগে যাচ্ছেন কেন ? আপনার কাছে এমনই দু-একটা ব্যাপার জানতে এসেছি।' তাতে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে আমি রাজি নই।' তারপরেও আমি নরম করে বললাম, 'আপনার ছাদে একটা জোর আলো জ্বলে, ওই আলোটা একবার দেখে যেতে চাই।' তাতে সে বলল, 'আমার ছাদে আমি যেমন ইচ্ছে আলো জ্বালাব, তাতে আপনার কী ? যাকে-তাকে আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেবই বা কেন ?' এই বলে সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল !"

কাকাবাবু বললেন, "লোকটি বেআইনি কিছু বলেনি। যে-কেউ ইচ্ছে করলেই বাড়ির ছাদে আলো জ্বালতে পারে। সে আলো নীল হবে না লাল হবে, টিমটিম করে জ্বলবে কিংবা কতখানি জোরালো হবে, তা নিয়ে কোনও আইন নেই !"

অনির্বাণ বলল, "আমার সঙ্গে আরও দু'জন পুলিশ অফিসার ছিল, তারা তো আমাকে এরকম অপমানিত হতে দেখে রাগে ফুঁসছিল। একজন তো রিভলভার বের করে প্রায় গুলি করতে যায় আর কী ! আমি তাকে থামালাম। টোবি দত্ত লোকটা আইন জানে। সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া আমি তার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারব না। সে কোনও বেআইনি কাজ না করলে সার্চ ওয়ারেন্ট বের করব কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা মুখ চুন করে ফিরে এলে ?"

অনির্বাণ বলল, "তা ছাড়া আর উপায় কী বলুন ! টোবি দত্তর ওপর নজর রাখার জন্য আমি লোক লাগিয়েছি। তারপর একটা পার্টিতে আমার কাছ থেকে এই ঘটনা শুনে কর্নেল সমর চৌধুরীর কৌতূহল জাগল। জানেনই তো, আমাদের এখানে কাছাকাছি আর্মির একটা বড় বেস আছে। সমর চৌধুরী চুপিচুপি হেলিকপটার নিয়ে টোবি দত্তর বাড়ির ওপর ঘুরপাক খেয়ে এসেছেন কয়েকবার। কিছুই দেখতে পাননি। হেলিকপটারটা কাছাকাছি এলেই আলোটা নিভে যায়। তারপর মিশমিশে অন্ধকার। দেখা যায় না কিছুই। গ্রামের লোক টোবি দত্তর বাড়ির আলোটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না, কিন্তু রাত্তিরবেলা ওই হেলিকপটারটা দেখলেই ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করে !"

কাকাবাবু বললেন, "আর একখানা ইউ এফ ও ভেজাল বলে প্রমাণিত হল। ওরে সন্তু, আমাদের আর ইউ এফ ও দেখা হল না ! তবে টোবি দত্তর বাড়ির নীল আলোটা একবার দেখা যেতে পারে, কী বলো !"

অনির্বাণ বলল, "আমি আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব সেখানে।"

॥ ৩ ॥

বিকেলবেলা কাকাবাবু সন্তুকে কোচবিহার শহরটা ঘুরিয়ে দেখালেন।

এককালে শহরটি যে বেশ সুন্দর ছিল, তা এখনও বোঝা যায়। সোজা, টানা-টানা রাস্তা, মাঝে-মাঝে একটা দিঘি, পুরনো আমলের কিছু-কিছু বাড়ি দেখলে রাজা-রানিদের আমলের কথা মনে পড়ে। আর রাজবাড়িটা তো রূপকথার রাজাদের বাড়ির মতন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সন্তুর মনে হল, যেন একপাল হাতির পিঠে চড়ে চলেছেন রাজার পাত্রমিত্র, একেবারে প্রথম হাতির ওপর বসে আছেন মহারাজ, মাথায় সোনার মুকুট, তাঁর কোমরে তলোয়ারের খাপে হিরে বসানো, পদাতিকরা কাড়া-নাকাড়া আর ভেঁপু বাজাচ্ছে। ইস, সন্তু কেন সেই যুগে জন্মাল না!

সন্ধেবেলা সার্কিট হাউসে ফেরার পথে কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ সন্তু, ওকে একটু দূরে-দূরে রাখতে হবে। সর্বক্ষণ একজন পুলিশের কত্তা সঙ্গে থাকলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না।"

পরদিন সকালে কাকাবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়ার পর অনির্বাণ নিয়ে এল জিপের বদলে একটা সাদা রঙের গাড়ি, সে নিজেও পুলিশের পোশাক পরেনি, বডিগার্ডও আনেনি সঙ্গে। যেন সে ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে।

বনবাজিতপুর গ্রামটার নাম কোনও ম্যাপে না থাকলেও জায়গাটা হেলাফেলা করার মতন নয়। জঙ্গলের ধারে বেশ পুরনো একটি গ্রাম, অনেক পাকা বাড়ি আছে, তার মধ্যে কয়েকটি একেবারে ভাঙা। একসময় কিছু অবস্থাপন্ন লোকের বাস ছিল এখানে। রাস্তাটাস্তা যথেষ্ট পরিষ্কার। একটা ইস্কুল আছে।

গ্রামের কাছে পৌঁছে অনির্বাণ বলল, "এখানকার ইস্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। চলুন আগে তাঁর কাছে যাই, অনেক কিছু শোনা যাবে। আজ ছুটির দিন, বাড়িতেও পাওয়া যাবে তাঁকে।"

হেডমাস্টারের নাম অমিয়ভূষণ দাস, তাঁর বাড়িটি কাঠের তৈরি দোতলা, সামনে ফুলের বাগান। পুলিশের বড়কর্তাকে দেখে তিনি একেবারে বিগলিত হয়ে গেলেন। কাকাবাবু আর সন্তুর নাম উনি আগে শোনেননি, ওঁদের বিষয়ে কিছু জানেন না।

দোতলার ওপর অর্ধেকটা চাঁদের মতন বারান্দা, সেখানে নিয়ে গিয়ে তিনি বসালেন অতিথিদের। বারান্দায় অনেক বেতের চেয়ার ছড়ানো, মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল, তার পায়াগুলো দেখে সন্তু চমকে উঠল। সেগুলো সব আসল হাতির পা। সন্তুর মনোযোগ দেখে অমিয়ভূষণ বললেন, আমার ছোটভাই চা-বাগানে কাজ করে, সে ওই টেবিলটা পাঠিয়েছে।"

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, "বলুন অমিয়বাবু, এখানকার নতুন খবর কী?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "এখানকার থানার দারোগা কাল এসে বলে গেল,

রাত্তিরবেলা যে-জিনিসটা এখানকার আকাশে ঘুরপাক খায়, সেটা নাকি হেলিকপটার ? গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করছে না। হেলিকপটার তো অনেকেই আগে দেখেছে। এখানে যেটা আসে সেটা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোয়। তারপর হঠাৎ এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়।"

অনির্বাণ বলল, "গ্রামের লোকরা যাই বলুক, আপনার কী মনে হয় ?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "আমার অনিদ্রা রোগ আছে, তাই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়। আমি বার দু-এক দেখেছি। আমি কিন্তু জিনিসটা না দেখার আগে হেলিকপটারের কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু চোখে দেখলাম অন্যরকম। যেন একটা উড়ন্ত হাঙর সারা গায়ে আলো ঝলসাচ্ছে, আর মাথা ও লেজের কাছ থেকে বেরোচ্ছে ফোয়ারার মতন আগুনের ফুলকি। হেলিকপটার তো এরকম হয় না !"

অনির্বাণ বলল, "জিনিসটা এখানে তিন রাত্তির এসেছে। এখানকার আর্মির একজন কর্নেল সেই তিনবারই হেলিকপটার নিয়ে এখানে এসেছেন, সেটা আমি চেক করেছি।"

অমিয়ভূষণ ভুরু কুঁচকে বললেন, "তিনবার ? না তো, অন্তত পাঁচ-ছ'বার এসেছে। হ্যাঁ, পাঁচবার তো নিশ্চয়ই।"

কাকাবাবু বললেন, "আর্মির হেলিকপটার ছাড়াও আবার অন্য কিছু আসে নাকি ?"

অনির্বাণ বলল, "তা সম্ভব নয়। এঁদের ভুল হচ্ছে, তিনবারই এসেছে। মাস্টারমশাই, টোবি দত্তর খবর কী ? ওর ছাদে এখনও সেই নীল আলো জ্বলে ?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "তা জ্বলে। আমার মনে হয় কী জানেন, টোবি দত্ত কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে। অন্য কোনও গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়।"

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, "অন্য কোনও গ্রহে প্রাণী আছে তা হলে ?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "নেই ? সে কি মশাই ? আকাশে লক্ষ-কোটি গ্রহ-নক্ষত্র আছে। তার আর কোথাও মানুষ নেই কিংবা অন্য প্রাণী নেই, শুধু পৃথিবীতেই আছে ?"

অনির্বাণ তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "না, না, আমি তা বলিনি। এত গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে অনেক রকম প্রাণী তো থাকতেই পারে। কিন্তু এ-পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোনও বৈজ্ঞানিক কোনও সন্ধান পাননি, টোবি দত্ত জেনে গেল ? আলো জ্বালিয়ে তাদের ডাকছে ?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "হতেও তো পারে। একটা কথা ভাবুন তো, টোবি দত্ত যদি সত্যিই এটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারে, তা হলে আমাদের কোচবিহারের কত নাম হয়ে যাবে। সারা পৃথিবীর বড়-বড় বৈজ্ঞানিকরা এখানে

ছুটে আসবেন !”

এই সময় একজন কাজের লোক বাড়ির ভেতর থেকে নারকোল গুঁড়ো দিয়ে চিঁড়েভাজা মাখা আর চা নিয়ে এল।

কাকাবাবু চামচে করে খানিকটা চিঁড়েভাজা মুখে দিয়ে বললেন, “বাঃ, দিব্যি খেতে তো ! অমিয়বাবু, আপনার বাড়িতে আর কে কে আছেন ?”

অমিয়ভূষণ বললেন, “এখন বাড়ি প্রায় খালি। আমার স্ত্রী স্বর্গে গেছেন। আমার ছোট ভাইয়ের কথা তো বললাম, চা-বাগানে কাজ করে। এখন আমার সঙ্গে থাকে শুধু আমার ছোট মেয়ে মণিকা।”

কাকাবাবু বললেন, “ভারী সুন্দর বাড়িটা আপনার। আপনাদের গ্রামটাও নিরিবিলি, ছিমছাম, আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ইচ্ছে করছে, এখানে তিন-চারদিন থেকে যাই। গ্রামে থাকার তো সুযোগ হয় না। এখানে হোটেল কিংবা ডাকবাংলোও নেই। আপনার বাড়িতে একখানা ঘর পেতে পারি কয়েক দিনের জন্য ? কিছু ভাড়াও অবশ্যই দেব।”

অমিয়ভূষণ জিভ কেটে বললেন, “ছি ছি ছি, ভাড়ার কথা তুলছেন কেন ? আপনারা অতিথি হয়ে থাকবেন। আমাদের গ্রামে যে থাকতে চাইছেন, এটাই তো আমাদের সৌভাগ্য !”

কাকাবাবু অনির্বাণের দিকে ফিরে বললেন, “তা হলে আমাদের সুটকেসদুটো সার্কিট হাউস থেকে আনাতে হবে যে !”

অনির্বাণ বলল, “সে আমি ফিরে গিয়ে পাঠিয়ে দেব। তা হলে এখন চলুন, টোবি দত্তর বাড়ির চারপাশটা একবার ঘুরে দেখি। তারপর সমর চৌধুরীর সঙ্গেও আপনার আলাপ করিয়ে দেব। বিকেলবেলা এখানে চলে আসবেন।”

কাকাবাবুরা তখনকার মতন বিদায় নিলেন অমিয়ভূষণের কাছ থেকে।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু বললেন, “আসবার সময় একটা ব্রিজ পার হয়ে এসেছি। এই গ্রামের পাশে একটা নদী আছে। চলো, সেই নদীটার ধারে গিয়ে একটু বসি।”

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, “টোবি দত্তর বাড়ি দেখতে যাবেন না ?”

কাকাবাবু বললেন, “না। শুধু-শুধু বাড়িটা দেখে কী হবে ? রাত্তিরবেলা আলোটা দেখব।”

“নদীর ধারে গিয়ে কী করবেন ?”

“কিছু করব না। নদীটা দেখব। সব সময়েই কিছু না কিছু করতে হবে নাকি ?”

গাড়িটা নিয়ে আসা হল নদীর ধারে। সরু নদী, দু'পাশে বড় বড় পাথর, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জল। স্রোত আছে। সন্তু কাছে গিয়ে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে দেখল বেশ ঠাণ্ডা।

কাকাবাবু একটা পাথরের ওপর বসে ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে বললেন,

“আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। এর পরের লাইনগুলো কী বলো তো অনির্বাণ ?”

অনির্বাণ বলল, “এই রে, আমি তো বাংলা কবিতা পড়িনি। আমার ইংলিশ মিডিয়াম ছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “বাঙালির ছেলে হয়ে তুমি এই কবিতাটাও জানো না ? সন্তু, তুই বলতে পারবি ?”

সন্তু বলল, “হ্যাঁ, ‘পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি, দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি...’”

কাকাবাবু বললেন, “ওই দ্যাখ তো, এখন কে নদী পার হচ্ছে ?”

অনির্বাণ চমকে উঠে বলল, “ওই তো টোবি দত্ত !”

নদীতে হাঁটু জলের বেশি নেই, হেঁটে নদী পার হয়ে আসছে একজন লম্বা মতন মানুষ, গায়ের রং কালো, মাথার চুল কাঁচা-পাকা। জিন্‌সের ওপর লাল রঙের গেঞ্জি পরা। হাতের মাস্‌ল দেখলেই বোঝা যায়, লোকটির গায়ে প্রচুর শক্তি আছে।

লোকটির সঙ্গে একটি কুকুর। খুব বড় নয়, মাঝারি, কান দুটো ঝোলা, গায়ে প্রচুর চকোলেট রঙের লোম। কুকুরটা মহা আনন্দে জলের ওপর দিয়ে লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে।

টোবি দত্ত কাকাবাবুদের বেশ কাছাকাছিই এপারে এসে উঠল। এঁদের দিকে তাকাল না একবারও। এখানে যে কয়েকজন মানুষ রয়েছে, তা যেন গ্রাহ্যই করছে না সে। তার খালি পা, প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গোটানো, কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাগ।

টোবি দত্ত ডান দিকে গিয়ে হাঁটতে লাগল নদীর ধার দিয়েই। কুকুরটাও সঙ্গে-সঙ্গে গেল খানিকটা, তারপর হঠাৎ ফিরে এল। জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সন্তু, কুকুরটা হিংস্রভাবে ডাকতে ডাকতে তেড়ে গেল সন্তুর দিকে।

সন্তু প্রথমটা বুঝতে পারেনি, হাসিমুখেই তাকিয়ে ছিল কুকুরটার দিকে। হাত বাড়িয়েছিল আদর করার জন্য। কিন্তু কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়াতে গেল তাকে।

সন্তু এক ঝটকায় ঠেলে দিল কুকুরটাকে।

সেটা একবার উলটে ডিগবাজি দিয়েই আবার উঠে সন্তুর বুকের দিকে এক লাফ দিল।

অনির্বাণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “এ কী, কুকুরটা পাগল হয়ে গেল নাকি ?”

টোবি দত্তও থমকে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে।

অনির্বাণ চেঁচিয়ে বলল, “ও মশাই, আপনার কুকুর সামলান। ছেলেটাকে কামড়ে দেবে যে !”

সন্তুর সঙ্গে কুকুরটার রীতিমত লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কুকুরটা যাতে দাঁত

বসাতে না পারে, সেজন্য ওর পেটে ঘুসি মেরে-মেরে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, কুকুরটাও ফিরে আসছে সঙ্গে-সঙ্গে। সন্তুর হাত বা পায়ে নয়, মুখেই কামড়ে দিতে চায় কুকুরটা।

কাকাবাবু প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সোজা হয়ে বসে আছেন। একবার টোবি দত্তর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। কী অসম্ভব ঠাণ্ডা আর স্থির সেই দৃষ্টি। চোখের যেন পলক পড়ে না।

টোবি দত্ত দু'বার শিস দিল। তারপর ডাকল, "ডন, ডন, কাম হিয়ার !"

কুকুরটা তাতে ভ্রূক্ষেপও করল না।

অনির্বাণ একটা বড় পাথর তুলে নিয়েও ছুড়ে মারতে ভয় পাচ্ছে। যদি সন্তুর মাথায় লাগে।

সন্তু একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে জলের মধ্যে হাঁচড়-পাঁচড় করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কুকুরটা এক লাফে উঠে পড়েছে সন্তুর ঘাড়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে পর-পর দু'বার গুলির শব্দ হল। কুকুরটা ছিটকে পড়ে গেল বেশ খানিকটা দূরে।

অনির্বাণ ঘুরে দেখল টোবির দিকে। কিন্তু গুলি সে করেনি। কাকাবাবুর হাতে রিভলভার। তাঁর নিশানা অব্যর্থ।

কাকাবাবু খানিকটা আফসোসের সুরে বললেন, "কুকুর মারতে আমার খুব খারাপ লাগে। কিন্তু পাগল হয়ে গেলে না মেরে তো উপায় নেই।"

টোবি দত্ত নদীতে নেমে গিয়ে মৃত কুকুরটাকে তুলে নিয়ে এল দু' হাতে। কাকাবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

অনির্বাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "আপনি ঠিক কাজই করেছেন। দু-তিনদিন ধরে আমার এই কুকুরটা অদ্ভুত ব্যবহার করছিল। সম্ভবত ওকে কেউ বিষ খাইয়েছে। ছেলেটিকে কামড়ে দিলে খুব খারাপ হত। আমার কুকুর আগে কখনও কাউকে এইভাবে কামড়াতে যেত না।"

কাকাবাবু বললেন, "এত সুন্দর দেখতে কুকুরটা ! আমি খুব দুঃখিত।"

টোবি দত্ত আর কোনও কথা না বলে সেই মরা কুকুর কোলে নিয়ে চলে গেল।

সন্তু উঠে এসেছে জল থেকে। কাকাবাবু বললেন, "দাঁতটাঁত বসাতে পারেনি তো ? শরীরের কোথাও রক্ত বেরিয়েছে ?"

সন্তু বলল, "না, সেসব কিছু হয়নি।"

অনির্বাণ বলল, "তবু একবার ডাক্তার দেখানো দরকার। পাগলা কুকুরের জিভের লালা লাগলেও মহা বিপদ হতে পারে। সন্তু, তোমাকে ইঞ্জেকশন নিতে হবে চোদ্দটা !"

কাকাবাবু বললেন, "আজকাল চারটে নিলেও চলে। একজন ডাক্তারের

পরামর্শ নেওয়াই উচিত। কী ঝামেলা বলো তো, এমন চমৎকার নদীর ধারে বসে আছি, এমন সময় একটা পাগলা কুকুর এসে উপদ্রব শুরু করল!"

সন্তুর জামা প্যান্ট সব জলে ভিজে গেছে। সে মুখে আর গায়ে হাত বুলিয়ে দেখছে, কোথাও কুকুরটা আঁচড়ে দিয়েছে কি না!

অনির্বাণ বলল, "আমি তো দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কুকুরটা যদি সন্তুকে কামড়ে শেষ করে দিত? টৌবি দত্ত একটা পাগলা কুকুর সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে!"

কাকাবাবু বললেন, "এই ব্যাপারে অন্তত আমি ওকে দোষ দিতে পারি না। পাগলা কুকুর তো মনিবকেও কামড়ে দেয়। ও নিশ্চয়ই জানত না কুকুরটা সত্যি পাগল হয়ে গেছে। ওর ধারণা, কুকুরটাকে কেউ বিষ খাইয়েছে।"

অনির্বাণ বলল, "ওর কুকুরকে কে বিষ খাওয়াবে?"

কাকাবাবু বললেন, "তা আমি কী করে জানব! যাই হোক, চলো আগে কোনও ডাক্তারের কাছে যাই।"

কোচবিহার শহরের দিকে না গিয়ে গাড়ি ছুটল অন্যদিকে। হাইওয়ের পাশেই এক জায়গায় সেনাবাহিনীর বিশাল ছাউনি। সেখানে ওদের নিজস্ব পোস্ট অফিস, হাসপাতাল সব আছে।

সেই হাসপাতালের ডাক্তার শৈবাল দাশগুপ্তের সঙ্গে অনির্বাণের অনেকদিনের চেনা। হাসপাতালে না গিয়ে শৈবাল দাশগুপ্তের বাড়িতে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে শোনা গেল, তিনি জলপাইগুড়ি শহরে গেছেন, একটু পরেই ফিরবেন।

শৈবাল দাশগুপ্তের স্ত্রী মালবিকাও ডাক্তার। তিনি বাড়িতেই রয়েছেন। খবর পেয়ে তিনি এসে সন্তুকে পরীক্ষা করলেন ভাল করে। তারপর বললেন, "দেখুন, যতদূর মনে হচ্ছে, ছেলেটির কোনও বিপদ হবে না, ইঞ্জেকশনের দরকার নেই। তবে, আমি তো এই রোগের চিকিৎসা করি না, উনি এসে আর একবার দেখবেন। আপনারা বসুন না!"

অনির্বাণ বলল, "কর্নেল সমর চৌধুরীকে একবার খবর দেওয়া দরকার। আপনার বাড়ি থেকে টেলিফোন করা যায় না?"

মালবিকা বললেন, "হ্যাঁ, কেন যাবে না! আপনিই ফোন করুন।"

এর মধ্যেই এসে পড়লেন ডাক্তার শৈবাল দাশগুপ্ত। ফরসা, পাতলা চেহারা, হাসিখুশি মানুষ। সব ব্যাপারটা শুনে তিনি সন্তুকে বললেন, "জামা খুলে শুয়ে পড়ো। আমি আর-একবার দেখি!"

তিনি সন্তুকে পরীক্ষা করে দেখতে-দেখতেই একটা ফোন এল। সেই ফোনে কথা বলে এসে তিনি জানালেন, "যাক, ভালই হয়েছে। এই ঘটনাটা বনবাজিতপুরে ঘটেছে তো? সেখানকার টৌবি দত্ত নামে একজন লোক একটা কুকুরের মাথা কেটে নিয়ে এসে হাসপাতালে জমা দিয়েছেন। কুকুরটা পাগল

হয়েছিল কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে চান। হাসপাতাল থেকে আমাকে জানাল। টোবি দত্ত ঠিক কাজই করেছেন। কুকুর হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে সে-বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের ইঞ্জেকশন নেওয়া দরকার। কাউকে আদর করে চেটে দিলেও তার জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি যে খুব ভয় দেখাতে শুরু করলেন!"

ডাক্তার বললেন, "না, না, সেরকম ভয়ের কিছু নেই। কালকেই কুকুরের মাথাটা টেস্ট করে জানা যাবে। আজ আমি একে অন্য একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে দিচ্ছি।"

এই ডাক্তার-দম্পতির এক ছেলে দার্জিলিংয়ে পড়ে। সন্তুরই সমবয়েসী। মালবিকা দাশগুপ্ত সন্তুর ভিজে জামা-প্যান্ট ছাড়িয়ে জোর করে নিজের ছেলের প্যান্ট, শার্ট পরিয়ে দিলেন। সন্তুর গায়ে দিব্যি ফিট করে গেল। তবে অন্য লোকের জামাটামা পরলে নিজেকেও অন্যরকম মনে হয়।

অনির্বাণ এর মধ্যে ফোন করল কর্নেল সমর চৌধুরীকে। তিনি সবাইকে অনুরোধ করলেন তাঁর বাড়িতে চলে আসতে। ওখানেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া হবে।

ডাক্তার-দম্পতি সেখানে যেতে চান না। তাঁদের অন্য কাজ আছে। সমর চৌধুরী টেলিফোনে ওঁদের সঙ্গেও কথা বললেন, তবু মাপ চেয়ে নিলেন ওঁরা।

একটু পরেই আর-একটা ফোন এল। রিসিভার তুলে একটুক্ষণ কথা বলেই রেখে দিলেন শৈবাল দাশগুপ্ত। মুখটা বিকৃত করে বললেন, "আবার একটা খুনের কেস এসেছে হাসপাতালে। একজন লোককে গলা মুচড়ে মেরে ফেলা হয়েছে।"

অনির্বাণ বলল, "তৃতীয় খুন!"

॥ ৪ ॥

কর্নেল সমর চৌধুরীর বাংলোটি প্রকাণ্ড। একতলা-দোতলায় একই রকম গোল বারান্দা, সামনের বাগানে একদিকে ফুলের গাছ, অন্যদিকে ফলের গাছ। বাইরের লোহার গেট থেকে বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত লাল সুরকির রাস্তা। বাগানে একটা ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন কর্নেল সমর চৌধুরী। তাঁকে দেখলে বাঙালি বলে মনে হয় না। কাবুলিওয়ালাদের মতন লম্বা-চওড়া চেহারা, ফরসা রং, নাকের নীচে মোটা থেকে সরু হয়ে আসা মিলিটারি গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। তিনি পরে আছেন একটা ড্রেসিং গাউন, দাঁত দিয়ে কামড়ে আছেন পাইপ।

কাকাবাবুদের দলটিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, "আসুন,

আসুন ! আপনিই মিস্টার রায়চৌধুরী ? আপনি খোঁড়া লোক হয়েও পাহাড়-পর্বতে ওঠেন শুনেছি। আশ্চর্য ব্যাপার ! কী করে পারেন ?”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমি কিন্তু অনেক কিছুই পারি না। কেউ তাড়া করলে দৌড়ে পালাতে পারি না। তাড়াতাড়ি কোনও সিঁড়ি দিয়ে নামতে-উঠতে পারি না। গাড়ি চালাতে পারি না !”

অনির্বাণ বলল, “রিভলভারে কী সাঙ্ঘাতিক টিপ। এরকম আমি আগে দেখিনি। ঠিক অরণ্যদেবের মতন !”

সমর চৌধুরী ভুরু তুলে বললেন, “তাই নাকি ?”

কাকাবাবু বললেন, “খোঁড়া লোকদের হাত দুটোই তো সম্বল।”

সমর চৌধুরী বললেন, “কত লোকেরই তো দুটো হাত আর দুটো পা থাকে, কিন্তু তাদের কি আপনার মতন সাহস থাকে ?”

অনির্বাণ সন্তুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, “এই ছেলেটিরও দারুণ সাহস। কীভাবে একটা পাগলা কুকুরের সঙ্গে লড়ে গেল !”

সমর চৌধুরী বললেন, “অনির্বাণ, তুমি লোকটাকে অ্যারেস্ট করলে না কেন ? একটা পাগলা কুকুর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল !”

অনির্বাণ বলল, “ব্যাপারটা তো আমাদের চোখের সামনে ঘটল। আমরা ওপরে বসে ছিলাম, আর সন্তু ছিল জলের ধারে। কুকুরটা যে হঠাৎ ওইভাবে ফিরে এসে সন্তুকে আক্রমণ করবে, তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। কুকুরের মালিক কোনও ইশারা-ইঙ্গিত করেনি। সুতরাং মালিককে দোষ দেওয়া যায় না।”

সমর চৌধুরী ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, “তুমি অন্য কোনও ছুতোয় ওকে ধরতে পারো না ? থানায় নিয়ে গিয়ে ভাল করে পেটালেই ওর পেট থেকে সব কথা বেরিয়ে পড়বে। ব্যাটার নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে। রাত্তিরবেলা ওসব আলো-ফালো জ্বেলে কী করে ?”

অনির্বাণ বলল, “আপনারা কি মনে করেন পুলিশের অঢেল ক্ষমতা ? নির্দিষ্ট অভিযোগ না পেলে অ্যারেস্ট করব কী করে ? কোর্টে তো নিতেই হবে, তখন জজসাহেব আমাদের ধমকে দেবেন !”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কর্নেল সাহেব, আপনি হেলিকপটার নিয়ে গিয়ে কিছু দেখতে পাননি ?”

সমর চৌধুরী বললেন, “কিচ্ছু না ! লোকটা মহা ধুরন্ধর। আমার চপারের আওয়াজ পেলেই সব কিছু নিভিয়ে দেয়। তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর কিছুই দেখা যায় না। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম।”

“আপনি ক’বার গিয়েছিলেন ?”

“দু’বার না তিনবার ? হ্যাঁ, তিনবার।”

“গ্রামের লোক বলছে অন্তত পাঁচবার।”

"তাই বলছে ? আরও বাড়াবে। এর পর বলবে সাতবার, তারপর দশবার। গ্রামের লোক তো সব কিছুই বাড়িয়ে বলে।"

"আবার যাবেন ?"

"না, গিয়ে তো কোনও লাভ হচ্ছে না। শুধু-শুধু তেল পুড়িয়ে কী হবে। তবে আপনি যদি যেতে চান, তা হলে একবার নিয়ে যেতে পারি।"

"সে পরে ভেবে দ্যাখা যাবে। আজ রাত্তিরে আমি আলোটা দেখি।"

অনির্বাণ বলল, "আমাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। আপাতত আমি টোবি দত্তকে নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছি না। সে কোনও ক্রাইম করেনি। কিন্তু এই পর-পর খুনের ঘটনা খুব ভাবিয়ে তুলেছে। খুন আর অস্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে বিভিন্ন গ্রামে। কিন্তু ধরনটা এক। কোচবিহারে এরকম খুনটুন আগে হত না। শান্ত জায়গা।"

কর্নেল চৌধুরী তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা করলেন। খেয়েই অনির্বাণ কাকাবাবুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওঁদের বনবাজিতপুরে পৌঁছে দিয়ে সে ফিরে গেল কোচবিহারে। সন্ধের সময় গাড়ির ড্রাইভার সুটকেস দুটো দিয়ে যাবে।

হেডমাস্টারমশাই এর মধ্যেই দোতলার একখানা ঘর গুছিয়ে রেখেছেন। যে-কোনও জিনিসের দরকার হলে কাজু নামে একজন ভৃত্যকে ডাকলেই সে ব্যবস্থা করবে। কাকাবাবুদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

পাশাপাশি দু'খানা খাট। তার একটাতে শুয়ে পড়ে কাকাবাবু বললেন, "আজ বোধ হয় রাত জাগতে হবে। এখন একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না। সন্তু, শুয়ে পড়। তোর জ্বরটর আসছে না তো ?"

সন্তু বলল, "না। আমার কিচ্ছু হয়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই জলের মধ্যে ছিলি তো, তাতে খানিকটা সুবিধে হয়েছে। কুকুরটার লালার বিষ তোর গায়ে লাগতে পারেনি। আচ্ছা সন্তু, তুই টোবি দত্তকে তো দেখলি। দেখে তোর কী ধারণা হল ?"

সন্তু বলল, "সায়েন্টিস্ট বা বিজ্ঞানী মনে হল না।"

"কেন ? বিজ্ঞানীরা খানিকটা আধ-পাগলা কিংবা আপন-ভোলা ধরনের হয় বলে তোর ধারণা ? সে তো গল্পের বইয়ের চরিত্র। একালের বড়-বড় বিজ্ঞানীরা খুব ডিসিপ্লিন্‌ড হয়। তাদের চেহারা কিংবা সাজপোশাকও হয় সাধারণ মানুষের মতন।"

"তবু কেন যেন মনে হল, জ্ঞানী লোক নয়।"

"বিদেশ থেকে অনেক টাকা নিয়ে ফিরেছে। বিদেশে কী কাজ করত সেটা কেউ জানে না।"

"স্মাগলার হতে পারে।"

"সেরকম একটা সম্ভাবনা আছে বটে ! এখান থেকে অন্য দেশের বর্ডার খুব দূরে নয়। কিন্তু স্মাগলার হলে রাত্তিরবেলা ছাদে ওরকম আলো জ্বালিয়ে রাখবে কেন ? ওদের তো অন্ধকারেই সুবিধে।"

"অন্য স্মাগলারদের কাছে নিশ্চয়ই সিগন্যাল পাঠায়। তারা ওই আলো দেখে বুঝতে পারবে যে ঠিক সময় হয়েছে।"

"তাতে যে পুলিশেরও নজর পড়বে। যেমন অনির্বাণরা খোঁজখবর নিচ্ছে। নিশ্চয়ই আশেপাশে পাহারাও রেখেছে।"

এই সময় দরজার কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েস, একটা ডুরে শাড়ি পরা। এক হাতে খানিকটা আচার, তাই চেটে-চেটে খাচ্ছে।

একটুক্ষণ সে এমনই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, "এই, তোমার নাম বুঝি সন্তু ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে ?"

মেয়েটি বলল, "বাঃ, আমি বুঝি বই পড়ি না ? কাকাবাবুকে তো দেখেই চিনতে পেরেছি। সবুজ দ্বীপের রাজা-তে এইরকম ছবি ছিল।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নিশ্চয়ই মণিকা ?"

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে বলল, "আপনি কী করে জানলেন ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "আমি বই না পড়েও জানতে পারি।"

মণিকা সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "এই, তুমি আচার খাবে ? খুব ভাল কুলের আচার। আমি নিজে বানিয়েছি।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, খেতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমায় দেবে না ?"

মণিকা বলল, "যাঃ, বৃদ্ধ লোকেরা আচার খায় নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, তুমি আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিলে ? আমি কিন্তু ততটা বৃদ্ধ হইনি। তা ছাড়া তুমি জানো না, বয়স্ক লোকদের অনেক ছেলেমানুষি লোভ থাকে। আমি আচার খেতে খুব ভালবাসি।"

মণিকা বলল, "আমার বাবা খায় না। একটু খেলেই দাঁত টকে যায়। অবশ্য আমার বাবা তোমার মতন হিমালয় পাহাড়েও ওঠেনি, জাহাজে করে সমুদ্রেও যায়নি।"

মণিকা এক ছুটে গিয়ে একটা বাটিতে অনেকটা আচার নিয়ে এল। সন্তুর সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবুও সেই আচার তারিয়ে-তারিয়ে খেতে লাগলেন।

মেয়েটির মুখখানার মতন গলার আওয়াজও খুব মিষ্টি। কিন্তু তার তৈরি আচার বেশ ঝাল।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে সে বলল, "তোমরা বুঝি এখানে কোনও ডাকাত ধরতে এসেছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "না গো, মণিকা, আমরা এমনিই তোমাদের বাড়িতে থাকতে এসেছি। তোমাদের এখানকার আকাশে রাত্তিরবেলা কী যেন দেখা যায়, সেটা দেখতে এসেছি। তুমি সেটা দেখেছ?"

চোখ-মুখ ঘুরিয়ে মণিকা বলল, "হ্যাঁ দেখেছি। মস্ত বড়, জটায়ু পাখির মতন, সারা গায়ে আলো, মাঝে-মাঝে পাখা ঝাপটায় আর মুখ দিয়ে আগুন ছড়ায়। আর কী দারুণ শব্দ হয়, আমি ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলেছিলুম!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কখনও হেলিকপটার দেখেছ, মণিকা?"

মণিকা বলল, "তাও দেখেছি। দিনহাটায় মামাবাড়িতে গেছিলাম, সেখানে একজন মন্ত্রী এসেছিলেন হেলিকপটারে, খেলার মাঠে নেমেছিল। আমাদের এই পাখিটা কিন্তু সে রকম মোটেই না। সবাই বলে, এই পাখিটা আসে মঙ্গলগ্রহ থেকে। ওর পিঠে বেঁটে-বেঁটে মানুষ বসে থাকে। আমি অবশ্য মানুষগুলো দেখিনি।"

সন্তু আবার বলল, "মঙ্গলগ্রহের বেঁটে-বেঁটে মানুষরা তোমাদের গ্রামে কী করে?"

মণিকা বলল, "তারা টোবি দত্তর সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেইজন্যই তো ছাদে আলো জ্বেলে রাখে।"

"তোমাদের বাড়ি থেকে টোবি দত্তর ছাদের আলোটা দেখা যায়?"

"না, গাছপালার আড়াল হয়ে যায়। পুকুরধারে গেলে দেখা যায়। বড় রাস্তায় গেলেও দেখা যায়। আরও অনেক জায়গা থেকে দেখতে পারো।"

"টোবি দত্তর বাড়ির একেবারে কাছে যাওয়া যায় না?"

"সবাই যেতে ভয় পায়। রাত্তিরবেলা বন্দুকধারী দরোয়ান ঘুরে বেড়ায়। কেউ কাছে গেলেই গুলি করে মেরে ফেলবে।"

"এ-পর্যন্ত একজনকেও মেরেছে?"

"না, তা মারেনি অবশ্য। তবু সবাই ভয় পায়।"

"আমরা আজ রাত্তিরে ওই আলোটা দেখতে যাব। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?"

"না গো, কী করে যাব। বাবা বারণ করেছেন। আলোটা জ্বলে রাত বারোটার সময়, ওই সময় মেয়েদের বাইরে বেরোতে নেই। অনেকে বলে, মঙ্গলগ্রহের লোকরা ধরে নিয়ে যেতে পারে। আমার কিন্তু ইচ্ছে করে, ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাক। তা হলে বেশ মঙ্গলগ্রহটা দেখে আসা যাবে!"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "তারপর যদি ওরা তোমাকে আর না ছাড়ে?"

মণিকা বলল, "ইস, অত সহজ নাকি? সে আমি ঠিক ফিরে আসব!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মণিকা, তুমি কলকাতায় গিয়েছ কখনও?"

মণিকা বলল, "না, এখনও যাইনি। শুধু দু'বার শিলিগুড়ি গেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কলকাতা দেখার আগেই মঙ্গলগ্রহ ঘুরে আসতে চাও ?"

মণিকার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প হল।

সন্ধের সময় অনির্বাণের গাড়িটা নিয়ে এল সুটকেস দুটো। গাড়ির ড্রাইভার বলল যে, সে এখানেই থেকে যাবে। কাকাবাবুদের কাজে লাগতে পারে।

এ-বাড়িতে খাওয়াদাওয়া চুকে যায় রাত ন'টার মধ্যে। হেডমাস্টারমশাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন। সন্তু আর কাকাবাবুও নিজেদের ঘরে এসে শুয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ঠিক পৌনে বারোটার সময় তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

গাড়িটা সঙ্গে নিতে চাইলেন না কাকাবাবু। হেঁটেই যাবেন। হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছেন কোন দিক দিয়ে যেতে হবে। অনির্বাণ যে বলেছিল টোবি দত্ত নতুন বাড়ি বানিয়েছে, তা ঠিক নয়। এই গ্রামে ছিল টোবি দত্তর মামাবাড়ি। তার মামারা ছিলেন বেশ ধনী। কিন্তু এই মামারা টোবি দত্তের মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন না। একবার টোবি দত্তর বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে টোবির মা এখানে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। ছোট ছেলে টোবিও মায়ের সঙ্গে ছিল তখন, কিন্তু ওর বড়মামা অপমান করে মাকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। সেই মামার বংশধররা এখন খুবই গরিব। আর টোবি দত্ত বিদেশ থেকে বহু টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সেই মামাদের বাড়িটাই কিনে নিয়েছে সে। সারিয়ে ঠিকঠাক করেছে ভাঙা বাড়িটাকে।

পুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। খানিকটা গেলে বড় রাস্তায় পড়া যাবে। চতুর্দিকে জমাট অন্ধকার। আকাশেও চাঁদ নেই। দিনের বেলা বেশ গরম ছিল, এখন বাতাসে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। রাত বারোটায় সমস্ত গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ে। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

হঠাৎ পেছনে কীসের শব্দ শুনে এরা দু'জন ঘুরে দাঁড়াল। কে যেন ছুটে আসছে। কাকাবাবু পকেটে হাত দিয়ে অন্য হাতে টর্চ জ্বালালেন। একটু পরেই দেখা গেল মণিকাকে।

সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "আমি যাব তোমাদের সঙ্গে !"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী, তোমার বাবা যে বারণ করেছেন ?"

মণিকা বলল, "বাবা তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালের আগে জাগবে না। কিছু জানতে পারবে না।"

কাকাবাবু মাথা নাড়িয়ে বললেন, "তা হয় না, মণিকা। তোমার বাবার অনুমতি ছাড়া তোমাকে আমরা সঙ্গে নিতে পারি না।"

মণিকা বলল, "চলো না। কিচ্ছু হবে না। বলছি তো, বাবা টেরও পাবে না !"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, সেটা অন্যায়। কাল বরং তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করে আমরা অন্য একটা জায়গায় যাব।"

মণিকা ছটফটিয়ে বলল, "তোমরা বেশ মজা করতে যাচ্ছ। আর আমি বাড়িতে একলা-একলা শুয়ে থাকব ? আমার একটুও ভাল লাগছে না।"

কাকাবাবু ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "লক্ষ্মীটি, আজ গিয়ে ঘুমোও। দেখো, কাল কিছু একটা হবে।"

খুব অনিচ্ছার সঙ্গে শরীর মোচড়াতে-মোচড়াতে ফিরে গেল মণিকা।

কাকাবাবুরা এগিয়ে গেলেন বড় রাস্তার দিকে। তাঁর ক্রাচ দুটির তলায় যদিও রাবার লাগানো আছে, তবু এই নির্জনতার মধ্যে একটু-একটু শব্দ হচ্ছে। সন্তুর পায়ে টেনিস-শু, সে পরে আছে হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট।

রাস্তায় কোনও মানুষজন নেই, একটা কুকুর ওদের দিকে ছুটে এসেও কাকাবাবুর ক্রাচ দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

টোবি দত্তর বাড়িটা ফাঁকা জায়গায়। দু'পাশে অনেকটা জমি, পেছন দিকে সরু নদীটার ওপাশেই জঙ্গল। ছাদে এখনও আলো জ্বলেনি, গোটা বাড়িটাই অন্ধকার।

মূল বাড়িটা থেকে খানিকটা সামনে একটা লোহার গেট, তার পাশে ছোট্ট গুমটি ঘর, ভেতরে টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে। সেখানে কোনও পাহারাদার বসে আছে বোঝা যায়। পুরো এলাকাটা কিন্তু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয়, হয়তো এক সময় ছিল, এখন ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে।

কাকাবাবু আর সন্তু বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখল। ভেতরে কোনও মানুষজন আছে কি না বোঝাই যায় না। টোবি দত্ত বিদেশ থেকে একা ফিরে এসেছে, তার বউ-ছেলেমেয়ে আছে কি না তা জানে না কেউ। একটা পোষা কুকুর ছিল, সেটাও তো মরে গেল !

সব দিক দেখে কাকাবাবু নদীর ধারেই বসলেন। আকাশ বেশ মেঘলা, আজ আর চাঁদ ওঠার আশা নেই। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, তবু নদীর ধারে বসলে ভাল লাগে।

সন্তু পকেট থেকে একটা ছোট্ট ক্যামেরা বের করল।

কাকাবাবু বললেন, "এই অন্ধকারে ক্যামেরা দিয়ে কী করবি ?"

সন্তু বলল, "যদি ইউ এফ ও আসে, ছবি তুলব। ছবি তুলতে পারলে জোজো আমাকে একটা দারুণ জিনিস খাওয়াবে বলেছে !"

"কী খাওয়াবে !"

"সেটা একটা নতুন কিছু জিনিস, আমি নাম ভুলে গেছি।"

"জোজোকে এবার সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন ? ও থাকলে বেশ মজার-মজার কথা শোনা যায়।"

"তুমি তো তখন জোজোকে সঙ্গে নেওয়ার কথা বললে না ! তা ছাড়া ওকে

নাকি জাপানের সম্রাট নেমন্তন্ন করেছে।"

"তা হলে আর আসবে কেন বল! কোথায় জাপানের রাজবাড়িতে ভোজ খাওয়া আর কোথায় কোচবিহারের পাড়াগাঁয়ে রাত্তিরবেলা বসে মশার কামড় খাওয়া!"

"কাকাবাবু, একটা কীসের শব্দ হচ্ছে।"

কাকাবাবু কান খাড়া করে শুনলেন। একটা বড় গোছের ডায়নামো বা জেনারেটর চালু হওয়ার মতন শব্দ আসছে টোবি দত্তের বাড়ির ভেতর থেকে। শব্দটা ক্রমে বাড়তে লাগল, তারপর ফট করে জ্বলে উঠল আলো।

বাড়ির অন্য কোথাও আলো নেই, শুধু ছাদ থেকে একটা আলোর শিখা উঠে গেল আকাশের দিকে। ফ্লাড লাইটের মতন ছড়ানো আলো নয়, একটাই শিখা। ভারী সুন্দর দেখতে আলোটা, গাঢ় নীল রং, দারুণ তেজী আলো, মেঘ ফুঁড়ে চলে গেছে মনে হয়।

সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাকাবাবু আপনমনে বললেন, "এটা যদি ওর শখের ব্যাপার হয়, তা হলে অদ্ভুত শখ বলতেই হবে! মাঝরাতে রোজ এরকম একটা আলো জ্বালিয়ে রাখার মানে কী?"

সন্তু বলল, "নিশ্চয়ই অন্য কাউকে কিছু সংকেত জানাতে চায়।"

কাকাবাবু বললেন, "প্রত্যেকদিন আলো জ্বেলে কী সংকেত পাঠাবে?"

সন্তু বলল, "অন্য কেউ যাতে সন্দেহ না করে, সেইজন্য রোজই আলো জ্বালিয়ে দেয়।"

প্রায় আধ ঘণ্টা ওরা তাকিয়ে রইল। আলোটা সমানভাবে জ্বলতেই লাগল। আর কিছুই ঘটছে না।

কাকাবাবু এক সময় বললেন, "আলোটা তো দেখা হল, চল আর বসে থেকে লাভ কী? এরকম একটা জোরালো আলো তৈরি করাও কম কৃতিত্বের কথা নয়!"

সন্তু বলল, "এ-গ্রামের লোকজন মাঝরাত্তিরে আলোটা দেখে ঘুমিয়ে পড়ে। কেউ তো সারা রাত জেগে বসে থাকে না। হয়তো ভোর রাতে কিছু একটা ঘটে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই কি সারারাত এখানে বসে থাকতে চাস নাকি?"

সন্তু বলল, "সত্যি যদি ওই লোকটা মহাকাশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে, একটা ইউ এফ ও আসে, তা হলে কিন্তু দারুণ ব্যাপার হয়!"

এই সময় আলোটা বেঁকতে শুরু করল। এতক্ষণ আলোটা সরলরেখায় স্থির হয়ে ছিল, এবার নামতে লাগল নীচের দিকে। এদিকেই নামছে, এক সময় সন্তু আর কাকাবাবুকে ধাঁধিয়ে দিল।

কাকাবাবু বলে উঠলেন, "সন্তু, শুয়ে পড়, মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য জায়গাটা দিনের আলোর চেয়েও বেশি আলোকিত হয়ে

গেল। আলোটা কিন্তু এক জায়গায় থেমে রইল না। সন্তু আর কাকাবাবুর পিঠের ওপর দিয়ে সরে গেল নদীর ওপারের জঙ্গলে। সেখানে আলোটা কেঁপে-কেঁপে যেন জায়গা করে নিচ্ছে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে এক জায়গায় আলোর সুড়ঙ্গের মতন হয়ে গেল। চলে গেল অনেক দূর পর্যন্ত।

কাকাবাবু উঠে বসে গায়ের জামা থেকে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, "ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হল যেন আমাদের ওপর আলো ফেলে তারপর গুলি চালাবে!"

সন্তু বলল, "আমাদের দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই!"

জায়গাটা আবার অন্ধকার হয়ে গেছে। সন্তু আর কাকাবাবু সরে গেলেন। আলোটা এখন জঙ্গলের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আলো ফেলে কি কাউকে রাস্তা দেখানো হচ্ছে?"

কাকাবাবু বললেন, "খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক, কেউ আসে কি না!"

জঙ্গলের দিক থেকে কেউ এল না, কিন্তু আকাশে একটা শব্দ শোনা গেল। ফট ফট ফট ফট শব্দ, সেইসঙ্গে এগিয়ে আসছে একটা আলো।

সন্তু আর কাকাবাবু অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন। আরও কাছে এগিয়ে আসার পর বোঝা গেল, সেটা একটা হেলিকপটার। কিন্তু সেটাকে বেশি আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। আর সেটা থেকে মাঝে-মাঝে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশে। সেইজন্যই সেটাকে দেখে ভয়ঙ্কর কিছু মনে হচ্ছে।

সন্তু আবিষ্ট গলায় বলল, "ইউ এফ ও!"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "দুর বোকা, হেলিকপটার চিনিস না?"

সন্তু বলল, "কিন্তু কর্নেল সমর চৌধুরী, আর তো হেলিকপটার আনবেন না বলেছেন। তা হলে এটা এল কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "অন্য কেউ আনতে পারে। কিন্তু এটা যে হেলিকপটার তাতে কোনও সন্দেহ আছে? এতে চেপে মহাশূন্য থেকে আসা যায় না।"

সন্তু ক্যামেরা বের করে ফটাফট ছবি তুলতে-তুলতে বলল, "হেলিকপটার কি এরকম আগুন ছড়াতে-ছড়াতে আসে?"

কাকাবাবু বললেন, "ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে!"

টোবি দত্তর বাড়ির আলোটা এবার আবার ওপরের দিকে উঠেই নিভে গেল!

সন্তু বলল, "ক্যামেরার লেন্সে ওটাকে ঠিক একটা আগুনের পাখির মতনই মনে হচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, "ইস, একটা বায়নোকুলার আনা উচিত ছিল। আরও ভাল করে দেখা যেত।"

আগুনের পাখিটা টোবি দত্তর বাড়ির ওপর চক্কর দিল দু-তিনবার। বেশি

নীচে নামতে পারবে না, কারণ দোতলা বাড়ির চেয়েও উঁচু-উঁচু গাছ রয়েছে চারপাশে।

হঠাৎ সেই আগুনের পাখিটারও সব আগুন আর আলো নিভে গেল, শব্দও থেমে গেল ! আবার সব দিক নিঃশব্দ, অন্ধকার।

সন্তু বলল, "ওটা ছাদে নামছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওপরে থেমে আছে। চুপ করে শোন, কে যেন কী বলছে !"

মনে হল, সেই হেলিকপটার কিংবা সেইরকম জিনিসটা থেকে কেউ চেঁচিয়ে কিছু বলল। টোবি দত্তর ছাদ থেকেই কেউ কিছু উত্তর দিল। মাত্র এক-দেড় মিনিটের ব্যাপার। হেলিকপটার শূন্যে এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না।

তারপরই খানিকটা দূরে শোনা গেল ফট-ফট শব্দ। আলো না জ্বেলেই সেটা আবার উড়তে শুরু করেছে। একটুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেল দিগন্তে !

॥ ৫ ॥

বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন কাকাবাবু। তারপর উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, "কী ব্যাপারটা হল বল তো ?"

সন্তু বলল, "সমর চৌধুরী মাত্র তিনবার হেলিকপটার নিয়ে এসেছিলেন। গ্রামের লোক দেখেছে অন্তত পাঁচবার। আজ সমর চৌধুরীর আসবার কোনও কথাই নেই। আমার মনে হয়, আর একজন কেউ আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "আর্মি ছাড়া আর কার কাছে হেলিকপটার থাকবে ?"

সন্তু বলল, "তা হলে এটা হেলিকপটার নয়, অন্য কিছু !"

কাকাবাবু বললেন, "তুই এখনও ইউ এফ ও'র কথা ভাবছিস ?"

সন্তু বলল, "ওরা যেন কী কথা বলল, আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

কাকাবাবু বললেন, "ভাল করে শুনতেও পাইনি। ওইটুকু সময়ের মধ্যে ওরা কী এমন কথা বলবে ? সব ব্যাপারটাই আমার কাছে ধাঁধার মতন লাগছে।"

সন্তু বলল, "সব যখন অন্ধকার হয়ে গেল, তখন আকাশের ওই জিনিসটা থেকে টোবি দত্তর ছাদে কোনও জিনিস নামিয়ে দিয়ে যায়নি তো ? কিংবা কোনও লোক নেমেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আজ আর কিছু জানা যাবে না। চল, এবার ফেরা যাক !"

হাঁটতে শুরু করে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি যেটাকে হেলিকপটার বলছ, সেটা যখন আগুন ছড়াতে-ছড়াতে উড়ে এল, তখন আমার বুকটা কাঁপছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ওটা আমাদের পৃথিবীর কিছু নয়, আরও দূর থেকে আসছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে পৃথিবীতে আমরাই প্রথম স্বচক্ষে অন্য কোনও গ্রহের বায়ুযান দেখলাম ? কল্পবিজ্ঞানের গল্প নয়, সত্যি-সত্যি ? কিন্তু সন্তু, হেলিকপটারের ফট-ফট ফট-ফট শব্দটা যে লুকনো যায় না ?"

সন্তু বলল, "ওদের কোনও বায়ুযানে একই রকম শব্দ হতে পারে। টোবি দত্ত সেইজন্যই আকাশে আলো দেখায়।"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে টোবি দত্তর সঙ্গেই বা শুধু অন্য গ্রহের প্রাণীদের ভাব হতে যাবে কেন ?"

সন্তু বলল, "আমি একবার ওর ছাদে উঠে দেখে আসব ?"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "তুই ওর ছাদে উঠবি কী করে ?"

সন্তু বলল, "চেষ্টা করে দেখতে পারি। টোবি দত্ত ওর বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেয় না। এখন চুপিচুপি দেখে আসা যায়। ওর বাড়িতে তো কুকুর নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, পাগল নাকি ? নাঃ, ওসব দরকার নেই। ফিরে গিয়ে এখন ঘুমনো যাক। কাল সকালে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা যাবে !"

নদীর ধার ছেড়ে ওরা উঠে এল রাস্তার দিকে। টোবি দত্তর বাড়িটা ডানপাশে। এখন সেটা আগের মতনই অন্ধকার। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

কাকাবাবু বললেন, "অন্যের মুখে শোনা আর নিজের চোখে দেখায় কত তফাত বুঝলি ? সবাই বলেছে, আলোটা সোজা আকাশের দিকে উঠে যায়। তারপর যে আলোটা বেঁকে অনেকক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে থাকে, সেটা কেউ বলেনি।"

সন্তু এ-ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিল না। সে আগুনের পাখির মতন বায়ুযানটার কথাই ভাবছে।

কাকাবাবু আবার আপনমনে বললেন, "জঙ্গলের মধ্যে ওরকম আলো ফেলার মানে কী ?"

সন্তু বলল, "আকাশ দিয়ে আগুন ছড়াতে-ছড়াতে অত শব্দ করে জিনিসটা উড়ে এল, তবু গ্রামের কোনও লোক জাগেনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেউ-কেউ নিশ্চয়ই জেগে উঠে দেখেছে। ভয়ে বেরোয়নি বাড়ি থেকে।"

সন্তু কাকাবাবুর গা ঘেঁষে এসে বলল, "কাকাবাবু, আমার খুব ইচ্ছে করছে ওই বাড়ির ছাদটা একবার দেখে আসতে। আমার দৃঢ় ধারণা, ওখানে অন্য গ্রহের কোনও প্রাণী আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "দূর, যতসব উদ্ভট ধারণা !"

"তবু একবার দেখে আসি না !"

"তুই ছাদে উঠবি কী করে ?"

"বাড়ির বাইরের দেওয়ালে মোটা-মোটা জলের পাইপ আছে। সেই একটা

পাইপ বেয়ে উঠে যাব।"

"তারপর ধরা পড়ে গেলে ?"

"ধরা পড়ব কেন ? এখন সব শুনশান হয়ে গেছে। এ বাড়িতে বেশি লোক নেই তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কুকুরও নেই। আমি টপ করে দেখে চলে আসব।"

"কী যে বলিস, সন্তু ! হঠাৎ যদি ধরা পড়িস—আমি তোকে উদ্ধার করব কী করে ? আমি তো আর পাইপ বেয়ে উঠতে পারব না !"

"আমাকে ধরে রাখলে তো সুবিধেই হবে। তুমি পুলিশ ডেকে তখন জোর করে ওর বাড়িতে ঢুকতে পারবে।"

"তবু আমার ভাল লাগছে না রে, সন্তু ?"

"তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি খুব সাবধানে যাব। যদি একটা দারুণ কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারি ?"

টোবি দত্তর বাড়ির পেছন দিকে দু'জনে আগে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে দেখে নিলেন। এদিকে কোনও পাহারাদার নেই। কাকাবাবু দু-একবার টর্চ জ্বালালেন নিচু করে, তাতেও কিছু হল না।

সত্যিই দুটো জলের পাইপ রয়েছে দেওয়ালে। পুরনো আমলের মোটা-মোটা পাইপ। সন্তু নিজের ক্যামেরাটা কাকাবাবুকে রাখতে দিয়ে নিজে একটা টর্চ পকেটে রাখল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এই পাইপ বেয়ে উঠতে পারবি ?"

সন্তু পাইপটার গায়ে একটা চাঁটি মেরে বলল "ইজি ! নাইজিরিয়াতে এর চেয়েও শক্ত আর অনেক উঁচুতে পাইপ বেয়ে কতবার উঠেছি !"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে তাকাতেই সন্তু বলল, "এটা আমার কথা নয়। হঠাৎ মনে হল, জোজো এখানে থাকলে এইরকম কথাই বলত।"

এত উদ্বেগের মধ্যেও কাকাবাবুর মুখে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। সন্তু যে এখনও ইয়ার্কি করতে পারছে, তার মানে ওর মনে ভয় ঢোকেনি। ছেলেমানুষ তো, ইউ এফ ও আবিষ্কার করার উত্তেজনায় ছটফট করছে।

কাকাবাবু বললেন, "দশ মিনিটের বেশি কিছুতেই থাকবি না।"

সন্তু জুতো খুলে পাইপটা জড়িয়ে ধরে উঠতে শুরু করল। কাকাবাবু এখনও ভাবছেন, কাজটা হঠকারিতার মতন হয়ে গেল কি না ! দুঃসাহস আর হঠকারিতা এক নয়। টোবি দত্ত অভদ্র, রুক্ষ, নিষ্ঠুর ধরনের লোক। সন্তুকে ধরে ফেলে যদি অত্যাচার করে !

সন্তু আস্তে-আস্তে উঠতে লাগল। মরচে-ধরা পাইপ বলেই পিছলে যাচ্ছে না হাত। মাঝে-মাঝে আংটা আছে, পা রাখা যায়। একতলা পেরিয়ে দোতলায় উঠে গেল সে। এক জায়গায় পাশে একটা জানলা পড়ল, সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। দোতলায় কার্নিসে এসে একটুক্ষণ থেমে-থেমে শব্দ শুনবার চেষ্টা

করল। তারপর শোনা গেল একটা বাচ্চা ছেলের গলায়, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা!

কে যেন কী হুকুম করল তাকে।

বাচ্চার গলাটা আবার বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা!"

এ-বাড়িতে কোনও বাচ্চা ছেলে আছে, তা তো কেউ আগে বলেনি!

এরপর একটা গম্ভীর মোটা গলা বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছ!"

যেন একজন কেউ একটা বাচ্চাকে কথা বলা শেখাচ্ছে। সন্তুর মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ই টি? অন্য গ্রহের শিশু?

এবার সন্তু আস্তে মাথা তুলল। কেউ নেই। প্রথমে একটা ছোট ছাদ। তারপর একটা পাঁচিলের ওপর আবার ছোট ছাদ। বড় বাড়ি হলেও ছাদগুলো খোপ-খোপ করা। একপাশে একটা ঘর, কথা শোনা যাচ্ছে সেখান থেকেই।

সন্তু একটা পাঁচিল ডিঙিয়ে এল। পরের ছাদটায় একটা কোনও বড় যন্ত্র ঢাকা দেওয়া আছে। ওইটাই নিশ্চয়ই আলোর ব্যাপার। আরও কয়েকটা কাঠের বাক্স এদিক-ওদিক ছড়ানো।

দ্বিতীয় পাঁচিলটা ডিঙোতে যেতেই কয়েকটা খুব সরু-সরু তারে তার পা লেগে গেল। পাঁচিলের নীচের দিকে এই তারগুলো টান-টান করে বাঁধা আছে। ইলেকট্রিক তার নয়। সেতারের তারের মতন। মৃদু ঝন্‌ন্ করে শব্দ হল। সন্তু চট করে সেখান থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল আর-একটা পাঁচিলের পাশে। দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে।

খুট করে শব্দ হয়ে জ্বলে উঠল একটা মিটমিটে আলো। খুলে গেল ঘরের দরজা। তারপর সন্তু যা দেখল, তাতে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, যেন তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে!

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কঙ্কাল। সাদা হাড় আর মাথার খুলি, চোখ দুটোর জায়গায় সবুজ আলো জ্বলছে।

সন্তু ভাবল, "এ আমি কী দেখছি? ভূত? কিন্তু ভূত বলে তো কিছু নেই। আমি ভূত বিশ্বাস করি না। তবে কি চোখের ভুল!"

সন্তু চোখ কচলে নিল। না। একটা সত্যিকারের কঙ্কাল এগিয়ে আসছে তার দিকে।

সন্তু তবু জোর দিয়ে ভাবার চেষ্টা করছে, না, না, হতেই পারে না। মানুষের শুধু কঙ্কাল হাঁটবে কী করে? কঙ্কালের তো প্রাণ থাকে না! তবু ওটা হেঁটে আসছে, ধপ-ধপ আর ঝন-ঝন শব্দ হচ্ছে।

সন্তু এমনই স্তম্ভিত হয়ে গেছে যে, তার পা যেন গেঁথে গেছে মাটির সঙ্গে। সে পালাতেও পারছে না। সে প্রাণপণে বলবার চেষ্টা করছে, এটা চোখের ভুল, ভূত নেই, ভূত নেই, কঙ্কাল হাঁটতে পারে না, পারে না!

কঙ্কালটা কাছে এসে পড়ে দু-হাত দিয়ে সন্তুর কাঁধ চেপে ধরে শূন্যে তুলল। অসম্ভব শক্ত আর ঠাণ্ডা তার হাত। সন্তু নড়তে চড়তে পারছে না। কঙ্কালটা

এইবার তাকে ছুড়ে ফেলে দেবে।

ঠিক তক্ষুনি গম্ভীর মোটা গলায় কেউ ডাকল, "রোবিন ! রোবিন !"

কঙ্কালটা অমনই একটা বাচ্চা ছেলের গলায় বলে উঠল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা !"

দরজার সামনে এখন এসে দাঁড়িয়েছে একজন লম্বাচওড়া মানুষ। কঙ্কালটা থপথপিয়ে এসে সন্তুকে নামিয়ে দিল সেই লোকটির সামনে।

সন্তু লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আরও কেঁপে উঠল। এ কী দেখছে সে ? লোকটির মোটে একটা চোখ, অন্য চোখটার জায়গায় শুধু একটা অন্ধকার গর্ত !

লোকটি কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী চাই এখানে ?"

লোকটির মুখ দেখে চিনতে পারেনি সন্তু। চোখের গড়ন দেখেই মানুষকে চেনা যায়। কিন্তু গলার আওয়াজ শুনে বুঝল, এই-ই টোবি দত্ত। কিন্তু সকালবেলা নদীর ধারে সে দেখেছিল টোবি দত্তকে, তখন তার দুটো চোখই ঠিকঠাক ছিল, এখন একটা চোখ একেবারে অদৃশ্য। অন্য চোখটা জ্বলছে। তা হলে কি টোবি দত্তও মানুষ নয় ? অন্য গ্রহের প্রাণী ? এদের আসল রূপ এমন বীভৎস ?

সন্তু আর চিন্তা করতে পারল না। তার পেছনে একটি জীবন্ত কঙ্কাল, সামনে একটি একচক্ষু দৈত্য। তার বুক চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সে আ-আ-আ শব্দ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কাকাবাবু সন্তুর আর্তনাদ শুনতে পেলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পাইপের নীচে। তাঁর রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ি অন্ধকারেও দেখা যায়। ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন। সন্তু ওপরে ওঠার পর এখনও দশ মিনিট কাটেনি।

হঠাৎ পেছনে খড়মড় শব্দ হতেই তিনি রিভলভার নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। টর্চ জ্বালাতেই দেখলেন, একটা ঝোপের পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে মণিকা। তার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

কাকাবাবু দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, "এ কী, তুমি এখানে ?"

মণিকা তার উত্তর না দিয়ে বলল, "সন্তুর কী হল ? নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "তোমাকে বাড়িতে যেতে বলেছি, তুমি এতক্ষণ বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?"

মণিকা বলল, "বাড়ি গিয়েছিলাম তো ! আগুন-পাখিটা যখন এল, সেই আওয়াজে আবার ঘুম ভেঙে গেল। বাড়িতে আমার ভয় করছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "অন্ধকারে একা-একা ঘুরে বেড়াতে বুঝি ভয় করে না !"

মণিকা বলল, "একা তো ঘুরিনি। তোমাদের কাছাকাছিই ছিলাম। কিন্তু সন্তু ফিরছে না কেন ? ধরা পড়ে গেছে। ও চেঁচিয়ে বলল, 'শুনতে পাওনি !"

কাকাবাবু বললেন, "না তো !"

মণিকা বলল, "আমি গিয়ে দেখে আসছি !"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কোথায় যাবে ?"

মণিকা বলল, "ছাদে ! আমিও পাইপ বেয়ে উঠতে পারব। আমি ছাদে চড়তে জানি !"

কাকাবাবু বললেন, "পাগলের মতন কথা বোলো না। তুমি পাইপ বেয়ে উঠবে ?"

মণিকা বলল, "মেয়ে বলে বুঝি পারব না ? দেখো না !"

সত্যিই সে পাইপ বেয়ে ওঠার চেষ্টা করল। এ যে আর-এক ঝামেলা ! সে কাকাবাবুর নিষেধ শুনবে না কিছুতেই। কাকাবাবু দৃঢ়ভাবে তার কাঁধ ধরে এক হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে এনে বললেন, "শোনো, তোমাকে আরও শক্ত একটা কাজ করতে হবে !"

মণিকা বলল, "কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা দু'জন দরকার হলে দরজা ভেঙে এই বাড়ির মধ্যে ঢুকব ! কিন্তু তার আগে একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সামনের লোহার গেটের কাছে গুমটির মধ্যে একজন পাহারাদার বসে আছে। তুমি তাকে গুমটির বাইরে ডেকে আনতে পারবে ?"

মণিকা বলল, "ওর হাতে বন্দুক থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "বন্দুক থাকলে কী হয়েছে ! তোমার মতন একটা মেয়েকে দেখামাত্র গুলি করবে নাকি ? সে ভয় নেই। তুমি ওর গুমটির সামনে গিয়ে কাঁদতে শুরু করো। কাঁদতে-কাঁদতে বলবে যে, তোমাদের বাড়িতে চোর এসেছে, ওর সাহায্য চাইতে এসেছ।"

মণিকা বলল, "যদি তবুও না বেরোয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "যা হোক বানিয়ে বলবে। চোরেরা তোমাকে মেরেছে, পা দিয়ে রক্ত পড়ছে ! কোনওক্রমে ওকে বের করা চাই ! যাও, ছুটে যাও !"

কাকাবাবু আর-একবার পাইপের ওপর দিকটা দেখলেন। সন্তুর কোনও চিহ্ন নেই। সন্তু ধরাই পড়ে গেছে তা হলে।

তিনিও দ্রুত এগিয়ে গেলেন গুমটির দিকে।

মণিকা বেশ ভালই অভিনয় করতে পারে। সে কেঁদে-কেঁদে বলছে, "ওগো, আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ! সব নিয়ে গেল। আমার বাবাকে বেঁধে রেখেছে।"

গুমটির পাহারাদারটি ভেতর থেকেই কথা বলছে। বাইরে আসবার লক্ষণ নেই।

মণিকা মাটিতে বসে পড়ে বলল, "আমার পায়ে রামদা দিয়ে কোপ মেরেছে।"

লোকটি বলল, "আমার যে এখান থেকে কোথাও যাওয়ার হুকুম নেই। দেখি, পায়ে কতখানি লেগেছে ?"

লোকটি বেরিয়ে আসতেই আড়াল থেকে এসে কাকাবাবু রিভলভার ঠেকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, "বন্দুকটা ফেলে দাও ! নইলে তোমার মাথার খুলি উড়ে যাবে।"

লোকটি বন্দুকটা ফেলে দিয়ে বলল, "এখানেও ডাকাত ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাড়ির কাছে চলো। দরজা খুলতে হবে।"

লোকটি বলল, "দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, আমি খুলব কী করে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়ির মধ্যে ক'জন লোক আছে ?"

লোকটি বলল, "তিন-চারজন হবে। আমি তো ভেতরে যাই না।"

দরজার কাছে এসে কাকাবাবু বললেন, "লাথি মারো। ভেতরের লোকজনদের ডাকো !"

লোকটি বেশ অবাক হয়ে বলল, "দলে আর কেউ নেই ? আপনি একা, মানে বগলে লাঠি নিয়ে যেতে চান !"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "ডাকো !"

মণিকা দমাদম সেই দরজায় লাথি মারতে লাগল।

কাকাবাবু চিৎকার করে ডাকলেন, "টোবি দত্ত, টোবি দত্ত ! দরজা খোলো ! আমি রাজা রায়চৌধুরী।"

কয়েকবার ডেকেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু বললেন, "মণিকা, পাহারাদারের রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে এসো তো ! গুলি করে আমি দরজা ভেঙে ফেলব।"

মণিকা রাইফেলটা নিয়ে আসার আগেই দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। হাতে একটা হ্যাজাক বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টোবি দত্ত। স্থির দু' চোখে কটমট করে তাকাল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবুর রিভলভারটা তখনও পাহারাদারের ঘাড়ে ঠেকানো। এক ঝটকায় পাহারাদারকে সরিয়ে দিয়ে টোবি দত্তর দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বললেন, "সন্তু কোথায় ? সন্তুর যদি কোনও ক্ষতি হয়, তোমাকে আমি চরম শাস্তি দেব। এই বাড়িটা গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেব !"

টোবি দত্ত কাকাবাবুর রিভলভার কিংবা ভয়-দেখানো কথা গ্রাহ্যই করল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে আসেন কেন ? মাইন্ড ইওর ওউন বিজনেস।"

তারপর মাথাটা পেছন দিকে ফিরিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আবার বলল, "ছেদিলাল, ছেলেটাকে বাইরে শুইয়ে দে। ওর কিছু হয়নি, নিজেই ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

টোবি দত্তর পেছনে দাঁড়িয়ে একজন বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা লোক। সে দু' হাতে

পাঁজাকোলা করে ধরে আছে সন্তুকে। আস্তে-আস্তে সে সন্তুকে মাটিতে শুইয়ে দিল।

তারপরেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালে প্রথম কাজই হল সন্তুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া।

সন্তুর অবশ্য একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল। টোবি দত্তর বাড়ির সামনে থেকে সে হেঁটেই ফিরেছে। ওই বাড়ির ছাদে কী-কী ঘটেছিল, তাও কাকাবাবুকে শুনিয়েছে। কাকাবাবু কোনও মন্তব্য করেননি। শুধু একবার বলেছিলেন, "ঠিক আছে, এসব পরে দেখা যাবে!"

অনির্বাণের গাড়িটা রয়েছে বলে সুবিধে হয়ে গেল। সকালবেলা শুধু এককাপ চা খেয়েই কাকাবাবু বেরিয়ে পড়তে চাইলেন, মণিকাও ঝোলাঝুলি করতে লাগল সঙ্গে যাওয়ার জন্য। হেডমাস্টারমশাই বাধ্য হলেন মত দিতে।

কাকাবাবু সামনে আর মণিকা-সন্তু পেছনে। সন্তু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গুম হয়ে আছে। কাল রাত্তিরের ঘটনাগুলো সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। কাকাবাবু বললেন, তিনি টোবি দত্তর দুটো চোখই দেখেছেন। অথচ একটু আগে সন্তু দেখেছে, তার একটামাত্র চোখ, সেটা ধকধক করে যেন জ্বলছিল, অন্য চোখটার জায়গায় শুধু একটা গর্ত। বীভৎস মুখখানা। সেটা সন্তুর চোখের ভুল? এরকম ভুল তো তার আগে কখনও হয়নি? আর ওই কঙ্কালের ব্যাপারটা তার নিজেরই এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। অথচ সত্যিই তো সে দেখেছিল! কেন অত তাড়াতাড়ি সে অজ্ঞান হয়ে গেল? না হলে সে রহস্যটা ঠিকই ধরে ফেলত।

বনবাজিতপুর ছাড়াবার পর মণিকা বলল, "দ্যাখো দ্যাখো, সন্তু ওই পুকুরটায় কত শাপলা ফুটে আছে। আমরা এটাকে বলি শাপলা পুকুর।"

সন্তু মুখটা ফিরিয়ে বেশ জোরে-জোরে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল।

মণিকা শিউরে উঠে খানিকটা সরে গিয়ে বলল, "এ কী! এ কী!"

কাকাবাবুও পেছন ফিরে তাকিয়েছেন।

সন্তু বলল, "তুমি তো দেখতে চাইছিলে আমার জলাতঙ্ক রোগ হয়েছে কি না? হ্যাঁ, হয়েছে, ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ!"

কাকাবাবু বললেন, "এই সন্তু, মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছিস কেন?"

মণিকা বলল, "আমি মোটেই ভয় পাইনি। পোষা কুকুর অমন বিচ্ছিরিভাবে ডাকে না। এইরকম ডাকে, ভুক-ভুক, ভুক-ভুক, ভুক।"

সন্তু বলল, "পোষা কুকুর পাগল হয়ে গেলেও বুঝি ওরকম মিষ্টি সুর করে ডাকবে?"

গাড়ির ড্রাইভার বলল, "আমি একবার একটা পাগলা কুকুরের ডাক শুনেছিলাম, এইরকম, ঘ্যা-ঘ্যা-ঘ্যা, ঘ্যা-ঘ্যা-ঘ্যা !"

কাকাবাবু বললেন, "গাড়িটা যে কুকুরের খাঁচা হয়ে গেল ! তার চেয়ে বরং সেই হেমো দুধওলার গান গাওয়া যাক। তুমি জানো, মণিকা ?"

মণিকা বলল, "না।"

কাকাবাবু নিজেই গেয়ে শোনাতে লাগলেন, "হেমো গয়লার ছিল যে এক গাঁয়ের বাড়ি/ সেথায় ছিল মস্ত বড় একটা হাঁসের ঝাঁক/ হেথায় প্যাঁক, হোথায় প্যাঁক, চারদিকেতে প্যাঁক প্যাঁক/ হেমো গয়লার ছিল যে এক..."

সন্তু জানলেও এই গানে গলা মেলাল না। তার মন ভাল নেই।

ডাক্তারের বাড়িতে এসে কিছু ভাল খবর পাওয়া গেল।

শৈবাল দাশগুপ্ত সন্তুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "নো প্রব্‌লেম। কুকুরটার মাথা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সে পাগল ছিল না। তবে কেউ তাকে বিষ খাইয়েছিল ঠিকই। সেই বিষের জ্বালায় ছটফটিয়ে সে কিছুক্ষণ পরেই মারা যেত। হয়তো তোমার মতন চেহারার কোনও ছেলে ওকে বিষ খাইয়েছে, সেই জন্য হঠাৎ তোমাকে কামড়াতে এসেছিল।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে সন্তুকে আর অত ইঞ্জেকশন নিতে হবে না ?"

শৈবাল দাশগুপ্ত বললেন, "নাঃ, কোনও দরকার নেই।"

মালবিকা বললেন, "কাল আপনারা আমার বাড়িতে কিছুই খাননি। আজ কিন্তু ব্রেকফাস্ট খেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও আপত্তি নেই। কী রে সন্তু, এখনও মুখ গোমড়া করে আছিস কেন ?"

মালবিকা বললেন, "নিশ্চয়ই ওর খিদে পেয়ে গেছে।"

শৈবাল দাশগুপ্ত বললেন, "অনির্বাণ ফোন করেছিল, সেও এসে যাবে একটু পরেই। কালকের খুনের ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশ মহলে সবাই খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। লোকটার বয়েস বছর-চল্লিশেক, কেউ তার গলাটা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। কোনও দৈত্য-দানব ছাড়া মানুষের পক্ষে ওরকম গলা মুচড়ে ভাঙা সম্ভব নয়। মৃত লোকটির গলায় আঙুলের দাগ, তাও মানুষের মতন নয়, সরু-সরু লম্বা-লম্বা।"

মালবিকা বললেন, "থাক, সক্কালবেলাতেই খুন-জখমের কথা বলতে হবে।"

কাকাবাবু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালেন মালবিকার দিকে।

খাওয়ার টেবিলে বসার একটু পরেই হাজির হল অনির্বাণ মণ্ডল। এসেই সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, "কাল সেই আলো দেখতে পেয়েছিলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

তারপর তিনি টোবি দত্তর বাড়ির ছাদে সন্তু যে উঠেছিল, সেই অংশটা বাদ

দিয়ে শুধু আলো আর আগুন-পাখির মতন হেলিকপটার দেখার অংশটুকু শোনালেন।

সন্তু জানে, কাকাবাবু যখন কোনও ঘটনা বাদ দিয়ে বলতে চান, তা হলে তখন চুপ করে থাকতে হয়।

কিন্তু মণিকা তো তা জানে না। সে বলল, "বাঃ, আর আমি যে ওই পাহারাদারটাকে বাইরে বের করে আনলাম ?"

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মণিকাও কাল অনেক সাহস দেখিয়েছে। সেসব পরে শুনবে। আচ্ছা অনির্বাণ, তুমি যে বলেছিলে, পুলিশের লোক সর্বক্ষণ টোবি দত্তর বাড়ির ওপর নজর রাখছে। কাল রাত্তিরে কেউ ছিল ?"

অনির্বাণ বলল, "থাকবার তো কথা। কেন, আপনারা তাকে দেখতে পাননি ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা ওখানে অনেকক্ষণ দেখেছি। বাড়িটার চারপাশ ঘুরেছি। কিন্তু পুলিশের কোনও পাত্তা পাইনি।"

অনির্বাণ বলল, "তা হলে সে ব্যাটা নিশ্চয়ই ফাঁকি মেরে বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়েছে! কাল ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ছিল। দিন আর রাতে দু'জনের ডিউটি থাকে পালা করে। খবর নিয়ে দেখতে হবে, কে ফাঁকি মেরেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্তর ওই আলোটা কতদিন ধরে জ্বলছে ?"

অনির্বাণ বলল, "মাসদেড়েক হবে। প্রায় প্রতিদিনই জ্বলে। খুব ঝড়-বৃষ্টি হলে বন্ধ থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশের লোক যদি প্রত্যেকদিন নজরে রাখত তা হলে বলতে পারত যে, হেলিকপটার ওই বাড়ির ওপর ঠিক কতবার গিয়েছিল। যেমন, কাল রাতেও যে এসেছিল, পুলিশের খাতায় তার কোনও রেকর্ড থাকবে না।"

অনির্বাণ বলল, "আমিও তো ভাবছি। কর্নেল সমর চৌধুরী বললেন, উনি আর যাবেন না। অথচ কাল রাতেই আবার গেলেন কেন ?"

সন্তু মুখ তুলে কিছু বলার জন্য কাকাবাবুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "সমর চৌধুরী কাল যাননি, অন্য কেউ গেছে। আমার মতে যেটা হেলিকপটার, সন্তুর মতে সেটা অন্য কোনও বায়ুযান কিংবা মহাকাশযানও হতে পারে।"

মালবিকা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "ইউ এফ ও ? সত্যি-সত্যি ইউ এফ ও দেখেছেন ?"

মণিকা বলল, "ওটা একটা আগুনের পাখি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু ওর ক্যামেরায় অনেক ছবি তুলেছে। সেই ফিল্‌মগুলো ডিভেলাপ করলে ঠিকঠাক বোঝা যাবে। এখন একবার সমর

চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করা যাবে ?"

অনির্বাণ বলল, "হ্যাঁ, চলুন সেখানেই যাই ।"

খাওয়া শেষ করে ডাক্তার-দম্পতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাকাবাবুরা আবার গাড়িতে চাপলেন ।

যেতে-যেতে অনির্বাণ বলল, "কাকাবাবু, কলকাতায় ফোন করে আমি টোবি দত্ত সম্পর্কে অনেক খবর জোগাড় করেছি । ওর ভাল নাম তরুবর দত্ত । কিন্তু সবাই টোবি দত্ত নামেই জানে । পাসপোর্টেও ওই নামই আছে । টোবি দত্ত অল্প বয়েসে এক পাদ্রির সঙ্গে জার্মানি চলে যায় । সেখানে লেখাপড়া শিখে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার হয় । সেখানে কিছুদিন চাকরি করে চলে যায় জাপানে । জাপানে একটা বড় কারখানায় কাজ করত । গত বছর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে কাজ ছেড়ে দেয় । কয়েক মাস জাপানেরই এক হাসপাতালে ছিল । তারপর অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে ফিরে এসেছে দেশে । সঙ্গে নানারকম যন্ত্রপাতিও এনেছিল । এয়ারপোর্টের কাস্টমসের খাতায় তার রেকর্ড আছে । আমাদের পুলিশের খাতায় ওর নামে কোনও অভিযোগ নেই ।"

কাকাবাবু বললেন, "জানা গেল যে, লোকটি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার । জাপানিদের কাছে পাত্তা পাওয়া সহজ কথা নয় ! যে-যন্ত্রপাতি এনেছে, তা দিয়ে ওরকম আলো তৈরি করতে পারে । আর একটুখানি খবর নিতে পারবে ? জাপানে ওর কী অসুখ করেছিল আর কোন হাসপাতালে ছিল ?"

অনির্বাণ বলল, "জানবার চেষ্টা করব ।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "সুশীল গোপ্পী কোথায় থাকে ?"

অনির্বাণ বলল, "সুশীল গোপ্পী কে ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তুমিই তো তার নাম বলেছিলে । টোবি দত্তর সঙ্গে দিনহাটায় এক স্কুলে, এক ক্লাসে পড়ত । যাকে দেখে টোবি দত্ত চিনতে পারেনি । তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই ।"

অনির্বাণ বলল, "সে বোধ হয় এখন কোচবিহার শহরেই থাকে । আমার ডি· এস· পি-কে বলে তাকে খুঁজে বার করছি ।"

মণিকা বলল, "ওই টোবি দত্ত আমাদের গ্রামের কোনও লোকের সঙ্গে মেশে না । বাবা একদিন ইস্কুলের একটা ফাংশানে নেমন্তন্ন করেছিলেন, তাও আসেনি । তবে ইস্কুলের ফান্ডে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে !"

অনির্বাণ বলল, "টোবি দত্ত কারও সঙ্গে মেশে না, ওর কোনও বন্ধু নেই । মাস দু-এক আগে একটা হাট থেকে ফিরছিল টোবি দত্ত, এই সময় সন্ধের অন্ধকারে দু-তিনটে লোক ওকে ঘিরে ফেলে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল । ছুরি মেরেছিল ওর পিঠে । খুব বেশি আহত হয়নি । টোবি দত্ত পালিয়ে গিয়েছিল কোনওরকমে । তারপর থেকে টোবি দত্ত আর একলা-একলা কোথাও যায় না । ওর একটা বড় স্টেশান ওয়াগন গাড়ি আছে, সেটা নিয়ে

মাঝে-মাঝে বেরোয়।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওকে গুণ্ডারা মারতে গিয়েছিল, সেজন্য ও পুলিশের সাহায্য চায়নি ?"

অনির্বাণ বলল, "পিঠে ছুরি-বেঁধা অবস্থায় টোবি দত্ত রাস্তা দিয়ে দৌড়োচ্ছে, সেই অবস্থায় ওকে হাট থেকে ফেরা অনেক মানুষ দেখতে পায়। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যায়। পুলিশেরও কানে আসে। ওখানকার থানার ও. সি. নিজেই টোবি দত্ত-র কাছে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। তাকে ভাগিয়ে দিয়ে টোবি দত্ত বলেছে, 'যান, যান, আপনারা পুলিশ কিচ্ছু করতে পারবেন না !' "

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশের ওপর ওর রাগ আছে দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য তোমার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেছিল। কাল টোবি দত্ত বলল, ওর কুকুরকে কেউ বিষ খাইয়েছে। তার মানে ওর একটা শত্রুপক্ষ আছে।"

অনির্বাণ বলল, "সবাই জানে ওর অনেক টাকা-পয়সা আছে। তা ছাড়া ওর ব্যবহারটা খুবই রুক্ষ, সুতরাং ওর শত্রু তো থাকতেই পারে। মুশকিল হচ্ছে, লোকটা যে আমাদের সঙ্গে দেখাই করতে চায় না !"

গাড়ি এবার কর্নেল সমর চৌধুরীর বাংলোর কম্পাউন্ডে ঢুকল। কর্নেল চৌধুরী তখন বাগানে ঘোড়ায় ঘুরছেন। আর কয়েকজন অফিসার পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে যেতে-যেতে কথা বলছে। কাকাবাবুদের দেখে তিনি ইঙ্গিতে ভেতরে গিয়ে বসতে বললেন।

একটু পরে তিনি অন্যদের সঙ্গে কথা শেষ করে বারান্দার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামলেন। তাঁর অঙ্গে পুরোপুরি সামরিক পোশাক। মাথায় টুপি। সিঁড়ি দিয়ে যখন তিনি উঠে আসছেন, তখন মণিকা বলল, "ওমা, এঁকে তো আমাদের গ্রামে একদিন দেখেছি। তখন এঁর থুতনিতে দাড়ি ছিল।"

কর্নেল চৌধুরী কাছে এসে বললেন, "এই মিষ্টি মেয়েটি কে ?"

কাকাবাবু বললেন, "বনবাজিতপুরের হেডমাস্টারের মেয়ে। আমরা এদের বাড়িতেই অতিথি। এই মেয়েটি আমাদের খুব যত্ন করছে।"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "আমি তো তোমাদের গ্রামে কখনও যাইনি, মা। মানে, আকাশ দিয়ে উড়ে গেছি, মাটি দিয়ে কখনও যাইনি। আমি জীবনে কখনও দাড়ি রাখিনি। তুমি অন্য কোনও লোককে দেখেছ।"

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার তো আর কোনও প্রবলেম নেই শুনলাম। গুড নিউজ !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কর্নেল চৌধুরী, আপনি কাল রাত্তিরে হেলিকপ্টার নিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন ?"

কর্নেল চৌধুরী খুবই অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললেন, "আমি তো কাল রাতে কোথাও বেরোইনি। ওখানে মানে কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্ত-র বাড়ির ওদিকটায় ?"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "ওখানে আর শুধু-শুধু যাব কেন ? আপনাদের তো কালই বললাম, ওখানে গিয়ে আর কোনও লাভ নেই। না, না, না, কাল কোনও হেলিকপটার ওড়েনি।"

তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন, "সেলিম ! সেলিম !"

পাশের ঘর থেকে একজন সুদর্শন যুবক দরজার কাছে স্যালুট দিল।

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি ফ্লাইট লেফটেনান্ট সেলিম চৌধুরী। কোনও হেলিকপটার উড়লে সেলিম জানবে, লগ বুকে এন্ট্রি থাকবে। সেলিম, কাল কোনও হেলিকপটার উড়েছিল ?"

সেলিম বলল, "না সার !"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "হেলিকপটার নিয়ে তো আমি একা আকাশে উড়ি না। সেলিমও সঙ্গে থাকে। গ্রামের লোক বুঝি কালও একটা দেখেছে ? ওদের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল যে ওখানে একটা হেলিকপটার সত্যিই এসেছিল তা তো আমরা নিজের চোখেই দেখেছি।"

কর্নেল চৌধুরী তবু বললেন, "তা কী করে হয় ! এখানে আর কারও কাছে হেলিকপটার নেই, থাকা সম্ভবও নয়।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু আমরা তিনজনেই তো ভুল দেখিনি।"

মণিকা বলল, "ওইটার শব্দ শুনেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।"

সন্তু বলল, "গ্রামের লোক ভুল বলে না। ওটা থেকে আগুন ছড়াচ্ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "আগুন তো তৈরি করা যায়। তুবড়ি, রংমশাল থেকে যেরকম আগুনের ফুলকি বেরোয়, অনেকটা সেই রকমই মনে হল।"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "এটা তো খুব চিন্তার বিষয় হল ! অন্য একটা হেলিকপটার আসে ? কোথা থেকে আসে ? তবে কি ইউ এফ ও হতে পারে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা তো গ্রামের লোকের কথায় পাত্তা দেন না। তারা তো আগেই বলেছে যে, একটা আগুনের পাখি পাঁচ-ছ' বার এসেছে।"

কর্নেল চৌধুরী অনির্বাণের দিকে ফিরে বললেন, "আপনারা কোনও কম্মের না ! ওই টোবি দত্তকে এখনও অ্যারেস্ট করতে পারলেন না ? ওকে ধরে পেটে কয়েকটা গুঁতো মারলেই সব কথা জানা যেত।"

অনির্বাণ বলল, "ওকে অ্যারেস্ট করার কোনও কারণ যে এখনও খুঁজে পাচ্ছি না !"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "পুলিশকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আর্মি অ্যাকশান নিতে হবে। আমি দিল্লিতে খবর পাঠিয়েছি। বাড়ির ছাদে ওরকম একটা আলো জ্বেলে রাখলে বিমান-চলাচলের অসুবিধে হতে পারে। আরও অনেক অসুবিধে আছে !"

তারপর তিনি মণিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজ আমি তোমাদের গ্রামে

যাব। রাত্তিরবেলা। তোমাদের সঙ্গে বসে ওই আগুনের পাখিটা দেখব। যদি সত্যি হয়, তা হলে তো সারা পৃথিবীতে বিরাট খবর হয়ে যাবে! তোমাদের বাড়িতে গেলে কী খাওয়াবে বলো।"

মণিকা বলল, "মাছভাজা। মুরগির মাংস।"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "ওসব তো রোজই খাই। নতুন কী খাওয়াবে বলো?"

কাকাবাবু বললেন, "কুলের আচার? ওটা মণিকা দারুণ বানায়!"

সবাই হেসে উঠল।

ওইরকমই ঠিক হল, আজ রাতে সবাই আসবেন বনবাজিতপুরে। টোবি দত্তের ছাদের আলো আর রহস্যময় বায়ুযানটি একসঙ্গে বসে দেখা হবে।"

কাকাবাবুরা ফিরে এলেন গ্রামে।

কিন্তু সে-রাত্রে কিছুই করা গেল না। রাত ন'টার পর শুরু হলে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক বাদে ঝড় কিছুটা কমলেও বৃষ্টি চলতেই থাকল। এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বেরনো যাবে না, আকাশে কিছু দেখাও যাবে না।

কর্নেল চৌধুরী কিংবা অনির্বাণও এল না। মণিকা ও তার বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার পর সন্তু ও কাকাবাবু শুতে গেলেন নিজেদের ঘরে।

ঘর অন্ধকার, বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে সন্তু। কিছুতেই তার ঘুম আসছে না।

কাকাবাবু এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে সন্তু, তোর শরীর খারাপ লাগছে নাকি?"

সন্তু কাতর গলায় বলল, "না, আমার শরীর খারাপ লাগছে না। আমার মনটা কীরকম যেন করছে!"

"কেন, কী হয়েছে?"

"কাকাবাবু, আমি ভূত মানি না। জানি যে ভূত বলে কিছু নেই। সবই গল্প। তবু সবকিছু আমার মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"ভূতের গল্প শুনলে গা-ছমছম করে। সেটা বেশ ভালই লাগে। কিন্তু কোনও ভদ্দরলোক ভূতে বিশ্বাস করে নাকি?"

"কিন্তু আমি যে দেখলাম একটা জ্যান্ত কঙ্কাল।"

"কঙ্কাল কক্ষনো জ্যান্ত হতে পারে না। সন্তু, সোনার পাথরবাটি কি হয়? মানুষ যখন হাঁটে-চলে, হাত-পা ছোড়ে, তখন মানুষকে চালায় তার মস্তিষ্ক। কঙ্কালের তো থাকে শুধু মাথার খুলি, তার মধ্যে ব্রেন কিংবা মস্তিষ্ক তো থাকে না। তা হলে একটা কঙ্কাল নড়বে-চড়বে কী করে?"

"তা তো আমি জানি। কিন্তু একটা কঙ্কাল আমার দিকে এগিয়ে এল। আমাকে দু হাতে চেপে ধরে উঁচু করে তুলল। অসম্ভব তার গায়ের জোর।"

"সেটা কঙ্কাল হতেই পারে না।"

"কাকাবাবু, আমি আগে কখনও অজ্ঞান হইনি। নিজের কাছেই আমার এত লজ্জা করছে!"

"শোন সন্তু, তুই কি ভাবছিস আমি ব্যাপারটা মাঝপথে ছেড়ে দেব? টোবি দত্ত-র ছাদে কী করে কঙ্কাল ঘুরে বেড়ায় তা আমি দেখবই দেখব। যেমন করে পারি ওর বাড়ির মধ্যে ঢুকব। ব্যাখ্যা একটা পাওয়া যাবেই।"

"আমি যে ওই ছাদে কাল উঠে ধরা পড়েছিলাম, সেটা তুমি এস পি সাহেব কিংবা অন্যদের বললে না কেন?"

"দ্যাখ, কঙ্কাল-টঙ্কালের কথা শুনলে ওরা হাসত। তুই টোবি দত্তের বাড়িতে ট্রেসপাস করতে গিয়ে ধরা পড়েছিস। তবু কিন্তু সে তোকে মারধোর করেনি কিংবা কোনও ক্ষতি করেনি। আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে ওর নামে কোনও অভিযোগও করা যায় না।"

তারপর পাশ ফিরে কাকাবাবু বললেন, "সর্বক্ষণ এইসব কথা চিন্তা করার কোনও দরকার নেই। এটা কাঠের বাড়ি, টিনের চাল। টিনের চালে বৃষ্টির কী সুন্দর শব্দ হয়। কান পেতে শোন, মনে হবে, রবিশঙ্কর দ্রুত লয়ে সেতার বাজাচ্ছেন। জানলার ধারের গাছগুলোতে হাওয়ায় এমন শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে যে, মনে হতে পারে, কাছেই সমুদ্র। মাঝে-মাঝে এমন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, যেন ওটা কোনও ম্যাজিকের খেলা!

একটু বাদে সন্তু ঘুমিয়ে পড়লে কাকাবাবু উঠে গিয়ে ওর গায়ে একটা চাদর টেনে দিলেন।

॥ ৭ ॥

কোচবিহার শহরে সুশীল গোপ্পীর একটা চায়ের দোকান আছে। সেই দোকানেরই পেছন দিকে একটা ছোট বাড়িতে সে বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে।

দোকানে বেশ ভিড়, কাউন্টারে বসে আছে সুশীল। অনির্বাণের ড্রাইভার তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে এল।

অনির্বাণ বলল, "আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। দোকানের মধ্যে তো বসা যাবে না। অন্য কোথাও বসতে হবে।"

অনির্বাণকে চিনতে পেরেছে সুশীল। পুলিশের এস পি সাহেবকে দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, "কিছু বুঝতে পারছি না, সার। আমি তো কিছু...মানে, আমার অপরাধ কী হয়েছে?"

অনির্বাণ বলল, "আপনার চিন্তার কিছু নেই। আপনাকে জেরা করতে আসিনি। এঁর নাম রাজা রায়চৌধুরী, ইনি আপনার কাছে কয়েকটা খবর জানতে চান।"

ক্রাচ বগলে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গে একটি কিশোর, এদের দেখেও সুশীল কিছু বুঝতে পারল না। সে সবাইকে নিজের বাড়িতে এনে বসাল। তারপর হঠাৎ কিছু একটা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে বলে উঠল, "আপনারা, মানে, আপনারা দু'জন কি সন্তু আর কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি খোঁড়া বলে অনেকেই আমাকে দেখে চিনে ফেলে।"

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বলল, "আপনি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমার কী সৌভাগ্য ! আমার বউকে আর ছেলেকে ডাকছি।"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "ওসব পরে হবে। আগে কাজের কথা বলে নিই। আপনার বাড়ি দিনহাটায় ?"

সুশীল বলল, "হ্যাঁ সার, বাড়ি দিনহাটায়, এখন এখানে দোকান খুলেছি।"

"ওখানে হাই স্কুলে পড়েছেন ?"

"হ্যাঁ সার।"

"টোবি দত্ত আপনার সহপাঠী ছিল ? ক্লাস নাইনে আপনারা একসঙ্গে পড়েছেন ?"

"ও, বুঝতে পেরেছি কার কথা বলছেন। টোবি নয়, তার ডাকনাম ছিল ত্যাপা। ফার্স্ট-সেকেন্ড হত। সে অনেক বছর আগের কথা। এই সেদিন একজনকে দেখলাম, মনে হল যেন আমাদের সেই ত্যাপা। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, পাত্তাই দিল না। বলল, আমাকে চেনে না !"

"তবু কি আপনার ধারণা, এই টোবি দত্ত আর আপনাদের সেই ত্যাপা একই ?"

"হ্যাঁ সার, আমার তো তাই ধারণা। ছোটবেলার বন্ধুদের চেহারা ঠিক মনে থাকে। ত্যাপা অনেকদিন নাকি ফরেনে ছিল, তাই আমাদের ভুলে গেছে।"

"এই ত্যাপা ক্লাস নাইনে ইস্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিল কেন ?"

"আপনি ত্যাপার খবর জানতে চান ? তা হলে মামুনকে ডাকি ? মামুনও আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত। সে-ই ছিল ত্যাপার বেশি বন্ধু। পাশেই মামুনের দোকান। সে সেতার, তবলা, হারমোনিয়াম সারায়।"

"ঠিক আছে, ডাকুন।"

সুশীল দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

অনির্বাণ বলল, "ত্যাপা বিদেশে গিয়ে নাম বদলে হয়েছে টোবি। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন, কাকাবাবু ? টোবি আর সুশীল একই ক্লাসে পড়ত, কিন্তু টোবির তুলনায় সুশীলকে বেশি বয়স্ক দেখায়। বিদেশে খাবারদাবার অনেক ভাল, তাই লোকে সহজে বুড়ো হয় না।"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু কি খাবারের জন্য ? ওটাও মনের ব্যাপার। যেসব মানুষ জীবনে কোনও ঝুঁকি নেয় না, অ্যাডভেঞ্চার করতে ভয় পায়, সারাটা

জীবন একই জায়গায় কাটিয়ে দেয়, তারাই তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায় ।”

সুশীল যাকে ডেকে আনল, তার চেহারা আরও বুড়োটে মতন । চেক লুঙ্গির ওপর সাদা পাঞ্জাবি পরা, চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল প্রায় সব সাদা ।

কাকাবাবু বললেন, “আদাব, মামুন সাহেব, বসুন । আপনার স্কুলের বন্ধু ত্যাপা সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানতে এসেছি । টোবি দত্তই যে সেই ত্যাপা, আপনি চিনতে পেরেছেন ?”

মামুন আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ চিনেছি । একটা ভ্যানগাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ায় । শুনেছি সে খুব ধনী হয়েছে । একদিন পেট্রোল পাম্পে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন দেখলাম, এ আমাদের সেই ত্যাপা ।”

“আপনি কাছে গিয়ে কথা বলেননি ?”

“না । সুশীলের কাছে আগেই শুনেছি, সে সুশীলকে পাত্তা দেয়নি । তা বড়লোক হয়ে গেলে গরিব বন্ধুদের আর চিনতে পারবে না, এ আর এমন অস্বাভাবিক কী !”

“এক সময় সে আপনার খুব বন্ধু ছিল ?”

“আমরা ক্লাস থ্রি থেকে একসঙ্গে পড়েছি । সব সময় পাশাপাশি বসতাম । মেধাবী ছাত্র ছিল, আমি পড়া জেনে নিতাম তার কাছ থেকে । আমাদের বাড়িতে আসত প্রায়ই ।”

“ক্লাস নাইনে সে হঠাৎ ইস্কুল ছেড়ে চলে গেল কেন ?”

“সেটা সার বড় দুঃখের ঘটনা । তোর মনে নেই রে, সুশীল ?”

সুশীল বলল, “একটু-একটু মনে আছে । সে-সময় আমরাও তাকে কিছু সাহায্য করতে পারিনি । সেইজন্যই বোধ হয় ইস্কুলের বন্ধুদের ওপর সে আজও রাগ পুষে রেখেছে ।”

কাকাবাবু মামুনকে বললেন, “আপনিই ঘটনাটা খুলে বলুন ।

মামুন বলল, “ত্যাপারা ছিল বড়ই গরিব । দু' বেলা খাওয়া জুটত না । তারই মধ্যে ত্যাপা পড়াশুনো করত খুব মন দিয়ে । কোনওবার ফার্স্ট, কোনওবার সেকেন্ড হত । আমাদের ক্লাসে আর-একটা ছেলে ছিল, তার নাম বিশু ।”

সুশীল বলল, “বিশু না রে, রাজু । থানার দারোগার ছেলে তো ? তার পদবিটা মনে নেই ।”

মামুন বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজু । রাজপুত্তুরের মতন চেহারা, কিন্তু ভারী, নিষ্ঠুর আর অহঙ্কারী । দারোগার ছেলে বলে আমাদের সে মানুষ বলেই গণ্য করত না । সেও লেখাপড়ায় ভাল ছিল বটে, কিন্তু ত্যাপার সমান না । সেইজন্যই ত্যাপার ওপর ছিল তার খুব হিংসে । আমরা সার, ইস্কুলে যেতাম হাফ প্যান্ট পরে, আর রাজু পরে যেত ফুল প্যান্ট । তার পোশাকের বাহার ছিল

কতরকম। থানার দারোগার ছেলের তো পয়সার অভাব হয় না।”

মুখ তুলে সে অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বলে উঠল, “মাপ করবেন সার, আপনার সামনে এই কথাটা বলে ফেলেছি !”

অনির্বাণ কাষ্ঠহাসি দিয়ে বলল, “পুলিশ ঘুষ খায়, এ-কথা তো সবাই জানে !”

মামুন বলল, “আপনারা ওপরতলার অফিসার, আপনাদের কানে অনেক খবরই পৌঁছয় না ! কিন্তু নীচের তলায়, থানায় থানায় ঘুষের রাজত্ব ! এখানে তো আমাদের ওপর পুলিশ জুলুম করে।”

সুশীলও সাহস সঞ্চয় করে বলল, “আমি সামান্য একটা চায়ের দোকান চালাই, আমার কাছেও পুলিশ ঘুষ চায়। এদিকে যে স্মাগলাররা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাদের কিছু বলে না।”

কাকাবাবু বললেন, “ওসব কথা পরে হবে। ইস্কুলের ঘটনাটা আগে শুনি।”

মামুন বলল, “একদিন ইস্কুলে ওই রাজুর মানিব্যাগ চুরি গেল। আমরা পাঁচ নয়া, দশ নয়া পয়সা নিয়ে স্কুলে যেতাম। আমাদের আর কারও মানিব্যাগ ছিল না। রাজুর ব্যাগে গোছা-গোছা টাকা। সেদিন ওর ব্যাগে ছিল নাকি আড়াইশো টাকা ! সে তো অনেক টাকা ! আমাদের বাপ-চাচারা এক মাসে অত টাকা রোজগার করত। রাজুর ব্যাগ হারিয়েছে বলে সারা ইস্কুলে তোলপাড় হয়ে গেল।”

অনির্বাণ বলল, “রাজু সন্দেহ করল ত্যাপাকে ?”

মামুন বলল, “সত্যিই ব্যাগ হারিয়েছিল কি না তাই-বা কে জানে ! ত্যাপার ওপর তো আগেই রাগ ছিল। ত্যাপা ছিল জেদি আর গোঁয়ার। মান-সম্মান জ্ঞান ছিল খুব। সেদিন আবার ত্যাপার পকেটে ছিল কুড়ি টাকা। ইস্কুলে কয়েক মাসের মাইনে বাকি পড়েছিল, সেই মাইনে দিতে এসেছিল। রাজু জিজ্ঞেস করল, ‘তুই হঠাৎ এত টাকা কোথায় পেলি ?’ ত্যাপা কিছুতেই তা বলবে না।”

সুশীল বলল, “তারপর শুরু হল মার। কী মার মারল ত্যাপাকে। দারোগার ছেলে বলে রাজুর অনেক চ্যালা ছিল। আমরা ভয়ে কিছু বলতে পারিনি।”

মামুন বলল, “আমি ত্যাপার পাশে দাঁড়াতে গিয়ে অনেক লাথি-ঘুসি খেয়েছি। ত্যাপাকে ওরা টানতে-টানতে নিয়ে গেল থানায়। সেখানেও রাজুর বাবা কোনও বিচার না করেই মারতে লাগলেন। ত্যাপার একটা চক্ষু দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল ঝরঝর করে।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “চোখে মেরেছিল ?”

মামুন বলল, “ইচ্ছে করে মেরেছিল। রাজু একটা বেল্ট দিয়ে মারতে-মারতে চ্যাঁচাচ্ছিল, ‘শয়তান, তোর চোখ গেলে দেব !’ সেই বেল্টের লোহার আংটা ত্যাপার একটা চোখে ঢুকে যায়। তখন ত্যাপাকে আমিই ওর বাড়িতে নিয়ে

যাই। ত্যাপার বাবা গরিব মানুষ, ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ওই অবস্থায় ছেলেকে দেখে তিনি বললেন, 'অপোগণ্ড ছেলে, তুই দারোগাবাবুকে চটিয়েছিস ? এখন আমাদের কপালে আরও কত দুঃখ আছে কে জানে !' তাই শুনে এক হাতে চক্ষু চেপে ত্যাপা এক দৌড় লাগাল। আমরা পেছন-পেছন ছুটে গিয়েও তাকে ধরতে পারিনি। সেই যে গেল, আর কোনওদিন দিনহাটায় ফেরেনি ত্যাপা। শুনেছি, শিলিগুড়িতে এক পাদ্রি সাহেব সেই অবস্থায় তাকে দেখে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারপর আর কিছু জানি না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চোখের জখম কতখানি ছিল ?"

মামুন বলল, "শিলিগুড়িতে আমার আর-এক বন্ধু আখতার সেই সময় ত্যাপাকে দেখেছিল, সে বলেছিল, ত্যাপার একটা চোখ নাকি নষ্টই হয়ে গেছে। ভুল খবর। এই তো সেদিন দেখলাম, ওর দুটো চোখই আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "পাথরের চোখ ! সেইজন্যই ওর দৃষ্টি অমন কঠিন আর ঠাণ্ডা মনে হয়।"

অনির্বাণ বলল, "ঠিক বলেছেন তো ! টোবি দত্তর দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কিন্তু একটা চোখ যে পাথরের হতে পারে, সে-কথা আমার মনে পড়েনি।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাদের ওরকম হয়, তারা মাঝে-মাঝে পাথরের চোখটা খুলে রাখে।"

সন্তু বিরাট একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই রাজু এখন কোথায় ?"

মামুন বলল, "পরের বছরই তার বাবা এই থানা থেকে বদলি হয়ে গেলেন দিনাজপুরে। আর তার কোনও খবর জানি না। পরের যে দারোগা এলেন, তাঁর কোনও ছেলেপুলে ছিল না, তাই কয়েকটা বছর আমরা বেশ শান্তিতে ছিলাম।"

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, "ত্যাপার কোনও ভাইবোন ছিল না ?"

মামুন বলল, "একটা ছোট ভাই ছিল। সে লেখাপড়া বিশেষ করেনি। চাকরিবাকরিও পায়নি। স্মাগলারদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়েছিল। তারপর তাদের হাতেই খুন হয়ে যায়। তার বাবাকেও ওরাই মেরেছিল শুনেছি। মায়ের খবর জানি না।"

সুশীল অনির্বাণকে বলল, "সার, এদিকে স্মাগলারদের উৎপাত খুব বেড়েছে। পুলিশ সব জেনেও কিছু করে না !"

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্তর পুলিশের ওপর কেন এত রাগ, তা কিছুটা বোঝা গেল !"

অনির্বাণ বলল, "সব পুলিশ তো এক নয় ! ডাক্তার, ইস্কুল মাস্টার, আর্মি অফিসার, ব্যবসায়ী, এদের মধ্যে খারাপ লোক নেই ?"

কাকাবাবু বললেন, "রাগের সময় যে এই কথাটা মনে থাকে না !"

সুশীল এর পর তার দোকানের ফিশ ফ্রাই আর চা না খাইয়ে ছাড়ল না। বিদায় নেওয়ার সময় মামুন বলল, "সার, ত্যাপার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, আমরা পুরনো বন্ধুরা তাকে ভুলিনি।"

গাড়িতে উঠে অনির্বাণ বলল, "টোবি দত্তর ব্যাক গ্রাউন্ড অনেকটাই জানা গেল। এই জায়গাটার ওপর তার রাগ আছে। বোধ হয় সে প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু এতকাল পরে রাজুকে সে পাবে কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো রাজুও এখানে আবার ফিরে এসেছে। কোনও গুণ্ডার দলের সর্দার হয়েছে !"

অনির্বাণ বলল, "কাকাবাবু, আপনি খুনটুনের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চান না। কিন্তু বনবাজিতপুরে যদি দু'রকম হেলিকপটার আসে, তা হলে তার মধ্যে একটা ইউ এফ ও হতেই পারে। এ সম্ভাবনাটা আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আর কোনও হেলিকপটার এখানে আসা অসম্ভব।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুর মতন তুমিও ইউ এফ ও বিশ্বাসী হয়ে গেলে দেখছি। কিন্তু ইউ এফ ও'র সঙ্গে তোমার এই খুনটুনের কী সম্পর্ক ?"

অনির্বাণ বলল, "যদি পৃথিবীর বাইরে থেকে কিছু এসে থাকে, তার মধ্যে কী ধরনের অদ্ভুত প্রাণী থাকবে তা আমরা জানি না। তারা খুব হিংস্র হতে পারে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "অনেক কমিক স্ট্রিপে গল্প আর ছবি থাকে, মহাকাশে ইঁদুরের মতন প্রাণী মানুষের চেয়েও অনেক শক্তিশালী আর বুদ্ধিমান। সন্তু ওইসব গল্প খুব পড়ে। তুমিও পড়ো নাকি ?"

সন্তু বলল, "আজকাল ওগুলো সবাই পড়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমিও তো কয়েকখানা পড়েছি তোর ঘর থেকে নিয়ে। সায়েন্স ফিকশান হল একালের রূপকথা। পড়তে ভালই লাগে। কিন্তু অনির্বাণ, অন্য গ্রহের অদ্ভুত প্রাণীরা এসে তোমার এই কোচবিহারের সাধারণ মানুষদের মারবে কেন ?"

অনির্বাণ বলল, "তা ছাড়া যে আর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। ইউ এফ ও'র প্রাণীরা হয়তো রাত্তিরে মাটিতে নেমে ঘুরে বেড়ায়। কোনও গ্রামের মানুষ দৈবাৎ তাদের দেখে ফেললেই সেই মানুষটাকে তারা মেরে ফেলছে গলা টিপে। যে ক'জন খুন হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই মুখে সাঙ্ঘাতিক ভয়ের ছাপ। একজন ভয়েই মারা গেছে, আর দু'জনকে গলা মুচড়ে মেরেছে। কিন্তু আঙুলের ছাপ মানুষের মতন নয় ! এই ব্যাপারটাতেই আমরা ধাঁধায় পড়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ, আচ্ছা, এই যে লোকগুলো খুন হয়েছে, এদের কারও সঙ্গে কারও কোনও সম্পর্ক আছে ?"

অনির্বাণ বলল, "এরা এক গ্রামের লোক নয়। কারও সঙ্গে কারও চেনা ছিল বলেও জানা যায়নি। শেষ যে লোকটা খুন হয়েছে, তার নাম ভবেন

সিকদার। লেখাপড়া শেখেনি, বেকার, তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর বয়েস। পাড়ায় একটু মাস্তানি করত, কিন্তু এমন কিছু না, পুলিশের খাতায় নাম নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "বেকার ছেলে, স্বাস্থ্য ভাল, কিছু একটা কাজ করতে চায়, অথচ আমাদের দেশ এদের কোনও কাজ দিতে পারে না। এটাই তো আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। শেষ পর্যন্ত এই ছেলেদের কেউ-কেউ বদ লোকদের পাল্লায় পড়ে। এই ছেলেটা চোরা চালানিদের দলে যোগ দেয়নি তো ?"

অনির্বাণ বলল, "তা অসম্ভব কিছু নয়। সীমান্ত এলাকায় স্মাগলারদের উৎপাত তো আছেই। পুলিশ আর কতদিন সামলাবে !"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ আবার বললেন, "টোবি দত্তকে যারা ছুরি মেরেছিল, তাদের কেউ ধরা পড়েছে ?"

অনির্বাণ আমতা-আমতা করে বলল, "না, মানে, টোবি দত্ত থানায় কোনও অভিযোগ জানায়নি। ওখানকার থানাও আর বেশি দূর এগোয়নি, আরও অনেক কাজ থাকে তো !"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, একটা লোককে রাস্তার ওপর কয়েকজন লোক ঘিরে ধরে ছুরি মারল, পুলিশ তার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেবে না ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, টোবি দত্তর পিঠে ছুরি গেঁথে গিয়েছিল, তবু সে স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুই কি এখনও ভাবছিস, টোবি দত্তর অলৌকিক ক্ষমতা আছে ? ছুরিটা বেশিদূর ঢোকেনি, তাই ক্ষতটা সেরে গেছে।"

অনির্বাণ বলল, "টোবি দত্তর গায়েও বেশ জোর আছে। সে লোকগুলোকে ঘুসি চালিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। তাতে বোঝা যায়, সে সঙ্গে ছুরি, ছোরা, বন্দুক রাখে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলে সে প্রতিশোধ নেবে না ? প্রকাশ্য রাস্তায় কয়েকজন লোক তাকে খুন করতে গেল, তার মতন একজন তেজি লোক সেটা হজম করে যাবে ? পুলিশ কিছু না করলেও সে নিশ্চয়ই ওই লোকগুলোকে খুঁজে বের করবে !"

অনির্বাণ বলল, "তা বলে আপনি বলতে চান, টোবি দত্তই এই লোকগুলোকে খুন করে প্রতিশোধ নিয়েছে ? কিন্তু গলায় ওরকম অদ্ভুত আঙুলের ছাপ..."

সন্তু উত্তেজিতভাবে কিছু বলার জন্য ডাকল, "কাকাবাবু..."

কাকাবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "সেসব পরে দেখা যাবে। অনির্বাণ, তুমি আগে খোঁজ নাও। এই তিনজন লোকই এক দলের কি না ! থানাগুলোতে চাপ দাও, ওরা গুণ্ডা-চোরাচালানিদের ঠিকই চেনে ! অন্য গ্রহের প্রাণীরা এসে কোচবিহারের গ্রামের মানুষদের খুন করছে, এ-কথা প্রকাশ্যে বোলো না, লোকে হাসবে !"

অনির্বাণ বলল, "খবরের কাগজেও এই ধরনের লিখছে !"

কাকাবাবু খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, "খবরের কাগজে লিখুক ! আমাদের আপাতত ইউ এফ ও নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। তোমরা গ্রামের মানুষদের কথায় পাত্তা দাও না। ওদের কথাগুলো ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে, ইউ এফ ও'র ব্যাপারটা পুরো ধাপ্পা !"

সন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "গ্রামের লোকরাই তো প্রথম থেকে বলছে, হেলিকপটার নয়, আগুনের পাখি, অন্য গ্রহের আকাশযান এসেছে পাঁচ-ছ' বার !"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এই কথাগুলোরই ঠিক-ঠিক মানে যদি আমরা বুঝতে না পারি, তা হলে আর আমরা শিক্ষিত কীসে ?"

সন্তু তবু চোখ-মুখ খুচিয়ে রইল। কাকাবাবুর কথাগুলি তার ধাঁধার মতন মনে হচ্ছে।

নাছোড়বান্দার মতন সে বলল, "কাকাবাবু, আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না। আমাকে বুঝিয়ে দাও !"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "যথাসময়ে বলব। এর মধ্যে আরও ভেবে দ্যাখ নিজেই বুঝতে পারিস কি না !"

॥ ৮ ॥

দুপুরবেলা বেশ জোর বৃষ্টি হয়ে গেল খানিকক্ষণ। তারপর আকাশ একেবারে পরিষ্কার। বেশ কয়েকদিন পর ঝকঝকে নীল আকাশ দেখা গেল।

হেডমাস্টারমশাই ইস্কুল থেকে ফেরার পর সবাই মিলে বারান্দায় চা খেতে বসলেন।

কথায়-কথায় হেডমাস্টারমশাই বললেন, "দিনহাটার একটা ইস্কুলে কে একজন লোক দু' লক্ষ টাকা দান করেছে। হঠাৎ এত টাকা পেয়ে সবাই অবাক ! টাকাটা কে দিয়েছে, তা জানা যাচ্ছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "ত্যাপা নামে একটি গরিবের ছেলে একসময় ওই ইস্কুলে পড়ত। বিদেশে গিয়ে সে খুব বড়লোক হয়েছে। খুব সম্ভবত টাকাটা সে-ই দান করেছে !"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "আমাদের গ্রামের টোবি দত্তও তো খুব বড়লোক। তার মামাদের অত বড় বাড়িটা কিনেছে। আমাদের ইস্কুলের বাড়িটা সারানো দরকার, সে কিছু টাকা দিলে পারত ! দিয়েছে মোটে পাঁচ হাজার টাকা !"

মণিকা গরম-গরম বেগুনি আর পেঁয়াজি ভেজে এনেছে মুড়ির সঙ্গে। তোফা খাওয়া হল।

মণিকা জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু আজ সন্ধেবেলা কী করা হবে ? মিলিটারির সেই সাহেব আসবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক জানি না। কোনও খবর পাইনি।"

মণিকা বলল, "আজ কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। সকালে আপনারা কোচবিহার শহরে গিয়েছিলেন, তখন আমাকে ইস্কুলে যেতে হল!"

কাকাবাবু হাসলেন।

একটু বাদে হেডমাস্টারমশাই বেরিয়ে গেলেন এক জায়গায় ছাত্র পড়াতে। মণিকা বাথরুমে গা ধুতে গেল।

কাকাবাবু সন্তুকে ফিসফিস করে বললেন, "আজ সন্ধের সময় আমরা এক জায়গায় যাব। সেখানে মণিকাকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু ও ছাড়তে চাইবে না। কী করা যায় বল তো ?"

সন্তু বলল, "আমরা চুপিচুপি এখনই কেটে পরি ?"

কাকাবাবু বললেন, "আরও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে। তা ছাড়া ওকে কিচ্ছু না বলে গেলে বেচারি খুব দুঃখ পাবে। একটা কাজ করা যায়। তুই বরং আজ থেকে যা এখানে। তুই ওর সঙ্গে গল্প করবি। আমি ঘুরে আসি।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, "না, আমি থাকব না। আমি যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এক কাজ কর। দু'জনে একসঙ্গে বেরনো যাবে না। তুই আগেই সরে পড়। তুই গিয়ে নদীর ধারে লুকিয়ে বসে থাক। সেই প্রথমবার যেখানে বসেছিলাম, যেখানে তোকে কুকুরটা আক্রমণ করেছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসে থাকবি, নদীর ওপারেও থাকতে পারিস, কেউ যেন তোকে দেখতে না পায়।"

সন্তু তক্ষুনি জুতো-মোজা পরে তৈরি হয়ে নিল। তারপর এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

কিছুক্ষণ পর কাকাবাবু ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে যেই ঘর থেকে বেরিয়েছেন, অমনই মণিকা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "যাই, একটু বেড়িয়ে আসি।"

মণিকা বলল, "সন্তু কোথায় গেল ?"

কাকাবাবু অম্লানবদনে বললেন, "ও তো পাঁচটার বাস ধরে কোচবিহার টাউনে চলে গেল!"

"কেন ?"

"ও যে তোমাদের আগুন পাখির ছবিগুলো তুলেছিল, তার প্রিন্টগুলো দেখার জন্য ছটফট করছিল। তা ছাড়া, কলকাতায় একটা ফোন করতে হবে।"

"রাত্তিরে ফিরবে কী করে ? আর তো বাস নেই!"

"অনির্বাণ যদি গাড়ি নিয়ে আসে, তা হলে তার সঙ্গে ফিরবে। না হলে থেকে যাবে।"

"আমাকে না বলে চলে গেল, ভারী দুষ্টু তো ! দাঁড়ান কাকাবাবু, আমি চটি পরে আসি, আমিও যাব আপনার সঙ্গে !"

কাকাবাবু অপলকভাবে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মণিকার দিকে। এই মেয়েটির সাহস আছে। ধরাবাঁধা গণ্ডির বাইরে যেতে চায়। এরকম মেয়ে বেশি দেখা যায় না। তবু আজ ওকে সঙ্গে নেওয়ার ঝুঁকি খুব বেশি।

তিনি আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, "না মণিকা, আজ আমি একাই যাব।"

মণিকা ভুরু তুলে বলল, "এই গ্রামের মধ্যে আপনি একা কোথায় বেড়াবেন ? আমি আপনাকে সব চিনিয়ে দেব।"

কাকাবাবু নরম গলায় বললেন, "চিনিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আমি নদীর ধারে ঘুরব। তোমাকে সঙ্গে আসতে হবে না। শুধু তাই নয়, তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, এর পরেও তুমি একা একা বেরিয়ে পড়বে না। আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি বাড়িতে থাকবে।"

মণিকা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "কেন, আমি আপনার সঙ্গে গেলে কী হয়েছে ? কেন নেবেন না আমাকে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ফিরে এসে বলব। ফিরে এসে তোমাকে একটা অদ্ভুত গল্প শোনাব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রইল, তুমি কিছুতেই আজ রাতে বাইরে বেরোবে না।"

কাকাবাবু মণিকার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একটু আদর করলেন। তারপর মণিকাকে সেই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। যেন তিনি অলসভাবে ভ্রমণ করছেন। টোবি দত্তর বাড়ির ধারেকাছে ঘেঁষলেন না। নদীর ধারে যখন পৌঁছলেন, তখন বিকেল প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমের আকাশ লাল। সন্তুকে কোথাও দেখা গেল না। কাকাবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ সূর্যাস্তের শোভা দেখলেন।

নদীর ওপর থেকে একটা শিসের শব্দ ভেসে এল।

কাকাবাবু দু'বার মাথা ঝোঁকালেন। তারপর নেমে পড়লেন নদীতে।

নদীতে জল বেশি নেই, কিন্তু মাঝখানে বড়-বড় পাথর। অন্য লোকেরা অনায়াসে বসে যেতে পারে। কিন্তু ক্রাচ নিয়ে যাওয়ার বেশ অসুবিধে। কাকাবাবু খোঁড়া পা-টা ঠিকমতন মাটিতে পাততে পারেন না, তবে সেই পায়েও একটা বিশেষ ধরনের জুতো পরে থাকেন। সেই জুতো খোলার অনেক ঝামেলা বলে তিনি প্যান্ট-জুতো ভিজিয়ে ফেললেন।

অন্য পাড়ে ওঠার পর সন্তু একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "আমি

টোবি দত্তর বাড়ির দিকে নজর রেখেছি। ছাদে কাউকে দেখা যায়নি।”

কাকাবাবু সে-কথায় কোনও গুরুত্ব না দিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “দ্যাখ, কিছু-কিছু গাছের ডাল কেউ ছেঁটেছে বোঝা যাচ্ছে।”

সন্তু বলল, “জঙ্গলের গাছ কাটা তো অপরাধ।”

কাকাবাবু বললেন, “পুরো গাছ কাটেনি। ডালপালা ছাঁটা তেমন অপরাধ নয়। মনে হয়, জঙ্গলের মধ্যে কেউ একটা রাস্তা বানাতে চেয়েছে।”

কাকাবাবু ঘড়ি দেখলেন। তখনই নদীর এ-ধারে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। একটা কালো রঙের জিপ গাড়ি থেকে নেমে এল অনির্বাণ।

কাকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল, “আমরা কোন দিকে যাব?”

কাকাবাবু বললেন, “একটু দাঁড়াও। আগে ব্যাপারটা একটু বুঝে নিতে হবে।”

এবার তিনি টোবি দত্তর বাড়ির দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। আবছা অন্ধকারে বাড়িটাকে জনমনুষ্যহীন মনে হয়।

কাকাবাবু বললেন, “টোবি দত্তর বাড়ির ছাদে গভীর রাতে একটা জোরালো আলো জ্বলে। কেন সে আলোটা জ্বালে, এর একটা সহজ উত্তর আমাদের মনে আসেনি।”

অনির্বাণ বলল, “কাকাবাবু, আপনার কাছে উত্তরটা সহজ মনে হতে পারে, আমাদের কাছে কিন্তু খুবই জটিল।”

কাকাবাবু বললেন, “জটিল কেন হবে? আলোটা সে জ্বালে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।”

অনির্বাণ বলল, “হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু কার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য?”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার!”

অনির্বাণ চমকে গিয়ে খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, “আমার জন্য?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, তোমার মতন পুলিশের বড়কর্তাদের জন্য! সে গোপনে কিছু করতে চাইলে নিশ্চয়ই এরকম একটা তেজি আলো জ্বালাত না। এই আলো তো লোকের নজরে পড়বেই। সে জানান দিতে চায়, আমি এরকম একটা আলো জ্বেলেছি, তোমরা এসে দ্যাখো!”

“আমরা এসে কী দেখব?”

“তুমি পুলিশের বড়কর্তা। মন্ত্রীদের আর ভি আই পি-দের দেখাশুনো করতেই তোমাদের সময় কেটে যায়। তুমি ব্যস্ত লোক, নিজে এসে দেখতে পারোনি। তোমার স্পাইদের মুখে খবর পেয়েছ। তারা তোমাকে ঠিক খবর দেয়নি।”

“এখানকার থানার দারোগাও রিপোর্ট করেছে এই অদ্ভুত আলোর কথা।”

“সেটাও ভুল রিপোর্ট।”

"কেন, ভুল বলছেন কেন ?"

"হয় তোমার স্পাই কিংবা দারোগা ভাল করে দেখেনি। অথবা ইচ্ছে করে ভুল খবর দিয়েছে। এসে থেকে শুনছি, আলোটা আকাশের দিকে জ্বলে, মেঘ ফুঁড়ে যায়। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম, আলোটা আকাশের দিকে কিছুক্ষণ জ্বলে বটে, তারপর বেঁকে যায়। এই জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ে, আর অনেকক্ষণ থাকে। অর্থাৎ টোবি দত্ত প্রথমে ওপরের দিকে আলো ফেলে যেন বলতে চায়, এই যে দ্যাখো আমার শক্তিশালী আলো। এবার সেই আলো আমি জঙ্গলে ফেলছি।"

"জঙ্গলে কী আছে ?"

"সেটাই তো এখন আমরা দেখতে যাব। এরকম একটা সংকেত সে দিয়ে যাচ্ছে, কেউ গ্রাহ্য করেনি। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়ার জন্য ইউ এফ ও, টি উ এফ ও'র ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। খবরের কাগজে, রেডিয়োতে ইউ এফ ও নিয়েই গালগল্প ফাঁদা হয়েছে, এই আলোটার কথা কেউ বিশেষ পাত্তাই দেয়নি !"

"ইউ এফ ও'র ধাপ্পা কে দিয়েছে ? আমরা তো দিইনি ! পুলিশ থেকে আমরা জানিয়েছি যে কর্নেল সমর চৌধুরীর হেলিকপটার গেছে ওখানে !"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আর সন্তু মনে-মনে বিশ্বাস করে ফেলেছ যে, আর-একটা কোনও উড়ন্ত চাকিও ওখানে আসে ! কিন্তু গ্রামের লোক কী বলেছে ? গ্রামের লোক সাধারণ হেলিকপটার চেনে না ? এখন এমন কোন গ্রাম আছে, যেখানকার লোক হেলিকপটার দেখেনি ? নর্থবেঙ্গলের লোক তো আরও বেশি দেখেছে।"

"হ্যাঁ, হেলিকপটার এখন সবাই চেনে।"

"তবু এখানকার গ্রামের লোক বলেছে, আগুন ছড়াতে-ছড়াতে আর বিকট শব্দ করতে-করতে একটা কিছু অদ্ভুত আকাশযান এখানে আসে। হঠাৎ সব আলো নিভিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সন্তু আর আমিও সেরকমটি দেখেছি। ঠিক তো ? গ্রামের লোক কি একবারও বলেছে যে, দু-একবার তারা ওইরকম অদ্ভুত উড়ন্ত চাকি দেখেছে, আর দু-একবার দেখেছে কর্নেল চৌধুরীর সাধারণ হেলিকপটার ? প্রত্যেকবার তারা একই জিনিস দেখেছে ! মণিকা কিংবা তার বাবা হেলিকপটার চেনে না, তা তো নয় !

অনির্বাণ আর সন্তু দু'জনেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অনির্বাণ আস্তে-আস্তে বলল, "মাই গড ! তার মানে, কর্নেল সমর চৌধুরীই তিনবারের চেয়ে বেশি হেলিকপটার নিয়ে এসেছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "অবশ্যই। তিনি হেলিকপটারটাকে আলোটালো দিয়ে সাজিয়ে, আগুনের পিচকিরি ছোটাতে-ছোটাতে নিয়ে এসেছেন। কেমিক্যাল আগুন সহজেই তৈরি করা যায়, সিনেমায় যেরকম দেখায় !"

সন্তু বলল, "কর্নেল চৌধুরী যে নিজের মুখেই বললেন, পরশু রাতে উনি হেলিকপটার নিয়ে আসেননি ? সেইজন্যই আমি আরও ভাবলাম..."

কাকাবাবু বললেন, "উনি মিথ্যে কথা বলেছেন !"

সন্তু তবু বলল, "ওঁর ফ্লাইট লেফটেনান্ট যে সাক্ষী দিলেন..."

কাকাবাবু বললেন, "তাকে শিখিয়ে রাখা হয়েছিল। উনি জানতেন, আমরা গিয়েই ওই কথা জিজ্ঞেস করব। সেইজন্য পাশের ঘরে একটি লোককে সাজিয়ে রেখেছিলেন। হয়তো ওই লোকটিকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন !"

অনির্বাণ বলল, "কর্নেল চৌধুরী এরকম মিথ্যে কথা বলবেন কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ওঁকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। হয়তো উনি ইউ এফ ও কিংবা উড়ন্ত চাকির গুরুত্ব ছড়িয়ে আনন্দ পান। পৃথিবীতে অন্যান্য জায়গাতেও দেখা গেছে, কোনও-কোনও লোক উড়ন্ত চাকির গুজব ছড়িয়ে মজা করার জন্য ছোট প্লেন কিংবা বেলুন উড়িয়ে উদ্ভট সব কাণ্ড করেছে !"

অনির্বাণ বলল, "কর্নেল চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলে উনি নিশ্চয়ই হা-হা করে হেসে উঠে বলবেন, 'প্র্যাকটিক্যাল জোক ! পুলিশকেও ধোঁকা দিয়েছি !' ওঁরা, আর্মির লোকেরা পুলিশকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখেন।'"

কাকাবাবু বললেন, "প্র্যাকটিক্যাল জোক হতে পারে, আবার অন্য কিছু হতে পারে।"

এবার তিনি জঙ্গলের দিকে ফিরে বললেন, "টোবি দত্ত জঙ্গলের মধ্যে আলো ফেলে কিছু দেখাতে চায়। কিন্তু কেউ সেটা দেখতে চায়নি। এইজন্য গাছের ডালপালা ছেঁটে, রাস্তা মতন বানিয়েছে, যাতে আলোটা যায় অনেক দূর পর্যন্ত !"

অনির্বাণ বলল, "চলুন, আমরা গিয়ে দেখি।"

কাকাবাবু বললেন, "হেঁটে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু কতদূর যেতে হবে তা তো জানি না। অন্ধকারে ক্রাচ নিয়ে আমি বেশিদূর যেতে পারব না। জিপেই যেতে হবে। আস্তে-আস্তে এই রাস্তাটা ধরে চালাতে বলো !"

অনির্বাণ বলল, "ড্রাইভার আনিনি। আমিই চালাব।"

জঙ্গলের ভেতর এরই মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। থেমে গেছে পাখির ডাক। এই বনে মানুষ বিশেষ আসে না, মাঝে-মাঝে হাতির উৎপাত হয় বলে শোনা যায়। হাতিদের যাওয়া-আসার একটা রাস্তা আছে। একবার দু'জন কাঠুরেকে হাতির পাল পদদলিত করেছিল। সে প্রায় তিন বছর আগের কথা। টোবি দত্ত তখনও এখানে আসেনি। হাতি দেখাবার জন্য টোবি দত্ত নিশ্চয়ই এদিকটায় আলো ফেলে না।

একটু দূর যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অনির্বাণ, তুমি জাপানে খোঁজ নিয়েছিলে ?"

অনির্বাণ বলল, "কলকাতার আই বি থেকে জাপানে ফোন করেছিল। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। টোবি দত্ত এক জাপানি মহিলাকে বিয়ে

করেছিল। কিছুদিন আগে সেই স্ত্রীটি গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা যায়। তারপর থেকেই টোবি দত্তর মাথায় গোলমাল দেখা দেয়। তাকে একটি মানসিক চিকিৎসার হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। চাকরিও ছাড়তে হয় সেইজন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ। আমি এইরকমই কিছু ভেবেছিলাম। টোবি দত্ত রুক্ষ আর অভদ্র ধরনের ব্যবহার করে। এইরকম স্বভাব নিয়ে কি সে জাপানে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করতে পারত ? জাপানিরা অতি ভদ্র হয়। তা হলে নিশ্চয়ই হঠাৎ কোনও কারণে টোবি দত্তর স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এমনও হতে পারে, মাথার গোলমাল হওয়ার পর থেকেই তার সব পুরনো কথা মনে পড়ে গেছে। এখানকার লোকেরা এক সময় তার ওপর কত খারাপ ব্যবহার করেছিল, সেইসব ভেবে-ভেবে রাগে ফুঁসতে থাকে।"

অনির্বাণ বলল, "রাগ জিনিসটা কিন্তু মানুষের খুব ক্ষতি করে।"

কাকাবাবু বললেন, "মাঝে-মাঝে রেগে ওঠা ভাল। সব সময় ভাল নয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও রাগ করতেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই করতেন। হয়তো রেগে চ্যাঁচামেচি করতেন না। ভেতরে-ভেতরে ফুঁসতেন। ওঁর একটা কবিতা আছে, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস ... ' সেটা পড়লেই মনে হয়, লেখার সময় উনি খুব রেগে ছিলেন।"

অনির্বাণ বলল, "আর তো রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বড়-বড় ঝোপ ঠেলে গাড়ি চালানো মুশকিল।"

কাকাবাবু ঝুঁকে দু'পাশ দেখে বললেন, "এখানেও কিছু-কিছু গাছের ডাল কাটা হয়েছে। আলোটা এদিকেই আসে। তুমি যতদূর পারো চালাও। তারপর নেমে পড়তে হবে !"

অনির্বাণ বলল, "জঙ্গলে আর কিছুই তো দেখা গেল না এ পর্যন্ত। এদিকে আলো ফেলে কী দেখাতে চায় টোবি দত্ত ?"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "হয়তো শেষপর্যন্ত দেখা যাবে কিছুই নেই। তখন যেন আমার ওপর সব দোষ চাপিয়ো না। ভুল তো হতেই পারে। এটা আমার একটা থিয়োরি।"

একটু বাদে জিপটা থেমে গেল। জল-কাদায় চাকা পিছলে যাচ্ছে, সামনে বড়-বড় ঝোপ।

অনির্বাণ বলল, "আর বোধ হয় সামনে এগিয়ে লাভ নেই। আজকের মতন এখান থেকেই ফেরা যাক।"

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "নেমে পড়ো, নেমে পড়ো !"

তিনিই প্রথম নেমে একটা পেন্সিল টর্চ জ্বাললেন। কাছেই একটা গাছের

সদ্য কাটা ডাল পড়ে আছে। ডালটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, "হ্যাঁ, এইদিকেই এগোতে হবে।"

ঝোপঝাড় ঠেলে-ঠেলে যেতে কাকাবাবুরই অসুবিধে হচ্ছে বেশি। তবু তিনি যাচ্ছেন আগে-আগে।

অনির্বাণ বলল, "এই সময় যদি একটা হাতির পাল এসে পড়ে?"

সন্তু বলল, "তা হলে আমাদের শুঁড়ে তুলে লোফালুফি খেলবে!"

কাকাবাবু বললেন, "কোনওক্রমে যদি একটা হাতির পিঠে চেপে বসতে পারিস, তা হলে হাতিটা আর তোকে নামাতে পারবে না।"

অনির্বাণ বলল, "অত সহজ নয়। হাতিটা তখন একটা বড় গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঘষবে। তাতেই চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাব!"

সন্তু বলল, "সামনে একটা আলো!"

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে টর্চ নিভিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, "চুপ, কেউ শব্দ কোরো না। ঝোপঝাড়ের আড়ালে, বেশ খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে মিটমিটে আলো। সেই আলোর আশেপাশে কী আছে, তা দেখা যাচ্ছে না। কোনও শব্দও নেই।"

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল।

কাকাবাবু মাঝে-মাঝে মাটির দিকে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছেন।

আরও খানিকটা যাওয়ার পর চোখে পড়ল একটা ভাঙা বাড়ি। প্রায় ধ্বংসস্তূপই বলা যায়। কোনও এক সময় হয়তো কোচবিহারের রাজারা এখানে এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে শখের বিশ্রাম ভবন বানিয়েছিলেন। এখন ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাচ্ছে, কেউ খবরও রাখে না। বাড়িটার একটা কোণ থেকে আলোটা আসছে।

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্ত তা হলে এই বাড়িটাকেই দেখায়।"

অনির্বাণ বলল, "এইরকম একটা ভাঙা বাড়ি দেখাবে কী জন্য? আলো জ্বলছে যখন, সাধারণ চোর-ডাকাতদের আখড়া হতে পারে। তার জন্য ওর এত আলোটালো ফেলার কী দরকার?"

কাকাবাবু বললেন, "ধরো, যদি তোমাদের ইউ এফ ও কিংবা উড়ন্ত চাকির অদ্ভুত প্রাণীরা এখানে বাসা বেঁধে থাকে?"

অনির্বাণ বলল, "উড়ন্ত চাকি যে আসেনি, তা তো প্রমাণ হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুই প্রমাণ হয়নি। কারা এই ভাঙা বাড়িতে আলো জ্বেলেছে, তা না দেখা পর্যন্ত সবটা বোঝা যাবে না।"

কাকাবাবু আবার এগোতে যেতেই অনির্বাণ তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়ান। ওর ভেতরে ঠিক কতজন আছে তার ঠিক নেই। আমরা মাত্র তিনজন। এক কাজ করা যাক, আমরা এখন ফিরে যাই। তারপর পুলিশ ফোর্স নিয়ে আবার এসে পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলব।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "ফিরে যাব ? ভেতরটা দেখার এত ইচ্ছে হচ্ছে, ফিরে এসে যদি কিছুই না পাই ! ততক্ষণে যদি সব ভোঁ-ভাঁ হয়ে যায় ? তুমি বরং ফিরে যাও অনির্বাণ। আরও পুলিশ ডেকে আনো। আমি আর সন্তু এই দিকটা সামলাই ততক্ষণ।"

অনির্বাণ বলল, "অসম্ভব ! আপনাদের দু'জনকে ফেলে রেখে আমি চলে যেতে পারি ? আমিও তা হলে এখানে থাকব।"

॥ ৯ ॥

কাকাবাবু বললেন, "তিনজনের পাশাপাশি থাকা চলবে না। ভেতরে যদি একটা দল থাকে, তা হলে বাইরে নিশ্চয়ই পাহারাদার রেখেছে। আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে, পাহারাদারদের ঘায়েল না করে ভেতরে ঢোকা যাবে না।"

সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যদি খুব বেশি বেকায়দায় পড়ে যাস, তা হলে একটা শিস দিবি !"

বাড়িটার যেদিকে আলো জ্বলছে, সন্তু চলে গেল তার উলটো দিকে। আকাশ আজ পরিষ্কার, জ্যোৎস্নায় সব কিছুই অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। বাড়িটা এমনই ভাঙা যে, মাঝে-মাঝে দেওয়াল হেলে পড়েছে। চতুর্দিকে ইট ছড়ানো। এমন জায়গা দেখলেই মনে হয় এখানে সাপখোপ আছে। সাপের ভয়েই সন্তু মাটির দিকে চেয়ে-চেয়ে হাঁটতে লাগল।

বেশ খানিকটা ঘুরেও সে কোনও পাহারাদার দেখতে পেল না।

এক জায়গায় মনে হল, ভেতরে ঢোকার একটা দরজা আছে। দরজাটা খোলা। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দরজার দিকে নজর রাখতে গেল যেই, অমনই হুড়মুড় করে কী যেন এসে পড়ল তার ঘাড়ে।

প্রথমে সে ভাবল, একটা বাঘ। তারপর ভাবল, হনুমান। তারপর বুঝতে পারল, মানুষ। সে চিন্তাই করেনি যে, পাহারাদার গাছের ওপর উঠে বসে থাকতে পারে ! লোকটা গায়ে একটা কালো চাদর মুড়ি দিয়ে আছে।

পাহারাদারের শরীরের ওজনে সন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে মাটিতে।

পাহারাদারটি বলল, "আরে, এ যে দেখছি একটা বাচ্চা !"

সন্তু কেঁদে ফেলে বলল, "ওরে বাবা রে, আমি ভেবেছি ভূত। ভূতে আমাকে মেরে ফেলল !"

পাহারাদারটি বলল, "অ্যাই, ওঠ। তুই এখানে কী করছিস ?"

সন্তু উঠে বসে, চোখ মুছতে-মুছতে বলল, "রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।"

পাহারাদারটি ধমক দিয়ে বলল, "রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিস মানে ? এই জঙ্গলে রাত্তিরবেলা ঢুকেছিস কেন ?"

সন্তু বলল, "বাবা মেরেছে। বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

পাহারাদারটির হাতে একটা লম্বা ছুরি। সেটা নাচাতে-নাচাতে বলল, "তোর বাড়ি কোন গ্রামে ?"

সন্তু বলল, "আমি যমের বাড়িতে থাকি। তুমি যাবে সেখানে ?"

লোকটি বুঝতে না পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কোথায় ?"

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠে তার মুখে একটা লাথি কষাল। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটল যে, লোকটা বুঝতেও পারল না। তা ছাড়া তার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট একটি ছেলে যে এইরকমভাবে মারতে সাহস করবে, তা সে কল্পনাও করেনি।

লোকটা ছিটকে পড়ে গেল খানিকটা দূরে। হাতের ছুরিটা খসে গেছে। সেটা সঙ্গে-সঙ্গে কুড়িয়ে নিয়ে সন্তু লোকটার বুকের ওপর চেপে বসে বলল, "আমি যমের বাড়ি থেকে আসছি। আমি চেহারা বদলাতে পারি। এই ছোট দেখছ, একটু পরেই প্রকাণ্ড হয়ে যাব। চ্যাঁচালেই তোমার গলাটা কেটে ফেলব, হাঁ করো, হাঁ করো !"

লোকটি ভয়ে-ভয়ে হাঁ করতেই সন্তু নিজের পকেটের রুমালটা ভরে দিল ওর মুখে। তারপর নির্দয়ভাবে ওরই ছুরি দিয়ে ওর চাদরটা ফালা-ফালা করে কেটে, এক-একটা টুকরো দিয়ে বাঁধল ওর মুখ, হাত, পা।

সন্তু বলল, "এখানেই শেষ নয়। এবার ছুরিটা বসিয়ে দেব তোমার বুকে। খুব তাড়াতাড়ি যমের বাড়ি চলে যাবে।"

আতঙ্কে লোকটার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কথা বলতে পারছে না, প্রবলভাবে মাথা নাড়ল।

সন্তু বলল, "তা হলে এখানে চুপ করে শুয়ে থাকো।"

লোকটাকে ফেলে রেখে, ছুরিটা হাতে নিয়ে সন্তু এগিয়ে গেল আলোটার দিকে।

একটু পরেই দেখল, কাকাবাবু আর অনির্বাণ আর একটা লোকের হাত-পা বাঁধছে।

অনির্বাণ বলল, "একে কাবু করতে আমার কোনও অসুবিধেই হয়নি। নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা চারদিক ঘুরে এসেছি, আর কেউ নেই। এবার ভেতরে ঢোকা যাক।"

সামনেই একটা দরজা, তার ওপাশে একটা চাতাল। তার কোনও দেওয়াল নেই। আলোটা কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না। তবে কোথায় যেন মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে একটু-একটু।

চাতালটা ঘুরতে-ঘুরতে চোখে পড়ল একটা সিঁড়ি। সেটা নেমে গেছে নীচের দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "মাটির নীচেও ঘর আছে মনে হচ্ছে।"

অনির্বাণ বলল, "রাজা-মহারাজাদের বাড়িতে থাকত।"

সেই সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা নামতেই আলোটা দেখা গেল। সিঁড়ির পাশে-পাশে দুটো ঘুলঘুলি, সেখান থেকে আলোটা আসছে।

অনির্বাণ আর কাকাবাবু দুটো ঘুলঘুলিতে চোখ রাখলেন।

নীচে একখানা ঘর বেশ পরিচ্ছন্ন। দেওয়াল-টেওয়াল ভাঙা নয়। মেঝেতে একটা শতরঞ্চি পাতা, তার মাঝখানে হ্যাজাক বাতি জ্বেলে বসে আছে তিনজন লোক। তারা খুব মনোযোগ নিয়ে বিস্কুটের মতন সোনার চাকতি গুনছে। অনেক চাকতি। পাশে তিন-চারটে কাগজের বাক্স।

কাকাবাবু সরে এসে সন্তুকে দেখতে দিলেন। তারপর তাকালেন অনির্বাণের দিকে। অনির্বাণ মাথা ঝাঁকাল।

ক্রাচের যাতে শব্দ না হয়, সেইজন্য কাকাবাবু ক্রাচ দুটো বগল থেকে সরিয়ে দেওয়াল ধরে-ধরে নামতে লাগলেন। সিঁড়ির নীচে একটা মজবুত লোহার গেট, মনে হয় নতুন। গেটটা অবশ্য এখন খোলা!

তিনজন প্রায় একসঙ্গে ঢুকে পড়ল ঘরে। ভেতরের লোকেরা সোনা গুনতে এতই মগ্ন হয়ে ছিল যে, এদিকে খেয়ালই করেনি। আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলতেই তারা দেখল, দু'জনের হাতে রিভলভার, একজনের হাতে ছুরি।

অনির্বাণ গম্ভীরভাবে আদেশ দিল, "সবাই ঘরের এককোণে চলে যাও। মাথার ওপর হাত তুলে থাকো। কোনওরকম পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি চালাব।"

তারপর সে খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, "এ কী? ফাগুলাল না?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওকে তুমি চেনো?"

অনির্বাণ বলল, "ও তো পুলিশের লোক। ওর ওপরেই টোবি দত্তর বাড়ির ওপর নজর রাখার ভার দেওয়া হয়েছিল। ব্যাটার এই মতলব?"

কাকাবাবু বললেন, "রক্ষকই ভক্ষক। পুলিশের চাকরিতেও মাইনে পায়, আর স্মাগলারদের সঙ্গে থেকেও অনেক রোজগার করে।"

ফাগুলাল ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু বললেন, "এই লোক তিনটিকে বাঁধতে হবে। দড়ি জোগাড় করা দরকার। সোনাগুলোও ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। সন্তু, তুই সোনাগুলো কাগজের বাক্সে ভর তো!"

অনির্বাণ বলল, "এটা একটা স্মাগলারদের ডেন বোঝা গেল! এইটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য টোবি দত্ত অত আলো-টালোর ব্যবস্থা করেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো আরও কিছু আছে। খুঁজে দেখতে হবে। স্মাগলারদের ওপর টোবি দত্তর খুব রাগ। ওর ভাই আর বাবাকে স্মাগলাররাই খুন করেছে। যারা ওর পিঠে ছুরি মেরে ছিল, তারাও বোধ হয় এই দলের।"

ফাগুলাল হঠাৎ নিচু হয়ে শতরঞ্চির একটা কোনা ধরে জোরে টান মারল।

কাকাবাবু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। টাল সামলাতে পারলেন না। অনির্বাণও তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। একমাত্র সন্তু শতরঞ্চিতে পা দেয়নি, তার কিছু হল না।

কাকাবাবু হাত থেকে রিভলভারটা ছাড়েননি। কিন্তু সেটা তোলার সময় পেলেন না। ফাগুলাল একলাফে তাঁর সেই হাতটার ওপর পা চেপে দাঁড়াল। অনির্বাণ পড়েছিল উলটো হয়ে। তাকেও ধরে ফেলল একজন।

কাকাবাবুর দারুণ আফসোস হল। শতরঞ্চি টানা একটা পুরনো কায়দা। তাঁর আগেই উচিত ছিল পা দিয়ে শতরঞ্চিটা গুটিয়ে দেওয়া।

ফাগুলাল আর অন্যরা কাকাবাবুদের রিভলভার কেড়ে নিল। তারপর ফাগুলাল বিশ্রী গলায় বলল, "অ্যাই, উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া।"

কাকাবাবুর বাঁ হাঁটুতে জোর গুঁতো লেগেছে। তিনি আস্তে-আস্তে উঠতে লাগলেন।

ফাগুলাল ধমকে বলল, "জলদি ওঠ, জলদি !"

কাকাবাবু বললেন, "একটু সময় দাও, দেখছ না খোঁড়া মানুষ !"

ফাগুলাল বলল, "খোঁড়া মানুষ তো এখানে মরতে এসেছিস কেন ?"

এই বলে ফাগুলাল কাকাবাবুর পেটে একটা লাথি কষাল !

সন্তু শিউরে উঠল। তার হাতে ছুরি আছে বটে, কিন্তু ওদের হাতে রিভলভার। সন্তু কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "আমি তো উঠছিলামই। তবু তুমি আমাকে মারলে কেন ? এর জন্য তোমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে !"

ফাগুলাল হ্যা-হ্যা করে হাসতে-হাসতে বলল, "ওরে চুনি, ওরে গোপ্‌লা। এই খোঁড়াটা কী বলে রে ! আমাদের নাকি শাস্তি দেবে !"

চুনি নামে লোকটি বলল, "এদের নিয়ে এখন কী করি ? শেষ করে দিই ?"

ফাগুলাল বলল, "এখানে মারলে লাশগুলো নিয়ে ঝঞ্ঝাট হবে ! জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাই, মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেই কাম ফতে !"

অনির্বাণ বলল, "ফাগু, তুমি পুলিশের লোক হয়ে খুন করবে ? তোমার ধরা পড়ার ভয় নেই ?"

ফাগুলাল ভেংচিয়ে বলল, "ধরা পড়ার ভয় নেই ! কে ধরবে ? কে জানবে ? এস. পি. সাহেব, তুমি তো জ্যান্ত ফিরছ না !"

চুনি সন্তুর দিকে চেয়ে বলল, "এই ছোঁড়াটা যে ছুরি বাগিয়ে আছে ! এই, ফ্যাল ছুরিটা !"

সন্তু চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

চুনি বলল, "ওর হাতে গুলি চালাব ?"

কাকাবাবু কঠিন গলায় বললেন, "ওর হাতে যে গুলি করবে, তার হাতখানা আমি ছিঁড়ে শরীর থেকে আলাদা করে দেব !"

ওরা তিনজনই এবার কাকাবাবুর দিকে ফিরে তাকাল। এরকম কথা যেন তারা কখনও শোনেনি।

ফাগুলাল ভুরু তুলে একটুক্ষণ কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, "এ-লোকটা তো অদ্ভুত! পাগল নাকি? তুই এত বড়-বড় কথা বলছিস কেন রে? এক্ষুনি যদি তোর কপালটা ফুটো করে দিই, তা হলে তোকে কে বাঁচাবে?"

কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে আছেন ঠিক ফাগুলালের চোখের দিকে। তাঁর কপাল ও মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়ে ভয়ঙ্কর দেখাল। তিনি বিরাট জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "আমায় মারবি? মার দেখি তোর কত সাহস? রাজা রায়চৌধুরীকে যে মারবে সে এখনও জন্মায়নি।"

ঠিক মশা-মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে কাকাবাবু বিদ্যুৎ-বেগে ফাগুলালের রিভলভার-ধরা হাতখানায় একটা চাপড় মারলেন। ফাগুলালও গুলি চালাল, কিন্তু হাতটা সামান্য বেঁকে যাওয়ায় সেই গুলি লাগল দেওয়ালে।

কাকাবাবু এর পরেই লোহার মতন মুষ্টিতে একটা ঘুসি মারলেন ফাগুলালের চোখে। সে আর্ত চিৎকার করে বসে পড়ল।

সন্তুও সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে পড়েছে চুনির ঘাড়ে। ছুরিটা তার গলায় ঠেকিয়ে বলল, "রিভলভারটা ফেলে দাও! নইলে গেলে!"

অন্য লোকটির কাছে কোনও অস্ত্র নেই। সে এইসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভয় পেয়ে দৌড় লাগাল সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু এই সাফল্য বেশিক্ষণ ভোগ করা গেল না।

কাকাবাবু আর সন্তু রিভলভার দুটো কুড়িয়ে নেওয়ার আগেই সিঁড়ির পাশের একটা ঘুলঘুলি থেকে গম্ভীর গলায় কেউ বলল, "বাঃ বাঃ, নাটক বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু আর দরকার নেই। খেলা শেষ। রাজা রায়চৌধুরী, রিভলভারে হাত দেবেন না। এদিকে তাকিয়ে দেখুন, দুটো রিভলভার আপনার দিকে এইম করা আছে। একটু নড়লেই শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। আমি বাজে কথা বলি না।"

কাকাবাবু দেখলেন, দুটো ঘুলঘুলি থেকে বেরিয়ে আছে দুটো রিভলভারের নল।

কাকাবাবু সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

সেই কণ্ঠস্বর আবার বলল, "ছেলেটাকে বলুন, বাঁদরের মতন যেন আর লাফালাফি না করে। তা হলে আপনিই আগে মরবেন।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন। সন্তু সরে গেল দেওয়ালের দিকে

কণ্ঠস্বরটি আবার বলল, "এই চুনি, এই ফাগু, অপদার্থের দল! একজন খোঁড়া, আর একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গেও লড়তে পারিস না? অস্তর দুটো কুড়িয়ে নিয়ে তাক করে থাক।"

তারপর সিঁড়িতে জুতোর মশমশ শব্দ করে নেমে এসে ঘরে ঢুকল একজন লোক। থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে বড় কালো চশমা, মাথায় কাউবয়দের মতন টুপি। পাক্কা সাহেবের মতন পোশাক!

ঘরে ঢুকে বলল, "চুনি, সোনাগুলো বাক্সে ভরে ফেল। আমার ঘোড়ায় তুলে দিবি।"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে হেসে বলল, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী! আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে নাকি? আপনাকে যে মারবে সে এখনও জন্মায়নি। আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। পর পর দুটো বুলেট যদি আপনার বুকে ঠুসে দিই, তারপর কী হবে?"

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, "চেষ্টা করে দেখুন না!"

লোকটি বলল, "ওই ফাগুলালের মতন আমাকেও চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাবেন নাকি? আমার হাত কাঁপে না। তবে বুলেটের বদলে অন্যভাবেও মারা যায়। আপনারা তো একটা গাড়ি এনেছেন দেখলাম। সেই গাড়িতে চাপিয়েই আপনাদের একটা পাহাড়ে নিয়ে যাব। সেখান থেকে গাড়িসুদ্ধু গড়িয়ে ফেলে দেব একটা খাদে। গাড়িটায় আগুনও জ্বালিয়ে দেব। তারপর দেখব, আপনারা কী করে বাঁচেন! সবাই ভাববে, আপনারা তিনজনেই গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।"

সন্তুর দিকে ফিরে সে বলল, "নো হ্যাংকি-প্যাংকি বিজনেস। আজ পর্যন্ত আমার হাত থেকে কেউ পালাতে পারেনি। যদি তাড়াতাড়ি মরতে না চাও, তা হলে চুপচাপ থাকো।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি জিভের তলায় একটা গুলি রেখে গলার আওয়াজটা বদলাবার চেষ্টা করছেন। ওটার আর দরকার নেই। আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। থুতনির দাড়িটা যে নকল, তাও জানি। রাত্তিরবেলা কালো চশমা পরবারই বা দরকার কী?"

লোকটি থুঃ করে একটা কাচের গুলি মুখ থেকে ফেলে দিল বাইরে। কালো চশমাটা খুলতে খুলতে বলল, "আপনি বুদ্ধিমান লোক তা জানি। কিন্তু কেন আমার খপ্পরে পড়তে এলেন? এবারেই আপনার লীলাখেলা শেষ!"

অনির্বাণ দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "কর্নেল সমর চৌধুরী? আপনি?"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষের লোভের শেষ নেই। মিলিটারিতে এত ভাল চাকরি করেন, তবু স্মাগলারদের দলের নেতা হয়েছেন!"

অনির্বাণ বলল, "আর্মির দু-একজন অফিসার বর্ডারে চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত, এরকম রিপোর্ট পেয়েছি। কিন্তু কর্নেল সমর চৌধুরীর মতন মানুষ... ভাবতেই পারিনি!"

সমর চৌধুরী বললেন, "চোপ! আর একটাও কথা নয়! এই ফাগু, সোনাগুলো চটপট ভরে নে। বেশি দেরি করা যাবে না। তোদের টাকা কাল

পেয়ে যাবি। ঠিকঠাক বাড়িতে পৌঁছে যাবে।”

কাকাবাবু তবু বললেন, “এত সোনা, এর তো অনেক দাম।”

সমর চৌধুরী বললেন, “লোভ হচ্ছে নাকি ? আমার দলে যোগ দেবেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “আপনার দলটাই তো আর থাকবে না। পুলিশ এবার সব জেনে ফেলবে !”

সমর চৌধুরী বললেন, “আপনার মনের জোর আছে তা স্বীকার করতেই হবে। পুলিশকে কে জানাবে ? আর ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে আপনারা তিনজনেই খতম। এ নিয়ে বাজি ফেলতে পারি।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে বাজি রইল !”

সমর চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, “কার সঙ্গে বাজি লড়ছি আমি ? আপনি তো মরেই যাচ্ছেন, রাজা রায়চৌধুরী !”

সোনাগুলো প্রথমে দুটো কাগজের বাক্সে রেখে তারপর দুটো ক্যাম্বিসের থলিতে ভরা হল। সমর চৌধুরী নিজে সে দুটো এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে রিভলভারটা ধরে রইলেন।

তারপর সবাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কাকাবাবুর ঠিক পেছনে সমর চৌধুরী। তাঁর ঘাড়ের কাছে রিভলভারটা ঠেকিয়ে বললেন, “যদি আধ ঘণ্টা আগেই মরতে না চান, তা হলে ভাল ছেলের মতন সিঁড়ি দিয়ে উঠুন।”

চাতাল থেকে বাড়ির একেবারে বাইরে আসতেই একটা ঘোড়ার চিঁহিহি ডাক শোনা গেল। জ্যোৎস্নায় দেখা গেল, খানিকটা দূরে একটা গাছতলায় একটা ঘোড়া লাফালাফি করছে। তার ডাক শুনলে মনে হয়, সে ভয় পেয়েছে কোনও কারণে।

সমর চৌধুরী বললেন, “ঘোড়াটার আবার কী হল ?”

ফাগুলাল বলল, “কাছাকাছি বাঘ-টাঘ এসেছে নাকি ?”

সমর চৌধুরী বললেন, “ঘোড়াটা বাঁধা আছে। বাঘ এলে কি এতক্ষণ আস্ত রাখত ? অন্ধকারে একা থাকতে ওর ভাল লাগছে না। শোন ফাগুলাল, খানিকটা দূরে একটা জিপগাড়ি আছে। এরা এনেছে। এদের সেই জিপে চাপাতে হবে। তুই চালাবি। আমি ঘোড়া নিয়ে পাশে-পাশে যাব। তিনমুণ্ডি পাহাড়ের ওপর থেকে গাড়িসুদ্ধু ওদের ফেলে দিতে হবে। পেট্রোল ট্যাঙ্কে আমি নিজে আগুন জ্বেলে দেব !”

ঘোড়াটা এই সময় দু' পা তুলে দাঁড়িয়ে একটা বীভৎস চিৎকার করল। যেন সে মরতে বসেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা আলো এসে পড়ল সেখানে। টর্চের আলো নয়। অনেক তীব্র। এই আলো আসছে গড়বাজিতপুরের টোবি দত্তের বাড়ির ছাদ থেকে।

সেই আলোয় দেখা গেল ঘোড়াটার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা ধবধবে

সাদা কঙ্কাল। মাঝে-মাঝে সে এক হাত দিয়ে ঘোড়াটার পেটে মারছে।

সমর চৌধুরী বললেন, "ওটা কী ?"

ফাগুলাল কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "ভূ-ভূ-ভূ-ভূত ! সেই ভূতটা আবার এসেছে ! আমাদের তিনজনকে মেরেছে !"

অন্য লোকগুলো ভয়ে চিৎকার করতে-করতে দৌড় লাগাল উলটো দিকে।

সন্তুর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। এবার তো তার চোখের ভুল নয়। সবাই দেখছে।

সমর চৌধুরী ভয় পাননি। ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "ভূত না ছাই ! কেউ একটা সঙ সেজে এসেছে।"

পর-পর দু'বার গুলি চালাল সে। সে-গুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল, কঙ্কালটার কোনও ক্ষতি হল না।

কঙ্কালটা একটা বাচ্চা ছেলের গলায় বলে উঠল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা !"

তারপর দুলে-দুলে এগিয়ে আসতে লাগল এদিকে।

এবার ফাগুলালও 'বাবা রে' বলে দৌড় লাগাল প্রাণপণে।

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, "কী হে কর্নেল চৌধুরী, তুমিও এবার পালাবে না ?"

সমর চৌধুরী মুখ ফিরিয়ে চোটপাট করে বললেন, "এটা কী ? তোমরা এনেছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ ! আমরা কঙ্কাল-টঙ্কালের কারবার করি না।"

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এটা কি সত্যিই একটা কঙ্কাল ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি যা দেখছ, আমিও তাই দেখছি !"

অনির্বাণ বলল, "একটা কঙ্কাল কি সত্যি-সত্যি হাঁটতে পারে ? এ কখনও হয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, কঙ্কাল হাঁটতে পারে না। তা হলে এটা কঙ্কাল নয় !"

সমর চৌধুরী কঙ্কালটার ঠিক মাথা লক্ষ করে আর-একটা গুলি চালালেন। এবারও ছিটকে গেল সেই গুলি। কঙ্কালটার দু' চোখের গর্তে জ্বলে উঠল লাল আলো। হঠাৎ জোরে-জোরে এগিয়ে এসে এক হাতে চেপে ধরল সমর চৌধুরীর ঘাড়। সেই অবস্থায় তাকে শূন্যে তুলে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

সমর চৌধুরীর হাত থেকে খসে পড়ল রিভলভার। তিনি বিকট চিৎকার করতে-করতে বলতে লাগলেন, "রায়চৌধুরী, বাঁচাও বাঁচাও ! তুমি যা চাইবে দেব। সব সোনা দিয়ে দেব। বাঁচাও !"

কাকাবাবু বললেন, "সব ব্যাপারটা কেমন বদলে গেল ? এখন সমর চৌধুরী আমার কাছে সাহায্য চাইছে। কিন্তু কী করে সাহায্য করব ?"

কঙ্কালটা এবার দু' হাত দিয়ে সমর চৌধুরীকে ধরে শূন্যে ঘোরাতে লাগল।

যেন এবার একটা প্রচণ্ড আছাড় মেরে ওর হাড়গোড় ভেঙে দেবে !

এই সময় ঘোড়াটার পেছন দিকের অন্ধকার থেকে কেউ ডেকে উঠল। "রোবিন ! রোবিন !"

কঙ্কালটা সঙ্গে-সঙ্গে থেমে গেল। শূন্যে তুলে রাখল সমর চৌধুরীকে।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল টোবি দত্ত। তার একটা চোখ, অন্য চোখটার জায়গায় অন্ধকার।

সন্তু এখন যদিও জানে যে, টোবি দত্তর একটা চোখ পাথরের, তবু সেটা এখন নেই, চোখের জায়গায় খোঁদলটা দেখে তার বুকটা কেঁপে উঠল।

টোবি দত্ত জাপানি ভাষায় কিছু একটা আদেশ করতেই কঙ্কালটা সমর চৌধুরীকে আছাড় না মেরে আস্তে করে নামিয়ে দিল মাটিতে।

টোবি দত্ত এবার এক হাত বাড়িয়ে অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে বলল, "আই ফর অ্যান আই ! চোখের বদলে চোখ ! রাজু, তুই আমার একটা চোখ নষ্ট করেছিলি, আজ তোর একটা চোখ আমি খুবলে নেব !"

কাকাবাবু অস্ফুট গলায় বললেন, "সমর চৌধুরীই তা হলে রাজু। ওরা দুই পুরনো শত্রু !"

টোবি দত্ত আবার বলল, "আমার পোষা কঙ্কাল তোর হাড় গুঁড়ো করে দিতে পারত। কিন্তু আমি নিজের হাতে তোকে শাস্তি দেব ! হেলিকপটার নিয়ে গিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলি ? তোর ওই হেলিকপটার আমি ইচ্ছে করলেই গুলি করে উড়িয়ে দিতে পারতাম। খালি হাতে লড়ার সাহস আছে ? আয় !"

সমর চৌধুরী অনেকটা সামলে নিয়েছেন। একবার পেছন ফিরে তিনি কঙ্কালটাকে দেখলেন। সমর চৌধুরী শক্তিশালী পুরুষ। খালি হাতে লড়াই করলে তিনিই হয়তো জিতবেন।

কঙ্কালটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কাকাবাবুদের দিকে গ্রাহ্যই করছে না।

কাকাবাবু বললেন, "এবার বুঝতে পারলে, ওটা একটা রোবট। জাপানে রোবট দিয়ে অনেক কলকারখানায় এখন কাজ করানো হয়। টোবি দত্ত সেখান থেকে রোবট বানানো শিখে এসেছে। তারপর কঙ্কালের মতন সাজিয়েছে।"

অনির্বাণ বলল, "ও আমাদের কিছু করবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করা। ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড। টোবি দত্ত হুকুম না দিলে কিছুই করবে না।"

ওদিকে সমর চৌধুরী একটা ঘুসি চালাতে যেতেই টোবি দত্ত ধরে ফেলল তাঁর হাত। এক হ্যাঁচকা টানে তাঁকে ফেলে দিল উলটে। টোবি দত্ত তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সমর চৌধুরী আবার উঠে দাঁড়ালেন। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "ত্যাপা, তোর মতন দু-তিনটেকে আমি ছিঁড়ে ফেলতে পারি।"

তারপর শুরু হয়ে গেল শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই। একবার টোবি সমরকে

মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে, আবার সমর দু'-পায়ের লাথিতে টোবিকে ছিটকে ফেলে দেন। কঙ্কাল-রোবটটা ওঁদের পাশে-পাশে ঘুরছে, যেন সে রেফারি। মারামারিতে বাধা দিচ্ছে না।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, সোনার থলি দুটোর ওপর তুই নজর রাখ। অনির্বাণ, তুমি সমরের রিভলভারটা তুলে নাও। যদি ওর চ্যালারা ফিরে আসে, তখন কাজে লাগবে। তবে মনে হয় ভূতের ভয়ে ওরা আর ফিরবে না। এই রোবটটাও ওদের তিনজনকে মেরেছে।"

অনির্বাণ বলল, "এদের লড়াই কতক্ষণ চলবে ? কে জিতবে বোঝা যাচ্ছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি চাই টোবি জিতুক। সমর চৌধুরী আর্মি অফিসার হয়েও স্মাগলারদের দল চালান। এঁরা দেশের শত্রু। সমাজের ঘৃণ্য জীব। সেই তুলনায় টোবি এমন কিছু অন্যায় করেনি। সে প্রতিশোধ নিতে এসেছে !"

অনির্বাণ বলল, "একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে এরকম খুনোখুনির লড়াই আমার দেখা উচিত নয়। ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে অ্যারেস্ট করা দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "চেষ্টা করে দ্যাখো !"

অনির্বাণ কাছে এগিয়ে যেতেই কঙ্কালটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল। সে অন্য কাউকে কাছে যেতে দেবে না।

হঠাৎ টোবি দত্ত সমর চৌধুরীকে বাগে পেয়ে একটা গাছের সঙ্গে চেপে ধরে দু'বার মাথা ঠুকে দিল খুব জোরে। সমর চৌধুরী আর সহ্য করতে পারলে না। ঢলে পড়ে গেলেন মাটিতে।

টোবি দত্ত জয়ের আনন্দে একটা দৈত্যের মতন হুঙ্কার দিয়ে বলল, "এইবার রাজু, আর কোথায় পালাবি ? চোখের বদলে চোখ। চোখের বদলে চোখ ! আমার চোখ নষ্ট করেছিলি, তোর দুটো চোখই আমি আজ গেলে দেব !"

সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা সরু কাঠি খুঁজতে লাগল।

অনির্বাণ উত্তেজিতভাবে বলল, "ও সমর চৌধুরীর চোখ গেলে দেবে। এই দৃশ্য আমরা দেখব ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আর সন্তু ওকে আটকাও। আমি কঙ্কালটাকে সামলাচ্ছি।"

কাকাবাবু কঙ্কালটার কাছে এগিয়ে যেতেই সে হাত বাড়িয়ে বাধা দিল। কাকাবাবুও খপ করে তার হাতখানা চেপে ধরলেন। তারপর শুরু হল পাঞ্জার লড়াই।

কাকাবাবুর হাতে দারুণ শক্তি, কিন্তু একটা রোবটের সঙ্গে পারবেন কেন ? কঙ্কালের হাতখানা লোহার, তাতে সাদা রং করা। কাকাবাবু প্রাণপণে লড়তে লাগলেন।

টোবি দত্ত অন্য কিছু না পেয়ে একটা গাছের সরু ডাল ভেঙে নিয়ে অজ্ঞান

সমর চৌধুরীর বুকের ওপর চেপে বসল।

কাকাবাবু প্রাণপণে রোবটের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছেন, তাঁর পাশ দিয়ে সন্তু আর অনির্বাণ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টোবি দত্তর ওপর। টোবি দত্ত দু' হাত চালিয়ে ওদের সরিয়ে দিতে চাইল। সন্তু চেপে ধরল তার গলা, অনির্বাণ রিভলভারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারল তার মাথায়। তারই মধ্যে টোবি দত্ত গাছের ডালটা ঢুকিয়ে দিয়েছে সমর চৌধুরীর এক চোখে।

কাকাবাবু বললেন, "আমি আর পারছি না ! সন্তু, তোরা সরে যা শিগ্‌গির !"

কঙ্কালটা তাঁকে ঠেলে ফেলে দিল দূরে। তারপর এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে সন্তু আর অনির্বাণকে দু' হাতে তুলে ছুড়ে দিল। টোবি দত্ত অজ্ঞান হয়ে গেছে। কঙ্কালটা তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তারপর দুলতে-দুলতে হেঁটে-হেঁটে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে।

অনির্বাণ ধুলো ঝেড়ে উঠে বসে বলল, "টোবি দত্তকে নিয়ে চলে গেল ?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই সেরকম প্রোগ্রাম করা ছিল রোবটটাকে। এখন আমরা চেষ্টা করলেও টোবিকে উদ্ধার করতে পারব না। পরে অনেক সময় পাবে। এর পর টোবিকে ধরা কিংবা তাকে শাস্তি দেওয়া পুলিশের কাজ। আমি আর সন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই। সমর চৌধুরীর এক্ষুনি চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে যে তিনি মারা যাবেন ! ওঁকে বাঁচানো দরকার। বাঁচিয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া দরকার।"

সমর চৌধুরীর ঘোড়াটা কোনওক্রমে বাঁধন খুলে পালিয়ে গেছে এর মধ্যে। সমর চৌধুরীকে নিয়ে যেতে হবে খানিকটা দূরে জিপে। তাঁর এখনও পুরো জ্ঞান ফেরেনি। চোখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে আর গলা দিয়ে বেরোচ্ছে একটা গোঙানির শব্দ।

সন্তু আর অনির্বাণ সমর চৌধুরীকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল। কাকাবাবুকে নিতে হল সোনার থলি দুটো। ফাগুলালের দলবল কঙ্কালের ভয়ে একেবারেই পালিয়েছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে কাকাবাবু ওপরের দিকে তাকালেন। আকাশে আজ ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। দমকা হাওয়া উঠছে মাঝে-মাঝে। তাতে জঙ্গলের নানারকম গাছে নানারকম পাতায় শব্দ হচ্ছে বিভিন্ন রকম।

কাকাবাবু মনে-মনে বললেন, "কী সুন্দর আজকের রাতটা ! এর মধ্যেও মানুষ মারামারি, খুনোখুনি করে ? ছিঃ ! এর চেয়ে নদীর ধারে বসে গান গাইলে কত ভাল লাগত !

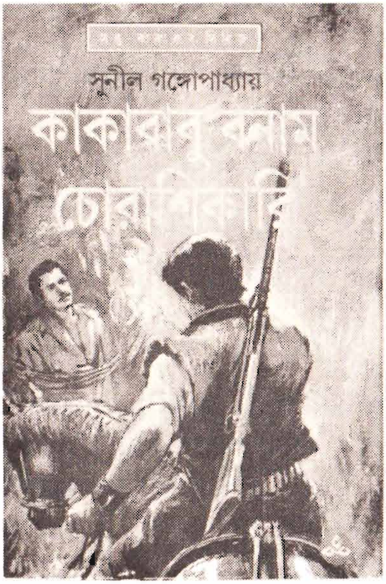

কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি

এমন ঝিঁঝির ডাক যে, কানে যেন তালা লেগে যায়। রাত্তিরবেলার জঙ্গল খুব নিস্তব্ধ হয় বলেই তো সবাই জানে। কিন্তু রাত্তিরেও যে জঙ্গলের কোথাও-কোথাও এত ঝিঁঝি ডাকে, তা সন্তুর জানা ছিল না।

জঙ্গল একেবারে মিশমিশে অন্ধকারও নয়। আকাশে একটু-একটু জ্যোৎস্না আছে। মাঝে-মাঝে পাতলা সাদা মেঘ ঢেকে দিচ্ছে চাঁদ, আবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কাছে-দূরে ঝিকমিক করে জ্বলছে অজস্র জোনাকি। ঝিঁঝিগুলো অবিরাম শব্দ করে যায়, অথচ তাদের দেখা যায় না। আর জোনাকিগুলো আলো দেখায় কিন্তু কোনও শব্দ করে না।

একটা জিপ গাড়ির সামনের দিকে বসে আছেন কাকাবাবু আর রাজ সিং, পেছন দিকে জোজো আর সন্তু। কেউ নড়াচড়া করছে না একটুও। এইভাবে কেটে গেছে দেড় ঘণ্টা। শীতের রাত, মাঝে-মাঝে শিরশিরে হাওয়া দিলে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

একসময় রাজ সিং কোটের পকেট থেকে একটা চুরুট বের করলেন। তারপর ফস করে একটা দেশলাই জ্বেলে ধরালেন সেটা।

কাকাবাবু পাশ ফিরে তীব্র চাপা গলায় বললেন, "চুরুট ধরিয়েছেন ? ছিঃ, আপনার লজ্জা করে না ? ফেলে দিন এক্ষুনি !"

রাজ সিং চুরুটে দুটো টানও দিতে পারেননি, কাকাবাবুর ধমক খেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেটা জুতোর তলায় পিষে নিভিয়ে দিয়ে, ফেলে দিলেন বাইরে।

কাকাবাবু বললেন, "দেখুন, সামনে এক জায়গায় পাশাপাশি দুটো আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। ও দুটোও জোনাকি, না কোনও জানোয়ারের চোখ ?"

রাজ সিং বললেন, "জোনাকি নয়, পিট-পিট করছে না, স্থির হয়ে আছে। তবে, বেশ নীচের দিকে। ছোট জানোয়ার। মনে হয়, খরগোশ !"

কাকাবাবু বললেন, "পেছন দিকে আরও দুটো চোখ। একজোড়া খরগোশ। ওই যে লাফাচ্ছে !"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই চোখ দুটোও মিলিয়ে গেল। আবার অন্ধকার।

কাকাবাবু হঠাৎ রাজ সিংয়ের কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজ সিং অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী ? কেন ?"

কাকাবাবু অনুতপ্ত গলায় বললেন, "আপনি চুরুট ধরিয়েছিলেন বলে আমি ধমকালাম। সেটা আমার উচিত হয়নি। আমি তো আপনার বস নই। আপনি আমার অধীনে চাকরি করেন না। আমি একজন সাধারণ মানুষ!"

রাজ সিং বললেন, "তাতে কী হয়েছে, আমি কিছু মনে করিনি। আপনি আমার চেয়ে বয়েসে বড়।"

কাকাবাবু বললেন, "ব্যাপারটা কী জানেন ? একসময় আমার নিজেরই খুব চুরুটের নেশা ছিল। হাতে সবসময় জ্বলন্ত চুরুট থাকত। এখন ধূমপান একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। গন্ধও সহ্য করতে পারি না। এখন কাছাকাছি কেউ সিগারেট বা চুরুট ধরালে আমার রাগ হয়ে যায়।"

রাজ সিং বললেন, "আমিও চুরুট টানা ছেড়ে দেব ভাবছি। বড় বাজে নেশা।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, চেষ্টা করুন ছেড়ে দিতে!"

পেছন থেকে জোজো বলল, "কাকাবাবু, আমি একটা কথা বলব ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কী বলবে, বলো!"

জোজো বলল, "কী বলব, মানে, যে-কোনও একটা কথা। অনেকক্ষণ কথা না বললে আমার পেটের মধ্যে সুড়সুড়ি লাগে।"

সন্তু বলল, "এতেই তো তোর দুটো সেনটেন্স বলা হয়ে গেল, জোজো!"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "চুপ!"

জঙ্গলের মধ্যে এবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে আসছে কেউ। যেন মানুষেরই মতন কেউ। খোঁড়া মানুষেরা যেমন পা টেনে-টেনে হাঁটে, শব্দটা অনেকটা সেরকম।

কাকাবাবু পাশ থেকে রাইফেলটা তুলে নিলেন হাতে। রাজ সিংয়ের কাছে একটা চার ব্যাটারির মস্ত বড় টর্চ। তা ছাড়া জিপের ওপরেও একটা সার্চলাইট লাগানো আছে।

এই জায়গাটায় জঙ্গল খুব ঘন। কোনও রকম পথের চিহ্ন নেই। এত ঝোপঝাড় যে, এর মধ্যে গাড়ি চালানোও প্রায় অসম্ভব! তবু জিপ গাড়িটা কী করে এলো, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার! কাকাবাবুই জোর করে রাজ সিংকে নিয়ে এসেছেন। আসবার সময় ধারালো টাঙ্গি দিয়ে মাঝে-মাঝে দু-একটা গাছ কেটে ফেলতে হয়েছে।

কাছেই একটা জলাশয়। ইচ্ছে করেই জিপটাকে জলাশয়ের একেবারে ধারে নিয়ে যাওয়া হয়নি। একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালপালার আড়ালে জিপটা লুকিয়ে

রয়েছে।

আওয়াজটা খানিক দূর দিয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল এক সময়। রাজ সিং কান খাড়া করে শুনে ফিসফিসিয়ে বললেন, "মানুষ নয়, মনে হচ্ছে ভালুক। ভালুকরা শুকনো পাতা ঠেলতে-ঠেলতে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "হরিণ দেখা যাচ্ছে না কেন ? জলের কাছে হরিণ তো খুব আসে দল বেঁধে !"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "কাছাকাছি বাঘ আছে। আমি গন্ধ পাচ্ছি।"

কাকাবাবু দু-তিন বার জোরে-জোরে শ্বাস টেনে বললেন, "কই, আমি তো কোনও গন্ধ পাচ্ছি না !"

জোজো বলল, "বাঘ থাকলে হরিণ আসে না।"

রাজ সিং বললেন, "হরিণরা সাধারণত আসে সন্ধের একটু আগে কিংবা ভোরের দিকে। মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি কি এখানে সারারাত থাকার প্ল্যান করছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, আপনার ঘুম পাচ্ছে নাকি ? এখন মোটে সাড়ে বারোটা।"

রাজ সিং বললেন, "এটা জঙ্গলের 'কোর এরিয়া'। এখানে অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার আসে। হঠাৎ হাতির পাল এসে গেলে খুব বিপদ হতে পারে।"

জোজো বলল, "বাঘ এলে বুঝি বিপদ হবে না ?"

রাজ সিং বললেন, "আমরা জিপগাড়িতে বসে আছি, বাঘ আমাদের দেখতে পেলেও হঠাৎ আক্রমণ করবে না। অসমের বাঘ তো মানুষখেকো নয়, নিজে থেকে প্রথমেই মানুষকে আক্রমণ করতে আসে না। গণ্ডার এলেও বিপদ নেই। গণ্ডার কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপ করে না। ভালুকও কাছ ঘেঁষবে না। কিন্তু হাতিকে বিশ্বাস নেই। জিপটা দেখে হাতির হয়তো লোফালুফি খেলার ইচ্ছে হতে পারে। গত বছরে একজন ফরেস্ট রেঞ্জারের জিপ গাড়ি উলটে দিয়ে একপাল হাতি তাঁকে পা দিয়ে পিষে মেরেছিল !"

কাকাবাবু বললেন, "কেন যেন হাতি সম্পর্কে আমার কোনও ভয় হয় না। হাতি দেখলেই মনে হয়, কেমন যেন আপনভোলা ভালমানুষ গোছের প্রাণী।"

রাজ সিং বললেন, "দেখলে ওরকম মনে হয় বটে, কিন্তু এক-এক সময় হাতি খুব হিংস্র হতে পারে। বিশেষত কোনও দলছাড়া একলা হাতি সবসময় রেগে থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "হাতি অত বড় প্রাণী, চুপিচুপি তো আসতে পারবে না। আমরা যদি জেগে থাকি, ডালপালা ভাঙার মড়মড় শব্দ শুনতে পাব, তখন সবাই মিলে চ্যাঁচামেচি শুরু করব। মানুষের চিৎকার শুনলে হাতি কাছে আসে না। আর জোজো যদি বেসুরো গলায় একটা গান ধরে, হাতিরা সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে

পালাবে।”

জোজো বলল, “কাকাবাবু, আমি একবার অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশানে ফার্স্ট হয়েছিলাম।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “টপ্পা, না ঠুংরি ?”

জোজো সগর্বে বলল, “খেয়াল ! দরবারি কানাড়া গেয়েছিলাম, বুঝলি ! জাজ ছিলেন ওস্তাদ বন্দে আলি মিঞা !”

কাকাবাবু বললেন, “তিনি খুব বিখ্যাত ওস্তাদ বুঝি ? নাম শুনিনি। সে যাই হোক, হাতিরা খেয়াল শুনতে ভালবাসে, না ভয় পায়, তা নিয়ে গবেষণা করা দরকার।”

রাজ সিংয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, “আপনারা গাড়িতে বসুন, আমি একটু ঘুরে আসি।”

রাজ সিং আঁতকে উঠে বললেন, “সে কী ! আপনি একলা-একলা কোথায় যাবেন ? না, না, এই জঙ্গলে পায়ে হেঁটে ঘোরা একেবারে নিরাপদ নয়।”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমার যখন অল্প বয়েস ছিল, তখন অনেকবার শিকার করতে গেছি। ওড়িশার জঙ্গলে বাঘও মেরেছি। এখন তো শিকার করা নিষেধ। বাঘ, গণ্ডার এত কমে আসছে, এদের বাঁচিয়ে রাখাই উচিত। নেহাত আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হলে কোনও প্রাণীকেই আমি মারতে চাই না। কিন্তু রাত্তিরবেলা জঙ্গলে আসতে খুব ভাল লাগে। কোনও জন্তু-জানোয়ারের দেখা পেলে রোমাঞ্চ হয়। সেইজন্যই তো এসেছি এখানে।”

রাজ সিং বললেন, “গাড়িতে বসেই দেখুন, নামবার দরকার কী ? কোনও-না-কোনও জন্তুর দেখা পাওয়া যাবেই।”

কাকাবাবু বললেন, “গাড়িতে আমরা বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারব না। মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে আসবেই। কথা শুনতে পেলে কোনও জন্তু কাছে আসবে না। আমি জলাটার ধার থেকে একটু ঘুরে আসি। ভয় নেই, আমি সাবধানে থাকব, কোনও জানোয়ারের মুখে প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও নেই !”

সন্তু বলল, “আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি !”

কাকাবাবু হুকুমের সুরে বললেন, “না, আমি একলা যাব। তোমরা কেউ গাড়ি থেকে নামবে না।”

কাকাবাবু রাইফেলটা নামিয়ে রেখে, ক্রাচদুটি তুলে নিয়ে পা দিলেন মাটিতে।

রাজ সিং ঝুঁকে পড়ে মিনতি করে বললেন, “সার, আমি অনুরোধ করছি, আপনি এভাবে যাবেন না। একটা অঘটন ঘটে গেলে আমি বড়সাহেবের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।”

কাকাবাবু বললেন, “মিস্টার সিং, আপনি আগে কোনও দিন এই জায়গাটায়

এসে রাত কাটিয়েছেন ?”

রাজ সিং একটু থতমত খেয়ে বললেন, “না, মানে, দিনের বেলা ঘুরে গেছি, রাত্তিরে কখনও থাকিনি।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি যতদূর জানি, আপনার মতন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনও অফিসারই এত দূরে এসে রাত্তিরে থাকেননি।”

তারপর কাকাবাবু আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

সন্তু আর জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোরা জোরে কথা বলিস না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসব। ঝিলের ধারটা দেখে আসব শুধু।”

সন্তু জানে, কাকাবাবু একবার জেদ ধরলে তাঁকে কিছুতেই ফেরানো যাবে না।

ক্রাচে ভর দিয়ে কাকাবাবু এগোতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। একটুক্ষণ তাঁকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, তারপর মিলিয়ে গেলেন গাছপালার আড়ালে।

জোজো বলল, “কাকাবাবু রাইফেলটাও নিলেন না ?”

সন্তু বলল, “দু' হাতে ক্রাচ থাকলে রাইফেল নেবেন কী করে ? তবে ওঁর কোটের পকেটে রিভলভার আছে নিশ্চয়ই।”

জোজো বলল, “রিভলভার দিয়ে কি বাঘ মারা যায় ?”

সন্তু বলল, “বাঘ মারা নিষেধ, তা জানিস না ? হ্যাঁ রে, তুই কি এখনও বাঘের গন্ধ পাচ্ছিস ?”

জোজো বলল, “একটু আগে পাচ্ছিলাম। এখন আর একটা বোঁটকা গন্ধ...নিশ্চয়ই বুনো শুয়োরের। জানিস, একবার মধ্যপ্রদেশে বাবার সঙ্গে গেছি, সন্ধেবেলা এরকম একটা জিপে করে যেতে-যেতে বাবা হঠাৎ বললেন, কাছাকাছি নেকড়ে বাঘ আছে। ঠিক তাই। জিপটা আরও দু' মাইল এগোবার পর দেখা গেল, রাস্তার ওপরেই সার বেঁধে বসে আছে তিনটে নেকড়ে।”

সন্তু বলল, “তোর বাবা দু' মাইল দূর থেকে গন্ধ পেয়েছিলেন ?”

জোজো বলল, “দু' মাইল আর এমন কী ! একবার আমেরিকা থেকে আমাদের রাষ্ট্রদূত বাবাকে ফোন করেছিলেন। বাবা কথায়-কথায় বললেন, তোমার বাড়িতে আজ বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে, তাই না ? আমি টেলিফোনেই গন্ধ পেয়ে গেছি। নুন একটু কম হয়েছে, যে রান্না করছে তাকে আরও দু' চামচ নুন মিশিয়ে দিতে বলো।”

সন্তু বাঁ হাতে মুখ চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

রাজ সিং খুবই উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। তিনিও জোজোর কথা শুনে না হেসে পারলেন না। তারপরই গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, “তোমাদের আংকল গেলেন কোথায় ? এইভাবে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার কোনও মানে হয় ?”

জোজো বলল, “জানেন সিং সাহেব, আমার বাবা খুব বড় জ্যোতিষী !

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ইংল্যান্ডের রানি, গারফিল্ড সোবার্স, পেলে, কপিলদেব, অমিতাভ বচ্চন, এঁরা সবাই আমার বাবার কাছে ভবিষ্যৎ জানতে চান।”

হঠাৎ এ-কথার কী মানে হয় তা বুঝতে না পেরে রাজ সিং শুকনো ভদ্রতা করে বললেন, “ও, তাই নাকি?”

জোজো আবার বলল, “আমার বাবার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, কাকাবাবুর ভবিষ্যৎ, মানে উনি কতদিন বাঁচবেন?”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কাকাবাবুর ঠিকুজি-কুষ্টি তুই কোথায় পেলি? কাকাবাবুর তো ওসব কিচ্ছু নেই-ই।”

জোজো বলল, “আমার বাবার কাছে ওসব দরকার হয় না। ছবি দেখলেই উনি বলে দিতে পারেন। কাকাবাবুর ছবি আমার কাছে নেই? বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাকাবাবুর ওপর অনেকের রাগ আছে, অনেক ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল কাকাবাবুকে খুন করতে চায়, কাকাবাবুর কি হঠাৎ কোনও বিপদ হতে পারে? বাবা অনেকক্ষণ দেখে-টেখে বললেন, নাঃ, একে হঠাৎ কেউ মেরে ফেলতে পারবে না। এর ইচ্ছামৃত্যু। নিজে ইচ্ছে না করলে এর মরণ হবে না। মহাভারতের ভীষ্ম যেমন, কাকাবাবু সেই টাইপের মানুষ!”

রাজ সিং বললেন, “কোনও লোক হয়তো মেরে ফেলতে পারবে না, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার? তারাও কি জ্যোতিষীর গণনার মধ্যে পড়ে? এই জঙ্গলে অনেক বিষাক্ত সাপ আছে।”

জোজো বলল, “উঁহুঃ! সাপে কামড়ালেও উনি মরবেন না। ওই যে বললাম, ইচ্ছামৃত্যু!”

সন্তু বলল, “এত শীত, সাপের ভয়টা অন্তত এখন নেই। কাকাবাবু বলেছেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন, আর কত বাকি?”

রাজ সিং টর্চটা নীচের দিকে জ্বেলে, ঘড়ি দেখে বললেন, “মাত্র এগারো মিনিট হয়েছে, তাতেই যেন মনে হচ্ছে কতক্ষণ কেটে গেল! কোনও জন্তুও দেখা যাচ্ছে না, এই জিপটার কথা সবাই টের পেয়ে গেছে!”

এর পর একটুক্ষণ কথা না বলে সবাই চেয়ে রইল সামনের দিকে। কাকাবাবুর কোনও পাত্তাই নেই। অরণ্য একেবারে সুনসান। রাত্তিরবেলা সব জঙ্গলই খুব রহস্যময় হয়ে ওঠে। মনে হয়, অন্ধকারে কারা যেন লুকিয়ে আছে, তারা দেখছে, কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না।

এক-এক সময় শুকনো পাতায় খসখস শব্দ হচ্ছে। সে আওয়াজ এমন মৃদু যে, খরগোশের মতন ছোট প্রাণী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ঝিলের জলে একবার একটু জোরে শব্দ হল, তাও অনেক দূরে।

আবার একটুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা খানখান করে পর-পর দু'বার রাইফেলের গুলির শব্দ হল। এত জোর সেই শব্দ, যেন পিলে চমকে গেল ওদের তিনজনের।

রাজ সিং সঙ্গে-সঙ্গে জিপের ওপরের সার্চলাইট জ্বেলে দিলেন। টর্চের আলোও ফেললেন সেই শব্দের দিক লক্ষ্য করে। সেই আলোর রেখা অনেক দূর পৌঁছলেও দেখা গেল না কিছুই। রাজ সিং টর্চটা ঘোরাতে লাগলেন, একজায়গায় দেখতে পেলেন, ঝোপঝাড় ঠেলে বেশ বড়সড় কোনও একটা প্রাণী দৌড়ে যাচ্ছে।

আরও দু' বার গুলির শব্দ শোনা গেল, আওয়াজ যেন দু' রকম।

সন্তু বলল, "কাকাবাবুর কাছে রাইফেল নেই, অন্য কেউ..."

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু লাফিয়ে জিপ থেকে নেমে ছুটতে শুরু করল। রাজ সিংও এক হাতে রাইফেল আর অন্য হাতে টর্চ নিয়ে দৌড়তে লাগলেন ঝিলের দিকে, জোজো প্রায় তাঁর পিঠ ছুঁয়ে রইল।

সন্তুই প্রথমে দেখতে পেল কাকাবাবুর একটা ক্রাচ। সেটা তুলে নিয়ে সে ব্যাকুলভাবে তাকাল এদিক-ওদিক।

রাজ সিং বললেন, "ওই যে..."

ঝিলের একেবারে ধার ঘেঁষে একপাশ ফিরে পড়ে আছেন কাকাবাবু। কপালে আর গালে রক্তের রেখা। সন্তুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হতে লাগল। এরকমভাবে শুয়ে আছেন কেন কাকাবাবু ? বেঁচে নেই ? জোজোর বাবা বলেছিলেন, ইচ্ছামৃত্যু...

সন্তু বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

ঠিক যেন একজন মৃত লোক বেঁচে ওঠার মতন কাকাবাবু অন্য পাশ ফিরে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, "তোরা আবার জিপ থেকে নামতে গেলি কেন ? গোলাগুলি চলছিল, তোদের বিপদ হতে পারত !"

॥ ২ ॥

তেজপুর শহরের একটু বাইরে, ছোট্ট একটা টিলার ওপর সুন্দর সাদা রঙের একটি দোতলা বাড়ি। সামনে গোলাপ ফুলের বাগান, কিন্তু পাঁচিল-টাচিল নেই। বারান্দায় বসলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

বাগানেই বেতের টেবিল ও কয়েকখানা চেয়ার পেতে চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। সকালবেলায় রোদ্দুর মিঠে লাগছে খুব। টেবিলের ওপর অনেক রকমের খাবার, মাশরুম দিয়ে ওমলেট, ফুলকপির শিঙাড়া, মাছের ডিমের চপ, কাজুবাদাম, কেক-পেস্ট্রি। চায়ের পেয়ালাগুলো ভারি সুন্দর।

এ-বাড়ির মালিকের নাম দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর। চমৎকার চেহারা, ফরসা, লম্বা, টানা-টানা চোখ, ধারালো নাক, মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ইনি অসমের বন বিভাগের সবচেয়ে বড় কর্তা, যাকে বলে চিফ কনজারভেটার অব ফরেস্ট। চাকরির জন্য ওঁকে থাকতে হয়

গুয়াহাটি শহরে, তেজপুরে তাঁর নিজের বাড়ি।

দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর সন্তু আর জোজোকে বারবার বলতে লাগলেন, "কই, তোমরা খাও, আরও নাও, লজ্জা পাচ্ছো নাকি?"

জোজোর অবশ্য লজ্জা-টজ্জা নেই। সে সবগুলো পদই দুটো-একটা করে চেয়ে নিয়েছে, আবার নিল। সন্তু বেশি খেতে পারছে না।

কাকাবাবু চা ছাড়া কিচ্ছু খাননি। তাঁর সারা মুখে ব্যথা। মুখের চেহারাটাও বিচ্ছিরি হয়ে গেছে। মুখের বাঁ পাশটাতে কাটাকুটি দাগ, তার ওপর আবার মারকিউরিওক্রোম ওষুধ লাগানো। রাজ সিং বসে আছেন একধারে চুপ করে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এইবার বলুন, মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনার হঠাৎ অসমের এই অঞ্চলটায় আসবার উদ্দেশ্য কী?"

কাকাবাবু মুখে হাসি মাখিয়ে বললেন, "সেরকম উদ্দেশ্য তো বিশেষ কিছু নেই। এমনই বেড়াতে এসেছি, জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরব!"

দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহুঃ! আপনি এ-কথা বললেও তো বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি কত রকম সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছেন, তা কি আমরা জানি না? আপনাদের বাংলায় একটা কথা আছে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে?"

কাকাবাবু বললেন, "আজকাল ও-কথার কেউ মানেই বোঝে না।"

তিনি সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, সন্তু, তুই ঢেঁকি কাকে বলে জানিস?"

সন্তু বলল, "ছবি দেখেছি। একটা মস্ত বড় কাঠের জিনিস। গ্রামের মেয়েরা সেই ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান থেকে চাল বানাত।"

বড়ঠাকুর বললেন, "তা ঠিক, এখন আর ঢেঁকি দেখাই যায় না। মেশিনে সব হয়। আমাদের এখানে গ্রামের দিকে কিছু-কিছু ঢেঁকি এখনও আছে। ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাতের অন্যরকম স্বাদ।"

কাকাবাবু বললেন, "ছবি দেখে ঢেঁকি চিনতে হয়। এর পর ছেলেমেয়েরা বাঘ-ভালুক-গণ্ডার এসবও ছবি দেখেই চিনবে। সব তো মেরে-মেরে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।"

বড়ঠাকুর আগের কথায় ফিরে গিয়ে কাকাবাবুকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তেজপুরে কি কোনও উল্কা পড়েছে? কিংবা জঙ্গলের মধ্যে অন্য গ্রহের প্রাণী নেমেছে? নইলে আপনি হঠাৎ এদিকে এসেছেন, নিশ্চয়ই কোনও রহস্যের সন্ধানে!"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আমি জঙ্গল ভালবাসি, জঙ্গল দেখতে এসেছি। অসমের জঙ্গল অতি অপূর্ব।"

বড়ঠাকুর বললেন, "জঙ্গল দেখতে চান, সব ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।

কাজিরাঙা, মানস ফরেস্ট, ওরাং, এ ছাড়া আরও কত জঙ্গল ছড়িয়ে আছে। কিন্তু রায়চৌধুরী সাহেব, আপনি কাল একটা অন্যায় করেছেন !"

"কী অন্যায় করেছি ?"

"এইসব সংরক্ষিত অরণ্যে আমরা রাত্তিরে কাউকে যেতে দিই না। জঙ্গল দেখতে হয় খুব ভোরবেলা। হাতির পিঠে চেপে ঘুরবেন, খুব ভাল দেখা যাবে। কিন্তু আপনি রাত্তিরবেলা গিয়েছিলেন, তারপর জিপ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন, এটা অন্যায়, খুব অন্যায়। সেজন্য আমি আমার ডি এফ ও রাজ সিংকে বকুনি দিয়েছি। যদি কোনও জন্তু-জানোয়ার হঠাৎ আপনাকে আক্রমণ করত, তা হলে বদনামের ভাগি হতে হত আমাদের। আপনি বিখ্যাত লোক—"

"বড়ঠাকুরমশাই, আমায় তো কোনও জানোয়ার আক্রমণ করেনি। আমায় যারা মারতে গিয়েছিল, তারা মানুষ। তাদের হাতে বন্দুক আছে।"

"মানুষ ?"

"মানুষ ছাড়া কে আর বন্দুকের গুলি চালাবে ?"

"ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল, আর-এক বার খুলে বলুন তো !"

"আমরা কাল মিহিমুখ থেকে জিপ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। হারমোতিতে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার, সেখানে তো অনেক লোকই যায়। আমরা আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। সোহোলা ছাড়িয়ে তিন-চার কিলোমিটার দূরে একটা ঝিল, সেখানে নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ কাটাতে চেয়েছিলাম।"

"বেশ তো, কিন্তু আপনি জিপ থেকে নামতে গেলেন কেন ?"

"বন্যপ্রাণীরা যখন জলপান করতে আসে, সেই দৃশ্যটা ভারী সুন্দর। দল বেঁধে গেলে সেটা দেখা যায় না। তাই আমি একলা চুপিচুপি গিয়ে জলের ধারে বসে ছিলাম। হঠাৎ কে যেন আমার দিকে গুলি চালিয়ে দিল। টিপ ভাল নয়, আমার গায়ে লাগাতে পারেনি। শব্দ শুনেই আমি ঝপ করে শুয়ে পড়েছিলাম মাটিতে, গোলাগুলি চললে সেটাই নিয়ম। কিন্তু মুশকিল হল কী, যেখানে আমি পড়লাম, সেখানে ছিল কাঁটাগাছের ঝোপ, তাও কাঁটাগুলো আবার বিষাক্ত। আমার গালফাল তো কেটে গেলই, জ্বালাও করতে লাগল দারুণ। সামলে নিতে আমার কিছুটা সময় লাগল, তাই পালটা গুলি যখন ছুঁড়তে গেলাম, তখন আততায়ী অনেকটা দূরে পালিয়ে গেছে।"

"হঠাৎ কে আপনাকে মারবার চেষ্টা করবে ?"

"সেটাই তো বড় প্রশ্ন। আপনারা রাত্তিরবেলা ভ্রমণকারীদের জঙ্গলে যেতে দেন না। নিজেরাও যান না। সেই সুযোগে চোর ডাকাত চোরাচালানদার পোচাররা যা খুশি করে বেড়ায় !"

"মিঃ রায়চৌধুরী, আমরা যথাসাধ্য জঙ্গল পাহারা দিই, তা সত্ত্বেও কিছু দুষ্ট লোক, কিছু গাছ-চোর, কিছু পোচার ঢুকে পড়ে ঠিকই, সব আটকানো যায় না

স্বীকার করছি। আচ্ছা 'পোচার' কথাটাকে আপনাদের বাংলায় কী বলে ?"

কাকাবাবু একটু চিন্তা করে কিছু খুঁজে পেলেন না। সন্তু আর জোজোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, পোচারের বাংলা কী হবে ?"

জোজো বলল, "যারা লুকিয়ে-লুকিয়ে বেআইনি ভাবে জন্তু-জানোয়ার শিকার করে, বাইরে বিক্রি করে।"

কাকাবাবু বললেন, "এককথায় বলতে হবে।"

জোজো বলল, "বেআইনি পশু-হত্যাকারী।"

সন্তু বলল, "চোরাশিকারি হতে পারে না ?"

বড়ঠাকুর বললেন, "চোরাশিকারি, হ্যাঁ, এটাই শুনতে ভাল, চোরাশিকারি ! হ্যাঁ। মিস্টার রায়চৌধুরী, যা বলছিলাম ! এই গাছ-চোর কিংবা চোরাশিকারি তো কখনও মানুষ মারে না ! সেরকম কোনও দৃষ্টান্ত নেই। কখনও ফরেস্ট গার্ডদের সামনাসামনি পড়ে গেলেও এরা পালাবার চেষ্টা করে। আপনাকে দেখামাত্র এরা গুলি চালাবে কেন ? অন্ধকারে লুকিয়ে পড়তে পারত !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কোনও পুরনো শত্রু ঠিক সেই সময় জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল, এ-কথা তো বিশ্বাস করা যায় না ! একজন কেউ গুলি করে আমাকে মারতে চেয়েছিল ঠিকই।"

বড়ঠাকুর বললেন, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। বেশ রহস্যজনক লাগছে।"

রাজ সিং এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন, "আচ্ছা রায়চৌধুরীবাবু, সোহোলার ওদিকটায় যে একটা ঝিল আছে, সেটার কথা কি আপনি আগে থেকেই জানতেন ? প্রথম থেকেই জিপটা ওদিকে নিয়ে যেতে বললেন, এই জঙ্গলে আগে খুব ঘুরেছেন বুঝি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, এখানে আগে আসিনি। কিন্তু কোনও নতুন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আগে আমি সেই জায়গাটা সম্পর্কে পড়াশোনা করি, খোঁজখবর নিই। আমার কাছে খুব বড় একটা ম্যাপের বই আছে, তাতে এ-দেশের সব জঙ্গলের ম্যাপ আছে, কোথায় কোন ভাঙা দুর্গ বা ক'টা জলাশয়, সেসব দেখানো রয়েছে।"

বড়ঠাকুর বললেন, "'ফরেস্ট অ্যাটলাস অব ইন্ডিয়া' বইটা তো ? খুবই মূল্যবান বই। যাই হোক, আপনার গায়ে যে গুলি লাগেনি, এটাই খুব ভাগ্যের কথা। আপনি আমাদের রাজ্যে অতিথি। আপনার জন্য গাড়ি থাকবে, সব জঙ্গলের বাংলোর ঘর বুক করা থাকবে। আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু আমাকে ফিরতে হবে গুয়াহাটি। রাজ সিং তো রইলেনই, এ ছাড়া শচীন সইকিয়া আর তপন রায় বর্মণ নামে দু'জন অফিসারের ওপর ভার দিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের যখন যা লাগবে, ওঁরা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়াতেই বড়ঠাকুর করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন তাঁর

দিকে। কাকাবাবু তাঁর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন, "সিনাকি হৈ ভাল্ লাগিল্।"

বড়ঠাকুর অবাক হয়ে বললেন, "আপনি অসমিয়া ভাষা জানেন নাকি ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "একটু-একটু জানি। কতবার আপনাদের এখানে এসেছি !"

বড়ঠাকুর সবাইকে বাগানের গেটের দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "আমার অনুরোধ, আপনারা ভোরের দিকেই জঙ্গল দেখতে যাবেন। তখন কত ফুল, কত পাখি দেখা যায়। রাত্তিরেরও একটা আলাদা রূপ আছে, তা মানি। রাত্তিরে যদি যেতেই চান, তা হলে সঙ্গে অন্তত চারজন আর্মড গার্ড থাকবে। তারা আপনাদের পাহারা দেবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আর্মড গার্ড আমি নিতে চাই না। 'সর্ষের মধ্যে ভূত', এই কথাটা আপনি জানেন ?"

বড়ঠাকুর বললেন, "ভূত ? না, জানি না তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশ কিংবা আর্মড গার্ডদের মধ্যে দু-একজন হচ্ছে সেই ভূত। এদের সঙ্গে গাছ-চোর কিংবা চোরাশিকারিদের গোপন যোগাযোগ থাকে। এরা আগে থেকে সব খবর দিয়ে দেয়। সেইজন্যই আমি কাল রাতে সঙ্গে কোনও পাহারাদার নিইনি, এমনকী জিপের ড্রাইভারও ছিল না।"

বড়ঠাকুর বললেন, "ও, এই ভূত ? তা আপনার কথাটা একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। বিশ্বাসঘাতকরা কোথায় নেই বলুন ? যাই হোক, সাবধানে থাকবেন !"

আজ ওদের জন্য একটি স্টেশন ওয়াগন মজুত রয়েছে। সারাদিন ইচ্ছেমতন ঘোরা যাবে। রাজ সিং সঙ্গে আসতে পারবেন না, তাঁর অফিসের কাজ আছে। তখনই ডাকবাংলোয় ফিরতে না চেয়ে কাকাবাবু বললেন, "চল, দু-একটা পুরনো জায়গা দেখে আসি।"

গাড়ির ড্রাইভারকে তিনি বললেন, "ময় বামুনি পাহাড় লৈ যাব বিসারু।"

গাড়ি চলতে শুরু করলে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তুমি বড়ঠাকুরকে অসমিয়া ভাষায় যে-কথাটা বললে, তার মানে কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝলি না ? সিনাকি হৈ ভাল্ লাগিল্ ! সিনাকি মানে চেনা। পরিচিত হওয়া। আপনার সঙ্গে চেনা হয়ে ভাল লাগল ! একটু-আধটু উচ্চারণের তফাত, নইলে অসমিয়া ভাষা আমাদের পক্ষে বেশ সোজা। মনে রাখবি। এখানে 'ময়' মানে আমি। যেমন হিন্দিতে বলে 'ম্যায়' !"

জোজো বলল, "বাংলাতেও অনেক গ্রামের লোক বলে 'মুই'।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক। আর 'আমি' মানে অসমিয়াতে 'আমরা'।"

সন্তু বলল, "তেজপুর নামটা বেশ ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "শহরটাও সুন্দর। পরিষ্কার, ছিমছাম। জানিস, এই

তেজপুরের আগে অনেক নাম ছিল। দেবীকূট, ঊষাবন, কোটিবর্ষা, বনপুর, শোণিতপুর।"

জোজো বলল, "এর মধ্যে ঊষাবন নামটাই আমার বেশি ভাল লাগছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এককালে ঊষা নামে এখানে এক রাজকন্যা ছিল। অপরূপ সুন্দরী। অনিরুদ্ধ এসে তাকে এখান থেকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে।"

সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "অনিরুদ্ধ কে বল তো ?"

জোজোর চেয়ে সন্তু রামায়ণ-মহাভারত অনেক ভাল করে পড়েছে। জোজো কিছু না জানলেও হার স্বীকার করে না। সে বলল, "আর-একটা কোনও রাজাটাজা হবে। দ্বারভাঙ্গার রাজা।"

সন্তু বলল, "মোটেই না। অনিরুদ্ধ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের এক ছেলে। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল দ্বারকায়। সেই গুজরাতে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "জোজো, তুমি হঠাৎ অনিরুদ্ধকে দ্বারভাঙ্গার রাজা বললে কেন ?"

জোজো বলল, "অনিরুদ্ধ মানে যাকে রুদ্ধ করে রাখা যায় না। আর দ্বারভাঙ্গা মানে যেখানে দরজা ভেঙে গেছে। দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল অনিরুদ্ধ।"

কাকাবাবু বললেন, "একেই বলে উপস্থিত বুদ্ধি। এই অনিরুদ্ধ অত দূরের দ্বারকা থেকে এখানে এসেছিল বিয়ে করতে ? শখ তো কম নয় !"

একটু পরেই গাড়িটা গিয়ে পৌঁছল বামুনি পাহাড়ে। সেখানে আসলে দেখবার কিছু নেই। শুধু কয়েকটা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। তবে এমনিই পাহাড়ের ওপর বসে থাকতে ভাল লাগে।

কাকাবাবু কয়েক টুকরো পুরনো পাথর নিয়ে দেখতে লাগলেন মনোযোগ দিয়ে। সন্তু আর জোজো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। আকাশ আজ ঝকঝকে নীল, মাঝে-মাঝেই ঝাঁক-ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে।

একটু বাদে একটা জিপ গাড়ি উঠে এল সেখানে। কাকাবাবু সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। ড্রাইভারের পাশ থেকে একজন লোক নেমে এগিয়ে আসতে-আসতে হাত জোড় করে বলল, "নমস্কার, কাকাবাবু !"

কাকাবাবু লোকটিকে একেবারেই চেনেন না। বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়েস, প্যান্টের ওপর পরে আছে একটা গাঢ় লাল রঙের ফুলহাতা সোয়েটার।"

কাছে এসে সে বলল, "আমার নাম তপন রায় বর্মণ। ফরেস্ট অফিসে কাজ করি। বড়ঠাকুর সাহেব বললেন আপনাদের কথা, তাই ভাবলাম দেখা করে আসি।"

কাকাবাবুও নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী করে জানলেন যে আমরা এখানে এসেছি ?"

তপন রায় বর্মণ বলল, "তেজপুরে বেড়াতে এসে সকলেই এখানে একবার আসে। তাই চান্স নিলাম।"

সন্তু ও জোজোকে ডেকে কাকাবাবু ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

তপন বলল, "আপনারা যদি পুরনো জঙ্গল দেখতে চান, তা হলে আর-একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। দা পার্বতীয়া। সেখানে বহুকালের প্রাচীন পাথরের দরজা রয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আজকের দিনটা এত সুন্দর, বেড়াবার মতনই দিন। চলুন, ঘুরে আসা যাক।"

তপন বলল, "আপনি আমাকে শুধু নাম ধরে ডাকবেন, তুমি বলবেন। আমিও আপনাকে কাকাবাবু বলব, মিস্টার কিংবা বাবুটাবু আমার বলতে ভাল লাগে না।"

সন্তু আর জোজোর দিকে ফিরে বলল, "তোমরাও আমাকে তপনদা বলবে।"

তপন নিজের জিপগাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবুদের স্টেশন ওয়াগনে চড়ে বসল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আজও কি আমরা রাত্তিরে জঙ্গলে যাব?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ! আজ রাতটা আমি ভাল করে ঘুমোব। কাল সকালে কী করা যায়, পরে ভেবে দেখা যাবে!"

জোজো বলল, "কাল সকালে হাতির পিঠে চেপে ঘুরলে হয় না? আমার তো মাহুত লাগবে না, আমি নিজেই হাতি চালাতে জানি।"

সন্তু বলল, "তুই কোথায় হাতি চালানো শিখলি রে?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "আফ্রিকায়। সেখানে আমার নিজস্ব পোষা হাতি ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, কাল সকালে তোমার হাতি চালানো দেখব।"

রাস্তাটা সারানো হচ্ছে বলে গাড়ি চলছে আস্তে-আস্তে। পেছন থেকে আর-একটা গাড়ির খুব তাড়া আছে মনে হয়, হর্ন দিচ্ছে বারবার। কিন্তু সে-গাড়িকে এগিয়ে যেতে দেওয়ার উপায় নেই। পেছনের লাল রঙের গাড়িটা অনবরত হর্ন দিতে লাগল।

কাকাবাবু দু' হাতে কান চাপা দিয়ে বললেন, "উঃ, এত হর্ন দেয় কেন?"

খানিক বাদে পেছনের গাড়িটা পাশের মাঠে নেমে পড়ে ধুলো উড়িয়ে কোনওরকমে সামনে চলে এল, তারপর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল আড়াআড়িভাবে। সেই গাড়ির সামনের সিট থেকে নেমে এল একজন লোক। তাকে দেখেই চমকে উঠতে হয়। ছ' ফুটের বেশি লম্বা, তেমনই চওড়া, মনে হয় যেন পাহাড়ের মতন মানুষ। তার দু' দিকের মোটা জুলপি

জুড়ে আছে গালের অনেকখানি, গোঁফ নেই।

সে-লোকটি গটমটিয়ে এসে এ-গাড়ির ড্রাইভারের কলার চেপে ধরে একটা গালাগালি দিয়ে বলল, "এই, তুই আমার রাস্তা আটকে ছিলি কেন রে ? হর্ন দিচ্ছি, শুনতে পাচ্ছিস না ? কানে কালা ?"

কাকাবাবু তপন রায় বর্মণের দিকে তাকালেন। তার মুখখানি শুকিয়ে গেছে, লোকটিকে দেখে ভয় পেয়েছে। সে মিনমিন করে বলল, "রাস্তা যে ভাঙা, জায়গা ছিল না !"

ড্রাইভারও কোনও প্রতিবাদ করছে না।

লোকটি আবার একটা গালাগাল দিতেই কাকাবাবু শান্ত, দৃঢ় গলায় বললেন, "ওর কলার ছেড়ে দিন। ভদ্রভাবে কথা বলুন !"

লোকটি কৌতূহলীভাবে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। কুটিলভাবে ভুরু কুঁচকে বলল, "এ আবার কে ? নতুন লোক দেখছি !"

তপন তাড়াতাড়ি বলল, "আজ্ঞে, ইনি আমাদের কনজারভেটর সাহেবের অতিথি। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। এঁর নাম রাজা রায়চৌধুরী।"

লোকটি ড্রাইভারের কলার ছেড়ে দিয়ে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী ! তাই নাকি ? ইনিই সেই ? নমস্কার, নমস্কার ! ও, সেইজন্যই আমার গাড়িকে আগে যেতে দেয়নি ? আমি ভাবলাম, কার এমন সাহস যে, আমার গাড়িকে জায়গা ছাড়বে না ? আমার গাড়ির নাম্বার দেখেছেন ? ৫৫৫৫। সবাই এ-গাড়ি চেনে !"

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে লোকটির মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

লোকটি বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি বেড়াতে এসেছেন, একদিন আমার বাড়িতে চা খেতে আসুন। আপনারা সবাই আসুন, আজই সন্ধেবেলা। তপনবাবু, তুমি এদের নিয়ে আসবে। আচ্ছা, তখন কথা হবে। চলি !"

লোকটি আবার ফিরে গেল নিজের গাড়িতে। সেটা হুশ করে অনেক জোরে বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবু তপনকে জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটা কে ?"

তপন বলল, "ওর নাম হিম্মত রাও। খুব বড় ব্যবসাদার। কাঠের ব্যবসা, পেট্রল পাম্প, অনেক কিছু আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "হোক না বড় ব্যবসাদার। তোমরা ওকে ভয় পাও কেন ?"

তপন বলল, "ওর অনেক টাকা। অনেক দলবল। সবাই ওকে ভয় পায়, এমনকী, পুলিশও ভয় পায়। ওর সঙ্গে কারও ঝগড়া হলে তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বোধ হয় খুন করে জঙ্গলে কোথাও ফেলে দিয়ে

আসে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "ও আমাকে চিনল কী করে ?"

তপন বলল, "আপনি বিখ্যাত লোক, আপনাকে অনেকেই চেনে।"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহুঃ ! একজন কাঠের ব্যবসাদার কী কারণে আমাকে চিনবে ? তুমি ওর কাছে আমার নাম বলতে গেলে কেন ? এর পর থেকে যার-তার কাছে আমার নাম বলবে না, পরিচয়ও দেবে না।"

তপন বলল, "হিম্মত রাও আপনাকে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করল—"

পেছন থেকে সন্তু বলল, "আমরা মোটেই যাব না। লোকটা অভদ্র ! কেন ওকে সবাই আগে যেতে দেবে ? ও কি লাটসাহেব নাকি ?"

জোজো বলল, "ইস্কাবনের গোলাম !"

সন্তু বলল, "অনেকটা। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, জোজো ? ওর গলায় সোনার হারের সঙ্গে যে লকেট, তাতে একটা হনুমানের ছবি !"

জোজো বলল, "এইসব লোককে জব্দ করা খুব সহজ। কোনও রকমে ওর ডান হাঁটুতে একটা আলপিন ফুটিয়ে দিতে পারলেই 'বাপ রে, মা রে' বলে চ্যাঁচাবে !"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? সামান্য একটা আলপিনে অত বড় চেহারার মানুষ কাবু হয়ে যাবে ?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, কাকাবাবু, যেসব লোক খুব লম্বা আর মোটা হয়, তাদের হাঁটুতে জল জমে থাকে। একটা আলপিন ফোটালেই সেই জল তিরতির করে বেরিয়ে আসবে, আর তখন এত ব্যথা হবে... সেইজন্যই তো আমি নিজের কাছে সবসময় কয়েকটা সেফটিপিন রাখি !"

তপন অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জোজোর দিকে।

দা পার্বতীয়া দেখে ফেরার পথে আর-একটি ঘটনা ঘটল।

একটা জংলা জায়গার সরু পথ থেকে একটা সাইকেল উঠে এল বড় রাস্তায়। সেটা চালাচ্ছে একজন খাকি প্যান্ট আর সবুজ চাদর জড়ানো লোক, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তার সাইকেলের দু' পাশে দুটো বোঝা চাপানো আছে।

এই গাড়ির ড্রাইভার তপনকে বলল, "সার, ওই দেখুন জলিল !"

তপন বলল, "ব্যাটা আবার বেরিয়েছে ? ধরো তো, ধরো ওকে !"

স্টেশন ওয়াগনটা স্পিড বাড়িয়ে কাছে আসতেই সাইকেল আরোহী ড্রাইভারকে দেখে চমকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সে সাইকেল ঘুরিয়ে নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে। এ-গাড়িটাও তাড়া করল তাকে। এবড়োখেবড়ো মাঠ, সদ্য ধান কাটা হয়ে গেছে, ধানগাছের গোড়াগুলো উঁচু হয়ে আছে। সেই লোকটি তারই মধ্যে এঁকেবেঁকে সাইকেল নিয়ে পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল একজায়গায়। তারপর সাইকেল ফেলেই সে দৌড় লাগাল। তপনও তড়াক

করে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল তার পিছু-পিছু। তপনও বেশ জোরে দৌড়োয়, কিন্তু জলিল অনেক ক্ষিপ্র।

এবার সন্তু আর জোজোও নেমে পড়ল। শুরু হয়ে গেল মাঠের মধ্যে চোর-চোর খেলা। কাকাবাবু সেই খেলা দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। জলিল ওদের তিনজনকেই নাস্তানাবুদ করে দিল। কাকাবাবু গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো, শেষপর্যন্ত লোকটা পালাবে, না, ধরা পড়বে ?"

ড্রাইভার বলল, "এ-লোকটা মহা ধড়িবাজ, এর আগে দু'বার পালিয়েছে !"

কাকাবাবু বললেন, "এবার ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ওই যে নীল কোট পরা ছেলেটি, শেষপর্যন্ত ও-ই ধরে ফেলবে !"

তপন আর সন্তু-জোজো তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে জলিলকে। এবার আর তার নিস্তার নেই। তপন দু' হাত তুলেছে ওকে ধরার জন্য, তবু জলিল সুড়ুত করে গলে গেল। ক্রিকেট-মাঠে ভাল ফিল্ডার যেমন ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ে ক্যাচ ধরে, সন্তু সেইভাবে এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরল জলিলের একটা পা। সে আর ছাড়াতে পারল না।

জলিলকে টানতে-টানতে নিয়ে আসা হল তার গাড়ির কাছে। তপন ওর সাইকেলটাকেও নিয়ে এল। সাইকেলটার দু' পাশে কাপড় দিয়ে ঢাকা দুটো খাঁচা। তার মধ্যে দশ-বারোটা পাখি। সবসুদ্ধু তোলা হল গাড়ির পেছনে।

জোজো বলল, "দেখলেন তো কাকাবাবু। আমি এমন প্যাঁচ কষে ওকে সন্তুর দিকে ঠেলে দিলাম, তাই তো সন্তু ওকে ধরতে পারল !"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দেখলাম তো ! কিন্তু ওকে ধরা হল কেন ?"

তপন বলল, "দেখছেন না, কত ভাল-ভাল পাখি ধরেছে। এগুলো বর্মা বর্ডার দিয়ে বিদেশে চালান যায়। এইসব পাখি ধরাই বেআইনি। এর আগে দু' বার আমাদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছে !"

সন্তু কোটের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কী পাখি ?"

তপন বলল, "বেশির ভাগই ময়না। বিদেশে অনেক দামে বিক্রি হয়। কথা শেখালে মানুষের মতন কথা বলতে পারে। দুটো সবুজ ঘুঘু পাখি, এরও খুব দাম, আর তিনটে হর্ন বিল—"

জলিলের মুখে একটা একরোখা ভাব। যেন সে একটুও ভয় পায়নি। ট্যাঁক থেকে একটা টিনের কৌটো বের করে তার থেকে একটা বিড়ি ধরাল।

কাকাবাবু বললেন, "ওকে নিয়ে এখন কী করবে ?"

তপন বলল, "থানায় জমা দেব।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর ওর কী শাস্তি হবে ?"

তপন বলল, "সেই তো মুশকিল ! এদের পেছনে বড়-বড় লোক থাকে। কোর্টে কেস উঠলে কোথা থেকে একজন উকিল এসে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। অনেকদিন কেস চলে। তারপর সামান্য কিছু টাকা জরিমানা হয়,

সে-টাকাটাও উকিল দিয়ে দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ ! তা হলে আর ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে লাভ কী ? ওকে বরং ওর বাড়িতে পৌঁছে দাও !"

তপন চোখ বড়-বড় করে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, "বেচারা কত কষ্ট করে পাখিগুলো ধরেছে, তারপর মাঠে এত দৌড়োদৌড়ি করল, অনেক পরিশ্রম গেছে। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিক। কী বলো হে জলিল, সেটাই ভাল না ? তোমার বাড়িতে গেলে আমাদের পানিটানি খাওয়াবে তো ?"

জলিল বলল, "আমি এখন বাড়ি যাব না !"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী, তোমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তুমি যাবে না ?"

জলিল দৃঢ়ভাবে বলল, "না !"

তপন বলল, "ওর বাড়ি আমাদের চেনাতে চায় না।"

ড্রাইভার বলল, "যতদূর মনে হয়, জামগুড়ি গ্রামের কাছাকাছি ওর বাড়ি। ওখানকার হাটে আমি ওকে দু-এক বার দেখেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "ব্যস, তা হলে আর কী ! ওই গ্রামে গেলেই ওর বাড়ির খোঁজ পাওয়া যাবে। সন্তু, জোজো, ওকে ভাল করে ধরে রাখিস, যেন লাফিয়ে হঠাৎ পালিয়ে না যায়। ওর বাড়িতে আমরা যাবই !"

জামগুড়ি গ্রামে দু-এক জন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, জলিলের বাড়ি পাশের গ্রাম সানকিভাটায়। সে-গ্রামেরও এক প্রান্তে একটি সুপুরিগাছ-ঘেরা মাটির বাড়ি, পাশে একটা ছোট্ট পুকুর।

কাকাবাবু সে-বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখলেন। এক পাশে রান্নাঘর। অন্য দিকে গোয়ালঘর, একটা ছোটমতন ধানের গোলা, বাড়ির পেছনে বাগান। ওদের শোওয়ার ঘরের বারান্দায় বাড়ির মেয়েরা ভয়চকিত মুখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

কাকাবাবু সেদিকে এগিয়ে গিয়ে একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জলিল তোমার কে হয় ? আব্বাজান ? পাখিগুলো কোথায় রাখে বলো তো মা, ভয় নেই, তোমার বাবাকে কেউ কিছু বলবে না, মারবেও না।"

মেয়েটি চোখে হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কাকাবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, "কাঁদছ কেন ? কোনও ভয় নেই। পাখিগুলো কোথায় দেখিয়ে দাও, তোমার বাবা ছাড়া পেয়ে যাবে।"

মেয়েটি তবু কোনও কথা না বলে কেঁদেই চলল।

কাকাবাবু বললেন, "তুমি দেখিয়ে দিলে না তো ? তা হলে আমরাই খুঁজে

নিচ্ছি। পাখি খোঁজা খুব সহজ।"

কাকাবাবু কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে শূন্যের দিকে একবার ফায়ার করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির ভেতরে খাঁচার পাখিগুলো ডেকে উঠল, আশপাশের গাছ থেকে অনেক কাক ভয় পেয়ে কা-কা করে উড়ে গেল, আর গোয়ালঘরের মধ্য থেকে অনেক পাখির কিচিরমিচির শোনা গেল।

তপন, সন্তু-জোজো ছুটে গেল গোয়ালঘরে। সেখানে একটি মাত্র গরু, তার পেছনে একটা চটের পরদা টাঙানো। সেই পরদার পেছনে মাটিতে খানিকটা গর্ত খুঁড়ে রাখা আছে অন্তত কুড়িটা বাঁশের খাঁচা। তার মধ্যে গাদাগাদি করে রাখা আছে পাখি, শ' পাঁচেক তো হবেই। ময়না, তিতির, ঘুঘু, ধনেশ, আরও নানা জাতের পাখি।

ওরা তিনজন খাঁচাগুলো নিয়ে আসতে লাগল উঠোনে। জলিল কোমরে হাত দিয়ে তাকিয়ে আছে জ্বলজ্বলে চোখে। কাকাবাবু মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী ? ফিরোজা ? বাঃ, কী সুন্দর নাম।"

তপন বলল, "বিগ ক্যাচ ! একসঙ্গে এত পাখি, দুর্লভ সব পাখি।"

কাকাবাবু বললেন, "জলিলকে মোটে দশ-বারোটা পাখিসমেত থানায় নিয়ে গেলে কী লাভ হত ! বড়জোর একশো-দুশো টাকা ফাইন হত। বিদেশে একসঙ্গে অনেক পাখি চালান যায়, মোটা টাকার কারবার।"

তপন বলল, "এইসব খাঁচা আটক করে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের গাড়িতে তো ধরবে না। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, আমাদের ড্রাইভার কাছাকাছি থানা থেকে আর-একটা গাড়ি নিয়ে আসুক। ততক্ষণ আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যস্ত হোয়ো না। এই পাখিগুলো যে তোমরা আটক করবে, তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে কী হবে ? পাখিগুলোকে কি থানার লোকেরা দানাপানি খাওয়াবে ?"

তপন বলল, "ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার নিতে হবে। তারপর গুয়াহাটির চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দিলে ওরা যা হোক ব্যবস্থা করবে।"

কাকাবাবু বললেন, "গভর্নমেন্টের তো আঠারো মাসে বছর। এগুলো নিয়ে গিয়ে থানায় রাখবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার পেতে কতদিন লাগবে কে জানে ! তারপর গুয়াহাটি চিড়িয়াখানায় পাঠাতে পাঠাতে অর্ধেক পাখি মরে যাবে না ? ঠিক করে বলো !"

তপন মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "তা হয় সার, অনেক সময় দেরি হয়ে যায় !"

কাকাবাবু এবার কড়াভাবে বললেন, "বিদেশে পাখি চালান দেওয়া যেমন অন্যায়, তেমনই তোমাদের অযত্নে পাখিগুলো মেরে ফেলা আরও বেশি অন্যায়। সব পাখি এখান থেকেই ছেড়ে দাও !"

তপন বলল, "সে কী বলছেন সার ? তা হলে যে জলিলের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ থাকবে না !"

কাকাবাবু বললেন, "পাখিগুলোকে বাঁচানোই তো বড় কথা, তাই না ? নাও, নাও, শুরু করো, খাঁচাগুলোর দরজা খুলে দাও !"

সন্তু আর জোজো মহা উৎসাহে এই কাজে লেগে গেল। এক-একটা খাঁচা খোলা হয় আর ফরফর করে উড়তে থাকে পাখি। সব পাখি তখুনি উড়ান দিয়ে মিলিয়ে যায় না। হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কিছু পাখি উঠোনে হেঁটে বেড়ায়, কিছু পাখি সুপুরি গাছগুলোতে বসে ডাকতে শুরু করল। ছোট পাখিগুলো একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে উড়তে লাগল মাথার ওপরে।

কাকাবাবু মুগ্ধভাবে এই পাখি ওড়ার দৃশ্য দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হয়, এমন সুন্দর দৃশ্য যেন তিনি বহুদিন দেখেননি।

তিনি ফিরোজাকে বললেন, "তুমিও পাখি ওড়াবে ? যাও না !"

ফিরোজা এবার দৌড়ে গিয়ে সন্তুদের পাশে গিয়ে হাত লাগাল।

সমস্ত পাখি মুক্তি পাওয়ার পর কাকাবাবু আবার ফিরোজাকে ডেকে বললেন, "আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, তুমি আমাকে একটু পানি খাওয়াবে ?"

ফিরোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা ঝকঝকে পেতলের ঘটি ভর্তি জল আর একটা কাচের গেলাস নিয়ে এল। কাকাবাবুর পর সন্তু-জোজোরাও সেই জল খেল।

কাকাবাবু ফিরোজাকে বললেন, "পাখিগুলো ছাড়া পেয়ে গেল, তাই তোমার বাবাকেও কেউ ধরে নিয়ে যাবে না। এবার থেকে তোমার বাবা পাখি ধরে আনলে তোমরা নিজেরাই খাঁচা খুলে ছেড়ে দেবে, কেমন ? তোমার মাকে, অন্যদেরও সেই কথা বোলো। মনে থাকবে তো ?"

॥ ৩ ॥

বিকেলের দিকে বাতাস এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে, বাগানে আর বসা যায় না। ডাকবাংলোর তিন দিকে রয়েছে চওড়া ঢাকা বারান্দা। সেখানে চাদরমুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে চেয়ারে বসেছে সন্তু আর জোজো। কাকাবাবু ওভারকোট পরে নিয়েছেন। একবার চা, একবার কফি পান করা হয়ে গেছে। জোজো গল্প বলে যাচ্ছে অনবরত।

একসময় জোজো সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কখনও কোনও পাখির পিঠে চেপেছিস ?"

সন্তু বলল, "পাখির পিঠে ? না তো ! অতবড় কোনও পাখি আছে নাকি ?"

জোজো বলল, "কেন ! উটপাখি ! আমি সেই পাখিতে চেপে গেছি অনেকটা দূর !"

সন্তু বলল, "উটপাখি ? 'অস্ট্রিচ'কে বাংলায় বলে 'উটপাখি'। কিন্তু উটপাখি তো ভাই পাখি নয়। চিংড়িমাছ যেমন মাছ নয়, বনমানুষ মানুষ নয়, ঘোড়ার-ডিম ডিম নয়, ডুমুরের-ফুল ফুল নয়...."

কাকাবাবু একটু বই পড়ছিলেন, বই সরিয়ে হাসিমুখে তাকালেন। জোজো সঙ্গে এলে সময়টা বেশ ভালই কাটে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "জোজো, তুমি উটপাখির পিঠে কোথায় চেপেছিলে ?"

জোজো অম্লান বদনে বলল, "বাবার সঙ্গে যখন সাউথ আমেরিকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, কী যেন দেশটার নাম, উরুগুয়ে বোধ হয়, সেখানে...."

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল, "ধ্যাত ! অস্ট্রিচ শুধু আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও পাওয়াই যায় না !"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন জোজোর দিকে। তারপর বললেন, "জোজোর কথাটা অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারবি না রে সন্তু। দক্ষিণ আমেরিকাতেও উটপাখির মতনই প্রায় একটা প্রাণী আছে, তার নাম রিয়া। উড়তে পারে না বটে, কিন্তু দারুণ জোরে ছোটে। আর্জেন্টিনায় আমি দেখেছি। পিঠে আর পেছন দিকে অনেক বড়-বড় পালক থাকে, আর ডিম পাড়ে বলে ওদের পাখি বলেই ধরা হয়।"

জোজো বলল, "ডিম পাড়লে পাখি হবে না কেন ? উটপাখিও ডিম পাড়ে। সেইজন্যই ওরাও পাখি।"

সন্তু বলল, "ডিম পাড়লেই বুঝি পাখি হয় ? কচ্ছপও তো ডিম পাড়ে, তা হলে কচ্ছপও পাখি ? পাখি মানে খেচর, যারা আকাশে ওড়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই রিয়াগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা আর কোনও পাখি বা প্রাণীর নেই। মেয়ে রিয়াগুলো ডিম পাড়ে, ডিম পেড়েই তারা চলে যায়, আর কোনও খবরই রাখে না। পুরুষ রিয়াগুলো সেই ডিম পাহারা দেয়, তা দিয়ে ফোটায়, বাচ্চাদের বড় করে তোলে। বাবা হিসেবে এমন দায়িত্ববান আর দেখা যায় না।"

জোজো বলল, "আমি ওই পুরুষ রিয়ার পিঠেই চেপেছি।"

সন্তু বলল, "ঠিক করে বল তো, তুই সত্যি-সত্যি চেপেছিস, না কোনও ছবিতে দেখেছিস ?"

কাকাবাবু ওদের তর্ক থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, ঘোড়ার ডিম কথাটা লোকে কেন বলে ? গরুর ডিম, মোষের ডিম তো বলে না ?"

জোজো বলল, "এককালে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল, তাদের ডানা ছিল, আকাশে উড়ত। ওই যে সন্তু খেচর না মেচর কী বলল, তাই-ই ছিল। সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া নিশ্চয়ই ডিম পাড়ত !"

সন্তু বলল, "কোনও এক জন্মে জোজো রাজপুত্র ছিল, তখন ও পক্ষিরাজ

ঘোড়ার পিঠেও চেপেছে।"

জোজো বলল, "হতেও পারে। আমি মাঝে-মাঝে স্বপ্নে আমার আগের জন্মগুলো দেখতে পাই। ঠিক আগের জন্মে আমি ছিলাম আর্মির একজন কর্নেল।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই দ্যাখো, ওই ঘোড়াটা বোধ হয় কোনও এক জন্মে পক্ষিরাজ ছিল !"

ওরা দু' জনেই চমকে মুখ ফেরাল।

সত্যি-সত্যি ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক ঢুকছে বাগানে। ঘোড়াটার রং কুচকুচে কালো, দেখলেই মনে হয় খুব তেজি। কাছে এসে ঘোড়াটা থেকে নামল তার আরোহী, এত শীতেও সে শুধু একটা নীল রঙের শার্ট আর জিন্স পরা। মাথায় একটা কাপড়ের টুপি। লোকটির চেহারা চোখে পড়বার মতন। গায়ের রং কালো, ছিপছিপে লম্বা, শরীরে একটুও মেদ নেই, খুব ভাল খেলোয়াড়দের মতন। ওর চোখের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী।

লোকটি দু' হাত তুলে কাকাবাবুকে বলল, "নমস্কার। আপনিই তো মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী ? আপনাদের আমি নিয়ে যেতে এসেছি।"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কোথায় ?"

লোকটি বলল, "আপনাদের চায়ের নেমন্তন্ন আছে। হিম্মত রাও আপনাদের আজ নেমন্তন্ন করেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তিনি নেমন্তন্ন করেছেন বটে, কিন্তু আমরা আজই যাব তো বলিনি। আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে।"

লোকটি বলল, "হিম্মত রাওয়ের ধারণা, আপনারা আজই যাবেন, তিনি চা-টা টেবিলে সাজিয়ে বসে আছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "দুঃখিত। ওই যে বললাম, আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। আজ আর বেরোতে ইচ্ছে করছে না।"

লোকটি বলল, "ও ! আপনারা যাবেন না ! ঠিক আছে। নমস্কার।"

আর একটিও কথা বাড়াল না সে। খুব সাবলীলভাবে ঘোড়ায় উঠে পড়ল। তারপর সোজাসুজি গেটের দিকে না গিয়ে বাগানের মধ্যে ছোটাতে লাগল ঘোড়াটাকে। ক্রমশই গতিবেগ বাড়াচ্ছে। ঘোড়ার পায়ের চাপে তছনছ হয়ে যাচ্ছে অনেক ফুল গাছ। তারপর একসময় প্রচণ্ড জোরে লাফ দিল ঘোড়াটা, বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "বাপ রে, লোকটা দারুণ ঘোড়া চালায় তো !"

সন্তু বলল, "হিম্মত রাওয়ের সঙ্গীরা সবাই কি অভদ্র ? লোকটা নিজের নামও বলল না !"

জোজো বলল, "অভদ্র ব্যবহার তো কিছু করেনি। জোরাজুরিও করেনি। আমরা যাব না শুনেই চলে গেল।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুর সামনে শুধু-শুধু বাগানের মধ্যে ঘোড়া চালাবার কেরদানি দেখাবার কী মানে হয় ? কতগুলো ফুলগাছ নষ্ট করে দিল। যারা গাছ নষ্ট করে, তাদের আমি কিছুতেই ভাল লোক মনে করি না।"

কাকাবাবু বললেন, "যাই বলিস, এমন চমৎকার স্বাস্থ্যবান লোক আজকাল দেখাই যায় না। কী সুন্দরভাবে ঘোড়াটায় চাপল !"

একটু বাদেই নিজে জিপ চালিয়ে চলে এল তপন রায় বর্মণ। মুখে-চোখে অস্থির ভাব।

সে বলল, "কাকাবাবু, আপনারা হিম্মত রাওয়ের বাড়ি চা খেতে গেলেন না ? আপনাদের জন্য তো স্টেশান ওয়াগনটা রয়েছেই, ওতে চলে গেলে পারতেন !"

কাকাবাবু বললেন, "একজন ডাকতে এসেছিল, আমরা যাব না বলে দিয়েছি।"

তপন বলল, "কিন্তু হিম্মত রাও যে রেডি হয়ে বসে আছে আপনাদের জন্য। না গেলে খুব অসন্তুষ্ট হবে। চলুন, চলুন !"

কাকাবাবু বললেন, "কী মুশকিল, ইচ্ছে না করলেও যেতে হবে নাকি ! জোর-জবরদস্তি করে নেমন্তন্ন ?"

তপন শুকনো মুখে বলল, "হিম্মত রাও আমার কাছে খবর পাঠাল, আপনাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। সব দোষটা আমার ঘাড়ে পড়বে। তারপর যদি আমার পেছনে লাগে !"

কাকাবাবু সন্তু আর জোজোর মুখের দিকে তাকালেন। ওরা দু'জনেই মাথা নাড়ল। চাদর জড়িয়ে আরাম করে বসেছে, এখন আর ওদের যাওয়ার ইচ্ছে নেই একটুও।

কাকাবাবু তপনকে বললেন, "বোসো, বোসো, একটু বোসো। আমাদের যে ডাকতে এসেছিল, সে কে বলো তো ?"

তপন একটা চেয়ার টেনে বসতে-বসতে জিজ্ঞেস করল, "কে এসেছিল ? কী রকম চেহারা ?"

কাকাবাবু বললেন, "ঘোড়ায় চেপে এসেছিল, কালো, লম্বা, খুব চমৎকার স্বাস্থ্য, বয়স হবে পঁয়তিরিশ-ছত্রিশ।"

তপন বলল, "ও বুঝেছি। টিকেন্দ্রজিৎ ! সে নিজে এসেছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "টিকেন্দ্রজিৎ কে ? হিম্মত রাওয়ের কর্মচারী ?"

তপন বলল, "না, না, কর্মচারী নয়, বন্ধু বলতে পারেন। টিকেন্দ্রজিৎ তো এখানে থাকে না। মাঝে-মাঝে আসে। তখন হিম্মত রাওয়ের বাড়িতে ওঠে। তাই তো অবাক হচ্ছি, সাধারণ একজন কর্মচারীর মতন টিকেন্দ্রজিৎ নিজে ডাকতে এসেছিল আপনাদের ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে যে সাধারণ নয়, তা সে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। এখানে থাকে না তো কোথায় থাকে ?"

তপন বলল, "তা ঠিক জানি না। লোকটা দুর্ধর্ষ শিকারি ছিল শুনেছি। বন্দুক চালায়, তলোয়ার খেলতে জানে, অনেক রকম খেলাধুলো জানে। ওর পুরো নাম রাজকুমার টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ। মনে হয়, মণিপুরের লোক। রাজকুমার মানে সত্যি-সত্যি রাজপুত্র নয়, মণিপুরিরা অনেকেই রাজকুমার লেখে নামের আগে।"

সন্তু বলল, "মণিপুরিরা কালো হয় ?"

তপন বলল, "না, বেশির ভাগই ফরসা, তবে দু-চার জন কালোও হয়। এই টিকেন্দ্রজিৎ ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসে। বোধ হয় ওর মা ছিল বাঙালি।"

সন্তু বলল, "আমি লক্ষ করেছি, হিম্মত রাওয়ের মতন ওর গলাতেও একটা সোনার চেন আছে। তবে তাতে হনুমানের বদলে একটা বাঘের মুখের ছবি।"

তপন বলল, "মনে হয়, ও আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে একবার ঘুরেই আসা যাক। কী রে, তোরা যাবি নাকি ?"

সন্তু প্রতিবাদের সুরে বলল, "হিম্মত রাও ডেকে পাঠালেই আমাদের যেতে হবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওই টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে আমার আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। লোকটা ইন্টারেস্টিং। তোরা বরং তা হলে থাক।"

তপন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের জামাকাপড় পরতে আবার সময় লাগবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আপনিই চলুন!"

কাকাবাবু তপনের জিপে গিয়ে উঠলেন।

হিম্মত রাওয়ের বাড়িটা দেখবার মতন কিছু নয়। বড় বাড়িও নয়, একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে অনেক ছোট-ছোট বাড়ি ছড়ানো। এরই মধ্যে রয়েছে কাঠের গোলা, ধানের গোলা, গোয়ালঘর, তিনখানা গাড়ির গ্যারাজ, এক-উঠোন কাঁচালঙ্কা ও বেগুন গাছ। বড়-বড় দুটো কুকুর ঘুরছে।

গাড়ি থেকে নামতেই একজন লোক ওদের নিয়ে গেল ভেতরের দিকের একটা বাড়িতে। পুরনো আমলের মোটা-মোটা সোফা দিয়ে সাজানো একটা বসবার ঘর। একপাশে একটা গোল শ্বেতপাথরের টেবিল। তার ওপর নানারকম বাসনপত্রে অনেক খাবার সাজানো। একটা সিংহাসনের মতন বিশাল চেয়ারে বসে আছে মানুষপাহাড় হিম্মত রাও। থুতনিতে এক হাত দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

কাকাবাবুর দিকে সে মনোযোগই দিল না, নমস্কারও করল না, তপনকে বলল, "আমি এখনও চা খাইনি। তোমরা না এলে আমি চা খেতামই না। রাত্রেও কোনও খানা খেতাম না।"

কাকাবাবুর মজা লাগল। এত বড় চেহারার মানুষটা ঠিক যেন বাচ্চা ছেলের

মতন অভিমান করে আছে।

তিনি ভদ্রতা করে বললেন, "আমাদের মাফ করবেন, হিম্মত রাও সাহেব। আজই যে আপনার এখানে আসতে হবে, তা আমি বুঝতে পারিনি। ছি ছি ছি, আপনার চা খেতে দেরি হয়ে গেল!"

হিম্মত রাও এবারও কাকাবাবুর কথা গ্রাহ্য না করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "রামলখন, ঝগরু!"

সঙ্গে-সঙ্গে দু'জন লোক হাজির হল দু'দিক দিয়ে।

হিম্মত রাও তাদের দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, "বাতি জ্বালিসনি কেন ঘরের? চায়ের পট নিয়ে আয়!"

এর পর সে উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুর কাঁধে একটা নতুন সুদৃশ্য গামছা পরিয়ে দিল। একটা প্লেটে করে এগিয়ে দিল কয়েকটি গুয়া বা কাঁচা সুপুরি। অসমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে অতিথিদের যে গামছা ও সুপুরি দিয়ে বরণ করা হয়, তা জানেন কাকাবাবু। তিনি একটা সুপুরি মুখে দিলেন, কামড়ালেন না বা চুষলেন না। অভ্যেস না থাকলে কাঁচা সুপুরি খেলে মাথা ঘোরে।

এবার হিম্মত রাও নম্র গলায় বললেন, "দয়া করে বসুন। গরিবের বাড়িতে সামান্য কিছু গ্রহণ করুন।"

তারপরই তপনের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিতাম!"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে বকছেন কেন? বললাম তো, দোষ আমারই!"

হিম্মত রাও বলল, "না, না, আপনার দোষ হবে কেন? আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার সব কথা মনে না থাকতে পারে। কিন্তু এই অতি চালাক বাঙালিটা কেন আপনাকে ঠিক সময় মনে করিয়ে দেয়নি? আপনার সঙ্গের ছেলেদুটো কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "তারা আর আসতে চাইল না। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে তো!"

হিম্মত রাও বলল, "তা হলে এত খাবার খাবে কে? সব টিফিন কেরিয়ারে ভরে দেব। ডাকবাংলোয় নিয়ে যাবেন! ওদের খেতে হবে!"

কাকাবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে টেবিল থেকে একটা বরফি তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "বাঃ, ভারী ভাল স্বাদ। আপনার বন্ধুটি কোথায়!"

হিম্মত রাও বলল, "কোন বন্ধু!"

কাকাবাবু বললেন, "রাজকুমার টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ, যিনি আমাদের ডাকতে গিয়েছিলেন?"

হিম্মত রাও বলল, "টিকেন্দ্রজিৎ? সে চলে গেছে। সে কখন আসে, কখন যায়, কোনও ঠিক নেই। ঝড়ের মতন আসে, যায়। টিকেন্দ্রজিৎ আর তার

ঘোড়া, বেশিক্ষণ এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না।"

"উনি কোথায় থাকেন ?"

"তা জানার কী দরকার আপনার ?"

"ও, না, না, কোনও দরকার নেই। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি তেজপুরে বেড়াতে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ। তাতে আপনার আপত্তি আছে ?"

"আপত্তি থাকবে কেন ? কাজিরাঙ্গা জঙ্গল দেখতে গেলে সবাই গুয়াহাটি থেকে সোজা জঙ্গলেই চলে যায়, সেখানে ভাল থাকার জায়গা আছে। তেজপুরে সাধারণত কেউ থাকে না।"

"এরকম ছোট-ছোট শহর দেখতে আমার ভাল লাগে।"

"বেশ, আপনি আমাদের অতিথি। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করব, যেখানে ইচ্ছে ঘুরে আসবেন, সঙ্গে খাবারদাবার থাকবে।"

"ধন্যবাদ, হিম্মত রাও সাহেব। কিন্তু সে সবের কোনও দরকার হবে না।"

"কেন ?"

"কারণ, আমি আপনার অতিথি নই। বনবিভাগের অতিথি। ওঁরাই সব ব্যবস্থা করবেন। তাই না তপন ?"

তপন রায় বর্মণ মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। মিস্টার বড়ঠাকুর সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

চা এসে গেছে। কাকাবাবু এক চুমুক দিয়ে বললেন, "বাঃ, তেজপুরে এসে এই প্রথম ভাল চা খেলাম। জানেন তো, আমরা বাঙালিরা দার্জিলিং চা খাই। অসমের চায়ের স্বাদ অন্য রকম।"

হিম্মত সিং অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "দার্জিলিংয়ের চা আবার চা নাকি ? শুধু গন্ধ ! লিকার হয় না। আমাদের অসমের চা-ই বেশি ভাল। শুনুন মিস্টার রায়চৌধুরী, সরকারি গাড়ি আপনাকে শুধু বাঁধাধরা জায়গায় নিয়ে যাবে। যেখানে সবাই যায়। আমার গাড়ি আপনাকে অনেক ভেতরে নিয়ে যেতে পারে, ইচ্ছে করলে আপনি হরিণ-টরিন শিকারও করতে পারবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাকে আবার ধন্যবাদ। আমি শিকার করি না। নিরীহ জন্তুদের গুলি করে মেরে আমি কোনও আনন্দ পাই না !"

হিম্মত রাও হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "এই আপনাদের একটা নতুন বাতিক হয়েছে। শিকার বন্ধ। কেন বন্ধ ? জন্তু-জানোয়াররা মানুষকে কামড়ায় না ? মানুষ মারে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাকে যদি একটা বাঘ তেড়ে আসে, আপনি নিশ্চয়ই সেটাকে মারতে পারেন। আপনার বাড়িতে যদি হঠাৎ একপাল হাতি চলে আসে, আপনি গুলি চালাবেন অবশ্যই। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে যেসব বাঘ আর হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারও কোনও ক্ষতি করছে না, লুকিয়ে-লুকিয়ে তাদের

মারার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই। পৃথিবী থেকে তা হলে একদিন সব বাঘ আর হাতি-টাতি শেষ হয়ে যাবে!"

হিম্মত রাও আবার হেসে বলল, "বাঘ আর হাতি! হা-হা-হা, বাঘ আর হাতি! অসমে বাঘ আর হাতি অনেক আছে, শেষ হবে না! আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "দু-তিন দিন। আচ্ছা, তা হলে এবার উঠি হিম্মতবাবু? আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়াতেই হিম্মত রাও কাছে এসে তার গদার মতন একখানা হাতে কাকাবাবুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "ভাল করে সব ঘুরে দেখুন। আপনি আজ সন্ধেবেলা না এলে খুব দুঃখ পেতাম।"

তারপর তপনের পিঠে একটা গুঁতো মেরে বলল, "এই তপনবাবু, সাহেবের ভাল করে যত্ন নেবে। আমাদের তেজপুরের অতিথি!"

হিম্মত সিং দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। কাকাবাবুরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নীচে। গাড়ির কাছে এসে কাকাবাবু কাঁধে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, "ওফ, শুধু হাতখানা রেখেছে, তাতেই যেন আমার কাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল।"

তপন ককিয়ে উঠে বলল, "আর আমার পিঠে...আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছি না।"

কাকাবাবু বললেন, "ওর গায়ে কতটা জোর, তা বুঝিয়ে দিল।"

একজন লোক সত্যি সত্যি দুটি টিফিন কেরিয়ারে ভর্তি করে খাবারগুলো নিয়ে আসছে গাড়িটার দিকে।

কাকাবাবু মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখতে লাগলেন। হিম্মত সিংয়ের যে অনেক টাকা আছে, তা বোঝা যায়। কিন্তু রুচি নেই। সবই কেমন যেন এলোমেলো। এখানে কোনও কিছু লুকিয়ে রাখাও সহজ। পুলিশ এ-বাড়ি সার্চ করতে এলেও সহজে কিছু খুঁজে পাবে না।

কাকাবাবু আফসোস করে বললেন, "টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে দেখা হল না!"

ঠিক সেই সময় ঘোড়ার পায়ের খটাখট আওয়াজ হল। প্রচণ্ড জোরে রাস্তা থেকে ঘোড়া চালিয়ে উঠোনে ঢুকে এল টিকেন্দ্রজিৎ। ঠিক যেন ঝড়ের মতন। শেষ মুহূর্তে সে ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল, ঘোড়াটা সামনের দু' পা তুলে চি হিঁ হিঁ হিঁ করে ডেকে উঠল। এক লাফ দিয়ে নামল টিকেন্দ্রজিৎ।

তপন জিপে উঠে পড়েছে, কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে। টিকেন্দ্রজিৎ একবার তাকাল কাকাবাবুর দিকে। যেন চিনতেই পারল না। অহঙ্কারের সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল গটগট করে।

॥ ৪ ॥

মিহিমুখ নামে একটা জায়গা থেকে হাতি নিতে হয়। এখনও ভোরের আলো পুরোপুরি ফোটেনি। আকাশের একদিক অন্ধকার, একদিক একটু লালচে-লালচে। শেষরাতে উঠে ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে আসতে চমৎকার লেগেছে, কিন্তু শীত বড্ড বেশি। সন্তু আর জোজো সোয়েটারের ওপর কোট, গলায় মাফলার, হাতে গ্লাভ্স পরে তৈরি হয়ে এসেছে।

গাড়িতে আসবার সময় জোজো অনবরত গান গেয়েছে। আর সন্তুকে বারবার খোঁচা মেরে বলেছে, "তুইও গান কর, গান কর। যদি টপ্পা শিখতে চাস, তা হলে এই শীতেই খুব ভাল শেখা যায়। আপনি-আপনি গলা কাঁপবে। এই দ্যাখ না, যাব না, যাব না-আ-আ-আ-আ !"

কাকাবাবু একসময় স্বীকার করেছিলেন, জোজো সত্যি গান জানে।

অন্য টুরিস্ট আজ বেশি নেই। কাকাবাবুদের জন্য মিহিমুখে দুটো হাতি আগে থেকে ঠিক করা আছে। তপন আসেনি, তার বদলে শচীন সইকিয়া নামে আর-এক জন অফিসার আজ ওদের দেখাশোনা করবে। লোকটি বেশ হাসিখুশি ধরনের।

জোজো বলেছিল বটে যে আফ্রিকায় তার পোষা হাতি ছিল, কিন্তু এখানে সে হাতির পিঠে চাপতে গিয়ে প্রথমবার গড়িয়েই পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। তাতে একটুও দমে না গিয়ে সে ঠোঁট উলটে বলল, "আফ্রিকার হাতির সঙ্গে এখানকার হাতির তুলনাই হয় না। এখানকার হাতিগুলো ছোট-ছোট। এত ছোট হাতির পিঠে চড়া আমার অভ্যেস নেই। এ যেন ঘোড়ার বদলে গাধার পিঠে চড়া !"

জোজো আর সন্তু বসল একটা হাতির পিঠে। আর-একটাতে কাকাবাবু আর শচীন সইকিয়ার ওঠার কথা, কিন্তু কাকাবাবু একটু দূরে একটা খড়ের ঘরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সেখানে একটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। সাধারণ ঘোড়া যেমন হয়।

কাকাবাবু শচীনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওই ঘোড়াটা কার ?"

শচীন বলল, "রাধেশ্যাম বড়ুয়া এখানে কাজ করে, ওটা তার ঘোড়া। বনবিভাগের নয়, ওর নিজস্ব।"

কাকাবাবু বললেন, "সে কি ঘোড়াটা আমাকে ধার দেবে ? আমি একটা কথা ভাবছিলাম। আমার এই দু' বগলে ক্রাচ নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে খুব অসুবিধে হয়। উঁচুনিচু থাকলে আরও মুশকিল। কিন্তু ঘোড়ায় চেপে অনায়াসে ঘুরতে পারি।"

শচীন বলল, "এখন তো আমরা হাতির পিঠে যাচ্ছি। মাটিতে নামব না।"

কাকাবাবু বললেন, "কোথাও একটু নামার ইচ্ছেও তো হতে পারে। ওই রাধেশ্যাম বড়ুয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন না !"

রাধেশ্যাম একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। একসময় সে বোধ হয় মিলিটারিতে ছিল, শচীনের সামনে এসে জুতোয় খটাখট শব্দ করে স্যালুট দিল।

শচীন বলল, "রাধেশ্যাম, তোমার ঘোড়াটা এই স্যারকে ব্যবহার করতে দেবে ? ইনি আমাদের কনজারভেটর সাহেবের অতিথি।"

রাধেশ্যাম কাকাবাবুর আপাদমস্তক চেয়ে দেখল। তারপর সন্দেহের সুরে বলল, "আপনি ঘোড়া চালাতে জানেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "এককালে তো ভালই পারতাম। অনেক দিন অভ্যেস নেই। চেষ্টা করে দেখি ?"

রাধেশ্যাম ঘোড়াটা আনার পর কাকাবাবু ক্রাচ দুটো শচীনের হাতে দিয়ে একটু কষ্ট করেই ঘোড়াটার পিঠে চাপলেন। অচেনা আরোহী পেয়ে ঘোড়াটা পিঠ ঝাঁকাতে লাগল, কাকাবাবু দু' হাঁটু দিয়ে চেপে রইলেন তার পেট। প্রথমে আস্তে-আস্তে কয়েক কদম যাওয়ার পর তিনি জোরে ছুটিয়ে দিলেন, মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এলেন জঙ্গল থেকে।

হেসে বললেন, "এই তো বেশ পারছি। ঘোড়াটাও আমাকে চিনে গেছে, আর ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে না।"

রাধেশ্যাম বলল, "হ্যাঁ, আপনি চালাতে জানেন, বোঝা যাচ্ছে ! নিয়ে যান ওকে !"

কাকাবাবু উৎফুল্লভাবে বললেন, "কোনওই অসুবিধে হচ্ছে না। ভাবছি এবার কলকাতায় ফিরে গিয়েও ঘোড়ায় চড়ব। নিজের জন্য একটা ঘোড়া কিনে নেব।"

শচীন অন্য হাতিটিতে চাপল, কাকাবাবু চললেন ওদের পাশে পাশে। আকাশ এখন ভরে গেছে নীল আলোয়। জঙ্গলের অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার মতন। শুরু হয়ে গেছে পাখির ডাক। প্রথমেই চোখে পড়ল দুটো বনমোরগ। সাধারণ মোরগের চেয়ে অনেক বড়, আর তাদের মাথায় আগুন রঙের ঝুঁটি। তীক্ষ্ণভাবে ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল এক গাছ থেকে আর-এক গাছে।

অনেক দূরে দেখা গেল গোটাকতক হরিণ। একটা সরু পথ তারা লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হয়ে গেল চোখের নিমেষে।

জোজো বলল, "গণ্ডার দেখা যাবে না, গণ্ডার ?"

কাকাবাবু কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, "ব্যস্ত হয়ো না, দেখতে পাবে ! একদম কথা বলা চলবে না। আর শোনো, কোনও একসময় যদি আমরা আলাদা হয়ে যাই, তা হলে ঠিক করা রইল, ঠিক দু' ঘণ্টা বাদে আমরা আবার মিহিমুখে ফিরে আসব।"

শচীন বলল, "বাঘ সম্পর্কে সাবধান থাকবেন, স্যার। ঘোড়া দেখলে বাঘ

আসে। হাতির পিঠে থাকলে সে-ভয় নেই।”

হাতি চলেছে দুলকি চালে। মাঝে-মাঝে হাতি দুটো থেমে পড়ে কোনও গাছের ডাল ভাঙছে। ঘোড়া এত ধীর গতিতে চলতে পারে না। কয়েকবার কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন খানিকটা, আবার ফিরে এলেন।

তারপর এক সময় ওদের কিছু না জানিয়ে ইচ্ছে করেই তিনি চলে গেলেন অন্য দিকে।

এবার বেশ জোরে যেতে লাগলেন তিনি। অনেক দিন পর ঘোড়া চালিয়ে তাঁর খুব আনন্দ হচ্ছে। বয়সটা যেন কমে গেছে হঠাৎ। ঘোড়ার পিঠে একা-একা কিছুক্ষণ ছুটলেই নিজেকে যেন একজন যোদ্ধা মনে হয়। আগেকার আমলের যোদ্ধা। মাথায় পাগড়ি আর কোমরে তলোয়ার থাকলে মানায়।

প্রথম রাত্তিরে যেখানে গিয়েছিলেন কাকাবাবু, সেই জলাশয়টা খুঁজতে লাগলেন। খুব অসুবিধে হল না, মাঝে-মাঝে জিপ গাড়িটার চাকার দাগ চোখে পড়ছে। কোথাও-কোথাও গাছের ডাল কেটে জিপটাকে এগোতে হয়েছিল, সেই সব ডাল পড়ে আছে মাটিতে। এইসব চিহ্ন অনুসরণ করতে-করতে ঝিলটার কাছে পৌঁছে গেলেন কাকাবাবু।

ক্রাচ দুটো আনেননি, তাই ঘোড়া থেকে নামলেন না।

সেই রাত্তিরে এই জায়গাটা কত রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল, এখন সকালের আলোয় আর সে রকম কিছু মনে হয় না। ঝিলটার জল বেশ কমে গেছে, মাঝখানে ফুটে আছে লাল শালুক। একঝাঁক বালিহাঁস জলে ভাসছিল, ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়েই সবাই মিলে ঝটপটিয়ে উড়ে গেল।

জলের ধারে-ধারে নরম মাটিতে অনেক রকম জন্তুর পায়ের দাগ।

কাকাবাবু যে-জায়গাটায় পড়ে গিয়েছিলেন সে-জায়গাটাও খুঁজে পেলেন। সেখানকার মাটি ছেয়ে আছে কাঁটাঝোপে, বেশ বড়-বড় কাঁটা। ভাগ্যিস, চোখে বিঁধে যায়নি। সেই কাঁটাঝোপে আবার ছোট্ট-ছোট্ট হলুদ ফুল ফুটেছে।

ঘোড়াটা নিয়ে কাকাবাবু ঘুরতে লাগলেন ঝিলটার চারপাশে। দিনের বেলা জন্তু-জানোয়াররা জল খেতে আসে না। সারাদিন কি ওদের তেষ্টা পায় না?

অনেকটা ঘোরার পর কাকাবাবু এক জায়গায় একটা কাচের বোতল দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। এত দূরে টুরিস্টদের আসতে দেওয়া হয় না। চোরাশিকারিরাই তা হলে এই বোতলটা ফেলে গেছে। কাছেই একটা পাথরের দেওয়ালের মতন। কোনও এক সময় কেউ এখানে একটা ঘর বানিয়েছিল মনে হয়, এখন এই একটা দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

সেই দেওয়ালের পেছন দিকটায় গিয়ে কাকাবাবু দেখলেন, সেখানে দু-একটা পাউরুটির টুকরো, মুরগির মাংসের হাড়, ছেঁড়া খবরের কাগজ পড়ে আছে। চোরাশিকারিরা এখানে অনেকক্ষণ সময় কাটায় বোঝা যাচ্ছে। এখানে বসে খাওয়াদাওয়া করে। দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়েও থাকা যায়।

আবার ঝিলের দিকে এসে কাকাবাবু দেখলেন, সেই কাঁটা ঝোপের জায়গাটা থেকে এই দেওয়ালটা খুব দূরে নয়। তিনি এখন উলটো দিক দিয়ে ঝিল ঘুরে এসেছেন। সেই রাত্রে এই দেওয়ালটার বেশ কাছে এসে পড়েছিলেন। সেইজন্যই চোরাশিকারিরা তাঁর দিকে গুলি ছুড়েছিল। তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, না ভয় দেখাতে চেয়েছিল শুধু ?

কাকাবাবুর ঘোড়াটা ঝিলের কাছে গিয়ে চকচক করে জল খেয়ে নিল খানিকটা। ঘোলাটে জল, ভেতরে আবার শ্যাওলা জমে আছে। কাকাবাবু ভাবলেন, এই নোংরা জল খেতে মানুষের ঘেন্না হয়, জন্তু-জানোয়াররা তো দিব্যি খেয়ে নেয়। তাদের অসুখও করে না।

হঠাৎ ঝিলের অন্য পারে গাছপালার মধ্যে যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কাকাবাবু তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে পিছিয়ে নিয়ে কয়েকটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। কারা যেন আসছে। একটু পরেই বোঝা গেল, মানুষ নয়, আসছে হাতির পাল। ঝোপঝাড় ভেদ করে বেরিয়ে এল তিনটে বড় হাতি আর একটা বাচ্চা। তারা হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল ঝিলে। এই শীতে জল খুবই ঠাণ্ডা, ওদের কি শীত করে না ?

বোঝা গেল, ওরা স্নান করতে এসেছে। শুঁড় দিয়ে জল তুলে ফোয়ারার মতন ছিটিয়ে দিচ্ছে এক জন আর-এক জনের গায়ে। কাকাবাবু এ রকম দৃশ্য আগে দেখেননি। বাচ্চাটাকে নিয়ে খেলছে তিনটে বড় হাতি।

অন্য জন্তু-জানোয়ার দিনের বেলা আড়াল ছেড়ে বেরোতে ভয় পায়, কিন্তু হাতির কোনও ভয়ডর নেই। বাঘও সব সময় আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে। হাতি কাউকে গ্রাহ্য করে না।

কিছুক্ষণ হাতিদের জলকেলি দেখার পর কাকাবাবু আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

মিহিমুখে সন্তুরা তখনও ফিরে আসেনি। রাধেশ্যামকে ঘোড়াটা ফেরত দিয়ে কাকাবাবু তার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। রাধেশ্যাম তার এই ঘোড়াটার জন্য খুব গর্বিত। এর নাম রেখেছে সে রণজিৎ। এ ঘোড়া যে-কোনও লোককে তার পিঠে সওয়ার হতে দেয় না, ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলে দেয়। কাকাবাবুকে রণজিতের নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে।

কাকাবাবু রাধেশ্যামকে কিছু টাকা দিতে চাইলেন, সে কিছুতেই নিল না। সে বলল যে, কাকাবাবু ইচ্ছে হলে আবার রণজিৎকে নিতে পারেন যে-কোনও দিন।

সন্তু আর জোজো ফিরে এল তর্ক করতে-করতে।

সন্তু দেখতে পেয়েছে গোটা পাঁচেক গণ্ডার, একপাল বুনো শুয়োর, শম্বর আর বুনো মোষ। হরিণ তো অনেক।

জোজো বলল, সে আরও বেশি দেখেছে। সে ওগুলো ছাড়াও দেখেছে বাঘ

আর পাইথন।

সন্তু বলল, "মোটেই তুই বাঘ দেখিসনি। ওটা একটা হলদে মতন একটা ঝোপ।"

জোজো বলল, "আমি বাঘের মাথাটা দেখতে পেয়েছি, স্যাট করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।"

সন্তু বলল, "তোর ক্যামেরায় ছবি তুললি না কেন?"

জোজো বলল, "ওরকম বাঘের ছবি আমাদের বাড়িতে কত আছে!"

সন্তু বলল, "তুই যেটা পাইথন বললি, সেটা একটা গাছের ভাঙা ডাল।"

জোজো বলল, "আমি বলছি, পাইথনটা চোখ পিটপিট করছিল।"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "যাক, মোট কথা, তোদের সফর খুব সাকসেসফুল। অনেক কিছু দেখেছিস। সবচেয়ে কোন্‌টা ভাল লাগল?"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "পাইথন। সন্তু ওটা দেখেনি!"

সন্তু একটু ভেবে বলল, "সবই ভাল লেগেছে। তবে সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে ময়ূর। আমি আগে কখনও ময়ূরকে উড়তে দেখিনি। অতবড় লেজ নিয়ে উড়ে যায়, বেশ উঁচু গাছে বসে। রোদ্দুরে ওদের গায়ের রং ঝিলমিল করছিল।"

দুপুরবেলা বাংলোতে ফিরে খাওয়াদাওয়া করেই ঘুম। আগের রাতে ভাল করে ঘুমই হয়নি। এখন সেটা পুষিয়ে নিতে হবে।

কাকাবাবু অবশ্য ঘুমোলেন না। দুপুরে তাঁর কিছুতেই ঘুম আসে না। তিনি বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে রইলেন পা ছড়িয়ে। গায়ে রোদ লাগছে, তাতেও বেশ আরাম!

বিকেল হতেই কাকাবাবু ছেলে দুটিকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, "চলো, চলো, এখন বেরুতে হবে। বেড়াতে এসে শুধু-শুধু ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয়!"

টেলিফোন করতেই এ-বেলা স্টেশান ওয়াগনটা নিয়ে হাজির হল তপন। কাকাবাবু বললেন, "চলো, ভালুকপং ঘুরে আসি।"

তপন বলল, "স্যার, ওদিকে তো যাওয়া যাবে না। ওদিকটা অরুণাচলে পড়ে যাচ্ছে। অসম ছেড়ে অরুণাচলে ঢুকতে হলে পারমিট লাগে। অবশ্য কালকেই আপনাদের জন্য পারমিট আনিয়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "অরুণাচলের ভেতরে ঢুকব না। ভালুকপং-এর নদীর ধার পর্যন্ত তো যাওয়া যায়। সেই জায়গাটাও খুব সুন্দর।"

সন্তু বলল, "ভালুকপং! ভালুকপং! নামটা বেশ মজার তো!"

কাকাবাবু বললেন, "ওখানকার নদীর নামটাও খুব সুন্দর, জিয়াভরলি। তার মানে হচ্ছে জীবন্ত নদী।"

তেজপুর থেকে ভালুকপং প্রায় ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূরে। পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল।

নদীর ধারে পর্যটকদের থাকবার জন্য একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। পেছন দিকে জঙ্গল। সব মিলিয়ে বেশ ছবির মতন।

গাড়ি থেকে নেমে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তপন বলল, "অন্ধকার হয়ে গেছে, তাই নদীর জলের রং বোঝা যাচ্ছে না। দিনের বেলায় এ-নদীর জল সমুদ্রের মতন, নীল রঙের বলে মনে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ স্রোত আছে। সেই শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেইজন্য রাত্তিরবেলাতেও নদীটাকে জীবন্ত মনে হয়।"

সন্তু বলল, "এই নদীতে সাঁতার কাটা যায় ?"

তপন বলল, "খুব বিপজ্জনক। স্রোতে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এইসব পাহাড়ি নদীর কখন যে জল বাড়ে, কিছু বলা যায় না।"

জোজো বলল, "তেজপুরের বাংলো থেকে এ-জায়গার বাংলোটা অনেক ভাল। আমরা এখানেই থাকতে পারি না ?"

তপন বলল, "হ্যাঁ, ব্যবস্থা করা যায়। ভাগ্যে থাকলে বাংলোতে বসে-বসেই দেখা যায় হাতির পাল নদীতে জল খেতে আসছে।"

হঠাৎ নদীর জলে দারুণ জোর একটা শব্দ হল। এ-পার থেকে কে যেন জলে লাফিয়ে পড়েছে। ওরা দৌড়ে গেল সেই দিকটায়। আবছা আলোয় দেখা গেল, স্রোতের মধ্যে ঝপাঝপ শব্দ হচ্ছে, আর ঘোড়াসুদ্ধু একজন মানুষ উঠছে আর নামছে। মানুষটি নিশ্চয়ই হঠাৎ পড়ে যায়নি, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে না। সে ঘোড়াসুদ্ধ নদী পার হতে চাইছে।

সন্তু বলল, "বাবা, লোকটার তো দারুণ সাহস !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটা কে ? চেনো নাকি, তপন ?"

তপন বলল, "নাঃ ! ঠিকমতন তো দেখতেও পাচ্ছি না !"

কাকাবাবু বললেন, "টিকেন্দ্রজিৎ নাকি ?"

তপন বলল, "হতেও পারে। একমাত্র তারই এমন সাহস হতে পারে। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ এখানে কেন আসবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "যদি আমাদের ফলো করে আসে, তা হলে এরকম অকারণ বীরত্ব দেখাবারই বা দরকার কী ? অন্য কেউ হবে।"

ওরা সবাই একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সেই স্রোতের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে অশ্বারোহীটি একসময় পৌঁছে গেল নদীর ওপারে। সেখানে একটুও অপেক্ষা করল না, ঘোড়া চালিয়ে দিল তীরবেগে।

কাকাবাবু বললেন, "চলো, এবার ফেরা যাক। কাল আমরা ওরাং জঙ্গল দেখতে যাব।"

গাড়িতে ওঠার পর কাকাবাবু বললেন, "এখানে যেমন জিয়াভরলি নদী, তেমনই ওরাং-এর একটা নদীর নাম ধানসিঁড়ি। সন্তু, এই নদীটার নাম কেন বিখ্যাত বলতে পারিস ?"

জোজো বলল, "আমি পারি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? রবীন্দ্রনাথের সে লাইনটা কী শুনি ?"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল :

সন্ধ্যা নামে ধীরে ধীরে
ধানসিঁড়ি নদীতীরে
পাখিগুলি ডানা ঝাপটায় !

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ বাঃ ! তোমার তো বেশ মুখস্থ থাকে। তবে রবীন্দ্রনাথ যদি এরকম লাইন লিখে থাকেন, সেটা গবেষকদের কাছে একটা নতুন খবর হবে !"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, জোজো ওটা এইমাত্র বানাল, তুমি বুঝতে পারলে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলেও তো বেশ ভালই বানিয়েছে ! তুই এ রকম পারিস ?"

সন্তু বলল, "আমি কবিতা বানাতে পারি না। কিন্তু আমি জানি, এই নদীর নাম আছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। কিন্তু চন্দ্রবিন্দু নেই, ধানসিড়ি।"

আবার আসিব ফিরে
ধানসিড়িটির তীরে
এই বাংলায়।

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর কল্পনাশক্তি আছে বল ? কল্পনাশক্তি না থাকলে কবি হওয়া যায় না !"

সন্তু বলল, "ওর সবটাই কল্পনাশক্তি !"

তপন বলল, "আমাদের পেছন পেছন কেউ ঘোড়ায় চেপে আসছে।"

সবাই মুখ ফেরাল। আকাশে সামান্য জ্যোৎস্না, সেই অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল খুব জোরে কেউ একজন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, কপাকপ শব্দ হচ্ছে।

একটু পরেই সেই ঘোড়সওয়ার এসে গেল গাড়ির পাশাপাশি। কালো রঙের ঘোড়া, কালো রঙের পোশাক-পরা সওয়ার, মুখ না দেখতে পেলেও বোঝা যায় যে, সে টিকেন্দ্রজিৎ !

যদি সে হঠাৎ গুলি চালায়, সেইজন্য কাকাবাবু সবাইকে বললেন, "মাথা নিচু করো, শুয়ে পড়ো !"

টিকেন্দ্রজিৎ কিন্তু গুলিটুলি চালাল না, গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই যেন তার উদ্দেশ্য। গাড়ির পাশে-পাশে সমান গতিতে ছুটতে লাগল সে।

তপন বলল, "ঘোড়া ছুটিয়ে গাড়ির সঙ্গে পারবে ? দেখাচ্ছি মজা !"

তপন আরও গতি বাড়াবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, "থামো, থামো, ওকে দাঁড় করাও। আমি টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। ও কী চায়, তা জানা দরকার।"

তিনি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, "থামুন, থামুন, আমরাও থামছি !"

তপন গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। টিকেন্দ্রজিৎ কাকাবাবুর কথা গ্রাহ্যই করল না। একবার মাত্র মুখ ফিরিয়ে, সমান বেগে ছুটে গেল ধুলো উড়িয়ে। একটু পরে আর তাকে দেখা গেল না !

কাকাবাবু বললেন, "আশ্চর্য ব্যাপার তো ! লোকটা আমাদের আশেপাশে ঘুরছে। অথচ কথা বলতে চায় না !"

জোজো বলল, "রহস্যময় কালো অশ্বারোহী !"

সন্তু বলল, "তুই এই নামে একটা গল্প লিখে ফেল জোজো।"

বাংলোয় ফিরতে-ফিরতে রাত ন'টা বেজে গেল।

বারান্দায় বসে আছেন দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর আর রাজ সিং। দু'জনেই উঠে দাঁড়ালেন ওদের দেখে।

কাকাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার, মিস্টার বড়ঠাকুর ? আপনি গুয়াহাটিতে ফিরে যাননি ?"

বড়ঠাকুর বললেন, "কাল চলে গিয়েছিলাম। আজই ফিরতে হল একটা জরুরি খবর পেয়ে। মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি আমাকে আসল কথাটাই বলেননি ?"

কাকাবাবু দেখলেন, বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে আছে এই বাংলোর কেয়ারটেকার মণ্টা সিং, পেছনের খাবারের ঘরে বসে একজন একটা বেতের চেয়ার সারাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, "এখানে নয়। আমার ঘরে চলুন, কথা হবে।"

॥ ৫ ॥

বাংলোর দু'খানা ঘরের মধ্যে কাকাবাবুর ঘরটাই বেশি বড়। এক দিকে খাট ও লেখাপড়ার জন্য টেবিল-চেয়ার, অন্য দিকে কয়েকটি সোফা পাতা রয়েছে। খাটের দু' পাশে বড় দুটি বাতিদান।

কাকাবাবুর সঙ্গে সবাই চলে এল এ-ঘরে।

দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর বললেন, "অন্যরা পাশের ঘরে গল্প করুক বরং, আমি আর রাজ সিং আপনার সঙ্গে আগে জরুরি কথাগুলি সেরে নিই।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু আর জোজো থাকতে পারে। ওদের বাদ দিয়ে তো আমার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।"

তপন নিজে থেকেই বলল, "স্যার, আমি এখন বাড়ি যেতে পারি ? আমার একটু কাজ আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, এখন যাও। পরে তোমাকে কাজে লাগবে। তুমি মণ্টা সিং-কে বলে যাও, আমাদের কয়েক কাপ চা দিয়ে যেতে।"

তপন বেরিয়ে যাওয়ার পর দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিলেন। তারপর সোফায় বসে বললেন, "পশ্চিমবাংলার চিফ কনজারভেটর ডক্টর চক্রবর্তী আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, আপনি আপনার ভাইপোদের নিয়ে অসমে বেড়াতে আসবেন, আমরা যেন সব ব্যবস্থা করে দিই। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল। আপনার মতন মানুষ কি শুধু বেড়াতেই আসবেন, অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "ওই যে আপনি বলেছিলেন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আসলে আমার এখন অসমে আসবারই কথা ছিল না, যাব ঠিক করেছিলাম গোয়ায়। ওই চক্রবর্তীরাই এখানে জোর করে পাঠাল।"

বড়ঠাকুর বললেন, "চক্রবর্তীরাও পাঠায়নি, আপনাকে পাঠাবার নির্দেশ ছিল দিল্লি থেকে। কাল গুয়াহাটি গিয়ে সব খবর পেলাম, দিল্লি থেকে আমাদের অনেক কিছু জানানো হয়েছে।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "গণ্ডার !"

জোজো বলল, "আমি কাল পাঁচটা গণ্ডার দেখেছি !"

সন্তু জোজোর উরুতে চিমটি কেটে বলল, "চুপ কর না। নিশ্চয়ই শুধু দেখার কথা হচ্ছে না !"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু গণ্ডার নয়। আসল হচ্ছে গণ্ডারের শিং !"

জোজো বলল, "গণ্ডারের আবার শিং থাকে নাকি ? গোরু-মোষের শিং থাকে মাথার দু'পাশে। আমি তো দেখলাম, গণ্ডারের নাকের ওপর উঁচুমতন কী যেন একটা !"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো ঠিকই বলেছে। ইংরিজিতে বলে হর্ন, তাই আমরাও বলি শিং। আগে বাংলায় বলত খড়্গ। কিংবা খাঁড়া। গণ্ডারের নাকের ওপর খাঁড়া থাকে।"

সন্তু বলল, "আমি জানি, আসলে ওটা শিং বা খাঁড়া কিছুই নয়। গণ্ডার ওটা দিয়ে কাউকে গুঁতোতেও পারে না। ওটার মধ্যে শক্ত হাড়-টাড় নেই, লোমের মতন জিনিস জট পাকিয়ে-পাকিয়ে ওরকম দেখতে হয়ে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "হাড় নেই বটে, ওটা দিয়ে গুঁতোনো যায় না তাও ঠিক, কিন্তু ওই লোমের মতন জিনিসটাই খানিকটা শক্ত হয়ে যায়, নাকের ওপর থেকে কেটে নেওয়া যায়।"

বড়ঠাকুর বললেন, "ওই শিং বা খাঁড়ারই এক-একটার দাম সাত থেকে দশ লাখ টাকা। হাতির দাঁতের চেয়েও বেশি দাম !"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কেন, কেন ? অত দাম কেন ? হাতির দাঁত দিয়ে অনেক কিছু বানানো যায়, গণ্ডারের শিং দিয়ে কী হয় ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "কিছুই হয় না !"

জোজো বলল, "কিছুই হয় না, তবু অত দাম ? কারা কেনে ?"

কাকাবাবু বললেন, "বোকা লোকেরা কেনে ! অবশ্য সেই বোকা লোকদের অনেক টাকা থাকা চাই ! যারা হঠাৎ বড়লোক হয়, তাদের মধ্যে এ রকম বেশ কিছু বোকা লোক থাকে। এই বোকা বড়লোকগুলো যখন বুড়ো হয়, তখন খুব ভয় পেয়ে যায়। তারা ভাবে, এত টাকাপয়সা, এত লোকজন, এসব ছেড়ে হঠাৎ একদিন মরে যেতে হবে ? তখন তারা বয়স আটকাবার, গায়ের জোর বাড়াবার নানারকম ওষুধ খোঁজে। কেউ একজন এক সময় রটিয়ে দিয়েছিল যে, গণ্ডারের শিং গুঁড়ো করে, বেটে দুধের সঙ্গে খেলে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়। যে খাবে, সে আর বুড়ো হবে না ! সেই থেকে গণ্ডার মেরে-মেরে তাদের শিংগুলো গোপনে বিক্রি হয় !"

সন্তু বলল, "আসলে নিশ্চয়ই গণ্ডারের শিং খেলে কোনও কাজ হয় না ?"

কাকাবাবু বললেন, "সব মানুষই একসময় বুড়ো হয়, তা আটকাবার কোনও ওষুধ এ-পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি। গণ্ডারের শিং বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, তাতে ও রকম কোনও গুণই নেই।"

সন্তু বলল, "তা হলে শুধু-শুধু ওই জিনিসটা কারা কেনে অত টাকা দিয়ে ?"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে কারা এখন হঠাৎ বড়লোক ? আরব দেশের মরুভূমিতে পেট্রোল আবিষ্কারের পর সেখানকার অনেক লোক দারুণ ধনী হয়ে গেছে। এককালে যারা ছিল বেদুইন, তারা এখন কোটি-কোটি টাকার মালিক। অত টাকা নিয়ে কী করবে, ভেবেই পায় না ! আজেবাজে ভাবে খরচ করে। দশ লাখ টাকা দিয়ে একটা গণ্ডারের শিং কেনা তাদের পক্ষে কিছুই না।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "দুধের সঙ্গে গণ্ডারের শিং বাটা, কেমন খেতে লাগে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো খেয়ে দেখিনি ! কেউ দিলেও আমি খাব না ! তবে, একবার প্লেনে কায়রো যাওয়ার সময় একজন আরব শেখের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথায়-কথায় সে বলল, ইন্ডিয়ার গণ্ডারের শিং খুব ভাল জিনিস, একখানা খাওয়ার পরেই সে বুড়ো বয়েসে আর-একটা বিয়ে করেছে ! সে বলেছিল, জিনিসটা ওরকম বিচ্ছিরি দেখতে বটে, কিন্তু বেটে দুধের সঙ্গে মেশালে বেশ স্বাদ হয়। ঝাঁঝালো স্বাদ, অনেকটা আদার মতন।"

বড়ঠাকুর বললেন, "দিল্লির গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেয়েছে, এ-মাসে বোম্বাইতে চারজন আরব ব্যবসায়ী এসে পৌঁছেছে, তারা অন্তত একশোটা

গণ্ডারের শিং কিনবে। সুতরাং এখন চোরাশিকারিরা প্রচুর গণ্ডার মারবে।”

জোজো বলল, “গোয়েন্দারা যখন টের পেয়েই গেছে, তখন ওই আরব ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করছে না কেন?”

বড়ঠাকুর বললেন, “আগে থেকে কি গ্রেফতার করা যায়? বেআইনি জিনিস তাদের কাছে পাওয়া গেলে তবে তো ধরা হবে? তার আগে নিরীহ গণ্ডারগুলো শুধু-শুধু মারা পড়বে।”

কাকাবাবু বললেন, “এই তেজপুরের দিকটাতেই গণ্ডারের শিঙের চোরাকারবারের বড় বাজার। এখান থেকেই গণ্ডারের শিং বোম্বাইয়ের দিকে যায়। সেইজন্যই আমাকে তেজপুরে পাঠানো হয়েছে। কেউ যাতে কিছু বুঝতে না পারে, সেইজন্য আমি বেড়াবার ছুতো করে এসেছি।”

বড়ঠাকুর বললেন, “আপনি কি কিছু পরিকল্পনা করেছেন? সেইমতো আমাদের সব ব্যবস্থা নিতে হবে। দেরি করলে চলবে না। পাঁচ-ছ’ বছর আগে এখানে দারুণ বন্যা হয়েছিল, তখন প্রায় আশি-নব্বইটা গণ্ডার মারা যায়। এবারেও যদি শ’খানেক গণ্ডার ধ্বংস হয়, তা হলে ওদের সংখ্যা খুবই কমে যাবে।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, পরিকল্পনা একটা করেছি বটে!”

জোজো বাধা দিয়ে বলল, “কাকাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু মনে করবেন না?”

কাকাবাবু বললেন, “না, না, বলে ফেলো, বলে ফেলো। পেটের মধ্যে কথা আটকে রাখতে নেই!”

জোজো বলল, “চোরাশিকারিরা গণ্ডার মারে। পুলিশ কিংবা মিলিটারি দিয়েই তো তাদের ধরা উচিত। দিল্লি থেকে আপনাকে পাঠাল কেন? আপনি, মানে, আপনি জঙ্গলের মধ্যে দৌড়তে পারবেন না, তাড়াতাড়ি গাছে চাপতে পারবেন না, অনেকে মিলে আক্রমণ করলে আপনি একাই বা কী করবেন?”

কাকাবাবু মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, “তা ঠিক, তা ঠিক। আমি খোঁড়া লোক, আমার অনেক অসুবিধে। দিল্লির কর্তারা আমার ওপর বেশি-বেশি বিশ্বাস করে। হয়তো আমি কিছুই পারব না!”

বড়ঠাকুর এবার কাকাবাবুকে মিস্টার রায়চৌধুরী না বলে কাকাবাবু বলেই সম্বোধন করে বললেন, “আমি বলছি কারণটা। শোনো জোজো, পুলিশ কিংবা মিলিটারি দিয়েও এই চোরাশিকারিদের দমন করা যায় না। এত বড় জঙ্গল, রাতের অন্ধকারে কোথায় ওরা লুকিয়ে থাকে, কখন চট করে একটা গণ্ডার মেরে পালায়, তা ধরা শক্ত। তা ছাড়া, পুলিশ বা বনবিভাগ থেকে অভিযান চালাবার আগেই কী করে যেন ওরা খবর পেয়ে যায়।”

কাকাবাবু বললেন, “পুলিশ আর বনবিভাগে যে ওদের নিজস্ব লোক থাকে, সেটা স্বীকার করুন না। অনেক টাকার কারবার, তাই ওরা টাকা দিয়ে

অনেককে হাত করে রাখে। সেইজন্যই ওদের ধরা যায় না।”

বড়ঠাকুর বললেন, “কে যে ওদের খবর দেয়, তাও বোঝা যায় না। সুতরাং ওদের দমন করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। কাকাবাবু একবার আফ্রিকার কেনিয়াতে একটা বিরাট বন্যজন্তু-চোরাশিকারির দলকে শায়েস্তা করেছিলেন, দিল্লির গোয়েন্দারা সে-খবর জানে। সেইজন্যই তারা কাকাবাবুর ওপর ভরসা করেছে।”

কাকাবাবু বললেন, “সেবারে কেনিয়ায় ওই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলুম পাকেচক্রে। সন্তু, তোর মনে আছে?”

সন্তু বলল, “হ্যাঁ, সেবারে আমরা সেরিংগেটি ফরেস্টের মধ্যে একটা তাঁবুর হোটেলে ছিলাম।”

কাকাবাবু বললেন, “এবারেও যে আমি কিছু করতে পারব, তার ঠিক নেই। তবু চেষ্টা তো করতে হবে। আচ্ছা, হিম্মত রাও লোকটা কীরকম? ওর সঙ্গে চোরাশিকারিদের যোগ আছে?”

বড়ঠাকুর বললেন, “থাকতেও পারে। ওর অনেক টাকা, অনেক লোকবল। কিন্তু ওকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। একবার ওর বাড়ি সার্চ করেও কিছু পাওয়া যায়নি।”

কাকাবাবু বললেন, “অতখানি ছড়ানো বাড়ি, দেখেই বুঝেছি, ওখান থেকে কিছু খুঁজে বের করা শক্ত। ওর ওপর নজর রাখতে হবে। আর ওই কুমার টিকেন্দ্রজিৎ, সে আসলে কী করে?”

বড়ঠাকুর বললেন, “টিকেন্দ্রজিৎকে দেখেছেন? রহস্যময় মানুষ। ও যে কী করে, তা বলা শক্ত। ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। কখনও এখানে, কখনও মণিপুরে, কখনও অরুণাচলে চলে যায়। আপনি তো জানেন, তিনটে আলাদা রাজ্য, পুলিশ আলাদা, বনবিভাগ আলাদা। ওর পেছনে তাড়া করলেই ও অন্য রাজ্যে ঢুকে যায়, আমরা সেখানে যেতে পারি না। মণিপুরে ওর একটা বাড়ি আছে, সেখানকার পুলিশ জানিয়েছে যে, টিকেন্দ্রজিতের নামে কোনও অভিযোগ নেই। একবার টিকেন্দ্রজিৎ এখানে হরিণ মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, আদালতে জরিমানা দিয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, ও অন্য বড় জানোয়ারও মারে। শুনেছি, ওর হাতের টিপ সাঙ্ঘাতিক।”

কাকাবাবু বললেন, “লোকটি ইন্টারেস্টিং। বারবার দেখা দিচ্ছে কিন্তু আলাপ করছে না। ওর সঙ্গে একবার কথা বলার ইচ্ছে আছে। এবার আমার পরিকল্পনাটা শুনবেন?”

বড়ঠাকুর ব্যগ্রভাবে বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন, বলুন।”

কাকাবাবু বললেন, “কাল থেকে আগামী সাতদিন আপনারা পুলিশের সাহায্য নিন। আপনাদের ফরেস্ট গার্ড ও পুলিশ মিলে সমস্ত জঙ্গলটা চষে ফেলুক, রাত্তিরবেলাও টহল দিক। টানা সাত দিন, ব্যস, তারপর আর কিছু দরকার

নেই।"

বড়ঠাকুর হতাশভাবে বললেন, "ব্যস, শুধু এই ? এতে কিছু কাজ হবে মনে করেন ?"

তিনি রাজ সিংয়ের দিকে তাকালেন। রাজ সিং এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। এবার দৃঢ়ভাবে বললেন, "আমার মনে হয়, এতে কিছুই কাজ হবে না। একজনও চোরাশিকারি ধরা পড়বে না।"

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন, "আমিও তো জানি, এতে কিছু কাজ হবে না। এটা ওদের চোখে ধুলো দেওয়া। এই সাত দিন শিকার তো অন্তত বন্ধ থাকবে ! চোরাশিকারিরা জানে, পুলিশ-ফরেস্ট গার্ডরা যদি একটানা সাতদিন ধরে এত উৎসাহ নিয়ে বন পাহারা দেয়, তা হলে সাতদিন পরে তাদের উৎসাহ হঠাৎ আবার থেমে যাবে। তখন জঙ্গল একেবারে নিরিবিলি। তখন চোরাশিকারিরা কাজে নেমে পড়বে, সেই অবস্থায় তাদের ধরতে হবে।"

রাজ সিং বললেন, "কে ধরবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা কয়েকজন যাব শুধু।"

বড়ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "কী করে বোঝা যাবে, তারা কোথায় অপারেট করছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "বোঝার উপায় আছে। এই সাতদিনের মধ্যে আপনাদের আর-একটা কাজও করতে হবে। এই দেখুন !"

কোটের পকেট থেকে কাকাবাবু ফস করে একটা ম্যাপ বার করলেন। সেটা কোলের ওপর বিছিয়ে ধরে বললেন, "কাজিরাঙা ফরেস্টের এই ম্যাপটা দেখে-দেখে আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। কোর এরিয়ার মধ্যে, যেখানে গণ্ডারের সংখ্যা বেশি, সেখানে মোট পাঁচটি জলাশয় বা ঝিল আছে। একটা খুব বড় ঝিল, আর চারটি ছোট। এই যে সাতদিন আপনারা জঙ্গলে পাহারা দেবেন, তার মধ্যে গোপনে আর-একটা কাজ করতে হবে। এই চারটে ছোট ঝিল থেকে পাম্প করে সব জল তুলে নিতে হবে। একেবারে শুকনো করে ফেলবেন, কাদা-কাদা অবস্থাটা গণ্ডাররা ভালবাসে। সেইজন্য একেবারে শুকনো খটখটে করে ফেলা চাই। তা হলে একটা ঝিলে শুধু জল থাকবে, জন্তু-জানোয়ারেরা সেখানেই যাবে, চোরাশিকারিরাও সেখানে গিয়ে জমায়েত হবে। তখন শুরু হবে আমাদের কাজ।"

বড়ঠাকুর বললেন, "তবু যেন এর মধ্যে একটা আন্দাজের ব্যাপার থেকে যাচ্ছে। চোরাশিকারিরা ঠিক কবে, কখন জমায়েত হবে, তা আমরা জানব কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "খানিকটা আন্দাজের ব্যাপার তো থাকবেই। এ তো অঙ্ক নয়। তবে, আন্দাজটাও যুক্তিহীন নয়। গণ্ডার শিকার কখন হয় নিশ্চয়ই জানেন। জ্যোৎস্না রাতে। কেন জানেন ? আপনারা হয়তো জানেন, সন্তুদের

বুঝিয়ে দিচ্ছি। গণ্ডার শিকার করা তো সহজ ব্যাপার নয়। অত শক্ত, পুরু চামড়া একেবারে লোহার বর্মের মতন, এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে গণ্ডার মারা যায় না। আহত গণ্ডার অতি সাঙ্ঘাতিক প্রাণী, সারা বন একেবারে তছনছ করে দেবে। সেইজন্য ভাল করে দেখেশুনে টিপ করে গুলি চালাতে হয়। অন্ধকার রাতে তা সম্ভব নয়। গণ্ডারের শরীরের দুটি মাত্র জায়গা নরম। এক, তার খাঁড়ার ঠিক নীচে, নাকের কাছটায়। আর পেছন দিকে যখন ল্যাজ তোলে, সেখানে গুলি চালালে সঙ্গে-সঙ্গে গণ্ডার মরে যায়। সামনাসামনি এসে নাকের কাছে গুলি চালাবার সাহস ক'জনের আছে? তাই চোরাশিকারিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে, কখন গণ্ডার একবার লেজটা তুলবে।"

বড়ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, জোৎস্না রাতের ব্যাপারটা ঠিকই বলেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আর ঠিক ন'দিন পরেই পূর্ণিমা। সাত দিনের মধ্যে বনের মধ্যে পুলিশ আর গার্ডদের তাণ্ডব চলার পর থেমে গেলে, তারপর ওই জ্যোৎস্না রাতে চোরাশিকারিরা কাজে নেমে পড়বে, এরকম ধরে নেওয়া যায় না? এক দিন নাহয়, দু' দিন, তিন দিন আমাদের সেখানে গিয়ে বসে থাকতে হবে। মাচা বেঁধে রাখতে হবে গাছের ওপর।"

বড়ঠাকুর বললেন, "ঠিক আছে। আপনার কথামতন সব ব্যবস্থা হবে। আমি আর রাজ সিং রোজ সন্ধেবেলা এসে আপনাকে রিপোর্ট দিয়ে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, না, না, আমার সঙ্গে এর মধ্যে আর দেখাই হবে না। বেড়াতে এসে কেউ তেজপুরের মতন শহরে সাতদিন বসে থাকে? তা হলেই লোকে সন্দেহ করবে। আমরা তিনজন কাল বিকেলেই এখান থেকে চলে যাব শিলচর। অন্য জায়গায় বেড়াব। ফোনে যোগাযোগ রাখব আপনার সঙ্গে। আর পূর্ণিমার দিন দিনের বেলাই চলে যাব সরাসরি জঙ্গলে।"

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর উঠে পড়লেন বড়ঠাকুর আর রাজ সিং। কাকাবাবুদের খাবারের দেরি হয়ে গেছে অনেক। মণ্টা সিং খবর নিয়ে গেছে দু' বার।

ওঁদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে কাকাবাবু বললেন, "দেখবেন, সব ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে। আপনি নিজে জঙ্গলে গিয়ে রাত জাগতে রাজি আছেন তো?"

বড়ঠাকুর বললেন, "নিশ্চয়ই। রাজ সিংও থাকবেন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তপন রায় বর্মণ আর শচীন সইকিয়া, এদের বিশ্বাস করা যায়?"

বড়ঠাকুর বললেন, "এরা খুবই বিশ্বাসযোগ্য অফিসার। শচীন রাইফেল শুটিং খুব ভাল জানে। তপনও খুব কাজের লোক।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। আর কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। আপনারা এই চার জন আমার সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। মোট পাঁচ

জন।”

সন্তু বলল, “বাঃ, আমরা থাকব না? আমি আর জোজো? আমরা তো থাকবই।”

জোজো বলল, “তা হলে হল সাত জন। সপ্তরথী, কী বল সন্তু?”

বড়ঠাকুর ওদের দু’ জনের কাঁধ চাপড়ে দিলেন।

সন্তুর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কাকাবাবু আগে তাকেও কিছু বলেননি। শুধু এমনি বেড়ানোও ভাল, বেশ ভালই লেগেছে এই ক’ দিন। তবে এখন বেড়ানোর সঙ্গে একটা অ্যাডভেঞ্চার যুক্ত হল বলে তার আরও ভাল লাগছে।

॥ ৬ ॥

রাত্তিরবেলা ঘরে যে-কোনও শব্দ হলেই কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে তিনি বুঝতে পারলেন না শব্দটা কীসের।

তারপর আবার সামান্য ক্যাঁচ করে শব্দ হল। দরজাটা খুলে যাচ্ছে। চাবি দিয়ে কেউ দরজাটা খুলেছে।

বালিশের নীচে রিভলভার রাখা কাকাবাবুর বরাবরের অভ্যেস। সেটা বার করে কাকাবাবু উঠে বসলেন।

ঘর অন্ধকার, তবু বোঝা গেল একটি ছায়ামূর্তি পা টিপে-টিপে ঢুকছে ঘরে।

সে মাঝখানে আসবার পর কাকাবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, “মাথার ওপর হাতদুটো তুলে দাঁড়াও। একটু নড়বার চেষ্টা করলেই আমি গুলি করব।”

খুট করে তিনি বিছানার পাশে একটা আলো জ্বাললেন। এবং অবাক হয়ে দেখলেন, কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে মণ্টা সিং।

সে হাতজোড় করে বলল, “আপনি জেগে আছেন! আমায় মাপ করবেন স্যার, আপনার ঘুম ভাঙাতে চাইনি। খুব দরকারে পড়ে আসতে হল একটা জিনিস নিতে। আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, কিন্তু এ-বাংলো থেকে কারও কোনও জিনিস হারায় না। আমি ভেবেছিলাম স্যার, আপনার ঘুম না ভাঙিয়ে জিনিসটা নিয়ে যাব।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী জিনিস?”

মণ্টা সিং বললেন, “বালিশ। আপনার মাথার কাছে আলমারিতে স্যার একস্ট্রা বালিশ রাখা আছে। হঠাৎ দরকার পড়ল।”

কাকাবাবু বললেন, “এত রাতে হঠাৎ একস্ট্রা বলিশের দরকার পড়ল কেন?”

মণ্টা সিং বলল, “দু’ জন গেস্ট এসে একখানা ঘর চাইছে স্যার। পুলিশের দু’ জন অফিস্যার। তাদের তো থাকতে দিতেই হয়। ও-ঘরে একটা বালিশ কম আছে, একটা কম্বলও লাগবে, তাই ভাবলাম আপনাকে না বিরক্ত করে

কীভাবে নিয়ে যাই—"

কাকাবাবু দিনের বেলা ওই আলমারিটা খুলে দেখেছিলেন, সত্যি ওটার মধ্যে অনেক বালিশ আর কম্বল রাখা আছে। মণ্টা সিংয়ের কথাটা মিথ্যে নয়।

রিভলভারটা নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, নিয়ে যাও!"

মণ্টা সিং কাকাবাবুর খাটের পিছনে এসে আলমারি খুলে বালিশ বার করতে লাগল।

তারপর হঠাৎ সে ঘুরে গিয়ে, কাকাবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা রুমাল চেপে ধরল তাঁর নাকে।

মণ্টা সিং বেশ বলশালী লোক। কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে পারবে কেন? কাকাবাবু একটু পরেই এক ঝটকা দিয়ে তাকে ফেলে দিলেন মাটিতে।

তাকে ধমকে বললেন, "স্টুপিড, এত রাতে গুণ্ডামি করতে এসেছ? তোমার চাকরি থাকবে?"

মণ্টা সিং আবার লাফিয়ে এসে কাকাবাবুর মাথাটা চেপে ধরার চেষ্টা করল। কাকাবাবু ভাবলেন, এবার লোকটিকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তিনি লোহার মতন দু'হাতে মণ্টা সিংয়ের গলা টিপে ধরলেন।

ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে আরও দুটো লোক ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকাবাবুর ওপর। তারা কী একটা ভিজে-ভিজে ন্যাকড়া তাঁর নাকে ঠেসে দেওয়ার চেষ্টা করল।

কাকাবাবু এই তিনজনের সঙ্গে লড়তে গিয়েও টের পেলেন তাঁর হাতের জোর কমে আসছে, ঝিমঝিম করছে মাথা। পাশের ঘরেই সন্তু আর জোজো ঘুমোচ্ছে, ওদের জানানো দরকার।

তিনি ডাকতে গেলেন, গলা দিয়ে স্বর বেরোল না, চোখ অন্ধকার! এলিয়ে পড়লেন জ্ঞান হারিয়ে।

কাকাবাবুর যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। চোখ মেলার আগেই তিনি শুনতে পেলেন কিচির মিচির পাখির ডাক। প্রথমে তাঁর মনে হল, ডাকবাংলোর ঘরেই শুয়ে আছেন, সেখানেও বাগানে অনেক পাখি ডাকে, ভোরবেলা সেই ডাক শুনে তাঁর ঘুম ভাঙে।

চোখ মেলে কাকাবাবু দেখলেন, তাঁর মাথার ওপর মস্ত বড় একটা গাছ, তার ডালপালার ফাঁক দিয়ে একটু-একটু ভোরের আকাশ দেখা যাচ্ছে।

তারপর মাথাটা একটু উঁচু করে দেখলেন, একটু দূরে বসে আছে তিনটি লোক, মাঝখানে আগুন জ্বলছে, পিছন দিকে ঘন জঙ্গলে এখনও আলো ফোটেনি।

তখন তাঁর একটু-একটু করে সব মনে পড়ল। মাঝরাতে মণ্টা সিং ঢুকেছিল ঘরে, বিশ্বাসঘাতক মণ্টা সিং! বাংলোর কেয়ারটেকার হয়েও সে আচমকা তাঁকে আক্রমণ করেছিল, তারপর পিছন থেকে আরও কয়েকজন...। নাকে

ক্লোরোফর্ম ঠেসে তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, তারপর এই জঙ্গলে নিয়ে এসেছে... ।

কাকাবাবু মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলেন, কোথাও চোট লেগেছে কি না । না, রক্তটক্ত কিছু নেই, সারা গায়ে ব্যথাও নেই । রিভলভারটা রয়ে গেছে বালিশের নীচে, নাকি এরা চুরি করে নিয়েছে ?

তিনি দেখলেন, লম্বা কোটটা তাঁর গায়েই রয়েছে । এটা পরে তো তিনি ঘুমোতে যাননি, খুলে রেখেছিলেন । খুব শীত বলে এরা কোটটা তার গায়ে পরিয়ে এনেছে । কোটের পকেটে হাত দিয়ে তিনি তাঁর চশমাটা পেয়ে গেলেন ।

এবারে তিনি দেখলেন, সেই লোক তিনটি কাপে করে চা খাচ্ছে ।

প্রথমেই তাঁর মনে হল, এরা এই জঙ্গলে চায়ের কাপ আর চা-দুধ-চিনি কোথায় পেল ? সব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, না এখানেই কোথাও এসব লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে ? কাছাকাছি কুঁড়ে ঘরটরও কিছু দেখা যাচ্ছে না ।

ওদের একজন বলল, "জ্ঞান ফিরেছে দেখছি, চা খাবে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ক্রাচ দুটো কোথায় ?"

অন্য একজন বলল, "তা আমরা কী জানি ! কেন, ক্রাচ দিয়ে কী হবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ক্রাচ না হলে হাঁটতে পারি না । আমি এখন ডাকবাংলোয় ফিরে যাব । দাঁত না মেজে আমি খাই না কিছু ।"

লোক তিনটি হাসতে লাগল ।

এবার কাকাবাবু ওদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলেন । জলিল শেখ, সেই পাখি-চোর, যার সব পাখি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । অন্য দু' জনের চেহারা দুর্গাঠাকুরের অসুরের মতন ।

কাকাবাবু বললেন, "জলিল শেখ, তোমায় থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি বাঁচিয়ে দিলাম । তারপরেও তুমি এইসব অপকর্ম শুরু করেছ ?"

জলিল বেশ জোরে থুঃ শব্দ করে মাটিতে থুথু ফেলল । তারপর বলল, "তুমি আমার ভাত মারতে চেয়েছিলে । আমার রোজগার বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলে । তখনই আমি মনে-মনে বলেছিলাম, তোমাকে আবার বাগে পেলে দেখে নেব ।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, দেখলাম তো তোমার বেশ ভাল বাড়ি । পুকুর আছে, বাগান আছে, তুমি চাষবাস করলেই পারো ! তোমার মেয়ে ফিরোজা কেমন আছে ?"

অন্য একজন বলল, "এই জলিল, কথা বলিস না, কথা বলিস না । হুকুম নেই ।"

এই সময় জঙ্গলের মধ্যে কীসের যেন শব্দ শোনা গেল । গাছপালা ভেদ করে কেউ আসছে, খুব জোরে ।

জলিলরা একসঙ্গে ফিরে তাকাল। একজন হাতে তুলে নিল বন্দুক।

তারপরই শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। দেখা গেল একটা কালো রঙের ঘোড়া ছুটে আসছে, তার ওপর কালো পোশাক পরা একজন সওয়ার।

একেবারে কাছে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল টিকেন্দ্রজিৎ। তারপর সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতন লাফিয়ে নেমে পড়ল। তার কোমরে একটা চওড়া বেল্ট, এক পাশে রিভলভারের খাপ। হাতে চাবুক।

সে কাকাবাবুর সামনে এসে পা ফাঁক করে, কোমরে দু' হাত দিয়ে দাঁড়াল। তার পায়ে গাম বুট, মাথায় টুপি।

কাকাবাবু তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। টিকেন্দ্রজিতের চেহারাটা সত্যি সুন্দর। প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা, সারা শরীরে একটুও চর্বি নেই, সরু কোমর, চওড়া বুক, চওড়া কাঁধ। চোখ দুটো টানা-টানা, ধারালো নাক। একেবারে ইংরেজি সিনেমার নায়কের মতন। কাকাবাবুদের ছেলেবেলায় গ্যারি কুপার নামে একজন নায়ক ছিল, অনেকটা সেইরকম, যদিও টিকেন্দ্রজিতের গায়ের রং ফরসা নয়।

কাকাবাবু দু' হাত জোড় করে কপালের কাছে তুলে বললেন, "নমস্কার, আপনিই তো কুমার টিকেন্দ্রজিৎ ? আপনার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল।"

টিকেন্দ্রজিৎ কাকাবাবুর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোনও কথা বলল না।

কয়েক মুহূর্ত পরে জলিলদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "একে চা দিয়েছিস ?"

একজন বলল, "জিজ্ঞেস করেছিলাম, দাঁত না মেজে চা খায় না বলল।"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "একটা নিমডাল ভেঙে দে। দাঁতন করে নিক।"

নিজে সে এক কাপ চা নিয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে চলে গেল জঙ্গলের দিকে।

জলিল কাকাবাবুকে একটা নিমগাছের ডাল আর এক মগ জল এনে দিল। কাকাবাবু আর আপত্তি না জানিয়ে মুখ ধুয়ে নিলেন। ভোরবেলা তাঁর চা খাওয়ার অভ্যেস।

কাকাবাবুর চা খাওয়া শেষ হতেই ফিরে এল টিকেন্দ্রজিৎ। লোক তিনটিকে বলল, "এবার ওকে ওই শিমুলগাছটার সঙ্গে বাঁধ ভাল করে। নায়লনের দড়ি এনেছিস তো ?"

লোক তিনটি কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে আসতেই তিনি টিকেন্দ্রজিতকে বললেন, "আমাকে বাঁধবার দরকার কী ? এমনিই তো আমরা কথা বলতে পারি। খোঁড়া পা নিয়ে আমি তো দৌড়ে পালাতে পারব না !"

টিকেন্দ্রজিৎ কাকাবাবুর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে বলল, "তুমি পালাতে পারবে না জানি। পালাবার কোনও উপায় তোমার নেই। তবে, তুমি যদি বাধা

দেওয়ার চেষ্টা করো, তা হলে প্রথমেই ছুরি দিয়ে তোমার একটা কান কেটে নেওয়া হবে। এ পর্যন্ত তোমাকে কোনও আঘাত করা হয়নি।

ওরা এসে কাকাবাবুর দু' হাত ধরে টানতে লাগল। কাকাবাবু বুঝলেন, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে সত্যিই কোনও লাভ নেই।

ওরা একটা গাছের কাছে নিয়ে এসে কাকাবাবুর হাত দুটো পিছনে মুড়িয়ে বাঁধল, তারপর পা দুটোও বেঁধে দিল। কাকাবাবুর আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা রইল না।

টিকেন্দ্রজিৎ এবার গাছটা ঘুরে-ঘুরে কাকাবাবুর হাত ও পায়ের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখল। সন্তুষ্ট হওয়ার পর সে তার প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট বার করে ঢুকিয়ে দিল কাকাবাবুর কোটের পকেটে। কাকাবাবু এর মানে বুঝতে পারলেন না। চা খাওয়ার সময় বিস্কুট দিল না, এখন বিস্কুট দিয়ে কী হবে ? হাত বাঁধা, ইচ্ছে করলেও তো বিস্কুট খেতে পারবেন না।

টিকেন্দ্রজিৎ মুখের সামনে এসে বলল, "সেদিন আমি নিজে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম। আপনি আলাপ করেননি, আমাকে একবার বসতেও বলেননি। সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।"

কাকাবাবু আকাশ থেকে পড়ে বললেন, "সে কী ! আপনি ঝড়ের বেগে ঘোড়ায় চড়ে এলেন। হিম্মত রাওয়ের বাড়ি চায়ের নেমন্তন্নের কথা বললেন। আপনি কে, আপনার নাম কী, কোনও পরিচয়ই দেননি !"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "কুমার টিকেন্দ্রজিৎ কখনও নিজে থেকে পরিচয় দেয় না। তাকে চিনে নিতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি নতুন এসেছি, কী করে আপনাকে চিনব ?"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "কিন্তু আমাকে দেখে কি সাধারণ চাকরবাকর মনে হয় ? আমাকে একবার বসতেও বলেননি !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি এমন ছটফট করছিলেন, শুধু চায়ের নেমন্তন্নের কথা, যাই হোক, আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে অবশ্যই বসতে বলা উচিত ছিল।"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "এখন আর ওসব বললে কী হবে ? শুনুন, মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনাকে আমি ছেড়ে দেব। কেউ কিছু জানবার আগেই আপনাকে সসম্মানে বাংলোতে পৌঁছে দেব। সবাই ভাববে, আপনি মর্নিং ওয়াক করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ দুপুরের মধ্যেই ছেলে দুটিকে নিয়ে আপনাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। তিনটের সময় ফ্লাইট আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "হঠাৎ ফিরে যাব কেন ? আমরা বেড়াতে এসেছি !"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "আপনি বেড়াতে আসেননি। আপনি কে, কীজন্য এসেছেন, তা আমরা সব জানি। বড়ঠাকুর আর রাজ সিংয়ের সঙ্গে আপনি গোপন শলা-পরামর্শ করেছেন। ওরা যতই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করুক, গণ্ডার

আমরা মারবই ! বিদেশ থেকে ব্যবসাদাররা এসেছে, আপনারাও জানেন, আমরাও জানি, প্রায় দশ কোটি টাকার কারবার, এই সুযোগ কেন ছাড়ব ? আপনি আজই ফিরে যেতে রাজি আছেন ?”

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “কুমার টিকেন্দ্রজিৎ, আপনি যদি আমাকে চিনে থাকেন, তা হলে এটাও আপনার জানা উচিত যে, কারও হুকুমে আমি ভয় পেয়ে পালাই না।”

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, “প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা সবাই করে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য লোকে আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে, দেশ ছেড়ে চলে যায়, কত কী করে ! দশ কোটি টাকার কারবার, এবারে আমরা দু-চারটে মানুষ মারতেও দ্বিধা করব না। জেনে রাখবেন, কুমার টিকেন্দ্রজিৎকে বাধা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। হ্যাঁ, আপনি হঠাৎ ফিরে গেলে বড়ঠাকুররা কী ভাববে, তাই তো ? ডাকবাংলোয় ফিরে গিয়েই আপনি শুয়ে পড়বেন। যন্ত্রণায় ছটফট করার ভাব দেখাবেন। সবাইকে বললেন, আপনার বুকে খুব ব্যথা হচ্ছে। হার্ট অ্যাটাক। আপনার চিকিৎসার জন্যই তো ফিরে যাওয়ার দরকার। হার্ট অ্যাটাক নিয়ে তো আর আপনি জঙ্গলে পাহারা দিতে পারবেন না ! আপনি পশ্চিমবাংলার লোক, অসমের জঙ্গলে গণ্ডার মারা হচ্ছে কি না হচ্ছে, তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার কী দরকার ?”

কাকাবাবু মৃদু হেসে বললেন, “এখন অধিকাংশ জঙ্গলকেই বলে ন্যাশনাল ফরেস্ট। সংরক্ষিত জাতীয় অরণ্য। এর মধ্যে অসম, বাংলা, বিহারের তো কোনও ব্যাপার নেই। এই অরণ্যের প্রাণীরা আমাদের জাতীয় সম্পদ। এদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা আমাদের সবারই করা উচিত।”

টিকেন্দ্রজিৎ বিদ্রূপের সুরে বলল, “গণ্ডার একটা বিশ্রী প্রাণী। কুৎসিত দেখতে। সব সময় কাদায় গড়াগড়ি যায়। ওদের বাঁচিয়ে রাখার কী এমন দায় পড়েছে ? গণ্ডার মেরে যদি এত টাকা পাওয়া যায়, তা হলে মারব না কেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “এই রে, এটা আপনি কী বললেন কুমার ? দেখতে খারাপ বলেই মেরে ফেলতে হবে ? আপনার চেহারা সুন্দর, আপনার তুলনায় আমি দেখতে খারাপ, পৃথিবীতে আরও কত লোক আছে, যারা আপনার তুলনায় দেখতে খারাপ, তাদের সবাইকে আপনি মেরে ফেলবেন ? আর একটা কথা কী জানেন, আপনি বলছেন, গণ্ডাররা বিশ্রী দেখতে। গণ্ডাররা হয়তো আপনাকে, আমাকেও মনে করে বিশ্রী প্রাণী। ওদের মতন আমাদের মাথায় শিং বা খাঁড়া নেই। তা বলে গণ্ডাররা তো আমাদের মেরে ফেলতে চায় না। ওরা আপনমনে জঙ্গলে থাকে। আমরাও ওদের মারব না, ওরাও আমাদের মারবে না, এই তো সবচেয়ে ভাল।”

টিকেন্দ্রজিৎ একবার পেছন ফিরে নিজের লোকদের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে কর্কশ গলায় বলল, “তর্কের শেষ ! তোমাকে

বাঁচার সুযোগ দিয়েছিলাম, রাজা রায়চৌধুরী, তুমি তা নিলে না !”

কাকাবাবু বললেন, “খুব তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। শুধু-শুধু মরতে যাব কেন ?”

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, “এক্ষুনি এক কোপে তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দিতে পারি।”

কাকাবাবু বললেন, “দাও না দেখি ! তুমিই তো প্রথম নও, আমাকে এ রকম কথা আগেও অনেকে বলেছে। কিন্তু কেউ তো পারেনি এ-পর্যন্ত !”

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, “তুমি তো আগে টিকেন্দ্রজিৎকে দ্যাখোনি ? আমার মায়াদয়া নেই। গণ্ডার আমি মারব। গণ্ডার শিকার আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। এবার আমি মারবই, মারবই, মারবই ! অন্তত একশোটা গণ্ডার মারব ! তোমাকেও মারতে আমার হাত কাঁপবে না !”

এবার সে জলিলদের বলল, “তোরা চলে যা। তোদের আর দরকার নেই। এর ব্যবস্থা আমি করছি !”

ওরা তিনজন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। ওদের মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায় টিকেন্দ্রজিৎকে দারুণ ভয় পায়।

আগুন নিবে গেছে। আকাশ ভরা এখন সকালের আলো। প্রচুর পাখি তো ডাকছেই, একঝাঁক টিয়া উড়ে গেল সামনে দিয়ে। টিকেন্দ্রজিৎ তার ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা একটা থলি নিয়ে এল কাঁধে ঝুলিয়ে।

কাকাবাবু বললেন, “টিকেন্দ্রজিৎ, তুমি কথা বলতে-বলতে হঠাৎ আমার চুলের মুঠি চেপে ধরলে কেন ? ছিঃ আমার মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা আছে। কেউ যদি আমার গায়ে হাত দেয়, তা হলে আমি তার শোধ না নিয়ে ছাড়ি না। আমাকেও একদিন তোমার চুলের মুঠি চেপে ধরতে হবে।”

টিকেন্দ্রজিৎ দারুণ অবাক হয়ে ভুরু তুলে রইল।

তারপর বলল, “তুমি এখনও ভাবছ, তুমি ছাড়া পাবে ? এই বাঁধন তুমি খুলতে পারবে ? তা ছাড়া এক্ষুনিই তো আমি তোমায় মেরে ফেলতে পারি।”

কাকাবাবু বললেন, “আমায় মেরে ফেললে আর-একজন আসবে। আমি এমন ব্যবস্থা করে এসেছি যে, আমায় সত্যি-সত্যি কেউ মেরে ফেললেও তার শোধ নেওয়া হবেই। তুমি কিছুতেই নিস্তার পাবে না টিকেন্দ্রজিৎ !”

টিকেন্দ্রজিৎ হা-হা করে হেসে উঠে বলল, “আমায় কেউ কোনও দিন ধরতে পারবে না। সে সাধ্য কারও নেই। আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি, তা জানো ? শোনো, তোমাকে আমি নিজের হাতে মারব না। এই রকম অবস্থায় ফেলে রেখে যাব। পুলিশ তোমায় খোঁজাখুঁজি করবে নিশ্চয়ই। পুলিশে আমাদের লোক আছে। তারা এই জায়গাটা বাদ দিয়ে সারা কাজিরাঙ্গা জঙ্গল খুঁজে বেড়াবে। এখানে যদি আসেও, অন্তত তিনদিন লাগবে। এই তিনদিনে তোমার অবস্থা কী হবে বলছি।”

থলে থেকে একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছেড়ে

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "খুব সম্ভবত আজ রাতের মধ্যেই তুমি ভালুকের পাল্লায় পড়বে।"

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, "আমার দিকে ধোঁয়া ছেড়ো না। আমি চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারি না।"

এবার অবাক হওয়ার বদলে সাঙ্ঘাতিক চটে গেল টিকেন্দ্রজিৎ। চোখ দুটো জ্বলতে লাগল হিরের টুকরোর মতন। সে গর্জন করে বলল, "কী? তুমি এখনও আমাকে ধমকাচ্ছ, তোমার এত সাহস? কুমার টিকেন্দ্রজিৎ কখনও কারও ধমক সহ্য করে না!"

একমুখ ধোঁয়া সে কাকাবাবুর মুখের ওপর ছাড়ল। কাকাবাবু নাক কুঁচকে ফেললেন।

তারপর সে সেই জ্বলন্ত চুরুট চেপে ধরল কাকাবাবুর বুকে।

কাকাবাবুর বুকের রোম পুড়ে গেল, চামড়া গোল হয়ে পুড়তে লাগল।

কাকাবাবু ঠাণ্ডা গলায় বলল, "টিকেন্দ্রজিৎ, ও রকম কোরো না। আমি ঠিক শোধ নেব! শোধ নেব!"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "তুমি মরে ভূত হয়ে শোধ নেবে? আমি ভূতের ভয় পাই না!"

চুরুটটা সেখান থেকে তুলে সে এবার কাকাবাবুর ঘাড়ের কাছে চেপে ধরল। অসহ্য যন্ত্রণা হলেও কাকাবাবু মুখ বিকৃত করলেন না, ফিসফিস করে আবার বললেন, "মানুষকে কষ্ট দেওয়ার সময় মনে থাকে না যে, নিজেকেও একদিন এ রকম কষ্ট পেতে হবে! তোমার বুকে ও ঘাড়ে ঠিক এইরকমভাবে কেউ একদিন জ্বলন্ত চুরুট চেপে ধরবে!"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "সেরকম মানুষ জন্মায়নি।"

চুরুটটা ফেলে দিয়ে সে এবার একটা লম্বা চকোলেট বের করল তার ঝোলা থেকে। সেটার ওপরের রাংতা ছাড়িয়ে এক কামড় খেয়ে বাকিটা রেখে দিল কাকাবাবুর কোটের পকেটে। আরও একমুঠো লজেন্সের কাগজ ছাড়িয়ে সে রাখতে লাগল সেখানে।

তারপর একটু সরে এসে বলল, "তোমাকে আমি দগ্ধে-দগ্ধে মারব রাজা রায়চৌধুরী। এগুলো কেন রাখলাম জানো? তোমার যখন খুব খিদে পাবে, তখনও তুমি জানবে, তোমার কোটের পকেটেই বিস্কুট, চকোলেট, লজেন্স রয়েছে, তবু তুমি খেতে পারবে না। তুমি খেতে পারবে না, কিন্তু পিঁপড়েরা আসবে। বড়-বড় লাল পিঁপড়ে। হাজার-হাজার পিঁপড়ে ঘুরবে তোমার শরীরে। তাদের কামড়ে বিষের জ্বালা। তারপর রাত্তিরবেলা জন্তু-জানোয়াররা তোমায় ছিঁড়ে খাবে।"

ঝোলা থেকে একটা গণ্ডারের শিং বের করে সে বলল, "এই দ্যাখো, দুটো গণ্ডার এর মধ্যেই মেরেছি। আরও মারব, অন্তত আটানব্বইটা! সব গণ্ডার

শেষ হয়ে গেলেই বা ক্ষতি কী ? শিং বিক্রি করা ছাড়া এই জন্তুগুলো দিয়ে মানুষের আর কী উপকার হয় !"

কাকাবাবুর খুব ইচ্ছে হল জিনিসটা একবার হাত দিয়ে ধরে দেখতে। কিন্তু উপায় তো নেই !

কাকাবাবু বললেন, "তুমি একলাই সব গণ্ডার মারবে ? নিজের সম্পর্কে দেখছি তোমার খুব উঁচু ধারণা ! গণ্ডার শিকার করা এত সহজ ? তুমি আমাকে যেটা দেখালে, সেটা আসল গণ্ডারের শিং নয়, নকল !"

টিকেন্দ্রজিৎ আবার কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে সেই শিংটা কাকাবাবুর নাকের ওপর চেপে ধরে বলল, "এই দ্যাখো, আসল কি না !"

কাকাবাবু অনুভব করলেন, সেটা আঠা দিয়ে জট পাকানো শক্ত লোমের মতন জিনিস। বিশ্রী গন্ধ !

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "আমি একলাই সব কটাকে মারব কি মারব না, তুমি তা দেখতে আসবে না। পরের ব্যাপারে তোমার নাক গলানো এই শেষ !"

কাকাবাবুর মাথাটায় একবার প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল টিকেন্দ্রজিৎ। তারপর ঘোড়াটাতে উঠে পড়ল।

এদিকে সে মুখ ফেরাতেই কাকাবাবু বললেন, "আবার দেখা হবে !"

টিকেন্দ্রজিৎ হা-হা শব্দে অট্টহাসি করে উঠল। সেই হাসিতে যেন কেঁপে উঠল জঙ্গলের গাছপালা। হাসতে-হাসতেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এক সময় সেই হাসি আর ঘোড়ার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল অনেক দূরে।

॥ ৭ ॥

বুকের মাঝখানে আর ঘাড়ের কাছে চুরুট দিয়ে পোড়ানো দুটো জায়গায় জ্বালা করছে খুব ! পেটের কাছে একটা জায়গায় চুলকোচ্ছে। কাকাবাবু ভাবলেন, এখনই কী, এর পর যখন পিঁপড়েরা আসবে, তখনই আসল যন্ত্রণা শুরু হবে। সামান্য একটা পিঁপড়েকেও মারার উপায় নেই তাঁর এখন।

কতক্ষণ এইভাবে থাকতে হবে ?

তিনি সত্যি-সত্যি মরে যাবেন, তা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। এর আগে তো আরও কত বিপদে পড়েছেন, শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হবে টিকেন্দ্রজিতের মতন একটা লোকের কাছে ? এইরকমভাবে জঙ্গলে, সবার চোখের আড়ালে ?

এর চেয়ে সামনাসামনি কারও সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করা অনেক বেশি সম্মানজনক !

যদি কোনও জন্তু-জানোয়ার এসে পড়ে তো কী হবে ?

হাতির পাল এলে বোধ হয় গ্রাহ্য করবে না। হাতিরা মানুষ নিয়ে বিশেষ

মাথা ঘামায় না। গণ্ডার এলেও বিপদ নেই। ওরকম ভয়ঙ্কর চেহারা হলেও গণ্ডাররা সাধারণত নিরীহ প্রাণী। খুব রাগিয়ে না দিলে তারা কাউকে আক্রমণ করে না। তা ছাড়া, গণ্ডাররা নিশ্চয়ই বুঝবে, কাকাবাবু তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন!

অসমের বাঘ সাধারণত মানুষখেকো হয় না সবাই বলে। কিন্তু কোনও বাঘ এসে যদি দেখে, একটা মানুষ বাঁধা পড়ে রয়েছে, তা হলেও কি এমন একটা সহজ খাদ্য ছেড়ে দেবে? কোনওরকম শিকার করার ঝঞ্ঝাট নেই, শুধু কামড়ে-কামড়ে গা থেকে মাংস খেলেই হল!

দিনের বেলা বাঘ বেরোবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে ভালুক আসতে পারে। এখানকার জঙ্গলে ভালুক অনেক কমে গেলেও যে-ক'টা আছে, খুবই হিংস্র। হয়তো এদিকে কোথাও ভালুকের আস্তানা আছে। টিকেন্দ্রজিৎ জানে। ভালুক মানুষ দেখলে তার গা আঁচড়ে নখের ধার পরীক্ষা করে।

নাঃ, কোনও জন্তু-জানোয়ারের হাতে প্রাণ দিতে হবে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না!

সন্তু ঠিক আসবে। প্রথমে ওরা ভাববে, কাকাবাবু মর্নিং ওয়াক করতে গেছেন। তারপর বেলা বাড়লে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে পড়বে দু' জনে। বড়ঠাকুরকে খবর দেবে। বড়ঠাকুর মানুষটি ভাল, বেশ নির্ভরযোগ্য, উনি নিশ্চয়ই চতুর্দিকে খবর পাঠাবেন।

ওঃ হো, সকালে উঠেই তো ওরা দেখতে পাবে ক্রাচ দুটো পড়ে আছে। খাটের পাশে রয়েছে জুতো। তা হলেই বুঝতে পারবে, কাকাবাবু মর্নিং ওয়াকে যাননি, কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তা হলে সকাল থেকেই শুরু হবে খোঁজাখুঁজি। এটা একটা আশার কথা!

এখন ক'টা বাজে?

কাকাবাবুর হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়ি থাকলেও দেখা যেত না, হাত দুটো যে পেছন দিকে মুড়িয়ে বাঁধা। এর মধ্যেই কাঁধ টনটন করছে। কী জ্বালাতন, কতক্ষণ থাকতে হবে এভাবে?

টিকেন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই জঙ্গলের এমন জায়গায় এনেছে, যেখানে কোনও টুরিস্ট আসে না। আশপাশের গ্রামের লোকও আসে না। হঠাৎ কেউ এসে পড়ে যে উদ্ধার করবে, তার সম্ভাবনা নেই। কোনও জন্তু-জানোয়ারও দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় এখন সকাল সাড়ে আটটা-ন'টা।

হঠাৎ হুপ-হুপ শব্দে কাকাবাবু চমকে উঠলেন। কারা আসছে? মনে হচ্ছে যেন কয়েকটা বাচ্চা ছেলে খেলা করতে করতে এগিয়ে আসছে এদিকে।

না, বাচ্চা ছেলে নয়, কয়েকটা বানর। একটার পর একটা গাছ লাফিয়ে-লাফিয়ে আসছে এদিকে। গায়ের রং সোনালি, লম্বা-লম্বা ল্যাজ, এইগুলোই কি গোল্ডেন লাঙ্গুর? খুব দুর্লভ জাতের বানর। ওরা কাকাবাবুকে

লক্ষই করছে না। খেলা করছে নিজেদের মধ্যে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "হ্যালো, হ্যালো, লুক অ্যাট মি! আই অ্যাম হিয়ার।"

বলেই তিনি লজ্জা পেলেন। অসমের জঙ্গলের বানররা ইংরেজি বুঝবে কেন? ওদের গায়ের রং অনেকটা সাহেবদের মতন, সেইজন্যই কাকাবাবুর ইংরেজি মনে এসেছে।

বানরগুলো কাকাবাবুর গলার আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠল, পিছিয়ে গেল খানিকটা। তারপর সবাই সার বেঁধে বসে চোখ পিটপিট করে দেখতে লাগল। এক জন মানুষের এ রকম অবস্থা তারা কখনও দেখেনি।

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমাদের সাহায্য চাই!"

তারপরই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "চকোলেট! চকোলেট খাবে? আমার কোটের পকেটে আছে, নিয়ে যাও না!"

ইস, যদি হাত দুটো খোলা থাকত, কাকাবাবু ওদের চকোলেটের লোভ দেখিয়ে কাছে ডাকতে পারতেন!

আর কোনও জন্তু-জানোয়ার কাকাবাবুর বাঁধন খুলে দিতে পারবে না। একমাত্র বানরই ইচ্ছে করলে পারে। কারণ, ওরা হাতের ব্যবহার জানে।

ডারউইন সাহেব বলেছেন, বানররাই মানুষদের পূর্বপুরুষ। তা হলে বানরেরা কথা বলতে শেখে না কেন? ময়না, চন্দনা পাখিও মানুষের মতন কথা বলে। কুকুর কথা বলে না, কিন্তু মানুষের অনেক কথা বুঝতে পারে।

কাকাবাবু কাকুতি-মিনতি করে অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি বলতে লাগলেন, "তোমাদের বাঁদর বলব না। বাংলায় বাঁদর মানে দুষ্টু ছেলে। তোমরা আসলে কপি! শাখামৃগ! কিষ্কিন্ধ্যার অধিবাসী! রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন তোমরা কত সাহায্য করেছিলে! লঙ্কার রাক্ষসদের কী রকম নাস্তানাবুদই না করেছিলে! তোমরা আমার বাঁধন খুলে দাও না ভাই। তোমরা যা চাও তাই খাওয়াব। অনেক চকোলেট, লজেন্স আর কলা, খুব ভাল মর্তমান কলা, আর যা খেতে চাও বলো!"

ওদের মধ্যে যে পালের গোদা সে একলাফে একেবারে চলে এল কাকাবাবুর সামনে। কাকাবাবুর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল, তা হলে ওরা তাঁর কথা বুঝতে পেরেছে? এই বানরটার চেহারা বেশ বড়, লম্বা-লম্বা আঙুল, সে ইচ্ছে করলেই গিঁট খুলে দিতে পারে।

পালের গোদা বানরটা সে-চেষ্টা না করে হঠাৎ হুপ- হুপ শব্দ করে লাফাতে শুরু করল মাটিতে। খুব যেন তার আনন্দ হয়েছে। কী ব্যাপার, ও এখন নাচছে নাকি? এই কি নাচবার সময়?

গোদা বানরটা নেচেই চলেছে, নেচেই চলেছে। গাছের ডালে বসে অন্য

বানররা যেন এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে হাসছে। একজন মানুষের এরকম অসহায় অবস্থা দেখে বুঝি খুব মজা পাচ্ছে ওরা ?

হঠাৎ অন্য বানররা একসঙ্গে হুপ-হুপ চিৎকার করে আর-একটা গাছে চলে গেল, সেখান থেকে আর-একটা গাছে। গোদা বানরটাও লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল। তারপর তারা ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলে।

কাকাবাবু বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন!

কিচ্ছু উপকার হল না ওদের দিয়ে। বানর তো বানরই! সাধে কি আর লোকে 'বাঁদর' বলে গালাগালি দেয়!

আবার সব চুপচাপ। তেমন কোনও পাখিও ডাকছে না। একটু দূরে একটা গাছতলায় একঝাঁক ছাতারে পাখি কিচুলু-মিচুলু করছে। ওরা সবসময় ছ'-সাতটা পাখি একসঙ্গে থাকে আর মনে হয় যেন ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে। এদিকে যে একটা মানুষ রয়েছে, তা ওরা গ্রাহ্যও করছে না।

আর কিচ্ছু নেই, অনেকক্ষণ আর কিচ্ছু নেই।

কাকাবাবুর একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে তিনি চমকে উঠলেন।

ঘুমের মধ্যে যেটা বিকট শব্দ, সেটা আসলে ময়ূরের ডাক। ময়ূর দেখতে এত সুন্দর, কিন্তু তার ডাক এত কর্কশ! ছাতারে পাখিগুলো উড়ে গেছে। খুব কাছের একটা গাছের ডালে কখন এসে বসেছে একটা ময়ূর। বেশ বড় ময়ূর, অনেকখানি লম্বা ল্যাজ।

এত কাছ থেকে এরকম একটা সুন্দর ময়ূর কাকাবাবু আগে দেখেননি। ঠিক যেন একটা ছবি। ময়ূরটা এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছে। আর তার লম্বা গলায় ঝিলিক দিচ্ছে ময়ূরকণ্ঠী রং।

কিন্তু এই কি সুন্দর জিনিস দেখার সময়!

তবু কাকাবাবু একদৃষ্টে ময়ূরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তবু তো একটা জীবন্ত প্রাণী, যেন একজন সঙ্গী!

পায়ে সুড়সুড়ি লাগতেই কাকাবাবু নীচের দিকে তাকালেন। এই রে, পিঁপড়ে আসতে শুরু করেছে! লাল পিঁপড়ে। সর্বনাশ! কালো পিঁপড়েরা নিরীহ হয়, গায়ের ওপর দিয়ে ঘোরাঘুরি করলেও কামড়ায় না। কিন্তু লাল পিঁপড়েগুলো কুটুস-কুটুস করে কামড়ায়, ওইটুকু প্রাণী, তবু কী বিষ! লাল পিঁপড়ে আর কালো পিঁপড়ের এত তফাত কেন? এরা টের পায়ই বা কী করে? কাকাবাবুর পা বেয়ে-বেয়ে উঠে এসে ঢুকে পড়ছে কোটের পকেটে।

সামান্য পিঁপড়েদের জন্য কাকাবাবু ময়ূরটার কথাই ভুলে গেলেন।

পিঁপড়ের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এখন কাকাবাবুর কোটের পকেটে শুধু নয়, সারা গায়ে ছড়িয়ে গেছে পিঁপড়ে। যেখানে সেখানে কামড়াচ্ছে, কাকাবাবু ছটফট করতে লাগলেন। চুলকোচ্ছে সারা গা, কিন্তু কিছু করার উপায় নেই।

তিনি ভাবলেন, বাঘ-ভালুকের দরকার নেই, পিঁপড়ের কামড়েই তিনি শেষ হয়ে যাবেন।

ময়ূরটা কখন উড়ে গেছে তিনি টেরও পাননি।

পিঁপড়েদের শেষ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল তাদের অত্যাচার। কিছুই যখন করার উপায় নেই, কাকাবাবু তখন চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন সন্তুর কথা। সন্তুকে একটা খবর পাঠাতে হবে। ওয়্যারলেসে যেমন খবর পাঠানো যায়, তেমনই মানুষের চিন্তারও তো তরঙ্গ আছে। মনটাকে একাগ্র করে খুব তীব্রভাবে একজনের কথা চিন্তা করলে সে সাড়া দেবে না ?

কাকাবাবু চোখ বুজে মনে-মনে বলতে লাগলেন, 'সন্তু, সন্তু, চলে আয়, তোকে আসতেই হবে। আমি একটা জঙ্গলের মধ্যে রয়েছি, কোথায় ঠিক জানি না, তোকে খুঁজে বের করতে হবে। তুই পারবি না ? চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবি। সারারাত এই জঙ্গলে যদি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমাকে থাকতে হয়, তা হলে আমি পাগল হয়ে যাব ! তুই আয় সন্তু, তুই আয়, তুই আয়—'

ভালুক দুটো এল বিকেলের দিকে।

টিকেন্দ্রজিৎ যা-যা বলেছিল, ঠিক মিলে যাচ্ছে। পিঁপড়েরা এখনও আছে, চকোলেট-লজেন্সগুলো নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে, এখন তারা সারা শরীরে ঘুরে-ঘুরে আরও কিছু খুঁজছে, কামড়াচ্ছে মাঝে-মাঝে।

ভালুক দুটো ঠিক যেন বেড়াতে বেরিয়েছে। মাঝে-মাঝে ওরা চার পায়ে হাঁটছে, এক-এক বার দু' পায়ে ভর দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াচ্ছে। গাছের গুঁড়ি থেকে খুঁটে-খুঁটে তুলে কী খাচ্ছে কে জানে ! ওদের থাবায় বড়-বড় নখ ! ওই নখ দিয়ে মানুষের গা চিরে দিতে পারে।

কাকাবাবু প্রায় দম বন্ধ করে রইলেন। ভালুকের দৃষ্টিশক্তি ভাল নয়, বেশি দূর দেখতে পায় না। কোনও রকম শব্দ করলে চলবে না।

সকালবেলা টিকেন্দ্রজিতের লোকেরা যে জায়গাটায় বসে ছিল, ঠিক সেই জায়গায় ভালুক দুটো ঘুরতে লাগল। কিছু যেন গন্ধ পেয়েছে। কাকাবাবুর গাছটা মাত্র দশ-বারো হাত দূরে। ওরা এখনও এদিকে তাকায়নি।

সূর্য অস্ত গেছে, আকাশে লাল রঙের আলো এখনও রয়েছে। জঙ্গলের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে আসছে আস্তে-আস্তে। কাকাবাবু একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ভালুক দুটোর দিকে। ওরা চলে যাচ্ছে না কেন ? এই জঙ্গলে, ভালুকের হাতে প্রাণ হারাতে হবে, এটা এখনও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না ! বাঁচতে হবেই। টিকেন্দ্রজিতের ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে না ? পৃথিবীর যে-কোনও জায়গাতেই টিকেন্দ্রজিৎ লুকোক না কেন, কাকাবাবু তাকে ঠিক খুঁজে বের করবেনই। তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

ভালুক দুটো কাকাবাবুর অস্তিত্ব টের পায়নি বটে, কিন্তু চলেও যাচ্ছে না। ঘুরঘুর করছে এক জায়গায়। কাকাবাবু ভাল করে শ্বাস নিতে পারছেন না।

তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। এবার বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন ! সন্তুরা এখনও আসছে না কেন ?

পেছন দিকের জঙ্গলে সরসর শব্দ হতেই কাকাবাবু সেদিকে ঘাড় ঘোরালেন। ভালুক দুটোও সেই শব্দ শুনতে পেয়েছে, তারা একটু-একটু করে পিছিয়ে গেল একটা ঝোপের দিকে।

কাকাবাবুকে দারুণ অবাক করে দিয়ে সাইকেল চেপে একজন লোক হাজির হল সেখানে। অস্পষ্ট আলোতেও কাকাবাবু চিনতে পারলেন। জলিল শেখ !

সে নিশ্চয়ই ভালুক দুটোকে দেখতে পায়নি। নিশ্চিন্তভাবে সাইকেলটাকে একটা গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখল। তারপর কাঁধের থলে থেকে মস্ত বড় একটা ছোরা বের করে দাঁড়াল এসে কাকাবাবুর সামনে।

কাকাবাবু কটমট করে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটুও ভয় না পেয়ে ধমকের সুরে বললেন, "আমাকে খতম করে দিতে এসেছ ! একজন হাত-পা বাঁধা লোককে মারতে বীরত্ব লাগে না। মারতে চাও, মারো, কিন্তু জেনে রেখো, এর শাস্তি তুমি পাবেই। তোমাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাবই।"

জলিল শেখ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

তারপর দ্রুত কাকাবাবুর হাত-পায়ের বাঁধন কাটতে-কাটতে বলতে লাগল, "বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পাপ করেছি, তার শাস্তিও পেয়েছি। আমার মেয়েটা, সে আমার নয়নের মণি, সে নেই !"

কাকাবাবু চমকে গিয়ে বললেন, "তোমার মেয়ে ফিরোজা ... সে নেই মানে ?"

জলিল শেখ ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, "কাল তাকে আমি খুব মেরেছিলাম। কাল আমি আবার পাখি ধরে বাড়িতে রেখেছিলাম, মেয়েটা খাঁচা খুলে সব পাখি ছেড়ে দিল। আমার রাগ হয়ে গেল খুব, তাই তাকে মারলাম। মেয়েটা রাত্তিরে কিছু খায়নি। আজ সকালে বাড়ি ফিরে দেখি, সে নেই। কে বলল, সে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, কেউ বলল, জঙ্গলে চলে গেছে ... বাবু, আমার ওই একমাত্র মেয়ে ... আমি এত বড় পাপী ..."

হাত-পায়ের বাঁধন মুক্ত হওয়ার পরই কাকাবাবু ক্রাচ দুটোর অভাব বোধ করলেন। গাছে হেলান দিয়ে সারা গা চুলকে পিঁপড়ে তাড়াতে-তাড়াতে বললেন, "অতটুকু মেয়ে, সে কোথায় যাবে ? ভাল করে খোঁজ করো গিয়ে। তুমি যে আমায় ছেড়ে দিলে, টিকেন্দ্রজিৎ যদি জানতে পারে ?"

জলিল শেখ বলল, "ওসবের আর আমি পরোয়া করি না। আর আমি পাপ কাজ করব না। না খেয়ে যদি মরতে হয় সেও ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "কাছাকাছি দুটো ভালুক রয়েছে।"

জলিল শেখ যেন সে-কথা শুনতেই পেল না। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এখান থেকে নিজে-নিজে ফিরে যেতে পারবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ক্রাচ ছাড়া আমি হাঁটতে পারি না। রাত্তির হয়ে গেলে জঙ্গলের রাস্তাও চিনতে পারব না।"

জলিল শেখ বলল, "আপনাকে আমার সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ডাকবাংলোর কাছে ছেড়ে দেব। আমার মেয়েটা যে কোথায় গেল!"

কাকাবাবু ওর সঙ্গে কথা বললেও একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সামনের জঙ্গলের দিকে। দুটো ছায়া যেন দুলতে-দুলতে এগিয়ে আসছে।

কাকাবাবু বললেন, "জলিল, তোমার পেছনে ভালুক!"

জলিল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ওরে বাপ রে!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার ছোরাটা শিগ্গির আমাকে দাও। তোমার কাছে আর কোনও অস্ত্র আছে?"

জলিল বলল, "আজ্ঞে না। হ্যাঁ, মানে একটা গুলতি আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ও দিয়ে কিছু হবে না। আমার পেছনে এসে চেঁচাও, খুব জোরে চেঁচাতে থাকো!"

কাকাবাবু ছোরাটা সামনে উঁচু করে ধরে রইলেন। সারাদিন হাত-পা বাঁধা ছিল, শরীরে রক্ত-চলাচল হয়নি ঠিকমতো, দারুণ ক্লান্ত লাগছে, তবু লড়তে তো হবেই। জলিলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনিও চেঁচাতে লাগলেন, "আয়, আয় দেখি তোদের গায়ে কত জোর!"

ভালুক দুটো খানিকটা এসে থমকে গেল। মনে হল, কর্তা-গিন্নিতে বেড়াতেই বেরিয়েছে, এখন মারামারি করার ইচ্ছে নেই। চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত হয়ে আবার পেছন ফিরে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

জলিল সাইকেলটা কাছে এনে বলল, "উঠে পড়ুন স্যার, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।"

এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে পায়েচলা পথও নেই। ঝোপঝাড় ঠেলেঠুলে এগোতে হচ্ছে। একবার তো একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে উলটেই পড়ে গেলেন দু'জনে।

আবার সাইকেলটা সোজা করার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ডাকবাংলোতে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?"

জলিল বলল, "তা আজ্ঞে চার-পাঁচ ঘণ্টা লেগে যাবে!"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এত দূর! সমস্ত শরীরে ব্যথা। মনে-মনে বললেন, 'টিকেন্দ্রজিৎ, কোথায় পালাবে তুমি? তোমার ওপর এর সব কিছুর প্রতিশোধ আমি নেবই!'

আরও কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দেখা গেল দূরে একটা আলো। আলোটা এগিয়ে আসছে। তারপর শব্দ পাওয়া যেতেই বোঝা গেল, সেটা একটা গাড়ির হেডলাইট। একটা গাড়ি আসছে এদিকে। শত্রুপক্ষ, না মিত্রপক্ষ? হয়তো

টিকেন্দ্রজিৎই কোনও লোককে পাঠিয়েছে তার বন্দির অবস্থাটা দেখবার জন্য !

সাইকেলটা থামিয়ে জলিল আর কাকাবাবু একটা বড় গাছের আড়ালে লুকোলেন। যদি শত্রুপক্ষ হয়, তা হলে ধরা পড়ে গেলে খুবই বিপদ। ওদের কাছে বন্দুক-পিস্তল থাকলে লড়াই করা যাবে না।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "জলিল, তুমি পালাও। শব্দ না করে দূরে সরে যাও।"

জলিল বলল, "আপনাকে ফেলে আমি পালাব ? কিছুতেই না।"

গাড়িটা আসছে আস্তে-আস্তে। একটা জিপগাড়ি। ভেতর থেকে কেউ টর্চের আলো ফেলছে। এদিক-ওদিক।

কাকাবাবু হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলেন, "সন্তু !"

সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থেকে সাড়া এল, "কাকাবাবু !"

কাকাবাবু বুক খালি করে নিশ্বাস ছাড়লেন। সন্তুকে তিনি মনে-মনে ডাক পাঠিয়েছিলেন, সন্তুকে আসতেই হবে। শুধু একটু দেরি হয়েছে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এসে সন্তু কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরল। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কী হয়েছিল ? কে এখানে ধরে এনেছিল ? তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি তো, আমরা সারাদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

কাকাবাবু কোনও কথা বললেন না। সন্তুর কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে জিপ গাড়িটার সামনের সিটে বসলেন।

তারপর বললেন, "বড্ড ক্লান্ত রে আমি, ঘুম পাচ্ছে, পরে সব বলব !" তাঁর মাথা ঝুঁকে এল বুকে, তিনি ঘুমিয়েই পড়লেন সঙ্গে-সঙ্গে।

॥ ৮ ॥

তেজপুর থেকে শিলচরে চলে আসার পর কেটে গেল সাতটা দিন। এর মধ্যে কাকাবাবু আর সার্কিট হাউস থেকে বেরোলেনই না। শুধু বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বিশ্রাম। এর মধ্যে সন্তু আর জোজো বেড়িয়ে এল দুটো চা-বাগানে। সেখানে তাদের খাতির যত্ন করে খুব খাওয়ানো-দাওয়ানো হয়েছে। চা-বাগানের আতিথেয়তা খুব বিখ্যাত।

ঘর থেকে না বেরোলেও কাকাবাবু টেলিফোনে নানা রকম খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। জলিল শেখের বাড়ির কাছে গোপনে পুলিশ পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে হঠাৎ এসে তাকে কেউ না মারতে পারে। কেউ আসেনি এ-পর্যন্ত। তবে দুঃখের বিষয় তার মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও।

টিকেন্দ্রজিতের কোনও পাত্তা নেই। তেজপুরে তাকে আর দেখাই যাচ্ছে না। কাকাবাবু মণিপুর রাজ্যের পুলিশের বড় কর্তাকে ফোন করেছিলেন। ইম্ফল শহর থেকে খানিকটা দূরে তার একটা বাড়ি আছে বটে, কিন্তু সেখানে ফেরেনি টিকেন্দ্রজিৎ। সে-বাড়ির লোকেরা তার কোনও সন্ধান জানে না।

কাকাবাবু সেসব শুনে আপনমনে মাথা নাড়তে-নাড়তে বলেন, "দেখা হবে, ঠিক ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

সকালবেলা কাকাবাবু দোতলার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসলেন। পায়ের ওপর রোদ এসে পড়েছে, ভারী আরাম লাগছে। স্থানীয় একটা খবরের কাগজ দিয়ে গেছে। তার প্রথম পাতাতেই বড়-বড় অক্ষরে খবর, কাজিরাঙার জঙ্গলে চিরুনি-তল্লাশ। ফরেস্ট গার্ড ও পুলিশবাহিনী সমস্ত জঙ্গলে অভিযান চালাচ্ছে দিনের পর দিন। বেআইনিভাবে গাছ কাটার জন্য ধরা পড়েছে পাঁচজন লোক, জেলখানা থেকে পলাতক দু'জন আসামী এক জায়গায় লুকিয়ে ছিল, তারাও ধরা পড়েছে। একটা আহত লেপার্ডকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে, সব কাজই চলছে বেশ ভালভাবে। এই ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে কাকাবাবু আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। দু-একবার তিনি শূন্যে ঘুসি চালিয়ে দেখলেন, হাতের জোর ঠিক আছে কি না।

সন্তু আর জোজো নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরে এল ব্রেকফাস্টের সময়। রোজ-রোজ টোস্ট আর ওমলেটের বদলে খানসামা আজ দিয়ে গেল গরম-গরম পুরি আর আলু-ফুলকপির তরকারি। তরকারিটার দারুণ স্বাদ হয়েছে, জোজো দু' বার চেয়ে নিল। কাকাবাবু বললেন, "কলকাতায় ফিরে গিয়ে ওজন নিলে দেখা যাবে, আমাদের তিনজনেরই ওজন বেড়ে গেছে। বাইরে বেড়াতে এলে বেশি খাওয়া হয়ে যায়।"

জোজো বলল, "আমার কোনও প্রব্লেম নেই। একদিন এমন যোগব্যায়াম করে নেব যে, তাতেই আবার অনেকটা ওজন কমে যাবে!"

সন্তু বলল, "তুই মোটে একদিন যোগব্যায়াম করবি?"

জোজো বলল, "একদিন যথেষ্ট। এ তোদের এলেবেলে যোগ ব্যায়াম নয়। বাবার সঙ্গে যখন তিব্বতে গিয়েছিলাম, তখন একজন আসল লামা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এক দিনেই এক বছরের কাজ হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তিব্বতেও গেছ বুঝি?"

জোজো বলল, "বাঃ, যেবারে চায়না গেলাম, সেবারই তো। জানেন কাকাবাবু, একটুর জন্য আমার লেভিটেশান শেখা হল না। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হল যে!"

সন্তু বলল, "লেভিটেশান মানে মাটি থেকে ওপরে উঠে যাওয়া?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ। তুই মানেটা জানিস দেখছি। মাটিতে পদ্মাসনে বসে আছিসতো, যোগবলে পুরো শরীরটাই মাটি থেকে একটু-একটু ওপরে উঠে যাবে।"

সন্তু বলল, "যাঃ, তা কখনও হয় নাকি? মাধ্যাকর্ষণ আছে না?"

জোজো বলল, "নিশ্চয়ই হয়। নাহলে লেভিটেশান কথাটা তৈরি হল কী করে?"

"তুই নিজের চোখে দেখেছিস কোনও লামাকে সে রকম ওপরে উঠতে?"

"আলবাত দেখেছি। আমার গুরুই তো করে দেখালেন।"

"বাজে কথা, 'টিনটিন ইন টিবেট' বইতে এরকম একটা ছবি আছে, তুই সেটা দেখে বলছিস !"

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন।

কথা ঘোরাবার জন্য জোজো বলল, "কাকাবাবু, পূর্ণিমা কবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "কালকে।"

জোজো বলল, "তা হলে আজ কি আমরা তেজপুরে ফিরে যাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা রওনা হব কাল সকালে। তেজপুরে যাব না, সোজা জঙ্গলে ঢুকব।"

সন্তু বলল, "জানো কাকাবাবু, জোজোর ধারণা, সব জায়গায় একই দিনে পূর্ণিমা হয় না। আমার সঙ্গে তর্ক করছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী হে জোজো ! আকাশে কি একটার বেশি চাঁদ আছে নাকি ?"

জোজো বলল, "তা নয়। গরম কিংবা শীত যেমন এক-এক জায়গায় কম বা বেশি হয়, তেমনই জ্যোৎস্নাও কম-বেশি হতে পারে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন আগে একটা মজার কথা শুনেছিলাম। রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে, আর এক জন লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা দাদা, আকাশে ওটা কী, চাঁদ না সূর্য ?' প্রথম লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আমি ঠিক বলতে পারছি না। আমি এখানে নতুন এসেছি !'

সন্তু হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বলল, "নিশ্চয়ই ওই লোকটা জোজো !"

কাকাবাবু বললেন, "না রে, জোজো কখনও কোনও ব্যাপারে 'আমি জানি না' বলে না।"

জোজো মুচকি হেসে বলল, "আমি সব ব্যাপারই সন্তুর থেকে একটু-একটু বেশি জানি তো, তাই সন্তু আমাকে হিংসে করে।"

সন্তু বলল, "আমি মোটেই সবজান্তা হতে চাই না। জ্যাক অব অল ট্রেড্স, মাস্টার অব নান।"

কাকাবাবু বললেন, "এ কী রে, তোরা ঝগড়া করছিস নাকি ?"

জোজো বলল, "এখানে আমাদের কোনও কাজ নেই তো, তাই মাঝে-মাঝে একটু ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "তোমাদের কিছু একটা কাজ দরকার, তাই না ? শিলচর শহরে আর কিছু দেখবার নেই। একটা কাজ করতে পারো। সন্তু, তোর জাটিঙ্গার কথা মনে আছে তো ?"

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো বলল, "জাটিঙ্গার পাখি তো ? সেই যে রাত্তিরবেলা আগুন জ্বাললে ওপর থেকে ঝুপ-ঝুপ করে পাখি এসে পড়ে ! হ্যাঁ,

হ্যাঁ, সেটা আজ দেখে আসি।”

কাকাবাবু বললেন, “এখন আর পাখি দেখা যাবে না। আগুন জ্বালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে জায়গাটা সুন্দর, নদীর ধার দিয়ে-দিয়ে রাস্তা, বেড়াতে ভাল লাগবে। তোমরা দু'জনে ঘুরে আসতে পারো।”

জোজো বলল, “কী করে যাব ? আপনি পুলিশকে বলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন।”

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমরা যখন ওখানে গিয়েছিলাম তখন বিশেষ কিছুই ছিল না। এখন একটা ভাল হোটেল হয়েছে। তোমরা সেই হোটেলে গিয়ে উঠতে পারো। শুনেছি, সেই হোটেলের মালিক হিম্মত রাও।”

এই নামটা শুনেই সন্তু সচকিত হয়ে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, “আমি গেলে আমার এই খোঁড়া পা আর গোঁফ দেখে চিনে ফেলতে পারে। তোমাদের হয়তো চিনবে না। তোমরা ভাব দেখাবে যেন পাহাড়ে বেড়াতে গেছ। গাড়ির বদলে ট্রেনে করে চলে যাও কাল ভোরে ফিরে আসবে।”

জোজো বলল, “আমি চোখে সান গ্লাস আর মাথায় একটা টুপি পরে নেব, কেউ চিনতে পারবে না।”

কাকাবাবু বললেন, “তোমাদের বিশেষ কিছু করতে হবে না। ভাল করে খাবে, কাছাকাছি স্টেশনে, বাজারে ঘোরাঘুরি করবে। শুধু কান খোলা রেখে শুনবে। কেউ টিকেন্দ্রজিৎ সম্পর্কে কিছু বলে কি না। খবরদার, তোমরা নিজে থেকে টিকেন্দ্রজিতের নাম একবারও উচ্চারণ করবে না, কোনও আগ্রহ দেখাবে না। অন্যরা কেউ কিছু বললে শুনে আসবে। কাল সকাল ন'টার মধ্যে ফিরে আসা চাই। ভোর পাঁচটায় ফেরার ট্রেন আছে।”

মিনিট দশেকের মধ্যে তৈরি হয়ে সন্তু আর জোজো কাঁধে দুটো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এই ট্রেনটা বেশ মজার। সরু লাইন, তার ওপর ছোট ট্রেন। দূর থেকে মনে হয় খেলনা গাড়ি। কিন্তু দিব্যি কু-ঝিক-ঝিক শব্দ করতে-করতে চলে। কামরার মধ্যে শুধু মুখোমুখি দুটি বেঞ্চ। এদিককার ট্রেনে নানা জাতের মানুষ দেখা যায়। কত রকম পোশাক, কত রকম ভাষা। টুকটুকে ফরসা দু-তিনটে বাচ্চা ছোটাছুটি করছে, ঠিক যেন জ্যান্ত পুতুল।

জানলার ধারে মুখোমুখি বসেছে দু'জনে। পাহাড়ের পর পাহাড় চলেছে। নদীটাকে মাঝে-মাঝে দেখা যায়, শীতকাল বলে জল খুব কম। বর্ষার সময় এই নদী দেখে চেনাই যাবে না।

জোজো বলল, “শোন সন্তু, কাকাবাবু না থাকলে আমি দলের লিডার। কারণ তোর থেকে আমি দু' মাস দশ দিনের বড়। আমার কথা শুনে চলবি।

দ্যাখ না ওই ব্যাটা বদমাশ টিকেন্দ্রজিৎটা সম্পর্কে কত খবর জোগাড় করে আনব।"

সন্তু ঝুঁকে জোজোর হাঁটুতে জোরে একটা চিমটি কাটল।

জোজো অবাক হয়ে তাকাতেই সন্তু বলল, "কাকাবাবু ওই নামটা উচ্চারণ করতে বারণ করে দিয়েছেন না ? তুই এর মধ্যেই শুরু করলি ?"

জোজো বলল, "ও, স্যরি, স্যরি। ঠিক আছে, এখন থেকে বলব শুধু 'টি', তা হলে কেউ বুঝতে পারবে না। ওই টি ব্যাটা কাকাবাবুকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।"

সন্তু বলল, "আমার মনে হয় 'কাকাবাবু' শব্দটাও আমাদের উচ্চারণ করা ঠিক নয়। ওই নামটাও অনেকে চিনে গেছে।"

জোজো বলল, "আমরা তো বাংলায় বলছি, কে বুঝবে ?"

সন্তু বলল, "এখানে অনেকেই বাংলা বোঝে।"

জোজোর পাশেই বসে আছে মাথায় পাগড়ি ও মুখভর্তি দাড়ি গোঁফওয়ালা এক মাঝবয়েসী সর্দারজি। তিনি গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে বলেন, "আমি বাংলা বুঝতে পারি !"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "ও, আপনি বাংলা বুঝতে পারেন ? আসলে কি হয়েছিল জানেন, আমাদের কাকাবাবুর খাবারের থালায় একটা টিকটিকি পড়ে গিয়েছিল, উনি দেখতে পাননি। সেই খাবার খেয়ে ওঁর অসুখ হয়ে গেল, একেবারে মরো-মরো অবস্থা। যাই হোক বেঁচে গেছেন শেষপর্যন্ত। সেই থেকে টিকটিকিদের ওপর আমাদের খুব রাগ।"

সর্দারজি হাসিটাকে চওড়া করে বলেন, "আমি বাংলা বুঝতে পারি ! আমি বাংলা বুঝতে পারি ! আই নো ওনলি দিস সেন্টেন্স ইন বেঙ্গলি !"

এবার সন্তুও হাসতে লাগল।

নদীর নাম জাটিঙ্গা, সেই নামেই স্টেশন। তার আগে একটা স্টেশনের নাম হারাংগাজাও। নামগুলো শুনলেই কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়।

সন্তু এদিকে আগে এসেছে, তার সব চেনা। এখান থেকে হাফলং পাহাড়ের ওপরের শহরটায় যাওয়া যায়। আগের বার সেখানে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডই না হয়েছিল !

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই চোখে পড়ল একটা নতুন দোতলা বাড়ি। সেটাই হোটেল। বাইরে সাইনবোর্ড লেখা আছে 'রিভারভিউ হোটেল। ফুডিং অ্যান্ড লজিং'।

সন্তু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ইস, ইংরেজি ভুল। 'ফুডিং' আবার হয় নাকি ? ফুড অ্যান্ড লজিং !"

জোজো বলল, "তোকে মাস্টারি করতে হবে না। ইন্ডিয়ান ইংরেজিতে ওসব চলে !"

গেট দিয়ে ঢুকেই অফিস ঘর। কাউন্টারে একটি লোক বসে আছে, তার পেছনের দেওয়ালে একজন বিশাল চেহারার লোকের ছবি বাঁধানো। হিম্মত রাও। এই হোটেলের মালিক কে, তা আর বলে দিতে হবে না।

ওরা দুটো বিছানাওয়ালা একটা ঘর নিল দেড়শো টাকায়। দোতলার ওপর ঘর। সামনে একটা গোল বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়ালে প্রায় একেবারে নীচেই দেখা যায় নদীটাকে। তার ও পাশে পাহাড়। পাহাড়ের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে একটা গাড়ি চলার রাস্তা চলে গেছে। জায়গাটা সত্যি সুন্দর!

জোজো বলল, "কাকাবাবু আমাদের ভাল করে খেতে বলেছেন। এখন দুপুর সাড়ে বারোটা, তা হলে খাবারের অর্ডার দেওয়া যাক।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই চান করবি না ? বেশ পরিষ্কার বাথরুম আছে।"

জোজো বলল, "এই শীতের মধ্যে প্রত্যেক দিন চান করতে হবে তার কোনও মানে নেই।"

দু-তিন বার বেল টিপতে একজন বেয়ারা এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

খাটের ওপর বসে জুতো খুলতে-খুলতে জোজো জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ ভাই, দুপুরের খাবার কী পাওয়া যাবে ?"

বেয়ারাটি বলল, "কী খাবেন বলুন ? চিকেন, মটন, এগ কারি।"

জোজো বলল, "মাছ পাওয়া যাবে না ?"

বেয়ারাটি বলল, "না, এখানে রোজ মাছ আসে না। কাল পেতে পারেন।"

জোজো বলল, "তা হলে আমরা চিকেন আর মটন দুটোই খাব। আর ডালের সঙ্গে ফুলকপির তরকারি আর বেগুন ভাজা হবে তো!"

সন্তু বলল, "ওরে জোজো, আমি তোর মতন তিব্বতি যোগ ব্যায়াম জানি না। আমি অত খেতে পারব না।"

জোজো সে-কথায় কান না দিয়ে বলল, এক প্লেটে ক' টুকরো চিকেন থাকে ?"

বেয়ারাটি বলল, "হাফ প্লেট দু' টুকরো, ফুল প্লেট চার টুকরো।"

জোজো বলল, "তা হলে ফুল প্লেট। চিকেন, মটন, দুটোই ফুল প্লেট।"

বেয়ারাটি বলল, "ডাইনিং হলে গিয়ে খাবেন, না ঘরে খাবেন ?"

জোজো বলল, "ঘরে, ঘরে। এখন কোথাও যেতে পারব না। কতক্ষণে খাবার আনতে পারবে ?"

বেয়ারাটি বলল, "এক ঘণ্টা তো লাগবেই। মাংস এখনও চাপেনি।"

জোজো প্রায় আঁতকে উঠে বলল, "ওরে বাবা, এক ঘণ্টা দেরি! দারুণ খিদে পেয়েছে। ট্রেন জার্নি করলেই আমার খিদে পায়। তুমি তা হলে ততক্ষণে দুটো ডাব্‌ল ডিমের ওমলেট করে নিয়ে এসো। তাতে তো দেরি হবে না।"

জামার পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে বেয়ারাটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার নাম কী ভাই ?"

বেয়ারাটি টাকা নিয়ে ছোট্ট সেলাম জানিয়ে বলল, "আমার নাম সেলিম।"

জোজো উঠে এসে তার কাঁধ চাপড়িয়ে বলল, "বাঃ, বেশ নাম। দেখো, ওমলেট দুটো যেন নরম-নরম হয়। আচ্ছা সেলিম, তুমি টিকেন্দ্রজিৎকে চেনো ?"

সেলিম বলল, "কে ?"

সন্তু কটমট করে তাকাল জোজোর দিকে।

জোজো অমনই গলা নিচু করে বলল, "ত্রিলোকচাঁদজি, তাই না ? নামগুলো উলটোপালটা হয়ে যায়। ত্রিলোকচাঁদজি কাঠের ব্যবসা করেন, তিনি কি এই হোটেলে উঠেছেন ?"

সেলিম বলল, "জানি না তো !"

জোজো বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে, যাও, ওমলেট নিয়ে এসো !"

সেলিম চলে যেতেই জোজো রামভক্ত হনুমানের মতন হাতজোড়া করে রইল সন্তুর দিকে।

সন্তু বলল, "তুই যে ডোবাবি দেখছি ! তুই আবার ..."

জোজো বলল, "ক্ষমা চাইছি তো ! এবারকার মতন মাফ করে দে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কী করব ! আমার মাথায় সব সময় ওই নামটা ঘুরছে। কাকাবাবুর ওপর অত্যাচার করেছে, ওর কথা ভাবলেই আমার রাগে গা জ্বলে যায়। একবার কাছাকাছি পেলে ওর টুঁটি চেপে ধরব।"

সন্তু বলল, "তুই ঘরে খাবার দিতে বললি। ঘরে বসে থাকলে আমরা অন্য লোকের কথা শুনব কী করে ? ডাইনিং হলে খেতে গেলে অন্য লোকজন দেখা যেত।"

জোজো বলল, "ঠিক আছে, ওমলেটটা দিয়ে যাক। অন্য খাবার ডাইনিং হলে গিয়েই খাব। একটা কথা ভেবে দ্যাখ সন্তু। এখানে কেউ নেই, এখন টিকেন্দ্রজিতের নাম উচ্চারণ করা যায়। টিকেন্দ্রজিৎ তো কাকাবাবুকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল, জঙ্গলের মধ্যে কাকাবাবু সারাদিন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রইলেন, ভালুক-টালুক এল, তবু কাকাবাবু মরলেন না কেন বল তো ? আমার বাবার জন্য !"

সন্তু বলল, "তার মানে ?"

জোজো বলল, "আমার বাবা বলেছিলেন না, কাকাবাবুর ইচ্ছামৃত্যু ! উনি নিজে মরতে না চাইলে কেউ ওঁকে মারতে পারবে না !"

সন্তু অন্যমনস্কভাবে বলল, "হুঁ !"

এক ঘণ্টা বাদে ওরা একতলার ডাইনিং হলে এসে দেখল, বেশি লোক নেই। একটা টেবিলে একা একজন আর অন্য একটা টেবিলে তিনজন নারী-পুরুষ বসে খাচ্ছে। হোটেলটার অনেক ঘর খালি।

দূরের টেবিলের তিনজন বাঙালি। তারা লামডিং থেকে আসবার পথে হাতি

দেখেছে, সেই গল্প করে যাচ্ছে উত্তেজিতভাবে।

জোজো বলল, "ওদের সঙ্গে আলাপ করব ?"

সন্তু বলল, "না। আমাদের কাজ শুধু শুনে যাওয়া।"

সেই তিনজন খালি হাতির গল্পই করে যাচ্ছে। আর কোনও কথা নেই।

জোজো বলল, "আদেখলা ! আর যেন কেউ কখনও হাতি দেখেনি।"

অন্য টেবিলের একলা লোকটি গম্ভীরভাবে খেয়ে চলেছে। ওরা এবার তার দিকে মনোযোগ দিল। ওর চেহারাটা রুক্ষ ধরনের। একটা খয়েরি রঙের ঢোলা পাঞ্জাবি পরা।

জোজো বলল, "ওই লোকটার পকেটে রিভলভার আছে।"

সন্তু বলল, "কী করে বুঝলি ?"

জোজো বলল, "দ্যাখ না, বারবার ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখছে।"

সন্তু বলল, "ওর মানিব্যাগে অনেক টাকা থাকতে পারে।"

জোজো বলল, "টিকেন।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "আবার ?"

জোজো বলল, "টিকে টিকে ! আমি বলছিলাম, আগে আমাদের পক্সের টিকে নিতে হত না ? এখন আর নিতে হয় না। কী মজা ! অবশ্য গঙ্গাসাগরে যেতে হলে কলেরার টিকে নিতে হয়। খুব লাগে !"

সন্তু বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছিস !"

জোজো বলল, "মিঃ টি যে এখানে আসবেই, তার কোনও মানে নেই। হয়তো এখানে কেউ তাকে চেনেই না। আমাদের শুধু-শুধু আসাটাই সার হবে।"

সন্তু বলল, "বেড়ানো তো হচ্ছে। শুধু-শুধু শিলচরে বসে থাকলে কী লাভ হত ?"

খাওয়ার পর ওরা বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে।

এখানকার বাজার খুবই ছোট, কয়েকখানা মাত্র দোকান। একটু ঘোরাঘুরি করলেই আর দেখার কিছু থাকে না।

এখানে টিকেন্দ্রজিতের সন্ধান পাওয়া যাবে কী করে ? কেউ তো চেঁচিয়ে কোনও গল্প করছে না। ওরা বেড়াতে গেল পাহাড়ের দিকে।

তাও বেশিদূর যাওয়া গেল না। হঠাৎ টিপিটিপি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। একেই দারুণ শীত, তার ওপর বৃষ্টি যেন সুচের মতন বিঁধতে লাগল। ওরা দু'জনে দৌড় লাগাল হোটেলের দিকে।

সন্তু বলল, "রেস দিবি, জোজো ? কে আগে হোটেলে পৌঁছতে পারে—"

জোজো বলল, "আমার ফার্স্ট হতে ভাল লাগে না। সবাই বড্ড হিংসে করে। কিন্তু সেকেন্ড আমি হবই।"

নিজেদের ঘরে এসে জোজো ধপাস করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। সন্তু ব্যাগ

থেকে বের করল একটা ক্যাসেট প্লেয়ার। এখন গান শুনে সময় কাটাতে হবে।

পাহাড়ের দিকে বৃষ্টি সহজে থামে না। বৃষ্টি ছাড়ল সেই শেষ-বিকেলে। সন্তু এসে দাঁড়াল বারান্দায়। এখন আকাশ একেবারে পরিষ্কার, সূর্য ডুবে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে। গাছপালাগুলো পরিচ্ছন্ন। সেদিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের আরাম লাগে।

জোজো এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে, সন্তু দু-তিন বার ডেকেছে, তবু ওঠেনি।

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সন্তু একসময় দেখতে পেল একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে ওপরের রাস্তা দিয়ে নেমে আসছে। এর আগে দু-একটা ট্রাক আর গাড়ি গেছে ওই রাস্তা দিয়ে, কিন্তু ঘোড়া ছুটতে দেখলে সব সময় ভাল লাগে।

এক সময় সেই অশ্বারোহী থেমে গিয়ে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। নদীর দিকে মুখ।

সন্তু এবার ঘরের মধ্যে গিয়ে জোর করে ঠেলে তুলল জোজোকে।

জোজো চোখ মুছতে-মুছতে বাইরে এসে বলল, "বাঃ, কী সুন্দর ছবি!"

সন্তু বলল, "ঘোড়ার পিঠে একজন লোককে দেখতে পাচ্ছিস?"

জোজো বলল, "ওকেও এই ছবিটার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। হে নীল ঘোড়াকা সওয়ার!"

সন্তু বলল, "ওই লোকটা টিকেন্দ্রজিৎ নয় তো!"

জোজো বলল, "ধুত! তোর মাথায় খালি ওই নাম ঘুরছে। আমি তো মুছে ফেলেছি। আমি বুঝে গেছি ওই টিকেন্দ্রজিৎ না ফিকেন্দ্রজিৎ এখানে কখনও আসেনি, কেউ তাকে চেনেও না। হিম্মত রাও-এর হোটেল বলেই টিকেন্দ্রজিৎকে এখানে আসতে হবে কেন?"

সন্তু বলল, "অনেকটা দূর। লোকটাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না অবশ্য।"

জোজো বলল, "আর কোনও লোক বুঝি ঘোড়ায় চাপতে পারে না? দুপুরবেলা আমরা বাজারে দুটো লোককে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখলাম না? তুই চা খেয়েছিস? চল, ডাইনিং রুমে গিয়ে চা খেয়ে আসি।"

সন্তুর এই বারান্দা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। জোজো জোর করল বলে যেতে হল।

এবারেও ঠিক সেই এক টেবিলে তিনজন আর অন্য একটা টেবিলে আর-একজন। বাঙালি তিনজন তিন প্লেট পকোড়া নিয়েছে।

সেলিম এসে কাছে দাঁড়াবার পর জোজো জিজ্ঞেস করল, "ওরা কীসের পকোড়া খাচ্ছে?"

সেলিম বলল, "মাশরুম পকোড়া। খুব ভাল, দেব আপনাদের ?"

জোজো বলল, "নিশ্চয়ই দেবে। আমাদের জন্যও তিন প্লেট নিয়ে এসো !"

সন্তু বলল, "অ্যাঁ ? তিন প্লেট কী হবে ? আমরা তো দু'জন !"

জোজো বলল, "আনুক না। তোর আর আমার এক প্লেট করে। তার পর আমাদের দু'জনের জন্য এক প্লেট।"

সেলিম চলে যাওয়ার পর জোজো বলল, "তুই এত কিপ্টেমি করছিস কেন রে ! কা-আ-আ, মানে আঙ্কেলবাবু আমাদের ভাল করে খেতে বলেছেন না ! অনেক টাকা দিয়ে দিয়েছেন।"

সন্তু বলল, "তার জন্য না। দুপুরে অত খেয়েছি, এখন শুধু চা খেতেই ইচ্ছে করছিল। যা ঠাণ্ডা পড়েছে !"

জোজো বলল, "তা হলে চা দিয়ে শুরু করলেই হয়।"

জোজো দৌড়ে উঠে গিয়ে সেলিমকে আগে চা দেওয়ার জন্য বলে এল।

বাঙালি তিনজন কী গল্প করছে, ওরা কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করল। এখন চলছে খাওয়ার গল্প। চাইনিজ ভাল, না মোগলাই রান্না ? চিকেন চাওমিন আর চিকেন বিরিয়ানির মধ্যে কোনটা রান্না করা বেশি শক্ত ? একজন ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোকের মধ্যে এই তর্ক চলছে তো চলছেই। চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে চুপ করে শুধু খেয়ে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ শোনার পর জোজো বলল, "হ্যাংলা ! বেড়াতে এসেও শুধু খাওয়ার কথা !"

সন্তু বলল, "আস্তে, শুনতে পাবে !"

জোজো বলল, "ওই মেয়েটা তোর দিকে আড়চোখে দেখছে। তোকে বোধ হয় চিনে ফেলেছে সন্তু।"

সন্তু বলল, "আমায় কী করে চিনবে ? তুই হচ্ছিস বিশ্বভ্রমণকারী জোজো, তোকেই নিশ্চয়ই চিনেছে।"

জোজো বলল, "তা হতে পারে। হয়তো আমাকে অন্য কোথাও দেখেছে। চিনে কিংবা মঙ্গোলিয়ায়।"

সেলিম শুধু চা দিয়ে গেছে। ওঁদের এক কাপ করে চা শেষ হয়ে গেছে, এখনও মাশরুম পকোড়ার পাত্তা নেই।

অন্য টেবিলের একা লোকটি বসে কিছুই খাচ্ছে না, বসে আছে চুপচাপ।

জোজো হাত তুলে সেলিমকে ডাকতে যাচ্ছে, তখনই বাইরের দরজা খুলে ঢুকল একজন লোক। সেদিকে তাকিয়ে সন্তু আর জোজোর চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

লোকটি ছ' ফুটের বেশি লম্বা, কালো রঙের প্যান্ট আর শার্টের ওপর পরে আছে চামড়ার জ্যাকেট। মাথায় টুপি। চোখ দুটি যেন ঝকঝক করছে। অনেক লোকের মধ্যে মিশে থাকলেও এর দিকেই সকলের প্রথম চোখ পড়বে।

জোজো ফিসফিস করে বলল, "টিকেন ... টিক ... টিক।"

সন্তু টেবিলের তলা দিয়ে তাকে একটা লাথি কষিয়ে বলল, "ওদিকে তাকাবি না। চায়ে চুমুক দে!"

টিকেন্দ্রজিৎ ঘরে ঢুকে প্রথমে চারদিকে তাকিয়ে দেখল।

একলা বসে থাকা গোমড়ামুখো লোকটার মুখে এবার হাসি ফুটেছে। সে টিকেন্দ্রজিতের অপেক্ষাতেই বসে ছিল বোঝা গেল।

টিকেন্দ্রজিৎ তার দিকে এগোবার আগেই সেলিম বেয়ারার কাছে গিয়ে কী যেন বলতে লাগল গুজগুজ করে। টিকেন্দ্রজিতের ভুরু উঠে গেল। সেলিম আঙুল দিয়ে সন্তু-জোজোর দিকেই দেখাচ্ছে।

এবার টিকেন্দ্রজিৎ এগিয়ে আসতে লাগল ওদের টেবিলের দিকে।

জোজোর বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস শব্দ হচ্ছে। সে বলেছিল বটে যে, টিকেন্দ্রজিৎকে দেখামাত্র তার টুঁটি চেপে ধরবে ; এখন সে বুঝতে পারছে, টিকেন্দ্রজিৎ একা তার মতন দশটা জোজোকে টিট করে দিতে পারে। জোজোর ধারণা হল, টিকেন্দ্রজিতের দু' পকেটে দুটো রিভলভার আছে। কাছেই এসেই সে ফস করে রিভলভার দুটো বের করে ঢিসুম-ঢিসুম করে গুলি চালাবে। বিশ্বাসঘাতক সেলিম তাদের চিনিয়ে দিয়েছে, আর নিস্তার নেই!

সন্তুর মুখখানাও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। টিকেন্দ্রজিৎকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার গায়ে অসম্ভব জোর, তারা দু'জনে মিলেও ওকে ধরে রাখতে পারবে না। তা ছাড়া এখানে টিকেন্দ্রজিতের দলের লোক আছে। তবু সন্তু মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, কিছুতেই টিকেন্দ্রজিতের হাতে ধরা দেওয়া চলবে না। যেমন করে হোক, ওর হাত ছাড়িয়ে পালাতেই হবে।

জুতো মশমশিয়ে টিকেন্দ্রজিৎ ওদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, কোমরে দু' হাত দিয়ে একটুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "আমায় কে খোঁজ করছে?"

দু'জনেই মাথা নিচু করে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

টিকেন্দ্রজিৎ এবার হেসে বলল, "খালি কাপে চুমুক দিচ্ছ কেন? চা ফুরিয়ে গেছে বুঝি?"

সত্যি! ওদের দু'জনের কাপই একদম খালি।

টিকেন্দ্রজিৎ জোজোর পিঠে এক চাপড় মেরে বলল, "এই যে, চুপ করে আছ কেন? তোমার নাম কী?"

জোজো মুখ তুলে কাঁপাকাঁপা স্বরে বলল, "আমি, আমি তো ত্রিলোকচাঁদজির খোঁজ করছিলাম!"

টিকেন্দ্রজিৎ হেসে ফেলে বলল, "ত্রিলোকচাঁদ, হা-হা-হা-হা, ওই নামে ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ নেই।"

এই সময় বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ হল।

সেলিম জানলার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে উঁকি মেরেই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "পুলিশ! পুলিশ এসেছে!"

টিকেন্দ্রজিৎ এবার নিজে গিয়ে জানলার কাছে দেখল।

তারপর সেলিমকে ধমক দিয়ে বলল, "পুলিশ দেখলে ঘাবড়াবার কী আছে? পুলিশরা হোটেলে খেতে আসতে পারে না? আমার খাবারটা ওপরে দিয়ে আসবি।"

টিকেন্দ্রজিৎ জানলার কাছ ছেড়ে শান্ত পায়ে এগিয়ে গেল ওপরের সিঁড়ির দিকে। একবার শুধু জ্বলন্ত চোখে জোজো-সন্তুকে দেখল।

সন্তু সিঁড়িটা পুরো দেখতে পাচ্ছে। টিকেন্দ্রজিৎ দ্রুত টকটক করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়িটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা গোল ব্যালকনি। সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতন ব্যালকনির রেলিং টপকে সে লাফিয়ে পড়ল হোটেলের পেছন দিকটায়। তারপরই শোনা গেল ঘোড়া ছোটার খটাখট শব্দ।

এবার দরজা ঠেলে ঢুকল পুরোদস্তুর পোশাক-পরা একজন পুলিশ।

জোজো অমনই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এসেছেন? এত দেরি করলেন কেন?"

পুলিশটি বলল, "আপনারাই তো সন্তুবাবু আর জোজোবাবু? বর্ণনা ঠিক মিলে গেছে। চলুন, আপনাদের আজই শিলচর ফিরতে হবে।"

জোজো বলল, "আমাদের নিতে এসেছেন তো, ঠিক আছে। দাঁড়ান, আগে মাশরুম পকোড়া খেয়ে যাই। অনেকক্ষণ অর্ডার দিয়েছি।"

তারপর সে গর্বিতভাবে বাঙালি তিনজনের দিকে তাকাল। যেন তাদের বুঝিয়ে দিতে চায়, পুলিশ জোজোকে ধরতে আসেনি, বরং সে পুলিশের ওপর হুকুম করতে পারে।

সন্তু তাড়াতাড়ি পুলিশটিকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন, আমাদের আজই ফিরতে হবে কেন? কাল সকালে ফেরার কথা ছিল। কী হয়েছে?"

পুলিশটি বলল, "এদিকের মেইন রোডে ধস নেমেছে, কোনও গাড়ি যেতে পারছে না। আপনাদের অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে তেজপুর যেতে হবে, তাই আজ শেষ রাত্রেই বেরিয়ে পড়া দরকার। সেই জন্য নিতে এসেছি।"

কাকাবাবুর আর কোনও বিপদ হয়নি জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে সন্তু বলল, "একটু পরে ফিরলেও হবে। শুনুন, আপনি আসবার আগে এখানে টিকেন্দ্রজিৎ ছিল। এইমাত্র পালাল। এখনও তাকে তাড়া করে গেলে ধরা যেতে পারে।"

পুলিশটি বলল, "টিকেন্দ্রজিৎ, ওরে বাবা! না, না, আমি ওকে তাড়াটাড়া করতে পারব না।"

সন্তু বলল, "কেন পারবেন না ? আপনার কাছে তো রিভলভার আছে। আমরা তিনজনে মিলে ওকে ধরে ফেলতে পারি।"

পুলিশটি বলল, "আমার ওপর সে রকম অর্ডার নেই। শিলচরে আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা, ফিরিয়ে নিয়ে যাব, ব্যস ! জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন !"

সন্তু হতাশভাবে বলল, "দুর ছাই !"

॥ ৯ ॥

গভীর জঙ্গলে বড় ঝিলটার কাছে কাকাবাবুরা সদলবলে পৌঁছে গেলেন দুপুরের একটু পরেই। চারটে বড় গাছে মাচা বাঁধা হয়েছে। অন্য গাছের ডাল কেটে সেই মাচাগুলোর সামনে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে, তলা থেকে কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না।

কাছাকাছি অন্য ঝিলগুলো শুকিয়ে ফেলা হয়েছে বলে এই দিনের বেলাতেই একপাল হরিণ এখানে জল খেতে এসেছিল, মানুষজনের শব্দ পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।

কাকাবাবু ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে বড়ঠাকুরকে বললেন, "একটা জিনিস লক্ষ করুন। ঝিলটার তিনদিকে বেশ খাড়া পাড়। এক দিকটা ঢালু। জন্তু-জানোয়াররা এই এক দিক দিয়েই আসবে-যাবে। তাতে নজর রাখার সুবিধে হবে।"

বড়ঠাকুর বললেন, "তা ঠিক। কাকাবাবু, একটা খবর শুনেছেন ? কলকাতার চিড়িয়াখানার মধ্যে ঢুকে একটা লোক একটা গণ্ডারের শিং কেটে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সে করাত-টরাত সব সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? তা হলে ওরা কীরকম বেপরোয়া হয়ে গেছে দেখুন ! বম্বেতে বিদেশি ব্যবসায়ীরা এসে বসে আছে, তাদের কাছে শিং বিক্রি করার জন্য এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। অনেক টাকার কারবার।"

বড়ঠাকুর বললেন, "এর মধ্যে পশ্চিম বাংলার জলদাপাড়ায় একটা গণ্ডার মারা পড়েছে। দু'জন ফরেস্ট গার্ড চোরাশিকারিদের ধরতে গিয়েছিল, একজন গার্ড খুন হয়ে গেছে। ওরা একসঙ্গে অনেকে দল বেঁধে আসছে এখন।"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে গণ্ডারের সংখ্যা অনেক বেশি, তাই এখানে হামলা হবে বেশি। অন্য রাজ্য থেকেও চোরাশিকারিরা এখানে এসে জুটবে। মনে হয়, আজকের পূর্ণিমা রাতের সুযোগটা তারা ছাড়বে না।

বড়ঠাকুর বললেন, "আমরা আর-একটা রিপোর্ট পেয়েছি। আফ্রিকাতেও অনেক গণ্ডার আছে, কিন্তু তাদের দুটো করে শিং থাকে। আমাদের দেশের গণ্ডারের শিং থাকে একটা। গুজব রটে গেছে যে, ভারতীয় গণ্ডারের শিঙের

শক্তি বেশি। এই শিং একটা খেতে পারলেই খুব তাড়াতাড়ি যৌবন ফিরে পাওয়া যায়। সেইজন্যই ভারতীয় গণ্ডারের শিঙের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "গুজবটা নিছকই গুজব। কোনও গণ্ডারের শিং খেলেই কিচ্ছু উপকার হয় না। চোরাব্যবসায়ীরাই এই গুজব রটিয়েছে। ভারতীয় গণ্ডার শিকার করাও খুব শক্ত। আফ্রিকার গণ্ডারের চেয়ে এ-দেশের গণ্ডারের চামড়া অনেক বেশি শক্ত, যেন লোহার বর্মের মতন, গুলি লাগলে ছিটকে যায়। যে জিনিস যত কম পাওয়া যায়, তার তত বেশি দাম বাড়ে।

রাজ সিং সব ক'টা মাচা ঠিকমতন মজবুত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখে এসে বললেন, "সব ঠিক আছে। যে তিনজন লোক মাচাগুলো বানিয়েছে, তাদের এবার ছেড়ে দেব ?"

বড় ঠাকুর বললেন, "না, না, ওদের ছাড়া হবে না। ওদের হাতে হাতকড়া লাগান। আমার ড্রাইভার খুব বিশ্বস্ত। আমার গাড়িতে ওদের এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে সারা রাত আটকে রাখবে। যাতে ওরা এখন ফিরে গিয়ে এখানে মাচা বাঁধার খবর কাউকে না দিতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, ভাল ব্যবস্থা।"

বড়ঠাকুর বললেন, "আমি যতদূর সম্ভব সাবধানে সব ব্যাপারটা গোপন রেখেছি। আমরা যে এখানে আজ আসব, তা কারও জানার কথা নয়। কাকাবাবু, আপনি যা-যা বলেছেন, সব মানা হয়েছে। শুধু একটা ব্যাপার আপনাকে জানানো হয়নি। সেটা আমাকে মানতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর আদেশে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও আমি জানি। এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য আনা হয়েছে তো ?"

বড়ঠাকুর বললেন, "আপনি জেনে গেছেন ? মুখ্যমন্ত্রী আপনার প্ল্যানটা সব শুনেছেন। তার পর বললেন, আপনারা এই ক'জন সেখানে রাত্রে থাকবেন, আপনাদের প্রাণের দায়িত্ব কে নেবে ? স্মাগলারদের কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র থাকে। আর্মি দিয়ে জায়গাটা ঘিরিয়ে রাখুন। তাই এক ব্যাটেলিয়ন আর্মি আসছে। এরা গাড়োয়ালি সৈন্য, খুব বিশ্বাসী, এখানকার ভাষাই বোঝে না। এরা আবার ক্যামোফ্লেজ জানে। গায়ে, মাথার সঙ্গে গাছের ডালপালা বেঁধে এমনভাবে জঙ্গলে মিশে যাবে যে ওদেরও গাছ বলে মনে হবে। আমাদের শচীনকে ওদের কম্যান্ডারের সঙ্গে রাখা হয়েছে, সে সব বুঝিয়ে দেবে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের কমান্ডারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এখান থেকে আধ মাইল দূরে ওরা নিঃশব্দে ছড়িয়ে থাকবে। আমার নির্দেশ না পেলে ওরা নড়বে না, কিছুই করবে না।"

বড়ঠাকুর বললেন, "তা হলে আমরা এখন ওপরে উঠে পড়ি ?"

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "সূর্য অস্ত যেতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টা দেরি

আছে। আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি একটু ঝিলটার চারপাশ দেখে আসি।"

কাকাবাবু রাধেশ্যাম বড়ুয়ার ঘোড়াটা সঙ্গে এনেছেন, সেটাতে চড়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। এই ঝিলটা অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বড় হলেও তিনদিকের পাড় বেশ উঁচু, কেউ নামতে গেলে গড়িয়ে পড়ে যাবে। এক দিকটা ঢালু। এর সুবিধে এই যে, এই এক দিকটায় নজর রাখলেই চলবে।

ফিরে এসে কাকাবাবু বললেন, "এই বার শুরু হবে আমাদের কঠিন পরীক্ষা। যে যার মাচায় উঠে বসে থাকব, কিন্তু কতক্ষণ যে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। হয়তো ওরা আসবে ভোরবেলা। এর মধ্যে আমাদের ঘুমোলে চলবে না, একটাও কথা বলা যাবে না। শুধু ঠায় বসে থাকা। প্রত্যেকের সঙ্গে খাবারের প্যাকেট থাকবে, তাও খেতে হবে নিঃশব্দে। সন্তু আর জোজো একসঙ্গে থাকলে কথা বলে ফেলতে পারে, তাই ওদের এক মাচায় দিচ্ছি না। সন্তু থাকবে তপনের সঙ্গে, আর জোজো রাজ সিংয়ের মাচায় থাকবে।"

তপন রায় বর্মণ জিজ্ঞেস করল, "চোরাশিকারিদের দেখতে পেলে আমরা কি গুলি চালাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, খবর্দার গুলি-টুলি চালাবে না। চুপ করে বসে থাকবে।"

তপন বলল, "ওরা যদি গণ্ডার মারতে শুরু করে, তা দেখেও আমরা চুপ করে থাকব ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তাও চুপ করে থাকবে। আমরা বন্দুক এনেছি শুধু আত্মরক্ষার জন্য। ওরা যদি আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যায়, যদি আমাদের আক্রমণ করতে আসে, তা হলেই শুধু আমরা গুলি চালাব। এরা অতি সাঙ্ঘাতিক মানুষ। অনেক টাকার লোভে একেবারে মরিয়া হয়ে গেছে। আমাদের এমনভাবে থাকতে হবে, যাতে ওরা আমাদের অস্তিত্ব কিছুতেই টের না পায়।"

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে তিনি ঘোড়াটাকে বাঁধলেন গাছের সঙ্গে, তারপর বললেন, "তোমরা সবাই যে যার মাচায় উঠে পড়ো। মনে থাকে যেন, একটাও কথা নয়। আমার শুধু একটা কাজ বাকি আছে।"

একটা ঝোলা-ব্যাগ থেকে তিনি বের করলেন দু' খানা জুতোর বাক্সের সমান একটা কাগজের বাক্স। তার থেকে বেরলো সাদা ধপধপে একটা ফেভিকলের বাক্স। চতুর্দিক সেলোটেপ দিয়ে এমনভাবে আটকানো, যাতে একটুও হাওয়া কিংবা জল ঢুকতে না পারে।

বড়ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "এটা আমি আর্মির কাছ থেকে জোগাড় করেছি।"

বড়ঠাকুর বললেন, "কী আছে এর মধ্যে ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "সেটা যথাসময়ে জানতে পারবেন।

খানিকটা কৌতূহল টিকিয়ে রাখা ভাল, তাই না ?"

কাকাবাবু সেই বাক্সটা ভাসিয়ে দিলেন ঝিলের জলে।

যে-ক'টা গাছে মাচা বাঁধা হয়েছে, সেখানে একটা করে দড়ির সিঁড়িও ঝোলানো আছে। যাতে জুতো পরেই ওঠা যায়। এই শীতের মধ্যে খালি পায়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

কাকাবাবু মাচায় উঠে দড়ির সিঁড়িটা গুটিয়ে নিলেন। একপাশে রইল রাইফেল, অন্যপাশে খাবারের প্যাকেট। মাচার ওপর গদি পাতা আছে, বেশ আরামেই বসা যাবে।

এর পর শুধু প্রতীক্ষা।

কাকাবাবু অন্য মাচাগুলোর দিকে তাকালেন। কোন-কোন গাছে মাচা বাঁধা হয়েছে তা তিনি জানেন, তবু কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। প্রত্যেক মাচা প্রায় দু' তলা সমান উঁচু, কোনও জন্তুও এত দূর থেকে মানুষের গন্ধ পাবে না। শীতকাল বলে একটা সুবিধে হয়েছে, হঠাৎ সাপ-টাপ এসে পড়বে না গায়ে। ডালটনগঞ্জে একবার জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকার সময় গায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে গিয়েছিল।

আকাশের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার তাড়াতাড়ি নেমে আসে, ওপর দিকটায় আরও কিছুক্ষণ আলো থাকে। উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক-ঝাঁক পাখি। ঝিলের মাঝখানে কয়েকটা শাপলা ফুটে আছে, সেখানে ওড়াউড়ি করছে কিছু ফড়িং আর প্রজাপতি। সব মিলিয়ে বাতাসে একটা সুন্দর শান্ত ভাব।

কাকাবাবু ভাবলেন, জঙ্গল এত সুন্দর, তবু মানুষ এখানে বন্দুক নিয়ে ঢোকে। অকারণে প্রাণিহত্যা করে। এমনকী, মানুষকেও মারে। হিংসার বিষনিশ্বাস ছড়ায়। আজকেই কত খুনোখুনি হবে কে জানে!

প্রথম যে বুনো শুয়োরের পালটা এল, তাদের বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া গেল। ওরা দুলে-দুলে দৌড়য় আর ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ করে। ঝিলের ধারে গিয়ে চকচক করে খানিকটা জল খেল, আবার দল বেঁধে দুলতে-দুলতে চলে গেল। যেন সময় নষ্ট করতে পারবে না, খুব তাদের জরুরি কাজ আছে।

কাকাবাবু লক্ষ করলেন, শুয়োরগুলো ঢালু দিকটা দিয়েই এল আর গেল।

খানিক বাদেই উঠল পূর্ণিমার চাঁদ। কী স্পষ্ট আর গোল, ঠিক যেন মনে হয় আকাশে একটা ফ্লাড লাইট জ্বালা হয়েছে। কিন্তু ইলেকট্রিক আলোর মতন কড়া নয়, চাঁদের আলো স্নিগ্ধ। তাই তো জ্যোৎস্না নিয়ে এত কবিতা লেখা হয়।

এমন ফটফট করছে জ্যোৎস্না, সব কিছুই যেন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লোকে বলে, জ্যোৎস্না রাতে তাজমহল দেখতে যেতে হয়। জ্যোৎস্না রাতে জঙ্গল দেখাও এক নতুন অভিজ্ঞতা। সব কিছুই যেন বদলে গেছে। এর মধ্যে

কখন যে গোটা সাতেক হরিণ আর দুটো গণ্ডার এসে গেছে, টেরও পাওয়া যায়নি।

প্রাণী হিসেবে গণ্ডার সত্যিই সুন্দর নয়। ঘোড়া যেমন সুন্দর। হরিণ তো সুন্দর বটেই। হাতি, বাঘ, ভালুক এদেরও নিজস্ব রূপ আছে। গণ্ডারের মুখখানা বিচ্ছিরি। কিন্তু এখন গায়ে জ্যোৎস্না মেখেছে বলে তত তাদের বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে না। এত বড় ভারী একটা জন্তু, কিন্তু হাঁটছে নিঃশব্দে।

অরণ্যের প্রাণীদের মধ্যে যাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, তারা ছাড়া কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। হাতির পাশ দিয়ে হরিণ চলে গেলেও হাতি কোনও দিন তাদের মারবে না। হরিণের সঙ্গে শুয়োরের লড়াই হয় না। গণ্ডার তো কারও সাতে-পাঁচেও থাকে না। ওদের ছোট-ছোট চোখ, বিশেষ কিছু দেখতেই পায় না, আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। হাতি তবু কখনও-কখনও খেপে গিয়ে মানুষ মারে, কিন্তু গণ্ডার কখনও মানুষ মেরেছে, এমন শোনাই যায় না। ওরা নিরীহ প্রাণী, মানুষের ক্ষতি করে না।

যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে বাঘ। যাকে-তাকে মারে। গায়ের জোরে পারবে না বলেই হাতি আর গণ্ডারকে ঘাঁটায় না। মানুষ আরও বেশি হিংস্র, মানুষ হাতির মাংস কিংবা গণ্ডারের মাংস খায় না, তবু ওদের মারে।

হরিণরা জল খেয়ে চলে গেল, রয়ে গেল গণ্ডার দুটো। ওরা জলে নামছে। অন্য সব জন্তরই শীত লাগে, কিন্তু গণ্ডারের শীত নেই। মোষরাও জল ভালবাসে, জলে ডুবে থাকে, কিন্তু তা গরম কালে। অন্য প্রাণীরা জল খেয়ে চলে যাচ্ছে একটু পরে, কিন্তু গণ্ডাররা যাচ্ছে না। শীতকালে ঝিলের জলে অন্য জন্তুরা থাকে না, গণ্ডারই শুধু থাকে, তাও অনেকক্ষণ থাকে, সেই জন্যই শীতকালে গণ্ডার শিকার করা সুবিধেজনক।

ঝিলের উঁচু দিকের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে দুটো হাতি। আকাশের গায়ে তাদের দেখাচ্ছে ছায়ামূর্তির মতন। হাতি দুটো সেখান থেকে নামার চেষ্টা না করে অনেকখানি ঘুরে চলে এল ঢালু দিকটায়। এদিকে জলের মধ্যে সাতটা গণ্ডার হয়ে গেছে।

অন্য জলাশয়গুলো শুকিয়ে ফেলায় এখানে আসছে অনেকে। একসঙ্গে এত জন্তু-জানোয়ার দেখার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না।

রাত বাড়ছে। কাকাবাবুর সঙ্গে রয়েছে খাবারের প্যাকেট, ফ্লাস্কে গরম কফি, তবু তাঁর কিছু খাওয়ার কথা মনেই নেই। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ঝিলের ঢালু দিকটায়। ফেভিকলের বাক্সটা জলে ভাসছে, তাও দেখা যাচ্ছে।

অন্য কোনও মাচা থেকে কেউ একটাও শব্দ করেনি এ পর্যন্ত। শুধু একবার কার যেন খাবারের একটা ঠোঙা পড়েছে নীচে। তাতে অবশ্য কিছু ক্ষতি হয়নি। গাছের শুকনো পাতা বা ফলটলও তো পড়ে!

মাঝরাত্তির পার হওয়ার পর কাকাবাবু ফ্লাস্কের ঢাকনায় কফি ঢেলে একটু-একটু চুমুক দিচ্ছেন, হঠাৎ তিনি একটা ব্যাপার খেয়াল করলেন। হরিণের মতন ছোট প্রাণীরা জল খেতে-খেতে হঠাৎ মুখ তুলে ঢালু জায়গাটার বাঁ দিকের জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকছে। তারপর তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে দল বেঁধে দৌড়ে পালাচ্ছে।

ওখানে কিছু একটা আছে। বাঘ, কিংবা মানুষ। হিংস্র প্রাণীর উপস্থিতি হরিণই সবচেয়ে আগে টের পায়। মানুষ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। চোরাশিকারিরা এসে গেছে তা হলে! একেবারে নিঃশব্দে কী করে এল? এ-জায়গাটা জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে। ওরা গাড়ি কিংবা ঘোড়ায় চেপে এসে, সেগুলো এক জায়গায় রেখে পা টিপে-টিপে হেঁটে এসেছে?

যেসব সৈন্য গাছ সেজে দূরে ঘিরে আছে, তাদের বলা আছে যে, কেউ ঝিলের দিকে আসতে চাইলে সাড়াশব্দ করবে না। কাকাবাবুর নির্দেশ না পেলে কিছুই করবে না ওরা।

সত্যিই চোরাশিকারিরা এসেছে কি না এখন বোঝা যাচ্ছে না। তবে ছোট-ছোট প্রাণীরা বাঁ দিকটায় তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে পালাচ্ছে ঠিকই। বাঘ হলে কি এতক্ষণে একটাও শিকার ধরত না?

রাত ঠিক পৌনে একটায় কোথা থেকে এক টুকরো মেঘ এসে হাজির হল আকাশে। কাকাবাবু প্রমাদ গুনলেন। এই রে, আরও মেঘ এসে যদি চাঁদটা ঢেকে দেয়, তা হলে কিছুই দেখা যাবে না। আজকের এত উদ্যোগ মাটি হয়ে যাবে?

ঠিক তখনই বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন মানুষ। সাত-আট জন তো হবেই। সকলের হাতে বন্দুক। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা তিনজন মানুষের সমান। এতদূর থেকেও চেনা যায়, সে হিম্মত রাও। পালের গোদা হয়ে সে নিজেও এসেছে।

ওরা সার বেঁধে এগিয়ে আসছে জলের দিকে। একসঙ্গে সবাই মিলে কী করতে চায়? আর ধৈর্য ধরতে পারেনি, ঢালু দিকটা আটকে এক সঙ্গে গুলি চালাবে? যত গুলি খরচ হয় হোক, এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে মারবে?

কাকাবাবু শঙ্কিতভাবে অন্য মাচাগুলোর দিকে তাকালেন। ওরা না ভুল করে কিছু একটা করে বসে!

চোরাশিকারির দলটা একেবারে জলের ধারে চলে এসেছে। উঁচু করেছে রাইফেল। এবার একসঙ্গে গুলি চালাবে।

কাকাবাবু ওভারকোটের পকেট থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোল সুইচ বের করে টিপে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে সেই ভাসমান ফেভিকলের বাক্সটায় দুটো বোমার বিস্ফোরণ হল। শব্দ মানে কী, যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, তোলপাড় হয়ে গেল

ঝিলের জল।

তারপরই যেন শুরু হয়ে গেল প্রলয়। সমস্ত জন্তুগুলো প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে ছুটল দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। হাতি দুটো চিৎকার করে উঠল, জঙ্গলের গাছের সব ঘুমন্ত পাখিরা উড়ে গেল বাসা ছেড়ে। কাকাবাবুর গাছের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াটা লাফাতে লাফাতে দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে।

চোরাশিকারিরা আচমকা সেই সাঙ্ঘাতিক আওয়াজে দিশেহারা হয়ে গিয়ে গুলি চালাতে পারল না। নিজেদের সামলে নেওয়ার আগেই দেখল, গণ্ডার-হাতি-শুয়োরের পাল প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে তাদের দিকে। পালাবার সময় পেল না, তারা পড়ে গেল ওই জানোয়ারদের সামনে।

হিম্মত রাও অত বড় চেহারা নিয়ে একটা গণ্ডারকে হাত দিয়ে রুখবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গণ্ডারের তুলনায় তার গায়ের জোর কিছুই না। গণ্ডারটা তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে আর হিম্মত রাও চেঁচাচ্ছে, "বাঁচাও, বাঁচাও!"

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন। এখন আর তাঁর করার কিছু নেই। যারা নিরীহ জন্তুদের শিকার করতে এসেছিল, এখন তারাই জন্তুদের শিকার। হাতির পায়ের চাপে কিংবা গণ্ডারের ঢুঁসোয় মরবে না বাঁচবে, তা ওরাই বুঝবে। যারা এই জানোয়ারদের হাত ছাড়িয়ে কোনওক্রমে পালাতে পারবে, তারা ধরা পড়বে সেনাবাহিনীর হাতে।

ঝিলের ঢালু দিকটা শেষ হওয়ার পর জঙ্গলের মধ্যে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চলছে। হঠাৎ কাকাবাবু দেখতে পেলেন, একটি কালো পোশাক পরা লম্বা লোক রাইফেল হাতে নিয়ে ছুটে আসছে এদিকে। কাকাবাবু এক পলক তাকিয়েই চিনতে পারলেন টিকেন্দ্রজিৎকে। সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবুর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, ওকে পালাতে দেওয়া চলবে না, ওকে কাকাবাবু নিজে শাস্তি দেবেন।

দড়ির সিঁড়িটা ফেলে কাকাবাবু তরতর করে নেমে এলেন নীচে।

কিন্তু তারই মধ্যে টিকেন্দ্রজিৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঝিলের দিকটা থেকে সে ছুটে আসছিল, এর মধ্যে কোনও বড় গাছ নেই যে, সে গাছে উঠে পড়বে। তা হলে লোকটা গেল কোথায়? অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, না কাকাবাবু চোখে ভুল দেখেছেন!

তিনি রাইফেলটা উঁচিয়ে চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে ওকে খুঁজতে লাগলেন।

যেন মাটি ফুঁড়ে হুস করে উঠে এল টিকেন্দ্রজিৎ। ঠিক কাকাবাবুর পেছনে। সামান্য একটু শব্দ পেয়ে কাকাবাবু ঘুরে দাঁড়াবার আগেই টিকেন্দ্রজিৎ তার রাইফেলটা উলটো দিকে ধরে তার বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল কাকাবাবুর ঘাড়ে।

কাকাবাবু ঝুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

টিকেন্দ্রজিৎ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "বারবার বেঁচে যাবে? আমার প্ল্যান নষ্ট

করেছ, তোমাকে খতম করে দিয়ে যাব।"

আবার সে রাইফেলটা তুলল।

আগের বারের আঘাতটা খুব জোর হয়নি। এবার কাকাবাবুর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, এবার সে তাঁর মাথাটা চুরমার করে দিতে চাইল।

ঠিক তখনই পেছন থেকে টিকেন্দ্রজিতের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল সন্তু। গায়ের জোরে সে পারবে না জেনেই টিকেন্দ্রজিতের চোখ দুটোতে সে আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ অসাধারণ ক্ষিপ্র। মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে সন্তুকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল সে, একটুর জন্য ভারসাম্য হারিয়ে সন্তুকে নিয়েই পড়ে গেল মাটিতে।

সন্তু চট করে গড়িয়ে গিয়ে টিকেন্দ্রজিতের বুকে চেপে বসে তার গলা টিপে ধরে চিৎকার করল, "জোজো, শিগ্‌গির সবাইকে ডাক, টিকেন্দ্রজিৎকে ধরেছি!"

টিকেন্দ্রজিৎকে কাবু করার ক্ষমতা সন্তুর নেই। সে দু' পা তুলে জোরে লাথি কষিয়ে ছিটকে দিল সন্তুকে। স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সন্তুকে কিংবা কাকাবাবুকে আর মারার জন্য জোর না করে সে রাইফেলটা তুলে নিয়ে বিদ্যুতের বেগে ছুটে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

সন্তুই যে এবার কাকাবাবুর প্রাণ বাঁচাল, তা তিনি জানতে পারলেন না। তাঁর জ্ঞান নেই।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি উঠে বসে বললেন, "সে-লোকটা কোথায় গেল? আমি কোথায়?"

কাকাবাবুর দু' ধারে বসে আছে জোজো আর সন্তু। বড়ঠাকুর দাঁড়িয়ে ছিলেন একটু দূরে। কাছে এসে বললেন, "আপনি জেগে উঠেছেন? বাঃ, আর চিন্তার কিছু নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কী হয়েছিল?"

বড়ঠাকুর বললেন, "মাথার পেছন দিকে একটা চোট লেগেছে। থেঁতলে গেছে খানিকটা, তবে ক্ষত খুব গভীর নয়। আমার কাছে ফার্স্ট এড বক্স ছিল, আমি ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি। আর ভয়ের কিছু নেই। এদিকে খবর খুব ভাল জানেন তো? একটাও গণ্ডার মারা যায়নি, কিন্তু চোরাশিকারি ধরা পড়েছে সাতজন। এদের মধ্যে তিনজনের হাত-পা ভেঙেছে। হিম্মত রাওয়ের অবস্থাটা যদি দেখতেন! একটা গণ্ডার ওকে ঢুঁসো দিয়ে-দিয়ে কতবার যে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে তার ঠিক নেই। দুটো পা-ই ফ্র্যাকচার। আর ও কোনওদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে কি না সন্দেহ!"

কাকাবাবু বললেন, "আর টিকেন্দ্রজিৎ?"

বড়ঠাকুর বললেন, "সে পালিয়েছে। তাকে ধরা গেল না। ও লোকটা যে অসম্ভব ধূর্ত! তবু সন্তু প্রায় কব্জা করে ফেলেছিল। সন্তুর অসাধারণ সাহস,

আপনাকে মারবার পর সন্তু টিকেন্দ্রজিতের গলা টিপে ধরেছিল, আমাদের পৌঁছোতে একটু দেরি হয়ে গেল, সেই ফাঁকে পালাল।"

কাকাবাবু আপনমনে বললেন, "পালাল !"

বড়ঠাকুর বললেন, "সে পালিয়েছে বটে, কিন্তু তার দলবল ধরা পড়ে গেছে, আর সে এদিকে মাথা গলাতে সাহস করবে না। আপনার বুদ্ধির জন্য এবারকার মতন অনেক গণ্ডার বেঁচে গেল।"

কাকাবাবু মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যান্ডেজটা অনুভব করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এই জায়গাটা কোথায় ?"

বড়ঠাকুর বললেন, "এটা একটা ওয়াচ টাওয়ার। এই একটা মুশকিল হয়ে গেছে। ওখানে সব মিটিয়ে আমরা এই ক'জন একটা গাড়িতে আসছিলাম। হঠাৎ গাড়িটা মাঝপথে খারাপ হয়ে গেল। কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না। তাই এই ওয়াচ টাওয়ারেই রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। এখানে কোনও ভয় নেই। রাতও প্রায় শেষ হয়ে এল।"

কাকাবাবু শুয়ে আছেন চৌকিদারের খাটিয়ায়। সেটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই বড়ঠাকুর হা-হা করে উঠে বললেন, "আপনি বিশ্রাম নিন, উঠবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার বিশেষ কিছু হয়নি।"

সন্তু এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। সে বলল, "কাকাবাবু, জোজো স্বীকার করেছে, ও আজ যা দেখেছে, সে রকম আর কখনও দেখেনি। হিম্মত রাওয়ের দৌড়ের দৃশ্যটা ভি ডি ও ক্যামেরায় তুলে রাখা উচিত ছিল !"

কাকাবাবু এ-কথায় হাসলেন না। তাকালেনও না ওদের দিকে। মুখখানা উদাসীন। চৌকিদারের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললেন, "টিকেন্দ্রজিৎ পালিয়ে গেল ? শুধু ওকেই ধরা গেল না !"

বড়ঠাকুর পেছনে আসতে-আসতে বললেন, "আপনি আর চিন্তা করবেন না। এবার তো পুলিশের দায়িত্ব। পুলিশ ঠিক ওকে ধরে ফেলবে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, পুলিশ ধরতে পারবে না। ও জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলে কেউ ওকে ধরতে পারবে না। দু-তিন মাস পরে সবাই এ-ঘটনা ভুলে যাবে। আবার ও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আর আমি কলকাতায় গিয়ে খাব-দাব, ঘুমোব ? আর সব সময় মনে পড়বে, টিকেন্দ্রজিৎ আমাকে দু'-দু'বার মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে, আমাকে অপমান করেছে, তবু আমি তার প্রতিশোধ নিতে পারিনি !"

একটু দূরে স্টেশন ওয়াগনটা দাঁড় করানো, তার সামনে একটা ডালা খুলে খুটখাট করছে ড্রাইভার। কাছেই বাঁধা রয়েছে ঘোড়াটা, তার এক পাশে রাইফেল বাঁধা, আর একটি থলি।

কাছে গিয়ে ঘোড়াটার গায়ে দু' বার চাপড় মারলেন। রাইফেলটা তুলে নিয়ে দেখলেন গুলি ভরা আছে কি না। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললেন,

"আমাকেই যেতে হবে টিকেন্দ্রজিৎকে খুঁজতে। আমি যাচ্ছি। তোমরা এখানে থাকো। তোমরা আমার পেছন-পেছন এসো না, টিকেন্দ্রজিৎকে শাস্তি দিয়ে তার পর আমি ফিরব।"

বড়ঠাকুর দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, "আপনি...এখন...এই অসুস্থ শরীর নিয়ে তাকে খুঁজতে যাবেন ? না, না, তা অসম্ভব !"

কাকাবাবু বললেন, "মোটেই অসম্ভব নয়। আমি টিকেন্দ্রজিৎকে শাস্তি দেব, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। যতক্ষণ না সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছি, ততক্ষণ আমার ঘুম হবে না !"

বড়ঠাকুর বললেন, "আপনি কি পাগল হয়েছেন, কাকাবাবু ? এইভাবে একা-একা গেলে... টিকেন্দ্রজিৎ তো যে-কোনও জায়গা থেকে লুকিয়ে গুলি করে আপনাকে মেরে ফেলতে পারে !"

কাকাবাবু বললেন, "মারুক ! হ্যাঁ, আমি পাগল হয়েছি ! প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারলে আমি বাঁচতেও চাই না। আত্মসম্মান বজায় রাখতে না পারলে বেঁচে থেকে লাভ কী ? আমি রাজা রায়চৌধুরী, আমাকে অপমান করে এ-পর্যন্ত আর কেউ পার পায়নি। আমি চললাম।"

বড়ঠাকুর বললেন, "আপনাকে আমরা এ-অবস্থায় কিছুতেই যেতে দিতে পারি না !"

বড়ঠাকুর এগোবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু রাইফেলটা তাঁর দিকে তাক করে বললেন, "খবরদার, বাধা দিতে গেলে আমি গুলি চালাব। সত্যি গুলি চালাব।"

সন্তু দৌড়ে এসে কাকাবাবুর একটা হাত চেপে ধরে বলল, "তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব !"

কাকাবাবু হিংস্রভাবে এক ধাক্কা মেরে সন্তুকে ঠেলে দিয়ে ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করে বললেন, "না, তুই আমার সঙ্গে আসবি না। তুই আমার পেছন-পেছন যদি দৌড়ে আসিস, তোকেও আমি গুলি করব।"

তারপর বড়ঠাকুরকে বললেন, "এই ছেলেটাকে ধরে রাখুন। ওর কিছু হলে তার দায়িত্ব আপনার ! আমি যাচ্ছি। হয় আমি টিকেন্দ্রজিৎকে ধরে নিয়ে আসব, নয় আমি মরব।"

তারপর লাফ দিয়ে ঘোড়াটার পিঠে চেপে ছুটিয়ে দিলেন খুব জোরে। প্রায় চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেলেন জঙ্গলে।

বড়ঠাকুর বললেন, "মাই গড ! মাথায় চোট লাগার ফলে উনি কি সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেলেন ?"

জোজো অস্ফুট স্বরে বলল, "ইচ্ছামৃত্যু ! ইচ্ছামৃত্যু !"

॥ ১০ ॥

বড়ঠাকুরের গাড়ি খারাপ, ইচ্ছে থাকলেও তাঁরা কাকাবাবুকে অনুসরণ করতে পারলেন না। কাকাবাবু চলে গেলেন অনেক দূরে।

গভীর অরণ্যের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, "টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ! যদি সাহস থাকে সামনে এসো! আমি একলা আছি, ভিতুর মতন লুকিয়ে থেকো না!"

জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারের পরোয়া করলেন না, আড়াল থেকে কেউ তাঁকে মেরে ফেলতে পারে, সে-কথাও চিন্তা করলেন না। তিনি একই কথা চিৎকার করে বলতে লাগলেন বারবার।

এখন তাঁকে দেখলে পাগল বলেই মনে হবে।

এত বড় জঙ্গলের কোথায় টিকেন্দ্রজিৎ লুকিয়ে আছে তার ঠিক নেই। এমন কি, সে মণিপুর বা অরুণাচলের দিকেও চলে যেতে পারে। জঙ্গল ছেড়ে লুকোতে পারে পাহাড়ে। তা ছাড়া ডাক শুনতে পেলেই বা সে সামনে আসবে কেন?

এ সব কিছুই কাকাবাবুর মনে পড়ছে না। প্রতিশোধের চিন্তায় তাঁর মাথায় আগুন জ্বলছে। তিনি গলা ফাটিয়ে ডাকলেন, "টিকেন্দ্রজিৎ, টিকেন্দ্রজিৎ!"

ভোর হয়ে যাওয়ার পরও তিনি ক্লান্ত হলেন না, কিন্তু তাঁর ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর নড়তে চায় না।

ঘোড়া থেকে নামলেন কাকাবাবু।

সেটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে তিনি নিজেও একটা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পাশে রইল গুলি ভরা রাইফেল।

তাঁর ঘুম ভাঙল ঘোড়াটার লাফাফাফি ও চিঁহিঁ ডাকে।

কাকাবাবু রাইফেলটা তুলে এদিক-ওদিক তাকালেন। ঘোড়াটা কোনও কারণে ভয় পেয়েছে। দু' পা উঁচুতে তুলে বাঁধন খুলতে চাইছে।"

কাকাবাবু হাঁক দিলেন, "টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ!"

সঙ্গে-সঙ্গে সামনের একটা ঝোপ থেকে একটা হলুদ রঙের প্রাণী এক লাফে আর-একটা ঝোপে গিয়ে পড়ল।

বাঘ! এই প্রথম বাঘ দেখা গেল এই জঙ্গলে। যতদূর মনে হয় লেপার্ড, লোকে বলে চিতাবাঘ, কিন্তু আসল চিতাবাঘ অন্যরকম, অনেক লম্বা হয়। এই লেপার্ডগুলো ছোট হলেও খুব হিংস্র। মানুষের মুখোমুখি হতে সাহস পায় না, কিন্তু ঘোড়ার মাংসের ওপর খুব লোভ।

লেপার্ডটা এখনও ঝোপের মধ্যে বসে আছে। মানুষটাকে ডিঙিয়ে কী করে ঘোড়াটাকে খাবে, বোধ হয় সেই কথা ভাবছে। ভাগ্যিস কাকাবাবুর ঘুমের মধ্যে ঘোড়াটার ওপর লাফিয়ে পড়েনি। কাকাবাবু ক্রাচ দুটো আনেননি। ঘোড়াটা

মরে গেলে তিনি একেবারে অচল হয়ে যাবেন।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। ঝোপের আড়ালে বাঘটার মাথা একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। তিনি ইচ্ছে করলেই পরপর দুটো গুলি চালিয়ে বাঘটাকে মেরে ফেলতে পারেন। কিন্তু অকারণে প্রাণিহত্যা করতে তাঁর মন চায় না।

তিনি জোরে-জোরে বললেন, "এই যাঃ যাঃ! পালা! হরিণ কিংবা খরগোশ ধর না গিয়ে! আমার ঘোড়াটা না হলে তোর চলছে না? যাঃ যাঃ!"

বাঘটার তবু নড়বার নাম নেই। অনেকদিন নিশ্চয়ই সে ঘোড়ার মাংস খায়নি।

বাঘটা কিছুতেই যাচ্ছে না দেখে তিনি রাইফেলের ডগাটা আকাশের দিকে তুলে একবার ফায়ার করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বাঘটা তিড়িং করে এক লাফ দিল, আরও কয়েক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাকাবাবু ঘোড়াটার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "ভয় নেই, ভয় নেই রণজিৎ! আমি যতক্ষণ আছি, তোকে কেউ মারতে পারবে না।"

আবার ঘোড়ায় চেপে তিনি সতর্ক দৃষ্টি মেলে এগোতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে হাঁক দিতে লাগলেন, "টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ!"

তিনি ঠিক করেছেন, যেমন করে হোক, টিকেন্দ্রজিৎকে খুঁজে বের করতেই হবে। তাকে না পেলে তিনি এই জঙ্গল ছেড়ে যাবেন না। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয় হোক!

জঙ্গলের মধ্যে কোথায় তিনি চলে এসেছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর কাছে এই জঙ্গলের একটা ম্যাপ ছিল, সেটা তো সঙ্গে আনেননি। এদিকে কোনও ঝিল বা জলাশয় চোখে পড়ছে না, কাল রাতের জায়গা থেকে এটা নিশ্চয়ই অন্য দিকে।

ঘুরতে-ঘুরতে দুপুরবেলা কাকাবাবু এক জায়গায় কয়েকটা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেলেন। নতুন উৎসাহ নিয়ে তিনি ছুটে গেলেন সেদিকে।

মোট পাঁচটা ঘর। কিছু হাঁস-মুরগি চরছে, দুটো ঘোড়া একটা মাটির গামলা থেকে খড়-বিচালি চিবোচ্ছে। একটি বুড়ো লোক আপনমনে কাঠ কেটে চলেছে।

কাকাবাবু কাছে গিয়ে বুড়োটিকে নমস্কার জানিয়ে অসমিয়া ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি টিকেন্দ্রজিৎকে চেনো, তাকে কাছাকাছি দেখেছ?"

বুড়োটি অবাক হয়ে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "বেশ লম্বা লোক, কালো রঙের ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ায়, মাথায় টুপি।"

একটা ঘর থেকে আর-একজন ছোকরা মতন লোক বেরিয়ে এল। কাকাবাবু তাকেও একই কথা জিজ্ঞেস করলেন।

সে মাথা নেড়ে জানাল যে, না, ওরকম কোনও লোককে তারা চেনে না।

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বার করে বললেন, "আমার ঘোড়াটাকে কিছু খাবার দিতে পারো ? পয়সা দেব।"

কাকাবাবু নেমে দাঁড়াতেই সেই ছেলেটি ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে গেল।

কাকাবাবু একটা ঘরের দাওয়ায় বসলেন। তাঁর মনে পড়ল, তাঁরও বেশ খিদে পেয়েছে। কাল দুপুরের পর আর কিছু খাওয়া হয়নি।

দু-তিন জন স্ত্রীলোক কাকাবাবুকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে। কাকাবাবু তাদের দিকে হাত দিয়ে খাওয়ার ইঙ্গিত করে বললেন, "আমায় কিছু খেতে দেবে ? তোমাদের ঘরে যা আছে, তাই দাও।"

একজন স্ত্রীলোক একটা ছোট বেতের ডালায় করে কিছু মুড়ি আর খানিকটা গুড় নিয়ে এল, কাকাবাবু সেই গুড়-মুড়িই খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন, তারপর ঢকঢক করে একঘটি জল খাওয়ার পর প্রাণটা ঠাণ্ডা হল।

ঘোড়াটাও পেটভরে খেয়ে এসে ফ-র-র ফ-র-র শব্দ করতে লাগল। কাকাবাবু আবার উঠে পড়ে ওই লোকদের বললেন, "তোমাদের ধন্যবাদ আর নমস্কার। এখানে টিকেন্দ্রজিৎ যদি আসে, তাকে বোলো, একজন খোঁড়া লোক তাকে খুঁজছে।"

আবার শুরু হল জঙ্গল পরিক্রমা। মাঝে-মাঝেই কাকাবাবু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন, "টিকেন্দ্রজিৎ ! টিকেন্দ্রজিৎ। যদি মরদ হও তো বেরিয়ে এসো। আমি একা এসেছি। আর কেউ নেই এখানে !"

মাঝে-মাঝে কোনও ঝোপের মধ্যে খচরমচর শব্দ হলে তিনি থেমে যান। মনে হয় যেন টিকেন্দ্রজিৎ তাঁকে অনুসরণ করছে। তারপর দেখা যায়, খরগোশ ছুটে পালাচ্ছে। এক জায়গায় হাতির পাল দেখা গেল, সাতটা বড় আর একটা বাচ্চা হাতি। গণ্ডার এখনও চোখে পড়েনি।

একসময় একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে তিনি থেমে গেলেন। একটা গাড়ি আসছে। কাকাবাবু একটা বেশ ঘন ঝোপের আড়ালে চলে গেলেন। মাথাটা নিচু করে থাকলে এখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। ঘোড়াটা কোনও শব্দ না করলেই হয়।

কাছে আসতে বোঝা গেল, সেটা একটা পুলিশের জিপ। একজন ড্রাইভার ও তিনজন বন্দুকধারী পুলিশ, ওদের মধ্যে সন্তু কিংবা জোজো নেই। ওরা কাকে খুঁজতে এসেছে, টিকেন্দ্রজিৎকে, না কাকাবাবুকে !

কাকাবাবু ঠিক করলেন, ঘোড়াটা যদি শব্দ করে আর জিপটা এই ঝোপের দিকে মুখ ফেরায়, তা হলে তিনি গুলি চালিয়ে জিপটার সামনের আর পেছনের চাকা ফুটো করে দেবেন। তারপর পালাতে অসুবিধে হবে না। তিনি কিছুতেই

ধরা দেবেন না ওদের হাতে। তার সঙ্গের থলিতে রাইফেলের অনেকের বুলেট আছে, কোটের পকেটে আছে রিভলভার।

জিপটা এদিকে ফিরলই না, সোজা চলে গেল। কেমন যেন দায়সারা ভাব। এমনভাবে খুঁজলে ওরা সারাজীবনেও টিকেন্দ্রজিৎকে খুঁজে পাবে না।

আবার ঘুরতে-ঘুরতে বিকেলের দিকে কাকাবাবু কিছু বাড়িঘর দেখতে পেলেন। জঙ্গলের মধ্যে এরকম আদিবাসীদের কিছু-কিছু বসতি থাকে। এ-জায়গাটা একটু বড়, গোটা পনেরো কুঁড়েঘর রয়েছে একটা গোল উঠোন ঘিরে।

একজন বুড়ো আপনমনে কুড়ুল দিয়ে একটা গাছের গুঁড়ি কেটে চ্যালাকাঠ করছে। কাকাবাবু তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "নমস্কার, তুমি টিকেন্দ্রজিৎকে চেনো ?"

বুড়োটি একটুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে টিকেন্দ্রজিতের বর্ণনা শুনল, তারপর আঙুল তুলে দূরে অন্য একটি লোককে দেখিয়ে দিল। সে-লোকটি একটি খাটিয়ার দড়ি মেরামত করছে। তার পাশেই একটি ঘরের দেওয়ালে একটা হরিণের শিং-সুদ্ধ শুকনো মাথা ঝোলানো রয়েছে।

কাকাবাবুর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। তা হলে টিকেন্দ্রজিতের সন্ধান পাওয়া গেছে !

সে-লোকটি কিন্তু কোনও পাত্তাই দিল না কাকাবাবুকে। ভুরু কুঁচকে কাকাবাবুকে আপাদমস্তক দেখে বলল, "কে টিকেন্দ্রজিৎ ? কখনও এ-নাম শুনিনি। কোনও বাইরের লোক এখানে আসে না।"

কাকাবাবু অনেকরকম চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে গোঁয়ারের মতন একই কথা বলে যেতে লাগল। এর কাছ থেকে কিছু জানার আশা নেই।

কাছেই কয়েকটি অল্পবয়েসী মেয়ে মাটিতে দাগ কেটে কী যেন খেলছে। কাকাবাবু সেদিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে। একটি মেয়েকে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। এর চেহারাও অন্য মেয়েদের থেকে কিছুটা আলাদা। সে একটা হলুদ রঙের ফ্রক পরে আছে।

কাকাবাবু ঘোড়াটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, "তুমি, তুমি ফিরোজা না ?"

মেয়েটিও চিনতে পেরেছে কাকাবাবুকে। সে ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে রইল।

কাকাবাবু এবার সেই গোমড়ামুখো লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ-মেয়েটিকে তোমরা কোথায় পেলে ? এ তো তোমাদের গ্রামের নয়।"

সেখানে আরও অনেকে ভিড় করে দাঁড়াল। সবাই মিলে বলতে লাগল যে, এ মেয়েটি সত্যিই তাদের কারও নয়। একটা লোক এই মেয়েটার হাত-পা বেঁধে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আর মেয়েটা খুব কাঁদছিল, তখন এ-গ্রামের

কয়েকজন লোক সেই চোরটাকে মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। সাত-আট দিন ধরে মেয়েটা এখানেই রয়ে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, "ওকে ওর বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসোনি কেন ? ওর বাবা-মা কত কষ্ট পাচ্ছে।"

ওদের একজন বলল, "ও মেয়ে যে কোথায় বাড়ি, কাদের মেয়ে, তা কিছুই বলতে চায় না। আমরা জঙ্গল ছেড়ে বাইরে যাই না, আমরা কী করে পৌঁছে দেব ? আপনি নিয়ে যান না ওকে !"

কাকাবাবু দো-টানার মধ্যে পড়ে গেলেন।

জলিল শেখ তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাঁর মেয়েকে এখানে দেখেও তিনি ফেলে যাবেন কী করে ? জলিল শেখ মেয়ের জন্য খুব কাঁদছিল। মেয়েটার মাও নিশ্চয়ই কাঁদছে। কিন্তু এ-মেয়েকে এখন বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলে আর টিকেন্দ্রজিতের খোঁজ করা হবে না।

এমনভাবে জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে তিনি কতদিন খুঁজবেন ! কখনও কি তাকে পাওয়া যাবে ? নাঃ, এরকম ঘুরে আর লাভ নেই। ফিরে যাওয়াই ভাল। অন্যায়ের প্রতিশোধ কিংবা অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার চেয়েও কি উপকারীর ঋণশোধ করা অনেক বড় কাজ নয় ?

কাকাবাবু ফিরোজাকে কোলে নিয়ে বললেন, "কী রে, দুষ্টু মেয়ে, বাড়ি যাবি না ?"

ফিরোজা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, কাকাবাবু তাকে জোর করে ঘোড়ায় তুলে নিলেন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জেনে নিলেন জঙ্গল থেকে বেরোবার রাস্তা কোনদিকে।

ফিরোজা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কাকাবাবু আদর করে তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, "কী রে ফিরোজা, তোর বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে না কেন ?"

ফিরোজা বলল, "বাবা আমাকে মারে !"

কাকাবাবু বললেন, "আহা, একদিন মারলেও বাবা তোকে ভালবাসে। মা ভালবাসে না ?"

ফিরোজা বলল, "আমার নিজের মা তো নেই ! বাড়িতে অন্য মা।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলেও ওটা তো তোর নিজের বাড়ি। তুই ইস্কুলে পড়িস না !"

ফিরোজা বলল, "হ্যাঁ, পড়ি।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ এখানে বেশ ইস্কুল ফাঁকি দিয়ে রয়েছিস। বেশ মজা, তাই না ? তুই এই গ্রামে এলি কী করে ?"

ফিরোজা বলল, "আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে একটা জঙ্গলে বসে ছিলাম। তখন একটা লোক এসে আমার হাত-পা বেঁধে ফেলল—"

ওর সঙ্গে গল্প করতে-করতে ধীর গতিতে চলতে লাগলেন কাকাবাবু।

হঠাৎ তাঁর মাথায় সেই পাগলামিটা আবার ফিরে এল। এ তিনি কী করছেন ? টিকেন্দ্রজিতের ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরে যাবেন ? টিকেন্দ্রজিৎ গোপন জায়গায় বসে হাসবে। একবার লোকালয়ে গিয়ে পড়লে আর তাঁর ফেরা হবে না। কলকাতায় গিয়ে অনবরত এই কথাটা তার মনে কাঁটার মতন বিঁধবে। এ পর্যন্ত যারাই তাঁর গায়ে হাত দিয়েছে, তাদেরই তিনি শাস্তি দিয়েছেন। টিকেন্দ্রজিৎ জিতে যাবে ? এ ব্যর্থতা তিনি মেনে নিতে পারবেন না সারা জীবন।

উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন, "ফিরোজা, আমার একটা কাজ বাকি আছে। তুই আর দু-একদিন এই আদিবাসীদের সঙ্গে থাকতে পারবি ?"

ফিরোজা মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ, পারব।"

কাকাবাবু এবার খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এলেন গ্রামে। ওরা আবার ভিড় করতেই তিনি একটা একশো টাকার নোট একজন বৃদ্ধকে দিয়ে বললেন, "ওকে তোমাদের কাছেই রাখো। আমি ফিরে এসে ওকে নিয়ে যাব। যদি আমি ফিরে না আসি, ওকে জামগুড়ি গ্রামের জলিল শেখের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ো।"

তারপরই আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন উলটো দিকে।

বনে-বনে তাঁর চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, "টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ !"

বিকেল শেষ হয়ে আসছে। একটু পরই রাত্রি নেমে আসবে। এই ঘোর অরণ্যের মধ্যে তিনি কোথায় থাকবেন, কী করে থাকবেন, কোনও চিন্তাই করছেন না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি সারারাতই এইভাবে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ঘুরছেন।

কোথাও পথের চিহ্ন নেই। গাছপালা ঠেলে-ঠেলে তাঁকে এগোতে হচ্ছে। এক-এক জায়গায় জঙ্গল এমনই দুর্ভেদ্য যে, সামনে এগোতে না পেরে ঘুরে যেতে হচ্ছে তাঁকে।

চিৎকার করতে-করতে কাকাবাবুর গলা চিরে যাচ্ছে। তিনি ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছেন। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

তাঁর সেই রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে পালাল একপাল হরিণ। মাথার ওপর দিয়ে ঝটপট করে উড়ে যাচ্ছে পাখি। ঘোড়াটাও ডেকে উঠছে মাঝে-মাঝে, কাকাবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

মাঝে-মাঝে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। ঠিক খেলার মাঠের মতন। আবার কোথাও এত বেশি ঝোপঝাড় আর লতাপাতা যে, দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে। এদিকটায় ছোট-ছোট পাহাড় রয়েছে। পাথরের ফাঁকে বড়-বড় সুড়ঙ্গের মতন। লুকোবার কত জায়গা। এসব জায়গা

থেকে কাউকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব !

কাকাবাবু তবুও খুঁজছেন আর চিৎকার করে ডাকছেন, "টিকেন্দ্রজিৎ, টিকেন্দ্রজিৎ !" ঝোপঝাড় ঠেলে দেখছেন, পাহাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে ঘুরে-ঘুরে দেখছেন।

একটা ছোট্ট টিলা ঘুরে আসতেই সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তার এক প্রান্তে স্থির হয়ে রয়েছে এক কালো ঘোড়ায় অশ্বারোহী।

কাকাবাবু প্রথমটায় দেখতেই পাননি, ডান দিক-বাঁ দিক দেখতে দেখতে আসছিলেন, হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়তেই তিনি দ্রুত ঘোড়ার রাশ টানলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ রাইফেল তুলে তাক করে আছে।

কাকাবাবুর এক হাতে ঘোড়ার রাশ, এক হাতে রাইফেল। দু' হাত দিয়ে না ধরলে ঠিকমতন গুলি চালানো যায় না। টিকেন্দ্রজিৎ একেবারে তৈরি হয়ে রয়েছে, কাকাবাবু রাইফেল তোলার সময় পেলেন না।

টিকেন্দ্রজিৎ গম্ভীরভাবে বলল, "তোমার হাতের রাইফেলটা ফেলে দাও রায়চৌধুরী।"

রাইফেলটা ফেলার বদলে কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। টিকেন্দ্রজিৎকে যে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেছে, তাতেই তাঁর ক্লান্তি কমে গেল। যাক, আর খুঁজে বেড়াতে হবে না !

টিকেন্দ্রজিৎ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "কী ব্যাপার বলো তো রায়চৌধুরী, তোমার এত মরার শখ কেন ? সারাদিন তুমি আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছ ! উইপোকা যেমন মরার জন্য আলোর দিকে ছুটে আসে, সেইরকম তুমিও আমার হাতেই মরতে চাও !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একা এসেছি। সঙ্গে পুলিশ কিংবা আর্মি আনিনি। তোমার সঙ্গে আমার শেষ লড়াইটা বাকি আছে।"

টিকেন্দ্রজিৎ হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "কীসের শেষ লড়াই ? এক্ষুনি গুলি করে তোমার মাথা ছাতু করে দিতে পারি, সব শেষ হয়ে যাবে। এর আগে অন্তত পাঁচ বার তোমাকে পেছন থেকে গুলি করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তুমি আমার নাম ধরে এত ডাকছ, তাই আমার কৌতূহল হল। এত আন্তরিকভাবে ডাকলে লোকে ভগবানেরও দেখা পেয়ে যায়, তাই আমি তোমার সামনে এলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "পেছন থেকে গুলি করে কাপুরুষরা। তুমি এক সময় খেলোয়াড় ছিলে। খেলার নিয়ম মানবে না ? সাহস থাকে তো সামনাসামনি লড়ে যাও !"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "এটা ছেলেখেলা নয় ! তুমি আমাদের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছ। বহু টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। সামান্য কয়েকটা গণ্ডার মরলে কী ক্ষতি

হত ? তার বদলে তোমাকে মরতে হবে। আমার মায়াদয়া নেই। তোমাকে এখানে মেরে ফেলে দিয়ে গেলেও পুলিশ কোনও দিন আমাকে ধরতে পারবে না। তুমি রাইফেল তোলার চেষ্টা করলেই আমি গুলি চালাব, তুমি খতম হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এর আগে অনেকেই আমাকে এ-কথা বলেছে, কিন্তু কেউ তো এ-পর্যন্ত মারতে পারেনি। আমি ম্যাজিক জানি, তাই আমি বারবার বেঁচে যাই। তুমি প্রথম বার টিপ ফসকাবে, সঙ্গে-সঙ্গে আমি দু' হাতে রাইফেল ধরে নেব। তারপর ? তুমি যদি অপ্রস্তুত থাকতে, আমি কিন্তু প্রথমেই তোমাকে গুলি করতাম না। তোমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি যখন, তোমাকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দিতাম। যদি পুরুষ মানুষ হও, সামনাসামনি সমানে-সমানে লড়তে এসো !"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "তোমার সঙ্গে সামনাসামনি আমি কী লড়ব ? হাতাহাতি ?"

কাকাবাবু বললেন, "রাজি আছি !"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "এ তো আচ্ছা পাগল দেখছি ! তুমি একে তো খোঁড়া, তায় প্রায় বুড়ো। তুমি পারবে আমার সঙ্গে ? তুমি তো দৌড়তেই পারবে না। আমি দৌড়ে-দৌড়ে তোমার চার পাশে ঘুরব, আমাকে ছুঁতেও পারবে না তুমি। আমি তোমার হাত-পা ছিঁড়ে ফেলব, ঘাড় মুচড়ে দেব। আমার কত শক্তি, জানো না তুমি !"

কাকাবাবু বললেন, "তুমিও আমার শক্তি জানো না।"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "তলোয়ার ধরতে জানো ?"

কাকাবাবু বললেন, "জানি। জোগাড় করো, তলোয়ার লড়তেও রাজি আছি।"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "একজন খোঁড়া লোকের সঙ্গে তলোয়ার লড়তে হবে ? লোকে শুনলে হাসবে। দশ গোনারও সময় পাবে না। তোমার পেট ফুটো করে দেব। আমি ফেন্সিং চ্যাম্পিয়ান।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার মতো চ্যাম্পিয়ান আমি ঢের দেখেছি। আমার একটা পা-ই তোমার সঙ্গে লড়ার জন্য যথেষ্ট ! তলোয়ার যখন নেই, তখন ডুয়েল লড়ো !"

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, "ডুয়েল ? হা-হা-হা-হা ! তুমি জানো না, একজন পুলিশ কমিশনার আমার নাম দিয়েছে 'ফাস্টেস্ট গান অ্যালাইভ'। তুমি চোখের পলক ফেলবার আগে আমি গুলি চালাতে পারি। তুমি মরবে, মরবে রায়চৌধুরী। তোমার আর নিস্তার নেই।"

কাকাবাবু বললেন, ডুয়েল লড়তে গিয়ে মৃত্যু অনেক সম্মানজনক। তুমি যদি মরো, তা হলে লোকে অন্তত এইটুকু বলবে যে, তুমি বীরের মতন

মরেছ।”

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে টিকেন্দ্রজিৎ বলল, “ঠিক আছে, চুকিয়ে ফেলা যাক। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।”

কাকাবাবুও নেমে পড়ে বললেন, “রাইফেল, না রিভলভার ?”

টিকেন্দ্রজিৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “যেটা ইচ্ছে, দুটোই আমার কাছে সমান।”

কাকাবাবু বললেন, “তবু তোমাকে আমি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছি। তুমি কোনটা চাও ?”

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, “ঠিক আছে, রিভলভার।”

দু'জনেই রাইফেল নামিয়ে রেখে রিভলভার বের করল।

কাকাবাবু বললেন, “আমরা দু'জনে উলটো দিকে ঠিক কুড়ি পা হেঁটে যাব।”

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, “তারপর অন্য একজনের দশ গোনার কথা। এখানে কে গুনবে।”

দু'জনে দু'দিকে গিয়ে দাঁড়াল। টিকেন্দ্রজিৎ বীরের মতন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাকাবাবু খোঁড়া পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না, একটু ঝুঁকে আছেন।

টিকেন্দ্রজিৎ গুনল, “এক...”

কাকাবাবু বাঁ হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ গুনল, “দুই, তিন, চার, পাঁচ...”

কাকাবাবুর রিভলভার সমেত ডান হাতটা নীচের দিকে নামানো।

টিকেন্দ্রজিৎ গুনল, “ছয়, সাত, আট, নয়...”

কাকাবাবুর কোনও উত্তেজনা নেই। তিনি সোজা চেয়ে আছেন তাঁর প্রতিপক্ষের দিকে।

টিকেন্দ্রজিৎ “দশ” বলেই কায়দা করে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। বলল, “তুমি মারো !” পরপর তিনটি গুলির শব্দ হল।

টিকেন্দ্রজিৎ ঝুপ করে নেমে এল মাটিতে। ওদিকে কাকাবাবুও মাটিতে পড়ে আছেন উপুড় হয়ে।

প্রথমে টিকেন্দ্রজিৎ কাতর শব্দ করে উঠল, “আঃ !”

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে উঠে বসলেন। তারপর এক পায়ে লাফাতে-লাফাতে চলে এলেন টিকেন্দ্রজিতের কাছে। টিকেন্দ্রজিৎ যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াতে শুরু করেছে। তার ডান হাত ও ডান পায়ের হাঁটুর কাছটা রক্তে মাখা। রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেছে অনেক দূরে।

টিকেন্দ্রজিৎ কাতরভাবে বলতে লাগল, “আমার আঙুল, আমার বুড়ো আঙুলটা নেই। আর কোনও দিন আমি অস্ত্র ধরতে পারব না। আমার হাঁটু,

হাঁটু ভেঙে গেছে। আমি আর বাঁচতে চাই না। রায়চৌধুরী, তুমি আর-একবার গুলি করে আমায় মেরে ফেলো।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি মানুষ মারি না"। জীবনে একটাও লোককে মেরে ফেলিনি! তোমাকে শাস্তি দেওয়ার কথা ছিল, শাস্তি দিয়েছি। তুমি আমার চুলের মুঠি ধরেছিলে। জীবনে আর কোনও কিছুই মুঠোয় চেপে ধরতে পারবে না। ডান পায়ে লাথি মেরেছিলে, আর কোনও দিন কাউকে লাথি মারতে পারবে না।"

টিকেন্দ্রজিৎ আবার বলল, "আমায় মেরে ফেলো। এই অবস্থায় আমি কিছুতেই বাঁচতে চাই না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমি আত্মহত্যা করার জন্য তৈরি ছিলাম। আত্মসম্মান বজায় রাখতে না পারলে বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা। তুমি লোককে ভয় দেখিয়ে চলতে। এখন আর তোমায় কেউ ভয় পাবে না, এটাই তোমার শাস্তি। আমার আর-একটা কাজ বাকি আছে।"

টিকেন্দ্রজিৎ হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "আমি আর কথা বলতে পারছি না। রায়চৌধুরী, দয়া করে কাছে এসো, আমার মাকে শুধু একটা কথা জানাতে হবে।"

কাকাবাবু কাছে এসে মুখ ঝুঁকিয়ে দাঁড়াতেই টিকেন্দ্রজিৎ তার অক্ষত বাঁ হাতটা দিয়ে কাকাবাবুর একটা পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। কাকাবাবু ধড়াম করে পড়ে গেলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ তার রক্তমাখা শরীর নিয়ে কাকাবাবুর বুকে চেপে হিংস্র গলায় বলল, "আমি মরব, তার আগে তোমাকেও শেষ করে যাব।"

সে কাকাবাবুর গলা চেপে ধরলেও তিনি ঘাবড়ালেন না। টিকেন্দ্রজিতের গায়ে যতই জোর থাক সে একহাতে কাকাবাবুকে কাবু করতে পারবে না। কাকাবাবু কোনওক্রমে ডান হাত তুলে একটা প্রচণ্ড ঘুসি কষালেন তার এক চোখে। তারপর তাকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন বুক থেকে।

চোখের ব্যথায় আরও জোর ছটফট করতে লাগল টিকেন্দ্রজিৎ।

কাকাবাবু হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে বললেন, "একটা কাজ বাকি আছে।"

টিকেন্দ্রজিতের কোটের পকেট হাতড়ে পেয়ে গেলেন লাইটার ও চুরুট। বহুদিন পর চুরুট ধরাবার জন্য তিনি কাশলেন দু' বার। মুখ বিকৃত করে বললেন, "ভাল লাগছে না।"

চুরুটের মুখটা যখন লাল গনগনে হল, তখন কাকাবাবু সেটা চেপে ধরলেন টিকেন্দ্রজিতের বুকে।

টিকেন্দ্রজিৎ আঁ-আঁ করে বিকট আর্তনাদ করে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "অন্য লোককে যখন কষ্ট দাও, তখন মনে থাকে না যে, নিজের শরীরে কষ্টটা কেমন লাগে?"

টিকেন্দ্রজিতের গলায় একটা সরু লোহার চেনে একটা বাঘের মুখের ছবিওয়ালা লকেট ঝুলছে। কাকাবাবু একটানে সেটা ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, "এটা আর তোমাকে এখন মানায় না। তুমি এখন একটা শেয়াল!"

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "আমাকে তুমি জঙ্গলে ফেলে রেখে গিয়েছিলে, তোমাকেও ফেলে রেখে গেলাম। হয় জন্তু-জানোয়ারের হাতে মরবে, কিংবা যদি কেউ বাঁচাতে আসে, ভাগ্যে যদি থাকে, তা হলে বাঁচবে।"

টিকেন্দ্রজিতের ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে, নিজের ঘোড়ায় চেপে কাকাবাবু ফিরে এলেন আদিবাসীদের গ্রামে। ফিরোজাকে তুলে নেওয়ার পর তিনি গ্রামের সেই গোমড়ামুখো লোকটাকে বললেন, "টিকেন্দ্রজিৎ নামে একজন লোক ওইদিকে জঙ্গলে আহত হয়ে পড়ে আছে। চিকিৎসা করলে এখনও সে বাঁচতে পারে। দ্যাখো, তাকে বাঁচাতে পারো কি না?"

ফিরোজাকে তার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দিতে রাত ভোর হয়ে গেল। সে-বাড়িতে কাকাবাবু বিশ্রাম নিলেন খানিকক্ষণ। তারপর বাংলোয় যখন ফিরে এলেন, তখন সকাল ন'টা বাজে।

সন্তু, জোজোরাও ফিরেছে একটু আগে। সারারাত তারা খোঁজাখুঁজি করেছে জঙ্গলে। তিনটি সার্চ পার্টি ঘুরেছে বিভিন্ন দিকে। হতাশ হয়ে ফিরে এসে সবেমাত্র তারা একটু ঘুমোবার আয়োজন করছে, এমন সময় বাগানে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে এল বারান্দায়।

ঘোড়া থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে-উঠতে কাকাবাবু বললেন, "আমার ক্রাচ দুটো এনেছিস তো রে! চা-টা বানাতে বল। আজ ভাল করে ব্রেকফাস্ট খাব।"

কাকাবাবুর শরীরে একটুও ক্লান্তির চিহ্ন নেই। চোখমুখ উজ্জ্বল, ঠোঁটে সেই স্বাভাবিক হাসি। তিনি একটা ইজিচেয়ারে বসলেন।

সন্তু, জোজো দু'জনে একসঙ্গে নানা প্রশ্ন শুরু করতেই কাকাবাবু হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "সব ঘটনাটা বলার আগে তোদের একটা জিনিস দেখাই। রূপকথার গল্পে পড়েছিস তো, রাজকুমার গিয়েছিল এক দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে, পাহাড়ের গুহায়। দারুণ যুদ্ধের পর তো দৈত্যকে হারিয়ে দিল রাজকুমার। কিন্তু রাজধানীতে ফিরে প্রমাণ দিতে হবে তো! সেইজন্য রাজকুমার দৈত্যের মস্ত বড় জিভটা কেটে এনেছিল। আমিও একটা জিনিস এনেছি।"

কাকাবাবু কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে কিছু তুলে আনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী প্রমাণ এনেছি বল তো?"

কোনও উত্তর না দিয়ে ওরা দু'জন উৎসুকভাবে চেয়ে রইল।

কাকাবাবু মুঠো খুলে দেখালেন। টিকেন্দ্রজিতের গলার সেই বাঘমুখো ছবিওয়ালা লকেট!

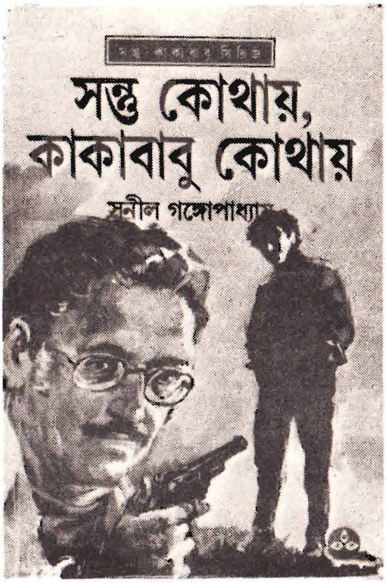

সন্তু কোথায়, কাকাবাবু কোথায়

সকালবেলা হোটেলের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে। বাথরুমেও টেলিফোন আছে, দুটো ফোন একসঙ্গে বাজলে বেশি শব্দ হয়। কাকাবাবু বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে-কামাতে গুন্‌গুন্‌ করে একটা গান গাইছিলেন, বেশ চমকে উঠলেন টেলিফোনের আওয়াজ শুনে।

এই হোটেলের অনেক কর্মচারীই বাঙালি। প্রথম দিন রিসেপশান কাউন্টারে এসে কাকাবাবু নিজের নাম বলার আগেই একটি মেয়ে তাঁকে চিনতে পেরেছিল। হাসিমুখে হাতজোড় করে বাংলায় বলেছিল, "নমস্কার সার, আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী ? আসুন, আসুন, আমাদের হোটেলের কী সৌভাগ্য !"

সেই মেয়েটির নাম মণিকা দাশগুপ্ত। সে সঙ্গে-সঙ্গে একটা অটোগ্রাফ খাতা বার করে কাকাবাবুর সই নিয়েছিল।

এখন কাকাবাবু ফোনের রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই সেই মণিকা নামের মেয়েটিই বলল, "গুড মর্নিং সার। দু'জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওপরে আপনার ঘরে পাঠিয়ে দেব ?"

কাকাবাবু ঘড়িতে দেখলেন, সাতটা পঁচিশ বাজে। এরকম সকালে কারা দেখা করতে এল ? কারও তো আসবার কথা নেই। তিনি যে ভাইজাগ এসেছেন, তাও বিশেষ কেউ জানে না। কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে রইলেন। সকালবেলা যে-কোনও লোকের সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি অনেকক্ষণ সমুদ্রের ধারে পায়চারি করেছেন, এখন দাড়ি কামিয়ে স্নানটান করবেন, তারপর ব্রেকফাস্ট খাবেন। দশটার সময় তাঁর এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কারা এসেছেন, মণিকা ? ওঁদের কি আমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল ?"

মণিকা বলল, "না সার। সেটা আমি আগেই জিজ্ঞেস করেছি। এঁদের

কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। কিন্তু এঁরা বলছেন, আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "দুঃখিত। ওঁদের বলে দাও, এখন দেখা করতে পারছি না। আমি এখনও তৈরি হইনি।"

কাকাবাবু ফোনটা রেখে দিয়ে গালে আবার সাবান ঘষতে লাগলেন।

আবার বেজে উঠল ফোন।

কাকাবাবু এবার একটু কড়া গলায় বললেন, "মণিকা, আমি চাই না কেউ এখন আমাকে বিরক্ত করুক। আমি এখন স্নান করতে যাচ্ছি। সকাল ন'টার আগে আমাকে আর টেলিফোনে ডেকো না।"

মণিকা আড়ষ্টভাবে বলল, "দুঃখিত সার, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি সার, কিন্তু এঁরা বলছেন, এঁরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছেন, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আপনি ফোনে কথা বলবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশের সঙ্গেও আমার কোনও জরুরি কথা থাকতে পারে না। আমি এখানে বেড়াতে এসেছি, কোনও কাজের কথা শুনতে চাই না!"

ফোনটা কেটে দিয়ে কাকাবাবু আবার দাড়ি কামানোতে মন দিলেন। কিন্তু একটু আগে যে গানটা গাইছিলেন, সেটা আর মনে এল না।

দাড়ি কামিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে তিনি সুটকেস খুলে জামা-কাপড় বার করতে লাগলেন।

হোটেলের ঘরের এক দিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ কাচের। পরদা সরালেই দেখা যায় সমুদ্র। এই শহরটার নাম কেউ বলে বিশাখাপত্তনম, কেউ বলে ভাইজাগ। এখানকার সমুদ্র ভারী সুন্দর। পাহাড় আর সমুদ্র একসঙ্গে দেখা যায়। কাকাবাবুর ঘর থেকে ডান দিকে তাকালে দেখা যায়, একটা পাহাড় যেন সমুদ্র থেকে খানিকটা মাথা উঁচু করে আছে। ওই পাহাড়টার নাম 'ডলফিন্‌স নোজ', শুশুকের নাক, ঠিক সেইরকমই দেখতে লাগে।

দরজায় দু'বার টোকা পড়ল। কাকাবাবু ভাবলেন, ভোরবেলা একটি বেয়ারা বেড-টি দিয়ে গিয়েছিল, সে বোধ হয় কাপ-প্লেট নিতে এসেছে। কাকাবাবু বললেন, "কাম-ইন!"

আবার দু'বার টকটক শব্দ হল দরজায়।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মাঝবয়েসী লোক। একজন সাদা শার্ট-প্যান্ট পরা, অন্যজনের একেবারে পুরোদস্তুর পুলিশের খাকি পোশাক, কোমরে রিভলভার, মাথায় টুপি পর্যন্ত। কাকাবাবু এদের আগে কখনও দেখেননি।

কাকাবাবু রীতিমতন বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার? আমি এখন কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইনি।"

সাদা পোশাক পরা ব্যক্তিটি বলল, "দুঃখিত, মিঃ রায়চৌধুরী। আমরা ডিউটি করতে এসেছি। আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কথা বলার তো একটা সময়-অসময় থাকে? আপনাদের কে পাঠিয়েছে? অনেক সময় পুলিশের লোকেরা নানা ব্যাপারে আমার পরামর্শ চায়।

"এখানকার পুলিশের কোনও বড়কর্তাকে তো আমি চিনি না। আপনাদের যে-ই পাঠাক, তাঁকে গিয়ে বলুন, এখানে আমি পুলিশের কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামাতে রাজি নই। আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই।"

পুলিশ দু'জন পরস্পরের দিকে চোখাচোখি করল। খাকি পোশাক পরা পুলিশটি রুক্ষভাবে বলল, "দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়ান, আমরা ভেতরে ঢুকে কথা বলব।"

সাদা পোশাক পরা লোকটি হাত তুলে তাকে থামতে ইঙ্গিত করে বিনীতভাবে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমাদের কেউ পাঠায়নি। আমরা স্পেশ্যাল স্কোয়াড থেকে আসছি। আমার নাম রঙ্গরাজ, আমার সঙ্গীর নাম রামা রাও।

"একটা কেসের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার। আপনাকে সব খুলে বললে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। আমরা কি ভেতরে গিয়ে বসতে পারি?"

রঙ্গরাজ তার জামার ভেতরের দিকের পকেট থেকে পরিচয়পত্র বার করে দেখাল।

কাকাবাবু দরজার কাছ থেকে সরে এলেন।

পুলিশ দু'জন দুটি চেয়ারে বসল।

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে আর-একটা চেয়ার টেনে নিলেন।

রঙ্গরাজ একটা নোটবুক আর কলম হাতে নিয়ে বলল, "আপনার নাম রাজা রায়চৌধুরী, আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন, ঠিক?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা আমার নাম জেনেশুনেই তো এসেছেন। আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

রঙ্গরাজ বলল, "এসব হচ্ছে রুটিন প্রশ্ন।"

কাকাবাবু বিদ্রূপের সুরে বললেন, "তার মানে, শুধু কথা বলতে নয়, আপনারা এই সকালবেলা আমাকে জেরা করতে এসেছেন?"

রঙ্গরাজ বলল, "তা একরকম বলতে পারেন। জানতে পারি কি, আপনি হঠাৎ এই সময় ভাইজাগ এসেছেন কেন ?"

কাকাবাবু খুব বিস্ময়ের ভান করে ভুরু তুলে বললেন, "সে কী কথা ? আমি স্বাধীন ভারতের একজন নাগরিক। কাশ্মির থেকে কন্যাকুমারিকা, যে-কোনও জায়গায় যখন খুশি যেতে পারি। এটা তো আমাদের নাগরিক অধিকার, তাই না ?"

রঙ্গরাজ বলল, "তা ঠিক। তবে, আরও অনেক জায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ ভাইজাগ এলেন কেন, সেটাই জানতে চাইছি।"

কাকাবাবু বললেন, "হঠাৎ আবার কী ? ইচ্ছে হয়েছে, তাই এসেছি।"

রঙ্গরাজ বলল, "অর্থাৎ, কেন এসেছেন, তা আপনি জানাতে চান না।"

কাকাবাবু বললেন, "জানাতে আমি বাধ্য নই !"

রামা রাও এর মধ্যে পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ধরাতেই কাকাবাবু সেদিকে ফিরে বললেন, "যদি চুরুট টানতে চান, আপনাকে বাইরে যেতে হবে। আমি চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারি না।"

রামা রাও তাড়াতাড়ি চুরুটটা অ্যাশট্রেতে ঠুকে-ঠুকে নিভিয়ে ফেলল।

তারপর কাকাবাবুর একটা ক্রাচ তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, "আপনি কি সবসময় ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন ? না কি এর ভেতরটা ফাঁপা ?"

কাকাবাবু বুঝলেন, এই লোকদুটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না।

সারা ভারতের বড়-বড় শহরের পুলিশের বড়কর্তারা তাঁকে চেনে। অন্য কোথাও এই ধরনের মাঝারি পুলিশরা তাঁকে জেরা করতে সাহস করত না।

ভাইজাগ শহরের পুলিশের ওপর মহলের কোনও অফিসার সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নিয়ে আসেননি। ভেবেছিলেন সেরকম কোনও দরকারও হবে না।

এই লোক দুটো শুধু-শুধু কিছুক্ষণ তাঁর সময় নষ্ট করে যাবে। শুধু সময় নষ্ট নয়, মেজাজ নষ্ট।

রঙ্গরাজ একটা ফোটোগ্রাফ বার করে কাকাবাবুর চোখের সামনে দেখিয়ে বলল, "এই লোকটিকে চিনতে পারেন ?"

পুরো চেহারা নয়, শুধু একটা মুখের ছবি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় অর্ধেক টাক, চোখ দুটো কোঁচকানো, ঠোঁটের ভঙ্গি নিষ্ঠুর ধরনের। সাধারণ চোর-ডাকাতের মতন।

কাকাবাবু একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "না, চিনি না। কখনও দেখিনি।"

রঙ্গরাজ বলল, "ভাল করে ভেবে দেখুন। চেনেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার স্মৃতিশক্তি ভাল। আমি মানুষের মুখ কখনও ভুলি না।"

রঙ্গরাজ বলল, "এই লোকটি কিন্তু আপনাকে চেনে। এর কাছ থেকেই আপনার ঠিকানা পেয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে যদি কেউ চেনে, আমিও তাকে চিনব, এ তো বড় অদ্ভুত যুক্তি! মনে করুন, একটা চোর আপনার বাড়িতে চুরি করার জন্য রোজ লুকিয়ে-লুকিয়ে আপনার ওপর নজর রাখে, আপনার নাড়ি-নক্ষত্র সব জেনে নেয়, তা বলে কি আপনিও চোরটাকে চিনবেন?"

একটু হেসে তিনি আবার বললেন, "আমি নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। শুধু এইটুকু বলি, এমন অনেকেই আমাকে চেনে, যাদের আমি চিনি না।"

রামা রাও বলল, "অত বেশি কথার দরকার কী? রঙ্গরাজ, এই লোকটাকে এখন থানায় নিয়ে গেলেই তো হয়!"

রঙ্গরাজ বলল, "আগে আমি খানিকটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

"মিঃ রায়চৌধুরী, এই লোকটা একটা দাগি স্মাগলার। ভাইজাগ পোর্টের কাছে কাল রাত্তিরে পুলিশ ওকে তাড়া করে, শেষপর্যন্ত গুলি চালিয়ে আহত করে। লোকটার কাছে শুধু আপনার নাম-ঠিকানা নয়, এমন আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে, যাতে বোঝা যায়, লোকটা আপনার সঙ্গেই দেখা করতে আসছিল। শুধু তাই-ই নয়, কয়েকবার কোঁতকা খাওয়ার পর লোকটা স্বীকার করেছে, এর আগে অন্তত একুশবার সে আপনার কাছে চোরাই জিনিস পৌঁছে দিয়েছে।"

রামা রাও বলল, "একুশবার! কোকেন স্মাগলিং, প্রায় কোটি টাকার কারবার।"

রঙ্গরাজ বলল, "লোকটি সব কথা স্বীকার করেছে। "সুতরাং আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে, এখনই। আপনি পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে নিন।"

কাকাবাবু লোক দুটির মুখের দিকে তাকালেন। একটু-একটু হাসতে লাগলেন। তারপর হা-হা শব্দে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন!

পুলিশ দু'জন নিরেট মুখ করে বসে আছে। তারা যেন হাসতে জানেই না!

কাকাবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, "ইজ দিস সাম কাইন্ড অব আ জোক? আজ পয়লা এপ্রিল নাকি? সকালবেলা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছেন? আপনাদের কে পাঠিয়েছে সত্যি করে বলুন তো!"

রামা রাও আবার চুরুটটা ধরিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট! স্বেচ্ছায় যেতে না চান, আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব।"

রঙ্গরাজ বলল, "আরে না, না। জোর করতে হবে না। উনি এমনিই যাবেন আমাদের সঙ্গে।

"মিঃ রায়চৌধুরী, এই সকালবেলা বাড়িতে বউ-ছেলেমেয়ের সঙ্গে সময় না কাটিয়ে আপনার এখানে আমরা নিশ্চয়ই ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে আসিনি। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ বেশ গুরুতর। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আপনি এই শহরের কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চেনেন?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রোফেসর ভার্গব আমার বন্ধু। ইতিহাসের বিখ্যাত পন্ডিত। তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে আজ দশটার সময়।"

পুলিশ দু'জন মাথা নাড়ল। তারা কেউ ভার্গবকে চেনে না।

কাকাবাবু জিভের চুকচুক শব্দ করে বললেন, "বোধ হয় ভার্গবের নাম করাটা আমার ভুল হল। আপনারা তাকেও স্মাগলার ভেবে জ্বালাতন করবেন হয়তো। নাঃ, এখানে আর কাউকে আমি চিনি না।"

রামা রাও বলল, "তা হলে চলো আমাদের সঙ্গে!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ক্রাচটা দিন। আমি বাথরুমে গিয়ে পোশাক বদলে আসছি।"

রামা রাও বলল, "না, না, বাথরুম-টাথরুমে যাওয়া চলবে না। তোমাকে আর চোখের আড়াল হতে দিচ্ছি না।

"ক্রাচ দুটো আমার কাছে থাকবে, ভেঙে দেখব ভেতরে কিছু আছে কি না। এর মধ্যে তোমার ঘরটাও সার্চ করে দেখব!"

কাকাবাবু লাফাতে-লাফাতে গেলেন নিজের বিছানার কাছে। বালিশের তলা

থেকে টেনে বার করলেন রিভলভার।

রামা রাও তা দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিজের কোমর থেকে রিভলভার বার করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে উলটে পড়ে গেল বেতের চেয়ারসুদ্ধু।

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, "আরে না, না, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আমি কি পুলিশের ওপর গুলি চালাব নাকি? আপনাদের দু'জনকে টিট করার ইচ্ছে থাকলে আমার রিভলভারেরও প্রয়োজন ছিল না। আপনারা বললেন, আমার ঘর সার্চ করবেন, তাই রিভলভারটা আগেই দেখিয়ে দিলাম। আমার লাইসেন্স আছে। আপনারা সত্যিই পুলিশ তো?"

রঙ্গরাজও কাকাবাবুর হাতে রিভলভার দেখে একধারে সিঁটিয়ে গিয়েছিল।

এবারে সোজা হয়ে বসে বলল, "সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনাকে আমরা থানাতেই নিয়ে যাব। সেখানে আপনার যা বলবার তা বলবেন।"

কাকাবাবু রিভলভারটা রঙ্গরাজের কোলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বললেন,

"এটা আপনার কাছে রাখুন। আপনারা আমার নামে যে অভিযোগ এনেছেন, সেটা অস্বীকার করলে আপনারা আমার ওপর অত্যাচার করবেন? আমার পেট থেকে কথা বার করার জন্য আমার গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দেবেন।"

রঙ্গরাজ বলল, "প্রথমেই সত্যি কথা বলে দিলে সে সব কিছুর দরকার হবে না।"

রামা রাও কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "কী করে মুখ খোলাতে হয় আমরা জানি। আঙুলে আলপিন ফোটালেই সবাই বাপ-বাপ করে সব কথা বলতে শুরু করে দেয়!"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আলপিন-টালপিন ফোটাবেন না, তাতে আমার খুব লাগবে। আপনারা যা জিজ্ঞেস করবেন, আমি সব উত্তর দেব।"

তারপর আবার ফিক করে হেসে ফেলে বললেন, "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, একটা ছিঁচকে অপরাধীর মতন পুলিশ আমায় থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে! আমার বন্ধুরা শুনলে খুব মজা পাবে।"

রামা রাও চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "এতদিন ধরে স্মাগলিং করে আসছ, একবারও ধরা পড়োনি? কলকাতার পুলিশ তোমায় ধরতে পারেনি! আমরা

সবক'টাকে জেলে ভরব !"

কাকাবাবু বললেন, "ছিঃ, ওরকমভাবে কথা বলতে নেই। "আমি যে স্মাগলার, তা কি প্রমাণ হয়েছে ? প্রমাণ হওয়ার আগে কারও নামে দোষ দেওয়া পুলিশেরও উচিত নয়।"

তারপর রঙ্গরাজের দিকে ফিরে বললেন, "আপনারা আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। নিজের মুখে আমার কিছুটা পরিচয় দিই ?

"আমি এক সময় ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভে দফতরের কর্তা ছিলাম। একটা অ্যাক্সিডেন্টে পা খোঁড়া হয়ে গেছে। তারপর বেশ কিছুদিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর, অর্থাৎ সি বি আই-এর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছি। অনেক রহস্য সমাধানের জন্য পুলিশকেও সাহায্য করেছি। এ-কারণে আমার অনেক শত্রু আছে। বোঝাই যাচ্ছে, সেরকম কেউ হয়রান করার জন্য আমাকে স্মাগলার সাজাচ্ছে।"

রঙ্গরাজ গম্ভীরভাবে বলল, "এসব কথা আমায় বলে লাভ নেই। থানায় গিয়ে বলবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা চাইছেন যখন, নিশ্চয়ই আমি থানায় যাব। তার আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিই ? আপনারা দু'জনেই আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে পারেন। এই হোটেলে মাশরুম দিয়ে খুব ভাল ওমলেট বানায়।"

রামা রাও বলল, "আমরা পরের পয়সায় কিছু খাই না। তোমাকে আর ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে তৈরি হওয়ার জন্য।"

কাকাবাবু এতক্ষণ পরে বিরক্তভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন। এরা এতই ছোটখাট পুলিশ যে, কিছুই বুঝবে না।

গায়ে একটা জামা গলিয়ে নেওয়ার পর তিনি বললেন, "যাওয়ার আগে একটা টেলিফোন করতে পারি ?"

রামা রাও বলল, "না।"

রঙ্গরাজ বলল, "হ্যাঁ, করে নিন, তাতে আর কতক্ষণ লাগবে !"

কাকাবাবু ফোন তুলে দিল্লির একটা নম্বর চাইলেন।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, সঙ্গে-সঙ্গে লাইন পাওয়া গেল।

কাকাবাবু তাঁর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মার গলার আওয়াজ পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কী ব্যাপার, রাজা ? অনেকদিন তোমার পাত্তা

নেই, কোনও যোগাযোগ রাখোনি। আজ হঠাৎ এই অসময়ে যে ফোন করলে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অসময়ে কেন ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রোজ এই সময়ে আমি যোগ-ব্যায়াম করি তা জানো না ?"

কাকাবাবু বললেন, "যোগ-ব্যায়াম। যোগ-নিদ্রায় তো ছিলে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এ-সময়ে আমি টেলিফোনও ধরি না। আজ কেন যেন ধরে ফেললাম। যাকগে, কেমন আছ তাই বলো !"

কাকাবাবু বললেন, "কুড়ি মিনিট আগেও খুব ভাল ছিলাম। এখন ভাল নেই। কলকাতা থেকে নয় কিন্তু, আমি কথা বলছি ভাইজাগ থেকে !"

"সেখানে আবার কী করছ ? কেউ ডেকে নিয়ে গেছে বুঝি ?"

"না, বেড়াতেই এসেছি বলতে পারো। "তুমি তো প্রোফেসর ভার্গবকে চেনো, তাঁর সঙ্গে আরাকু ভ্যালিতে একটা জিনিস দেখতে যাওয়ার কথা আছে।"

"আরাকু ভ্যালি ? নাম শুনিনি। সেখানে কী আছে ?"

"সেসব কথা পরে হবে। এর মধ্যে একটা ছোট্ট ঝঞ্ঝাটে পড়েছি। দু'জন পুলিশের লোক আমাকে হোটেলে অ্যারেস্ট করতে এসেছে। এরা বলছে, আমি নাকি স্মাগলার !"

নরেন্দ্র ভার্মার অট্টহাসি পুলিশ দু'জনও শুনতে পেল।

নরেন্দ্র ভার্মা খুব ভাল বাংলা জানে। অধিকাংশ কথাই বলছে বাংলায়। মাঝেমধ্যে দু-একটা ইংরিজি শব্দ।

রামা রাও আর রঙ্গরাজ উৎকর্ণ হয়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছে, বাংলা কিছুই বুঝতে পারছে না।

নরেন্দ্র ভার্মা হাসি থামিয়ে প্রায় ধমক দিয়ে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, তুমি কি এই সকালবেলা আমার সঙ্গে রং-তামাশা করতে চাইছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "না হে, রং-তামাশা নয়। "পুলিশ দু'জন এখানেই বসে আছে। প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এরা বন্দর এলাকায় কাল একজন স্মাগলারকে ধরেছে, তার কাছে নাকি আমার নামে চিঠি পাওয়া গেছে। সে নাকি স্বীকার করেছে, এর আগে একুশবার আমাকে কোকেন

সাপ্লাই করেছে। কোকেন জিনিসটা কীরকম, তা আমি চোখেই দেখিনি।"

"তোমাকে সত্যি-সত্যি ওরা ধরে নিয়ে যেতে এসেছে?"

"গোঁয়ারের মতন তাই তো জেদ ধরেছে দেখছি।"

"ওরা তোমাকে চেনে না? তোমার কীর্তি-কাহিনী কিছু শোনেনি?"

"নাঃ, এরা কিছুই জানে না। "দেখা যাচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশে আমার একটুও জনপ্রিয়তা নেই। তুমি কিছু করতে পারো?"

"সরাসরি পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার আমার নেই। ওদের বড়কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওদের বলো, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। আমি কয়েক জায়গায় ফোনটোন করে দেখি।"

"এরা পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করতে রাজি নয়। আমাকে ব্রেকফাস্টও খেতে দিচ্ছে না। তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলবে? যদি বুঝিয়ে দিতে পারো—"

"টেলিফোনে আমার কথা শুনে ওরা কী করে বিশ্বাস করবে যে, আমি নরেন্দ্র ভার্মা, না রাম-শ্যাম-যদু-মধু? এ তো মহা মুশকিল হল দেখছি! তোমাকে কেউ ফাঁসিয়েছে।"

"যে ফাঁসিয়েছে, সে আমার হাতে শাস্তি পাবেই। কিন্তু এখন কী করা যায়?"

"এক্ষুনি তো কিছু করা যাচ্ছে না। ওরা যখন নেবেই বলছে, তা হলে যাও, জেলখানার খিচুড়ি কেমন হয়, খেয়ে দেখো!"

"জেলের খাবার আমি কখনও খাইনি। এ-জীবনে খাওয়ার ইচ্ছেও নেই।"

ফোনটা রেখে দিয়ে, কাকাবাবু পুলিশ দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, চলুন আপনাদের থানাটা একবার দেখা যাক!"

॥ ২ ॥

রামা রাও এর মধ্যে টেবিলের সবক'টা ড্রয়ার খুলে, বিছানা উলটে খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখে নিয়েছে। কাকাবাবুর সুটকেস ঘাঁটাঘাঁটি করে আর কিছু না পেয়ে একটা গোল করে পাকানো শক্ত কাগজ তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "খুলে দেখলেই বোঝা যাবে, ওটা একটা ম্যাপ।"

রঙ্গরাজ বলল, "কোথাকার ম্যাপ ?"

কাকাবাবু বললেন, "যে সমস্ত জায়গায় আমার স্মাগলিং ডেন আছে, সেইসব জায়গা ম্যাপে এঁকে রেখেছি।"

রঙ্গরাজ বলল, "এটা আমাদের সঙ্গে নিতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "নিতে চান নিতে পারেন, বেশি ভাঁজ করবেন না।"

রামা রাও একেবারে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, হাতকড়া পরাবেন নাকি ?"

রামা রাও বাঁকা সুরে বলল, "দরকার হলে তাও পরাতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, তা চলবে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে, প্রকাশ্যে কাউকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাতে মানহানির মামলা হতে পারে।

"শুনুন, আপনারা ডিউটি করতে এসেছেন, ওপরওয়ালার নির্দেশে আমাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আমি আপত্তি করছি না। কিন্তু ডিউটির বাইরে গিয়ে কিছু করবেন না প্লিজ। আমার গায়ে হাত দেওয়া কিংবা ধাক্কাধাক্কি করার কোনও প্রয়োজন নেই। আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া ভাল, নইলে পরে আপনাদেরই এর ফল ভোগ করতে হবে।"

রামা রাও বলল, "যাঃ বাবা, এ যে আমাদেরই ধমকাচ্ছে দেখছি।"

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে আদেশের সুরে বললেন, "দেখি আমার ক্রাচ দুটো।"

রামা রাওয়ের দেওয়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু রঙ্গরাজ চোখের ইঙ্গিতে দিয়ে দিতে বলল।

কাকাবাবু ঘরের বাইরে এসে দরজায় চাবি দিলেন।

লিফ্‌টে করে নীচে নেমে কাউন্টারে চাবি জমা দিয়ে মণিকাকে বললেন,

“মিঃ ভার্গব নামে এক ভদ্রলোক আমার খোঁজ করতে পারেন। তাঁকে বলবে, আমি পরে যোগাযোগ করব।”

পুলিশের জিপ অপেক্ষা করছে বাইরে।

রামা রাও কাকাবাবুর পাশে বসে মনের আনন্দে চুরুট টানতে লাগল।

কাকাবাবু বিরক্তিতে নাক কুঁচকে রইলেন, কিন্তু বুঝলেন যে আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই।

ডক এলাকার থানাটি বেশ বড়। পুরনো আমলের বাড়ি, সামনের দিকে মোটা-মোটা থাম। শ্বেতপাথরে বাঁধানো দশ-বারোটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভেতরে যেতে হয়।

পুলিশ দু'জন কাকাবাবুকে একটা ঘরে নিয়ে এল, সেখানে থানার বড়বাবু বসে আছেন, তাঁর টেবিলের সামনে অনেক মানুষের ভিড়, তিন-চারজন একসঙ্গে কথা বলছে।

কয়েকজনকে সরিয়ে কাকাবাবুকে টেবিলের সামনে দাঁড় করানো হল।

রামা রাও বলল, “সার, এই সেই স্মাগলিং-এর কেস। রাজা রায়চৌধুরীকে অ্যারেস্ট করে এনেছি।”

বড়বাবু মুখ তুলে তাকালেন। ভাল করে দেখলেনও না কাকাবাবুকে, বললেন, “গারদে ভরে দাও!”

কাকাবাবু বললেন, “দাঁড়ান, আমার কিছু বলবার আছে। আমাকে মিথ্যে অভিযোগে ধরা হয়েছে। আমার পরিচয়টা একবার শুনুন।”

বড়বাবু একটা কী কাগজ পড়তে-পড়তে বললেন, “বিকেলে, বিকেলে, এখন আমি ব্যস্ত আছি।”

কাকাবাবু বললেন, “আমাকে আদালতে পাঠাবেন তো। আমি জামিন চাইব। আমার একজন উকিল দরকার।”

বড়বাবু আবার বললেন, “বিকেলে, বিকেলে।”

কাকাবাবু খানিকটা উত্তেজিতভাবে বললেন, “বিকেলে মানে? “আজ সকালেই আমাকে কোর্টে পাঠানো উচিত।”

বড়বাবু এবার মুখ তুললেন। কাকাবাবুকে গ্রাহ্যই করলেন না। পেছনে দাঁড়ানো রামা রাওকে ধমক দিয়ে বললেন, “এখানে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ নাকি? বললাম না, আসামিকে গারদে ভরে দাও! শুধু-শুধু সময় নষ্ট!”

অন্য লোকরা আবার কথা বলতে শুরু করে দিল। রামা রাও কাকাবাবুর বাহু চেপে ধরে বলল, “চলো!”

এবার কাকাবাবুকে আনা হল আর-একটি ঘরে। এ-ঘরে ভিড় নেই, বড় টেবিলের ওপাশে একজন লোক বসে আছে, সামনে একটা লম্বা খাতা।

রামা রাও বলল, "তোমার সঙ্গে যা আছে, এখানে জমা দাও। খালাস হলে আবার ফেরত পাবে।"

কাকাবাবু পকেট থেকে টাকাপয়সা, রুমাল, সুটকেসের চাবি ইত্যাদি বার করে টেবিলে রাখলেন। রঙ্গরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার রিভলভারটার কথাও খাতায় লিখিয়ে দিন।"

রঙ্গরাজ বলল, "তা দিচ্ছি। আপনার ক্রাচ দুটোও এখানে রাখুন।"

কাকাবাবু বললেন, "ক্রাচ ছাড়া আমি হাঁটতে পারি না। এ দুটো আমার সঙ্গে থাকবে ?"

রঙ্গরাজ বলল, "ও দুটো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ও-ধরনের কোনও জিনিস জেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই।"

কাকাবাবু বললেন,

"তা হলে আমি হাঁটব কী করে ?"

রামা রাও বলল, "বাঁদরের মতন লাফিয়ে-লাফিয়ে !"

এর পর সে কাকাবাবুর ঘাড়ে ধাক্কা দিতে-দিতে বলল, "এবার ভেতরে চলো।"

কাকাবাবু কঠিন মুখ করে বললেন, "ধাক্কা দিতে বারণ করেছি না ? আমি এমনিই যাচ্ছি।"

রামা রাও কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বলল, "বড়বাবু কী বললেন, শোনোনি ? এখন তুমি আসামি !"

কাকাবাবু বললেন, "আসামি মানে কী ? অপরাধী ? সেটা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আমি অপরাধী কি না তা ঠিক করবেন আদালতের বিচারক। পুলিশের বিচার করার অধিকার নেই। "এখন সকাল ন'টা বাজে, আমাকে আজই কোর্টে পাঠানো উচিত ছিল।"

রামা রাও একটা খুব খারাপ গালাগালি দিয়ে বলল, "তুমি বড্ড বকবক করো।"

একটা মস্ত লোহার গেট খুলে তার মধ্যে কাকাবাবুকে ঠেলে দিল সে।

জেলখানা কিংবা থানার গারদের ভেতরটা কেমন হয়, তা কাকাবাবু আগে কখনও দেখেননি। তাঁর ধারণা ছিল, এক-একজনের জন্য এক-একটা খুপরি-খুপরি অন্ধকার ঘর থাকে।

এখানে কিন্তু তা নয়। একটাই বেশ লম্বা ঘর, তার মধ্যে দশ-বারোজন লোক কেউ দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে, কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ঘরটা অসম্ভব নোংরা। দেওয়ালে থুতু, পানের পিকের দাগ, একটা দিক জলে ভাসছে, তার মধ্যে ফরফর করছে আরশোলা। সব মিলিয়ে একটা বিকট গন্ধ।

রামা রাওয়ের ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও কাকাবাবু দেওয়াল ধরে সামলালেন কোনওরকমে।

পেছনে লোহার গেটটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। অসম্ভব রাগে কাকাবাবুর সারা গা থেকে যেন গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। এরকম একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে তিনি জীবনে কখনও পড়েননি।

থানার বড়বাবু লোকটা এমনই অভদ্র যে, একটা কথাও শুনল না। যাকে তাকে ধরে আনলেই গারদে পোরা যায়?

যে ব্যক্তি কোনও দোষ করেনি, তাকেও এইরকম একটা নোংরা ঘরে থাকতে হবে? প্রত্যেক লোকেরই উকিলের সাহায্য নেওয়ার অধিকার আছে। এরা তাঁকে কোনও সুযোগই দিল না!

দুর্জন-দুশমনদের পাল্লায় পড়ে কাকাবাবুকে এর চেয়ে অনেক খারাপ জায়গায় থাকতে হয়েছে। মৃত্যুর মুখে পড়েছেন কতবার। তখনও এত রাগ হয়নি, কারণ সেইসব লোকেরা ছিল শত্রুপক্ষ।

কিন্তু সরকারি পুলিশের কাছ থেকে সামান্য ভদ্রতাটুকুও আশা করা যাবে না?

অন্য কয়েদিদের দিকে কাকাবাবু তাকিয়ে দেখলেন। কেউ লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, কারও গায়ে চিটচিটে ময়লা জামা, একজন ঘ্যাস-ঘ্যাস করে দাদ চুলকোচ্ছে। দেখলে মনে হয়, সবাই ছোটখাটো চোর বা পকেটমার, একজনের কাঁধে রক্ত-ভেজা ব্যাণ্ডেজ।

কয়েকজন কাকাবাবুকে ঢুকতে দেখে হ্যা-হ্যা করে হেসে তামিল আর তেলুগু ভাষায় কী যেন বলে উঠল, কাকাবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তাঁর সারা মুখ ঘামে ভিজে গেছে। রাগে, অপমানে ছটফট করছেন। হঠাৎ তিনি চোখ বুজে ফেললেন।

তিনি মনে-মনে নিজেকেই বললেন, এত রাগ ভাল নয়। বেশি রাগলে নিজেরই ক্ষতি হবে। এই কারাগার ভেঙে এক্ষুনি বেরিয়ে যাওয়া যাবে না কিছুতেই। অপেক্ষা করতে হবে। দেখা যাক, শেষপর্যন্ত কী হয়।

নরেন্দ্র ভার্মাও কোনও সাহায্য করতে পারল না। সে কি শেষপর্যন্ত ভাবল, আমি তার সঙ্গে রসিকতা করছি ?

খুব বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বুকটা হালকা করলেন কাকাবাবু। মেজাজ শান্ত করার জন্য গান সবচেয়ে ভাল ওষুধ।

এই পরিবেশটার কথা ভুলে যেতে হবে। মনে করতে হবে, এখানে কাছাকাছি আর কেউ নেই।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। চক্ষুদুটি বোজাই রইল। গুন্‌গুন্ করে শুরু করলেন তাঁর প্রিয় গান। সুকুমার রায়ের লেখা, তাঁর নিজের সুর :

শুনেছো কী বলে গেল, সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ ?
টক টক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে, একেবারে মিষ্টি !

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি এই গানটাই গাইতে লাগলেন অনেকবার। আশেপাশে কে কী বলছে, তিনি কিছুই শুনছেন না। গাইতে-গাইতে এক সময় তাঁর ঘুম এসে গেল। রাগ কমাবার পক্ষে ঘুমও খুব ভাল জিনিস। তাঁর অনেকটা ইচ্ছে-ঘুম। ইচ্ছে করলে তিনি সারা দিন-রাত ঘুমোতে পারেন, আবার দরকার হলে একেবারে না ঘুমিয়ে কাটাতে পারেন এক-দু'দিন।

ঘুমোচ্ছেন, মাঝে-মাঝে একটু জাগছেন, আবার ঘুমোচ্ছেন।

এইভাবে সারা দুপুর, বিকেল পেরিয়ে গেল।

এক সময় তাঁর কাঁধ ধরে কে যেন ঝাঁকাল। আর তিনি শুনতে পেলেন, বাংলায় কে যেন বলছে, "বন্দি, জেগে আছ ? বন্দি, জেগে আছ ?"

প্রথমে কাকাবাবু ভাবলেন, তিনি স্বপ্ন দেখছেন। এখানে কে বাংলায় কথা বলবে ?

তারপর চোখ মেলে দেখলেন, একজন কয়েদি তাঁকে ধাক্কাচ্ছে।

সে আঙুল তুলে লোহার গেটটার দিকে দেখিয়ে দিল।

সেই গেটের ওপাশে পাক্কা সাহেবদের মতন সুট-টাই ও মাথায় টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে একজন ছিপছিপে লম্বা লোক।

সে বলল, "কী গো বন্দি, ঘুম ভাঙল !"

খুশিতে কাকাবাবুর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল। এ যে তাঁর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মা!

কাকাবাবু উঠে এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, "নরেন্দ্র, তুমি এত তাড়াতাড়ি কী করে দিল্লি থেকে চলে এলে?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার জন্য কি কম ঝঞ্ঝাট করতে হয়েছে! সঙ্গে-সঙ্গে প্লেনের টিকিট পাওয়া যায় নাকি? শেষ পর্যন্ত পাইলটের পাশে বসে চলে এলাম। এখানে পৌঁছেছি ঠিক দু' ঘণ্টা আগে। এর মধ্যে অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে এই নরকের মতন জায়গাটায় আর কতক্ষণ থাকতে হবে?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে জেলে আটকে রাখে, এমন কারও সাধ্য আছে!"

একজন সেপাই গটগট করে এসে লোহার গেটের তালা খুলে দিল এবং কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা সেলাম দিল।

অন্য কয়েদিরা চ্যাঁচামেচি করে কী যেন বলে উঠল। বোঝা গেল না। বোধ হয় একজন এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়ায় তারা আপত্তি জানাচ্ছে।

কাকাবাবু গেটের বাইরে পা দিয়ে বললেন, "এসব তোমরা কী শুরু করেছ? আমার এতখানি সময় নষ্ট হল। বিনা অপরাধে তোমরা যাকে খুশি গারদে ভরে দেবে?"

নরেন্দ্র ভার্মা হকচকিয়ে বললেন, "আরে, আমাকে বকছ কেন? আমি তোমায় গারদে ভরেছি নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা পুলিশরা কি যা খুশি করতে পারো নাকি? এ দেশটা কি হিটলারের জার্মানি হয়ে গেল?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি কি পুলিশ নাকি? সি বি আই-এর লোকদের ঠিক পুলিশ বলা যায় না। আমরা কেন্দ্রীয় তদন্তকারি। পুলিশের মধ্যে তো নানা ধরনের লোক থাকে, মাঝে-মাঝে দু-একটা ভুল হয়ে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "এই থানার বড়বাবু কোথায়? তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সে বেচারি সব জানবার পর ভয়ে আর লজ্জায় একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে আছে। প্রথমেই তোমার সামনে আসতে চায়নি। চলো, তার কাছে যাই।"

কাকাবাবু বললেন, "আগে আমার জিনিসপত্র আদায় করো। ক্রাচ দুটো

দাও। রিভলভারটা দাও!”

বড়বাবু সেই আগের ঘরটাতেই বসে আছেন, এখন সে-ঘরটা একেবারে ফাঁকা।

কাকাবাবুকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, “আসুন, সার, বসুন সার, মাপ করে দেবেন সার। আমার লোকজন ঠিক বুঝতে পারেনি।”

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, “আমি আপনার কাছে নিজের পরিচয় দিতে চেয়েছিলাম, আপনি শুনলেনই না।”

বড়বাবু বললেন, “ভুল হয়ে গেছে, সার। সকাল থেকেই এত লোকজন, এত কাজের চাপ, মাথার ঠিক রাখতে পারি না।”

কাকাবাবু বললেন, “হোটেল থেকে কাউকে অ্যারেস্ট করে আনা কি তুচ্ছ ব্যাপার? যতই কাজ থাক, আপনি তার একটা কথাও শুনবেন না?”

বড়বাবু বললেন, “বললাম তো সার, ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করে দিন!”

একজন কেউ বারবার ক্ষমা চাইলে তার ওপর আর তর্জন-গর্জন করা যায় না।

এবার কাকাবাবু নিজেকে অনেকটা সংযত করে বললেন,

“আমি রাজা রায়চৌধুরী হিসেবে বিশেষ কোনও সুবিধে চাইছি না। যে-কোনও লোক যদি বাইরে থেকে এখানে বেড়াতে আসে, হুট করে তাকে হোটেল থেকে এনে গারদে পোরা যায়? আমাকে স্মাগলার বলে সন্দেহ করলে আমার ওপর পুলিশ কয়েকদিন নজর রাখতে পারত, হাতেনাতে ধরে কিছু প্রমাণ পেলে তবেই অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল। মনে করুন, কোনও একটা লোকের পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেল, যাতে লেখা আছে যে, এই থানার ও. সি. এক লক্ষ টাকা ঘুষ খেয়েছে কিংবা একটা মানুষ খুন করেছে। সেই চিঠি পেয়েই আপনাকে ধরে গারদে পুরে দেবে কেউ? সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবে না?”

বড়বাবু বললেন, “আপনি ঠিকই বলেছেন। একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। তবে ব্যাপার কী জানেন সার, যে স্মাগলারটা ধরা পড়েছে, তাকে জেরা করার পর এমনভাবে বলতে লাগল যে কবে, কোথায়, কতবার আপনার কাছে জিনিস পাচার করেছে যে, শুনলে মনে হবে সে সত্যি বলছে। অবশ্য তার মুখের কথা বিশ্বাস করা আমাদের উচিত হয়নি।”

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, “সেই লোকটি কোথায়? তার সঙ্গে আমরা

করতে চাই।"

বড়বাবু বললেন, "সে লোকটির নাম হরেন মণ্ডল। তার পায়ে গুলি লেগেছে। তাকে হাসপাতালে রাখা হয়েছে, দু'জন গার্ড পাহারা দিচ্ছে সেখানে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা হলে একবার হাসপাতালে যাওয়া যাক।"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে আর একটা কাজ বাকি আছে এখানে। বড়বাবু, আপনার রামা রাও নামে অফিসারটিকে একবার ডাকুন তো।"

তখনই হাঁকডাক করে রামা রাও-এর খোঁজ করা হল। সে এসে বড়বাবুকে স্যালুট করে দাঁড়াল।

বড়বাবু বললেন, "ওহে তোমরা ভুল লোককে ধরে নিয়ে এসেছ। এঁর কাছে মাপ চেয়ে নাও।"

রামা রাও ঠিক বুঝতে না পেরে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, "মাপ চাইবার দরকার নেই। ওর একটু ওষুধ দরকার।"

তিনি উঠে গিয়ে রামা রাওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "পুলিশ হয়েছ বলে তোমার অনেক ক্ষমতা, তাই না? যাকে-তাকে ঘাড়ধাক্কা দিতে পারো। নিজে কখনও ঘাড়ধাক্কা খেয়েছ? দেখো তো কেমন লাগে?"

কাকাবাবু রামা রাওয়ের ঘাড়ে ডান হাত রেখে এমন কঠিন একটা ধাক্কা দিলেন যে, সে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

সে বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান পুরুষ, কাকাবাবুর মতো একজন খোঁড়া লোকের গায়ে যে এত জোর, তা সে কল্পনাও করেনি।

থানার মধ্যে কোনও পুলিশের গায়ে হাত দেওয়ার মতন ঘটনা আগে কেউ দেখেনি।

রামা রাও ক্রুদ্ধ ভাবে ও. সি.-র দিকে একবার তাকিয়ে তেড়ে গেল কাকাবাবুর দিকে।

ও. সি. চট করে কাকাবাবুকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত তুলে বললেন, "ব্যস, ব্যস, হয়েছে, হয়েছে। শোধবোধ হয়ে গেছে।

"শোনো রাও, মিস্টার রায়চৌধুরী একজন বিখ্যাত মানুষ, ওঁকে এইভাবে ধরে আনা ঠিক হয়নি। আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

রামা রাও গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল।

নরেন্দ্র ভার্মা ব্যস্ত হয়ে বললেন,

"এখানে আর সময় নষ্ট করে কী হবে ? হাসপাতালে গিয়ে সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলা যাক।"

বড়বাবু বললেন, "আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেই গাড়িতে চলে যান।

"পুলিশ কমিশনার ফোন করেছিলেন, তিনি আপনাদের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।"

কাকাবাবু বললেন,

"আমাকে যারা পুলিশে ধরাবার চেষ্টা করেছে, যাদের জন্য আমার একটা দিন নষ্ট হল, তাদের আমি ঠিক খুঁজে বার করব। তারা কঠিন শাস্তি পাবে।"

বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠবার পর নরেন্দ্র ভার্মা হেসে বললেন,

"রাজা, তুমি এখনও রাগে ফুঁসছ ! অত রাগ ভাল নয়। থানার মধ্যে ওই লোকটাকে ঘাড়ধাক্কা না দিলে কি চলত না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সহজে রাগ হয় না। কিন্তু একবার রাগ চড়ে গেলে সহজে যেতে চায় না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এবার একটু অন্য কথা বলো। এখানে তুমি সত্যি-সত্যি এসেছ কেন ? শুধু বেড়াতে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সারাদিন আমি কিচ্ছু খাইনি। আগে ভাল করে খেতে হবে, তারপর অন্য কথা।"

নরেন্দ্র ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, "সে কী, দুপুরে কিছু খেতে দেয়নি ? লপ্‌সি না খিচুড়ি। কী যেন দেয় ?"

কাকাবাবু বললেন,

"দিয়েছিল বোধ হয় কিছু। আমি চোখ বুজে ছিলাম। আমি জেলের খাবার খাব না বলেছিলাম না ?"

"যদি আমার আসতে দেরি হত ? তোমাকে জেল থেকে ছাড়াতেও দু'-তিনদিন লেগে যেত ?"

"তা হলে দু'-তিনদিনই না খেয়ে থাকতাম।"

"এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন ভাইজাগে রয়েছেন। সেইজন্য পুলিশ কমিশনার খুব ব্যস্ত, তিনি নিজে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেননি। আমি সব বুঝিয়ে বলেছি। কমিশনার সাহেব তোমার সব কথা জানেন। উনি বললেন, একটা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে তোমার পেছনে যারা পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে, তাদের নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব আছে। তোমাকে আটকে রাখতে চায়, কারা চাইছে এবং কেন ?"

"সেসব পরে ভেবে দেখা যাবে। আগে কিছু খেয়ে নিয়ে পেট ঠাণ্ডা করি।"

শহরের মধ্যে একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে বসা হল।

ভেতরটা অন্ধকার-অন্ধকার, প্রত্যেক টেবিলে শুধু মোমবাতি জ্বলছে। লোকজন যারা বসে আছে, তাদের মুখ দেখা যায় না।

একেবারে কোণের একটা টেবিলে বসলেন ওঁরা দু'জন।

বেয়ারাকে ডেকে নরেন্দ্র ভার্মা একগাদা খাবারের অর্ডার দিতে যাচ্ছিলেন, কাকাবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আরে, আরে, তুমি করছ কী ? খিদে পেয়েছে বলে কি আমি রাক্ষসের মতন খাব ? একটা মাশরুম-ওমলেট, দু'খানা টোস্ট আর এক কাপ চা-ই যথেষ্ট।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমার জন্য একটা বড় গ্লাস লস্যি !"

কাকাবাবু টেবিলে রাখা জলের গ্লাস তুলে এক চুমুকে শেষ করে বললেন, "সকাল থেকে এই প্রথম জল খেলাম। হোটেলে গিয়ে স্নান করতে হবে। থানার গারদটা এত নোংরা যে এখনও আমার গা ঘিনঘিন করছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার খুব দুর্ভোগ গেল যা হোক। মিছিমিছি এই ঝঞ্ঝাট।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে দিল্লি থেকে, তা আমার শত্রুপক্ষ ভাবতেই পারেনি। দিল্লি থেকে যে আমি এরকম সাহায্য পেতে পারি, তাও বোধ হয় ওরা জানে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "পুলিশ কমিশনারও সেই কথা জানালেন। এখানে স্মাগলিং খুব বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ থেকে তাদের ধরার একটা বড়রকম অভিযান শুরু হয়েছে। স্মাগলিং-এর সঙ্গে যাদের সামান্য সম্পর্ক আছে, তাদের ধরা হচ্ছে। সেইজন্যই তোমার ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সাজানো হয়েছিল। একজন ধরা-পড়া স্মাগলারের পকেটে তোমার নামে চিঠি। তুমি হোটেলে থাকো, বাইরের লোক, পুলিশের সন্দেহ তো হবেই। তুমি যদি দিল্লিতে আমাকে ফোন করে না পেতে, কিংবা এরা যদি তোমাকে টেলিফোন করতেই না দিত, তা হলে তোমাকে বেশ কিছুদিন জেলে থাকতে হত।"

কাকাবাবু বললেন, "কারা এই মতলবটি করেছিল, তাদের খুঁজে বার করতে হবে। হাসপাতালের লোকটাকে জেরা করলেই কিছু জানা যাবে !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, তোমাকে তো আমি খুব ভাল করেই চিনি ! তোমাকে যারা বিরক্ত করে, তাদের শাস্তি না দিয়ে তুমি শান্ত হবে না।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমি এখানে থাকতে পারছি না। কাল সকালেই আমাকে বম্বে চলে যেতে হবে। সেখান থেকে আমেদাবাদ। খুব জরুরি কাজ, যেতেই হবে। তুমি একা-একা বিপদের ঝুঁকি নিতে যেয়ো না প্লিজ ! আমি চার-পাঁচদিন পর ফিরে আসব। সেই ক'টা দিন তুমি চুপচাপ হোটেলে বসে থেকো, কিংবা কলকাতায় ফিরে যেতে পারো।"

কাকাবাবু কিছু না বলে মুচকি হাসলেন।

বেয়ারা এসে খাবার দিয়ে গেল।

বাইরে থেকে যখন লোক আসছে বা কেউ বের হচ্ছে, তখন দরজাটা খোলায় আলো এসে পড়ছে ভেতরে। আবার অন্ধকার।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আরাকু ভ্যালি না কী একটা ভ্যালিতে যাওয়ার কথা বলেছিলে, সেখানে কী ব্যাপার ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেখানে চোর-ডাকাত ধরার কোনও ব্যাপার নেই। প্রোফেসর ভার্গব কিছু ঐতিহাসিক মূর্তি আবিষ্কার করেছেন, সেগুলো দেখতে যাওয়ার কথা আছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ভাইজাগে স্মাগলাররা আর চোর-ডাকাতরা বড়রকম কিছু একটা ঘটাবে। এর মধ্যে তুমি এসে পড়েছ। ওদের ধারণা, তুমি ওদের বাধা দিতে এসেছ। তাই ওরা তোমাকে সরাতে চায়।"

কাকাবাবু বললেন, "চোর-ডাকাত বা স্মাগলারদের নিয়ে আমি মাথাই ঘামাই না ! আমি এসেছি মূর্তি দেখার শখে।"

এই সময় দরজা ঠেলে একটা লোক ঢুকল। তার পেছন দিকটায় আলো বলে মুখ দেখা গেল না।

কয়েক পা দৌড়ে এসে সে কাকাবাবুর দিকে কিছু একটা জিনিস খুব জোরে ছুড়ে মারল। ঠিক তখনই কাকাবাবু চায়ের কাপটা তুলেছেন চুমুক দেওয়ার জন্য।

সেই জিনিসটা এসে লাগল চায়ের কাপে, কাপটা ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেল, সব চা-টা ছড়িয়ে গেল টেবিলে।

সেই জিনিসটা একটা মস্ত বড় ছুরি। কাকাবাবু ঠিক সময় কাপটা না তুললে ছুরিটা তাঁর বুকে বিঁধে যেত।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল।

লোকটা পেছন ফিরে পালাচ্ছে। নরেন্দ্র ভার্মা বাঘের মতন তাড়া করে গেলেন লোকটিকে, রেস্তরাঁর অন্য লোকজন হইহই করে উঠল।

কাকাবাবুর জামায়-প্যান্টে চা পড়ে গেছে।

তিনি একটুও উত্তেজিত না হয়ে একটা ন্যাপকিন দিয়ে ভিজে জায়গাগুলো মুছতে লাগলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা ফিরে এলেন একটু পরেই। কাকাবাবুর টেবিল ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে নানারকম প্রশ্ন করছে, কাকাবাবু কোনও উত্তর দিচ্ছেন না।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"নাঃ, লোকটাকে ধরা গেল না। রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল যাচ্ছে, লোকটা শট করে মিছিলের ওপারে চলে গিয়ে ভিড়ে মিশে গেল।"

কাকাবাবু ছুরিটা দু' হাতে ধরে বললেন, "বেশ ধার আছে। জানো নরেন্দ্র, আমার ক্রমশ বিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে যে, আমাকে কেউ কক্ষনও মারতে পারবে না। আমার ইচ্ছা-মৃত্যু!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দিনের বেলা এত লোকের মাঝখানে তোমাকে মারতে এসেছিল। ওরা বেপরোয়া হয়ে গেছে। "রাজা, তোমার আর বাইরে থাকা চলবে না। হোটেলে ফিরে চলো। সেখানে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করব।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, "আগে হাসপাতালে চলো। সেই লোকটাকে দেখে আসি।"

বিল মিটিয়ে দিয়ে বাইরে এসে নরেন্দ্র ভার্মা একবার চারদিক দেখে নিলেন।

কী একটা ধর্মীয় মিছিল এখনও চলেছে, গাড়ি-ঘোড়া সব থেমে আছে। এর মধ্যে দিয়ে যাওয়াও যাবে না।

গাড়ির মধ্যে বসে ওঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিছিলটা শেষ হওয়ার পর গাড়ি স্টার্ট দিল।

হাসপাতালে পৌঁছে একটা দুঃসংবাদ শোনা গেল।

কোনও আসামি আহত বা অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে রাখা হলেও তার বেডের পাশে পুলিশ পাহারা থাকে। এখানে হরেন মণ্ডল নামে স্মাগলারটির জন্যও দু'জন পুলিশ ছিল। গুলি লেগে হরেনের পা খোঁড়া হয়ে গেছে। তবু, ঠিক এক ঘণ্টা আগে বাথরুম যাওয়ার নাম করে হরেন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে। খোঁড়া পা নিয়ে সে হাসপাতালের তিনতলা থেকে কী করে পালাল, কেউ জানে না।

॥ ৩ ॥

নরেন্দ্র ভার্মার শত অনুরোধেও কাকাবাবু তখনই হোটেলে ফিরে যেতে রাজি হলেন না। তিনি তাঁর বন্ধু ভার্গবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেনই।

অধ্যাপক ভার্গবের বাড়ি শহর ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে। ঋষিকোণ্ডা বিচে যাওয়ার পথে একটা ছোট টিলার ওপারে ছবির মতন বাগানঘেরা সুন্দর বাড়ি। একেবারে বাড়ির গেট পর্যন্ত গাড়ি উঠে আসার রাস্তা আছে। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়।

সন্ধে হয়ে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আহা, কী চমৎকার হাওয়া এখানে! দেখছ নরেন্দ্র, সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস রয়েছে, অন্ধকারে মালার মতন দেখাচ্ছে। আমাদের কবি মাইকেল লিখেছেন,

"কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ..." অবশ্য এখানে মালা মানে অন্য মালা। 'প্রচেতঃ' মানে 'সমুদ্র', জানো তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য, একটু আগে একজন তোমায় খুন করতে এসেছিল, আর এর মধ্যে তোমার কবিতা মনে পড়ছে?"

কাকাবাবু বললেন, "কেউ আমার দিকে ছুরি বা গুলি ছুড়লে আমি তেমন গ্রাহ্য করি না। এরকম তো কতবার হয়েছে। কিন্তু বিনা দোষে পুলিশ যে আমাকে জেলে ভরে দিয়েছিল, সেটাতেই খুব রাগ হয়েছিল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "যাক, সেটা তো মিটে গেছে। পুলিশ আর তোমাকে বিরক্ত করবে না, বরং যা সাহায্য চাইবে তাই পাবে।"

কাকাবাবু বললেন, " 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন', এটা কার লেখা বলতে পারো? ওঃ, তুমি তো বাংলা পড়ো না। এটা রবীন্দ্রনাথের।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমায় দেখছি কবিতায় পেয়েছে। রাজা, তোমার জন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। আমি থাকতে পারব না, কাল সকালে আমাকে চলে যেতেই হবে।"

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন,

"যাও না, অত চিন্তা কীসের? তুমি থাকলেও সবসময় আমাকে পাহারা

দিতে নাকি ? আমার কিছু হবে না।”

বাগান পেরিয়ে এসে বাড়ির সদর দরজায় কলিং বেল টিপলেন নরেন্দ্র ভার্মা। তিন-চারবার বাজাবার পরেও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সারা বাড়িটা বড় বেশি নিস্তব্ধ।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “বাড়িতে কেউ নেই মনে হচ্ছে।”

কাকাবাবু বললেন, “দোতলায় একটা আলো জ্বলছে।”

দু'জনে মিলে কয়েকবার ডাকলেন, “প্রোফেসর ভার্গব! প্রোফেসর ভার্গব!”

তাও কেউ সাড়া দিল না।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “বোধ হয় ভুল করে একটা ঘরে আলো জ্বেলে চলে গেছেন।”

কাকাবাবু বললেন, “এত বড় বাড়ি, কোনও দরোয়ান বা ভৃত্য থাকা উচিত ছিল না ? বাড়ি ফেলে সবাই কি চলে যেতে পারে ? দরজার বাইরে তালা নেই, ভেতর থেকে বন্ধ, ওপরে আলো জ্বলছে, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে।”

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

কাকাবাবু বললেন,

“দেওয়ালে একটা জলের পাইপ রয়েছে, ওটা বেয়ে দোতলার বারান্দায় ওঠা যেতে পারে। কিন্তু আমি খোঁড়া মানুষ, ওই কাজটা তো পারব না ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু অপরিচিত লোকের বাড়িতে এইভাবে ওঠা কি ঠিক হবে ? তার চেয়ে বরং ফিরে গিয়ে থানায় খবর দেওয়া যাক। পুলিশ যা হোক ব্যবস্থা করবে।”

কাকাবাবু বললেন,

“আসবার আগে একটা টেলিফোন করা উচিত ছিল। চলো তো বাড়িটার চারপাশটা একবার ঘুরে দেখা যাক।”

সব দিকেই ফুলের বাগান, নানান রকম ফুলের গাছ। বাগানটার বেশ যত্ন করা হয় বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এখন ফুল দেখার সময় নেই।

কাকাবাবু ক্রাচ ঠকঠকিয়ে বেশ জোরে-জোরে হেঁটে পৌঁছলেন বাড়িটার পেছন দিকে। সেদিকেও রয়েছে একটা বারান্দা। একটা লোহার ঘোরানো

সিঁড়ি রয়েছে বারান্দা পর্যন্ত।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখা যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও!"

সিঁড়ির নীচে একটা ছোট দরজাও রয়েছে।

কাকাবাবু একটা ক্রাচ তুলে সেই দরজাটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। সেটা ভেজানো ছিল।

সেই দরজা দিয়ে দু'জন ঢুকলেন ভেতরে। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কয়েক পা এগোতেই উঁ-উঁ শব্দ শোনা গেল, মানুষের গোঙানির মতন। দু'জনে থমকে দাঁড়ালেন। দু'জনেই রিভলভার বার করে ফেলেছেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"একটা টর্চও আনিনি ছাই। ফিরে গিয়ে দেখব গাড়ির ড্রাইভারের কাছে টর্চ আছে কিনা!"

কাকাবাবু বললেন, "দেওয়ালে হাত বুলিয়ে দেখো তো। আলোর সুইচ থাকতে পারে।"

গোঙানির শব্দটা বেড়ে যাচ্ছে। খানিকটা খোঁজাখুঁজির পরে আলোর সুইচ পেয়ে জ্বালাতেই দেখা গেল, মেঝেতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা লোক পড়ে আছে, তার মুখে কাপড় গোঁজা, তাই সে কথা বলতে পারছে না।

নরেন্দ্র ভার্মা লোকটির মুখ থেকে কাপড়টা টেনে বার করতেই সে ভয়ার্ত গলায় কী যেন বলে উঠল, তেলুগু ভাষা, বোঝবার উপায় নেই।

নরেন্দ্র ভার্মা তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, "পুলিশ, পুলিশ।"

তাকে বন্ধনমুক্ত করতেই সে ছুটে গেল ভেতরের সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে ওইরকম একই অবস্থায় পড়ে আছে আর-একজন লোক। সেও গোঙাচ্ছে। আগের লোকটিই এর বাঁধন খুলে দিল।

সবাই মিলে দোতলায় উঠতে-উঠতে আরও গোঙানির শব্দ শুনতে পেল।

এবারে দেখা গেল একজন মহিলাকে। এরও হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে ? ভার্গবের স্ত্রী ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে অন্যরা খুলে দেবে। শিগ্‌গির ভেতরে চলো, প্রফেসর ভার্গবকে আগে খুঁজে বার করা দরকার। ভার্গব আমারই মতন বিয়ে করেননি। একলা থাকেন। এরা সবাই খুব সম্ভবত বাড়ির কাজের লোক।

দোতলায় পরপর কয়েকটি ঘর।

কাকাবাবু দ্রুত এগোতে লাগলেন আলো-জ্বলা ঘরটির দিকে। সে-ঘরের দরজা খোলা।

দরজার সামনে এসেই কাকাবাবু শিউরে উঠে বললেন, "এঃ !"

ঘরের মধ্যে একটা কুকুর মরে পড়ে আছে। বেশ বড় আকারের অ্যালসেশিয়ান, কেউ তাকে গুলি করেছে।

রক্ত থক থক করছে মেঝেতে।

সেটা লাইব্রেরি ঘর, সমস্ত দেওয়াল জুড়ে বইয়ের র‍্যাক।

ছোট-বড় অনেক মূর্তিও সাজানো রয়েছে, কয়েকটা মূর্তি কেউ ছুড়ে ছুড়ে ভেঙেছে।

কিছু বইপত্রও মাটিতে ছড়ানো।

প্রোফেসর ভার্গবকে দেখতে পাওয়া গেল ঘরের এককোণে। একটা রকিং চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, শরীরে কোনও স্পন্দন নেই।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"মাই গড ! ডেড ?"

কাকাবাবু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ভার্গবের থুতনিটা ধরে উঁচু করলেন,

তারপর বললেন, "নাঃ, অজ্ঞান হয়ে গেছেন।"

তাঁর বাঁধন খুলে, মুখের কাপড়টা বার করা হল।

কাকাবাবু তাঁর গালে আস্তে-আস্তে চাপড় মেরে ডাকতে লাগলেন, "ভার্গব ! ভার্গব !"

তবুও ভার্গবের জ্ঞান ফিরল না।

নরেন্দ্র ভার্মার নির্দেশে বাড়ির একজন লোক ছুটে এক জাগ জল নিয়ে এল। সেই জলের ছিটে দেওয়া হতে লাগল ওঁর মুখে।

একটু পরে ভার্গব চোখ মেলে বললেন, "কে ? তোমরা আমাকে মারছ কেন ? আমি কী দোষ করেছি ?"

কাকাবাবু মুখটা ঝুঁকিয়ে বললেন, "ভার্গব, আর কোনও ভয় নেই। আমি রাজা রায়চৌধুরী। ভাল করে তাকিয়ে দেখো।"

ভার্গব তবু ফিসফিস করে বললেন, "আমাকে মারতে চাও মারো। কিন্তু আমার মূর্তিগুলো ভেঙো না! ওগুলোর দাম আমার প্রাণের চেয়েও বেশি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "একটু সময় দাও, রাজা। এরকম অবস্থায় নার্ভাস ব্রেক ডাউন হতে পারে। কথা বলার জন্য জোর কোরো না, নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবেন।"

সারা ঘরে অনেক ছোট-ছোট টুল রয়েছে, বইয়ের র‍্যাকের ওপরের তাক থেকে বই পাড়ার জন্য। কাকাবাবু একটা টুল টেনে নিয়ে ভার্গবের মুখোমুখি বসলেন। তারপর বললেন, "ওঁকে গরম চা কিংবা কফি খাওয়ানো দরকার। আমারও তখন মুখের চা-টা নষ্ট হয়ে গেছে।"

বাড়ির লোকরা হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু মুখের কাছে কাপ ধরার ইঙ্গিত করে বললেন, "টি? কফি?"

মহিলাটি ছুটে চলে গেল। বোঝা গেল সে-ই এ বাড়ির রাঁধুনি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে ব্যাপারটা জানানো দরকার।"

ভার্গব আপন মনে কীসব বিড়বিড় করে বলে চলেছেন,। একটু বাদে হঠাৎ যেন তাঁর পুরো জ্ঞান ফিরে এল। তিনি স্পষ্ট চোখ মেলে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী? আমাকে বাঁচাবার জন্য তুমি ঠিক এই সময় কী করে এলে?"

কাকাবাবু বললেন, "কী হয়েছিল কী খুলে বলো তো?"

ভার্গব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কাকাবাবুর তুলনায় ভার্গবের ছোটখাটো চেহারা। টুকটুকে ফরসা রং, মাথায় টাক, মুখে সাদা দাড়ি। সারাজীবন পড়াশুনো নিয়েই কাটিয়েছেন, কখনও খেলাধুলো করেননি। তাঁর বাবা বেশ ধনী লোক ছিলেন, সেইজন্য টাকা-পয়সা নিয়েও চিন্তা করতে হয়নি কখনও।

পাশের ঘরে একটা কর্ডলেস ফোন খুঁজে পেয়ে সেটাতে কথা বলতে-বলতে নরেন্দ্র ভার্মা ফিরে এলেন এ-ঘরে।

কাকাবাবু বললেন, "ভার্গব, ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, নরেন্দ্র ভার্মা, দিল্লি থেকে আজই ছুটে এসেছেন। উনি সি বি আই-এর একজন

হর্তাকর্তা।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "প্রোফেসর ভার্গব, আপনি এতবড় বাড়িতে একা থাকেন ? যে-কোনও দিনই তো চোর-ডাকাতরা হামলা করতে পারে।"

ভার্গব আস্তে-আস্তে বললেন, "একা তো নয়। দরোয়ান আছে, মালি আছে, আর আমার কুকুর টোবি, কোনওদিন কিছু হয়নি, ওঃ ওরা টোবিকে মেরে ফেলল, আমার চোখের সামনে, ওঃ ওঃ।"

ভার্গব কেঁদে ফেললেন।

নরেন্দ্র ভার্মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে হাত তুলে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন কাকাবাবু।

তিনি জানেন যে, যারা কুকুর পোষে, তাদের প্রিয় কুকুর মারা গেলে তারা কত কষ্ট পায়। ঠিক নিজের ছেলেমেয়ের মৃত্যুর মতন শোক। এ শোকে কোনও সান্ত্বনাও দেওয়া যায় না। কাঁদতে দেওয়াই ভাল।

একটু পরে তিন কাপ কফি এল।

কাকাবাবু বললেন, "ভার্গব, একটু কফি খাও, ভাল লাগবে।"

নরেন্দ্র ভার্মা এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে যারা বেঁধে রেখে গেছে, তারা কারা ? একজনকেও চিনতে পেরেছেন ?"

ভার্গব দু' দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না। জীবনে দেখিনি। কথা শুনলেই বোঝা যায়, বিশেষ লেখাপড়া জানে না। এই ধরনের লোক তো আমার বাড়িতে আসে না। এখানে ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপক দু'-একজন আসেন। আমি নিরিবিলিতে থাকতে ভালবাসি। তবু কেন এই উপদ্রব ?"

কাকাবাবু বললেন, "যারা এসেছিল তারা সাঙ্ঘাতিক লোক। এ-বাড়ির দরোয়ান, মালি আর রাঁধুনির হাত-পা-মুখ বেঁধে ভেতরে ফেলে রেখে গেছে। ভার্গবেরও একই অবস্থা। আমরা এসে না পড়লে দিনের পর দিন ওরা এই অবস্থায় পড়ে থাকত। সদর দরজা বন্ধ করে পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে। অন্য লোক ডাকতে এলে হয়তো সদর দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যেত।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "একটা ঘরের আলো জ্বেলে রেখে গেছে।"

ভার্গব বললেন, "ওরা এসেছিল দুপুরে। তবু ইচ্ছে করে আলো জ্বালল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"কুকুরটা ছাড়া আর কাউকেই প্রাণে মারেনি। উদ্দেশ্য কী, ডাকাতি ? আপনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর দেখুন, কী-কী নিয়ে গেছে। পুলিশকে খবর দিয়েছি, কমিশনার সাহেব নিজেই হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।"

ভার্গব বললেন, "কী আর নেবে ডাকাতরা ? আমার বাড়িতে সোনাদানা বা ওই ধরনের দামি জিনিস কিছু নেই। টাকা-পয়সা থাকে ব্যাঙ্কে। শুধু এই মূর্তিগুলো আর বই, এগুলোই দামি। ওরা কতকগুলো মূর্তি আছড়ে-আছড়ে ভেঙেছে ইচ্ছে করে, এসব মূর্তির দাম ওরা বোঝে না। আমি কিছু নিতে দেখিনি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলেনি ?"

ভার্গব বললেন, "হঠাৎ দু'জন লোক এই ঘরে ঢুকে এল। আমি বই পড়ছিলাম। টোবি বসে ছিল আমার পায়ের কাছে। অচেনা লোক দেখে টোবি ডাকতে-ডাকতে ছুটে গেল ওদের দিকে। অমনই একজন গুলি করে টোবিকে মেরে ফেলল। তারপর আমার কাছে এসে আমাকে বেঁধে ফেলতে লাগল, আমি কী করেই বা ওদের বাধা দেব ? কোনওদিন কারও গায়ে হাত তুলিনি। ওদের একজন মূর্তি ভাঙতে লাগল, আর-একজন আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, যদি বাঁচতে চাও তো ব্যাঙ্গালোর চলে যাও। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।"

নরেন্দ্র ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, "ব্যাঙ্গালোর ? হঠাৎ ব্যাঙ্গালোর কেন ?"

ভার্গব বললেন, "ব্যাঙ্গালোরে আমার পৈতৃক বাড়ি, ওরা সেটা জানে বোধ হয়। আমি আসলে কর্নাটকের লোক, যদিও অন্ধ্রপ্রদেশে আছি অনেক বছর। ওরা আমাকে ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়াতে চায়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ননসেন্স ! কর্নাটকের লোক অন্ধ্রপ্রদেশে থাকতে পারবে না ? আপনার মতন একজন পণ্ডিত মানুষকে পেয়ে এদের ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা।"

বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হল।

নরেন্দ্র ভার্মা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বললেন, "পুলিশ কমিশনার এর মধ্যে এসে গেলেন ?"

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ করে উঠে এলেন একজন। সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরা। বেশ সুদর্শন পুরুষ। গোঁফ নেই, দেখলে পুলিশ বলে মনেই হয় না।

ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বললেন, "আমার নাম সুধীর রাজমহেন্দ্রী, কমিশনার সাহেব খুব ব্যস্ত আছেন। উনি ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে আমাকে আসতে বললেন। আমি ডি আই জি, ক্রাইম।"

নরেন্দ্র ভার্মা নিজের নাম বলে জানালেন, "আমি দিল্লি থেকে এসেছি।"

সুধীর রাজমহেন্দ্রী বললেন, "আমি প্রোফেসর ভার্গবকে চিনি, মানে কাগজে ছবি দেখেছি, ওঁর লেখা বইও পড়েছি। উনি নিশ্চয়ই রাজা রায়চৌধুরী? এ-বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে?"

নরেন্দ্র ভার্মা সব ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানালেন।

রাজমহেন্দ্রী ভুরু কুঁচকে বললেন, "অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কর্নাটকের মানুষদের তাড়াবার জন্য কোনও দল তৈরি হয়েছে, এমন শুনিনি। খোঁজ নিতে হবে। এ-বাড়ির সামনে দু'জন পুলিশ পোস্টিং করে দিলে আর তারা হামলা করতে সাহস করবে না!"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "আপনার কী ঝঞ্ঝাট হয়েছে, তাও আমি শুনেছি। মনে হচ্ছে আপনার ব্যাপারটা আর প্রোফেসর ভার্গবের ব্যাপারটা দুটো আলাদা দলের কাজ। আপনারটাই বেশি সিরিয়াস।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমারও মনে হয়, দুটো আলাদা দলের কাজ।"

রাজমহেন্দ্রী বললেন, "সবটা আপনাদের বুঝিয়ে বলি। ভাইজাগ এমনিতে শান্তিপূর্ণ শহর। খুনোখুনি বিশেষ হয় না। চোর-ডাকাত যে একেবারে নেই তা নয়, তবে অন্য শহরের চেয়ে কম। বাইরে থেকে বহু লোক এখানে বেড়াতে আসে, কাজে কর্মেও আসে, তাদের কোনও ক্ষতি হয় না। গণ্ডগোল হয় পোর্ট এলাকায়। সব পোর্টেই নানারকম স্মাগলিং চলে, মাঝে-মাঝে কিছু ধরা পড়ে, আবার বেড়ে ওঠে। এই স্মাগলিং চালায় নানান রাজ্যের লোক। অন্ধ্রের লোকই বড় কম। যারা ধরা পড়ে তারা মরাঠি, তামিল, পঞ্জাবি, বাঙালি, এমনকী কিছু-কিছু চিনেও আছে। সুতরাং সেই স্মাগলাররা নিশ্চয়ই প্রোফেসর ভার্গবের মতো নিরীহ লোককে নিয়ে মাথা থামাবে না, কর্নাটকের লোককে অন্ধ্রপ্রদেশ ছেড়ে যাওয়ার কথাও বলবে না। কিন্তু রাজা রায়চৌধুরীকে

নিয়ে তাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। আপনি অনেক বড়-বড় ক্রিমিনালকে ঘায়েল করেছেন আমি জানি। একবার আন্দামানের খুব বড় একটা স্মাগলারদের গোটা দলকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই এখানকার স্মাগলাররা ভাবছে, আপনি ভাইজাগে এসেছেন সেরকমই কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যিই কিন্তু আমি সেজন্য আসিনি। আমি থাকি কলকাতায়, এত দূর ভাইজাগ শহরের স্মাগলিং নিয়ে মাথা ঘামাব কেন? কেউ আমাকে এ-কাজের দায়িত্বও দেয়নি। আমি এসেছি প্রোফেসর ভার্গবের মূর্তিগুলো দেখার জন্য। এটা আমার শখ।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"মুশকিল হচ্ছে কী জানো, রাজা, তুমি নিছক শখের জন্য কোথাও যাবে, এটা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তুমি যেখানেই যাও, সেখানকার অপরাধীরা তোমার গতিবিধি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে।"

রাজমহেন্দ্রী প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার নজর বুলিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমরা এখন খুবই সাঙ্ঘাতিক একটা ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। আপনারা বিশিষ্ট ব্যক্তি, আপনাদের কাছে বলা যেতে পারে। বন্দরে জাহাজ থেকে নানারকম জিনিসপত্র, যেমন ধরুন ঘড়ি, রেডিয়ো, ভি সি আর, সিগারেট, সোনা এইসব স্মাগলিং হয়। সব বন্দরেই হয়। কিন্তু গোপন রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে এখন ভাইজাগ বন্দর দিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাচার হচ্ছে শ্রীলঙ্কায়। সেগুলো কিনছে ওখানকার তামিল টাইগার বিদ্রোহীরা। আপনারা জানেন, ভারত সরকার ওখানকার বিদ্রোহীদের কোনওরকম অস্ত্র সাহায্য করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অথচ স্মাগলাররা অস্ত্র পাচার করছে। এতে দু' দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"আমরাও এই রিপোর্ট পেয়েছি। দিল্লিতে এই নিয়ে খুব আলোচনা চলছে। প্রধানমন্ত্রীও চিন্তিত।"

রাজমহেন্দ্রী বললেন, "যে-কোনও উপায়েই হোক এই স্মাগলিং বন্ধ করতেই হবে। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে হ্যান্ড গ্রেনেড বা হাত-বোমাই যাচ্ছে বেশি। কোথায় এই বোমাগুলো বানানো হচ্ছে, কোন পথে এই বন্দরে আসছে, তা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।"

রাজমহেন্দ্রী কাকাবাবুর দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চেয়ে রইলেন।

কাকাবাবু বললেন, "এটা গুরুতর ব্যাপার ঠিকই। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কথা বলছি, এই স্মাগলারদের ধরার জন্য দিল্লি থেকে আমার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়নি। সেজন্য আমি আসিনি। এরকম কাজের দায়িত্বও আমি নিতে পারব না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সে-ক্ষমতাও নেই।"

রাজমহেন্দ্রী বললেন,

"তা হলে আমি অনুরোধ করব, মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী, আপনি কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিন। আজ দুপুরেই আপনাকে ছুরি মারার চেষ্টা হয়েছে। ওরা আবার আপনার ওপর আক্রমণ করবে। আপনি কি পুলিশ পাহারায় চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন ? আপনার কলকাতায় ফিরে যাওয়াই উচিত। আমরা আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব। প্রোফেসর ভার্গবের বাড়ির সামনে দুটি পুলিশ পোস্টিং করিয়ে দিলেই চলবে, ওরা এখানে আর আসতে সাহস করবে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা একবার গলাখাঁকারি দিলেন। তাঁর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল।

তিনি বললেন, "মিস্টার রাজমহেন্দ্রী, আপনি যা পরামর্শ দিলেন, তা কি রাজা রায়চৌধুরী লক্ষ্মী ছেলের মতন শুনবেন ? ওঁকে আমি ভাল করেই চিনি। দারুণ একরোখা মানুষ। যারা ওঁকে ষড়যন্ত্র করে জেলে পাঠিয়েছে আর ছুরি মারার চেষ্টা করেছে, তাদের অন্তত একজন না একজনকে কঠিন শাস্তি না দিয়ে উনি এখান থেকে নড়বেন না। হয়তো দেখবেন, কালই উনি একা-একা বন্দর এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বন্দর এলাকাটা একটু ভাল করে ঘুরে দেখা দরকার। রস হিলের ওপর সুন্দর একটা গির্জা আছে, সেটাও আমার দেখা হয়নি।"

রাজমহেন্দ্রী বললেন, "পরে আর-একবার এসে দেখবেন। এখানে আর একদিনও থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। হোটেলে যে-কোনও লোক যে-কোনও সময়ে ঢুকে পড়তে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "হোটেল ছেড়ে আমি প্রোফেসর ভার্গবের বাড়িতে এসে থাকলেই তো পারি, এখানে অনেক ঘর আছে। জায়গাটাও সুন্দর।"

ভার্গব বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি এসে থাকুন না। খুব ভাল হয়। দু'জনে অনেক গল্প করা যাবে।"

রাজমহেন্দ্রী খুব জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, না, সেটা আরও বিপজ্জনক হবে। আপনি যেখানেই যাবেন, ওরা আপনাকে অনুসরণ করবে। এখানেও ধেয়ে আসবে। দু-একটা পুলিশ থাকলেও ওদের আটকানো যাবে না। ওরা সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর। কোটি-কোটি টাকার ব্যাপার, তার জন্য দু-চারটে খুন করতে ওদের একটুও হাত কাঁপবে না। আপনি কি প্রোফেসর ভার্গবকেও বিপদে ফেলতে চান ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি অন্য কাউকে বিপদে ফেলতে চাই না।" তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের র‍্যাকের কাছে একটা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভার্গব, এটা কোথাকার ? আরাকু ভ্যালির ?"

ভার্গব বললেন, "না। আরাকু ভ্যালি থেকে একটাই মোটে মূর্তি এনেছিলাম। ওরা সেটাও ভেঙে ফেলেছে।"

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে কাকাবাবু বললেন, "মানুষ যা গড়তে পারে না, তা ভাঙে কেন ?"

মেঝেতে বসে পড়ে কয়েকটা ভাঙা টুকরো জোড়া দেওয়ার চেষ্টাও করতে লাগলেন।

রাজমহেন্দ্রী বললেন, "আমাকে এবার বিদায় নিতে হবে। রায়চৌধুরী সাহেব, আজকের রাতটা ভেবেচিন্তে ঠিক করুন আপনি কী করবেন। কাল সকালে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। প্রোফেসর ভার্গব, আপনাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না। পুলিশ পাহারা দেবে।"

ভার্গব ফ্যাকাসেভাবে বললেন,

"বিরক্ত ? হাত-পা বেঁধে রেখে গেল। এঁরা দু'জন এসে না পড়লে কতদিন থাকতে হত কে জানে। হয়তো মরেই যেতাম !"

রাজমহেন্দ্রী চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভার্গব, আরাকু ভ্যালিতে যে মূর্তিগুলো দেখেছেন, তা কতদিনের পুরনো হবে মনে হয় ?"

ভার্গব বললেন, "অন্তত হাজার বছর তো হবেই। গুহার মধ্যে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা। একটা খসে পড়ছিল, আমি শুধু সেটাই নিয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু বললেন,

"ত্রিপুরার ঊনকোটি পাহাড়ের ওপর খোদাই করা অনেক মূর্তি দেখেছি, অনেকটা সে-ধরনের মনে হচ্ছে।"

ভার্গব বললেন, "ত্রিপুরার উনকোটির কথা আমি জানি। আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এই মূর্তিগুলো বাইরে থেকে দেখা যায় না। গুহার মধ্যে। সেখানে খুব অন্ধকার।"

কাকাবাবু বললেন, "অন্ধকারে অত মূর্তি গড়ল কী করে? সর্বক্ষণ মশাল জ্বেলে রাখতে হয়েছে। ধোঁয়ায় তো দম আটকে যাওয়ার কথা।"

ভার্গব বললেন, "হাওয়া চলাচলের নিশ্চয়ই ব্যবস্থা আছে। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা।"

নরেন্দ্র ভার্মা বলে উঠলেন, "আরে, আরে, তোমরা যে হঠাৎ মূর্তি আলোচনায় মেতে উঠলে! আমার এখন শহরে ফেরা দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলো, যাওয়া যাক। ভার্গব, আপনার এখানে থাকতে ভয় করবে না তো?"

ভার্গব বললেন, "ভয় তো করবেই। আমি আপনার মতন অত সাহসী নই। বাপরে বাপ, বিকেলে আপনাকে একজন ছুরি মারতে এসেছিল, তারপরেও আপনি হেসে কথা বলছেন? আমার তো এখনও বুক কাঁপছে।"

কাকাবাবু বললেন, "শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকের একটা সংলাপ আমার খুব ভাল লাগে। টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন!"

ভার্গব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হঠাৎ এই কথাটা কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এমনিই। মনে পড়ল।"

সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখলেন, দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে। ওঁদের জন্য গাড়িটা অপেক্ষা করছে, ড্রাইভারের মুখে বিরক্তির ভাব।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু বললেন, "নরেন্দ্র, তুমি সরষের মধ্যে ভূত কাকে বলে জানো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাদের অতশত খুঁটিনাটি বাংলা আমি জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "আগেকার দিনে মানুষকে ভূতে ধরলে ওঝা ডাকা হত। সেই ওঝারা মন্ত্র পড়া সরষে ছিটিয়ে-ছিটিয়ে দিলে ভূত পালাত। কিন্তু কোনও ভূত যদি সরষে দানার মধ্যেই ঢুকে বসে থাকে, তা হলে আর তাকে তাড়াবে কী করে?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হঠাৎ এই ভূতের ধাঁধাটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "চোর, ডাকাত, স্মাগলারদের ধরার জন্য আছে পুলিশবাহিনী। এখন পুলিশের মধ্যেই যদি চোর-ডাকাতরা ঢুকে বসে থাকে, তা হলে তাদের ধরা যাবে কী করে ? স্মাগলারদের ধরার জন্য একটা পুলিশবাহিনী যায়, আর ওই পুলিশের মধ্যে ওদের কোনও চর আগে থেকে খবর দিয়ে দেয়। তারা পালাবার সময় পেয়ে যায়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দুঃখের বিষয়, তুমি যা বললে তা মিথ্যে নয়। বড়-বড় অপরাধীদের ধরা যায় না, তারা টাকা পয়সা দিয়ে পুলিশের কিছু লোককে হাত করে রাখে। তবে, এই রাজমহেন্দ্রী লোকটাকে বেশ সৎ মনে হল।"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু-কিছু সৎ অফিসার তো আছে নিশ্চয়ই। না হলে দেশটা আর চলছে কী করে ?"

গাড়িটা টিলা থেকে নামতেই কাকাবাবু মুখটা ঝুঁকিয়ে বললেন,

"ড্রাইভার সাহেব, আমরা যদি আর এক ঘণ্টা এখানে থাকি, আপনার কি খুব অসুবিধে হবে ?"

ড্রাইভারটি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল,

"না, না। সার, আমার ওপর অর্ডার আছে, আপনারা যতক্ষণ চাইবেন, ততক্ষণ আমায় থাকতে হবে।"

কাকাবাবু নরেন্দ্র ভার্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এখন শহরে কী কাজ আছে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করতে হবে দিল্লিতে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে এক ঘণ্টা বাদে করলেও চলবে। এখন মোটে আটটা বাজে।"

"এখানে তুমি কোথায় যাবে ? চতুর্দিক অন্ধকার।"

"এসোই না আমার সঙ্গে।"

কাকাবাবু গাড়িটা থামাতে বললেন। রাস্তার ধারে ঝাউবন। মাঝখান দিয়ে একটা সরু রাস্তা। আকাশে বেশ জ্যোৎস্না। কাকাবাবু আগে-আগে চললেন।

একটু বাদেই পৌঁছে গেলেন বেলাভূমিতে। সেখানে মানুষজন কেউ

নেই।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে এলে কেন? কী আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, সামনে এত বড় একটা জিনিস রয়েছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এত বড় জিনিস? তার মানে সমুদ্র?"

"এখানে সমুদ্রের ধারটা কী সুন্দর! রাত্তিরবেলা সমুদ্র আরও সুন্দর দেখায়। এখানে কিছুক্ষণ না থেকে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয়?"

"এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখব? কেউ যদি আমাদের অনুসরণ করে থাকে, পেছন থেকে যে-কোনও সময় এসে আক্রমণ করতে পারে। তুমি কি পাগল হয়েছ?"

"আঃ নরেন্দ্র, তুমি সবসময় চোর-ডাকাতদের কথা ভাব কেন? এমন সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটেছে, আকাশে ঝকঝক করছে কত তারা, কী চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। এই সময়েও ওদের কথা ভাবতে হবে? একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকো। দেখো মনটা কেমন পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

তিনি নিজেই আগে বসে পড়লেন বালির ওপর।

॥ ৪ ॥

টুং করে একবার শুধু দরজায় বেল বাজল।

সামান্য শব্দেই কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িটা তুলে দেখলেন পৌনে ছ'টা বাজে।

জানলার পরদা সরানো, বাইরে দেখা যাচ্ছে ভোরের নরম নীল আকাশ।

শুয়ে-শুয়েই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

উত্তর এল না, আবার বেল বাজল একবার।

উঠে ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে, ক্রাচ দুটো না নিয়েই তিনি এক পায়ে লাফাতে-লাফাতে এলেন দরজার কাছে।

ম্যাজিক আই দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করলেন। কাউকে দেখা গেল না।

আবার লাফিয়ে-লাফিয়ে ফিরে গিয়ে বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা

নিয়ে এসে এক ঝটকায় খুলে ফেললেন দরজা।

আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়াল একটি কিশোরী মেয়ে। তেরো-চোদ্দো বছর বয়েস হবে। একটা ধপধপে সাদা ফ্রক পরা, ফরসা রং, মুখখানি ভারী সরল আর সুশ্রী, টানা-টানা চোখ। তার হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

সেই ফুলগুলি কাকাবাবুর পায়ের কাছে রেখে সে প্রণাম করল।

কাকাবাবু মুগ্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

মেয়েটি বাংলায় উত্তর দিল, "আমার নাম রাধা।"

তারপর সে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে বলল,

"সন্তুদাদা এখনও ওঠেনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু ? তুমি সন্তুকে চেনো নাকি ?"

রাধা ঘাড় হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি সন্তুদাকে চিনি, আপনাকে চিনি, জোজো-দেবলীনাকে চিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু এবার আসেনি আমার সঙ্গে। এসো, ভেতরে এসো।"

রাধা একটি চেয়ারে বসে বলল,

"বাঃ, এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় ? আমি কোনওদিন কোনও হোটেলে থাকিনি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন,

"এত সকালে তুমি কোথা থেকে এলে বলো তো ?"

রাধা বলল, "আমি একটা হস্টেলে থাকি। ভোরবেলা আমার সাঁতার শেখার ক্লাশ। আমি তো সাঁতার জানি, তাই রোজ-রোজ ওই ক্লাশে যেতে ইচ্ছে করে না। সেইজন্য আজ পালিয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, সেটা বেশ করেছ। দাঁড়াও একটু চায়ের অর্ডার দিচ্ছি, তুমি চা খাও ?"

রাধা দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু ফোনে চায়ের কথা বলে দিয়ে রাধার সামনে এসে বসলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এবারে বলো তো, তুমি সন্তুকে, আমাকে কী করে চিনলে ? সন্তু তো কখনও ভাইজাগে আসেইনি।"

রাধা বলল, "বাঃ, আমরা আগে কলকাতায় থাকতাম না ? সাত আট বছর বয়েস পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম। সেখানেই বাংলা শিখেছি। আমরা কিন্তু বাঙালি নই। আমার পুরো নাম রাধা গোমেজ। আমার মাও বাংলা

জানতেন।"

"তোমরা কলকাতায় কোথায় থাকতে ?"

"খিদিরপুর বলে একটা জায়গা আছে না ? সেইখানে। আমার এক মামাতো দাদার সঙ্গে সন্তুদাদা এক ইস্কুলে পড়ত। সন্তুদাদা একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল সেই দাদার সঙ্গে। সন্তুদাদাকে আমি সেই একবারই মোটে দেখেছি।"

"তুমি আমাকেও তখন দেখেছিলে ?"

"না, আপনাকে কক্ষনও দেখিনি। আপনাকে চিনেছি বই পড়ে। 'সবুজ দ্বীপের রাজা' বইটা কতবার যে পড়েছি তার ঠিক নেই। সন্তুদাদা আর আপনার সব অভিযানের কথা আমি পড়েছি।"

"বেশ। কিন্তু রাধা বলো তো, আমি যে এখানে এই হোটেলে আছি, তা তুমি জানলে কী করে ?"

"আমি এসেছি বলে আপনি রাগ করেছেন, কাকাবাবু ?"

"না, না, মোটেই রাগ করিনি। তোমার মতন এমন একটা ফুটফুটে মেয়েকে দেখলে কি রাগ করা যায় ? তবে অবাক হয়েছি। এই হোটেলে আমার থাকার কথা তোমাকে কে বলল ?"

রাধা একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তার হাসিমাখা ঝলমলে মুখখানা করুণ হয়ে গেল। ছলছল করে উঠল চোখ দুটি।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সে বলল,

"আমার বাবা আপনাকে মেরে ফেলবে !"

কাকাবাবু দারুণ চমকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ, কী বললে !"

রাধা আবার বলল, "আমার বাবা গুণ্ডাদের সর্দার। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব লোকেরা বাবার অনুচর। তারা বলেছে। আপনাকে মেরে ফেলবে !"

কাকাবাবু এবারে একটু হেসে বললেন, "তুমি বুঝি গল্প বানাতে ভালবাস, রাধা ?"

রাধা চোখ বড়-বড় করে বলল, "না, গল্প নয়, সত্যি, আপনি বিশ্বাস করুন। আমি নিজের কানে শুনেছি, ওরা বলেছে, রাজা রায়চৌধুরীকে সরিয়ে দিতে হবে !"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবা কে ? তার নাম কী ?"

রাধা বলল, "পিটার গোমেজ। আগে ভাল ছিল, এখন খারাপ হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সব ব্যাপারটা খুলে বলো তো। তুমি কোথায় ও-কথা শুনলে, কী করে শুনলে ? তুমি তো হস্টেলে থাকো ?"

রাধা বলল, "আমি হস্টেলে থাকি। শনিবার বিকেলে নিজেদের বাড়িতে যাই। ভিমানিপতনম কোথায় জানেন ? অনেকটা দূরে, সেই যেখানে ডাচদের ভাঙা দুর্গ আর লাইট হাউস আছে, সেখানে আমাদের মস্ত বড় বাড়ি। আমার বাবা আগে একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল, তখন আমরা কত ভাল ছিলাম, কত জায়গায় বেড়িয়েছি। তারপর কীজন্য যেন বাবার চাকরি চলে গেল। ছ' মাসের জন্য জেল খেটেছিল। কী জন্য, তা আমি জানি না। সেই সময় আমার মাও মনের দুঃখে মরে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "ইস। কত বছর আগে ?"

রাধা বলল, "ঠিক সাড়ে ছ' বছর। আমার তখন সাত বছর বয়েস। সব মনে আছে। তখন আমরা কলকাতাতেই থাকতাম। জেল থেকে বেরুবার কিছুদিন পর বাবা এখানে চলে এসে মাছের ব্যবসা শুরু করল। তারপরই আমার নতুন মা এল।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন ?"

রাধা বলল, "হ্যাঁ। এই নতুন মা আসার পরই বাবা একদম বদলে যায়। হঠাৎ খুব বড়লোক হয়ে গেছে। এখন আমাদের তিনখানা গাড়ি। মাছের ব্যবসা নয়, বাবার দলের লোকেরা স্মাগলিং করে, আমি সব জানি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কী করে জানলে, সেটা এবার বলো তো !"

রাধা বলল, "আমার আর কোনও ভাইবোন নেই। নতুন মায়েরও ছেলেমেয়ে নেই। বাবা আমাকে খুব ভালবাসে। প্রত্যেক শনিবার গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে হস্টেল থেকে বাড়িতে নিয়ে যায়। নতুন মা কিন্তু আমাকে তেমন পছন্দ করে না। তাই বাবার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলাও হয় না। আমি খুব বই পড়ি। বই পড়তেই সবচেয়ে ভালবাসি। বাংলা, ইংরিজি, তেলুগু সবরকম বই পড়ি। বই পড়তে-পড়তে অনেক রাত হয়ে যায়। তখন আমি টের পাই, গভীর রাতে চুপিচুপি বাবার কাছে অনেক লোক আসে। আমাদের বাড়ির মাটির নীচে সুড়ঙ্গ আছে। দু'-তিনটে ঘর আছে। ডাচদের আমলের পুরনো বাড়ি সারিয়ে নেওয়া হয়েছে তো, ওদের ওরকম থাকত। আমি এক-একদিন পা টিপে-টিপে গিয়ে দরজায় কান পেতে শুনেছি। সেই দলের মধ্যে আমার নতুন

মাও থাকে। ওরা স্মাগলিংয়ের কথা বলে, মানুষ খুন করার কথা বলে। শুনতে-শুনতে ভয়ে আমার বুক কাঁপে, তবু না গিয়েও পারি না। একদিন ঝাণ্ডু নামে একটা লোক আমাকে দেখে ফেলেছিল। বাবার দলের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে নিষ্ঠুর। সে বাবাকে কিছু বলেনি। গত রবিবার সেখানেই আমি শুনলাম, ঝাণ্ডু দাঁত কিড়মিড় করে বলছে, 'পার্ক হোটেলে রাজা রায়চৌধুরী উঠেছে, তাকে সরিয়ে দিতে হবে। ও এখানে এসেছে কেন?' বাবাও বলল, 'হ্যাঁ, রাজা রায়চৌধুরীকে সরিয়ে দিতে হবে। ও একটা পথের কাঁটা।' কাকাবাবু, সরিয়ে দেওয়া মানে কী? মেরে ফেলা নয়?"

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, "সরিয়ে দিতে চাইলেই কি সরিয়ে দেওয়া যায়?"

রাধা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক। আগেও মানুষ মেরেছে। ঘণ্টে নামে অন্য দলের একটা স্মাগলারকে ওরাই খুন করেছে আমি জানি। ওরা যদি আপনাকে মেরে ফেলে আমি কী করে সহ্য করব? আমি মনে-মনে আপনাকে পুজো করি। সন্তুদাদাকে কত ভালবাসি...।"

কাকাবাবু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "এ কী, তুমি কাঁদছ কেন? চোখ মুছে ফেলো, তোমার ভয় নেই, আমাকে কেউ মারতে পারবে না।"

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে রাধা মুখ তুলে বলল, "আপনাকে মারতে পারবে না, তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ। পারবে না।"

রাধা বলল, "তা হলে আপনি আমার বাবাকে মেরে ফেলবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আরে না, না, আমি মারতে যাব কেন?"

রাধা বলল, "আমি জানি, আপনাকে কেউ হারাতে পারে না। আপনার শত্রুরাই শেষপর্যন্ত হেরে যায়। তারাই মরে যায় কিংবা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আমার বাবা খুব বেপরোয়া, ধরা দেবে না, আপনার হাতেই মরবে। বাবা মরে গেলে নতুন মা আমাকে খুব কষ্ট দেবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবাকে আমি কিছুতেই মারব না, এই তোমাকে কথা দিলাম, রাধা।"

রাধা বলল, "আমার ভয় করে, সবসময় ভয় করে। আমার বাবা কেন এইরকম হয়ে গেল! কাকাবাবু, আপনি আর এখানে থাকবেন না।

কলকাতায় ফিরে যান। এই স্মাগলাররা সাঙ্ঘাতিক লোক। আমি জানি, বাবাদের দল ছাড়াও আর একটা দল আছে। এই দুই দলে খুব রেষারেষি। এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। আর এই দুই দলই মনে করে, আপনি তাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে এসেছেন। পুলিশ যা পারে না, আপনি তাই পারেন।”

কাকাবাবু বললেন, “কী মুশকিল, সবাই যে কেন এ-কথা ভাবছে! আমি মোটেই সেজন্য আসিনি। স্মাগলার-টাগলারদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

একবার শুধু আন্দামানে একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, সেটা ওদেরই দোষ!”

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, “কী দুঃখের কথা। তোমার বয়সী একটি মেয়ে এখন পড়াশুনো করবে, গান গাইবে, ছবি আঁকবে, খেলাধুলো করবে। সাঁতার কাটবে, নিজেকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবে, এইসবই তো স্বাভাবিক। তা নয়, খুন, স্মাগলিং এসব কথা তোমার মুখে শুনতেও খারাপ লাগছে!”

রাধা বলল, “ওই ঝাণ্ডু কী বলে জানেন তো? ও বলে একটু বড় হলে আমাকেও ওদের দলে নিয়ে নেবে, আমার নতুন মায়ের মতন। আমি অবশ্য ঠিক করেছি, ইস্কুলের পড়া শেষ হলেই কলকাতা চলে যাব। ওখানে কলেজে পড়ব।”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, তুমি কলকাতায় চলে এলে আমরা তোমার দেখাশুনো করব। তুমি একটু বসো তো রাধা, আমি বাথরুমে দাঁতটা মেজে আসি।”

টুথব্রাশে টুথপেস্ট লাগাতে-লাগাতে কাকাবাবু আপন মনে হাসলেন। কী অদ্ভুত যোগাযোগ! তিনি ঠিক করেছিলেন, স্মাগলিং নিয়ে মাথা না ঘামালেও যারা তাঁকে জেলে ভরার ব্যবস্থা করেছিল, আর ছুরি মারার জন্য ঘাতক পাঠিয়েছিল, তাদের পাণ্ডাকে খুঁজে বার করে তিনি শাস্তি দেবেনই। কিন্তু সেই দলের পাণ্ডাকে খুঁজতেই হল না। তার নাম-ধাম সবই জানা গেল। সেই পিটার গোমেজ এই রাধার মতন একটি সরল, সুন্দর মেয়ের বাবা। পিটার গোমেজকে শাস্তি দিলে রাধাও কষ্ট পাবে খুব। বাবার দোষে কি মেয়েকে শাস্তি দেওয়া যায়?

নাঃ, পুলিশ যা পারে করুক, তিনি আর এর মধ্যে থাকবেন না।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলেন, রাধা একটা ইতিহাসের বই পড়ছে মন দিয়ে। বইটা কাকাবাবু সঙ্গে এনেছেন।

কাকাবাবু বললেন, "রাধা, আমি এখান থেকে আজই চলে যাব ঠিক করলাম। তা হলে তোমার বাবার দলের কেউ আমার ধরা-ছোঁয়া পাবে না। আমার দিক থেকেও তোমার বাবার কোনও বিপদ হবে না।"

রাধা হাততালি দিয়ে বলল, "সেই ভাল, সেই ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন তুমি আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবে। হোটেলে একা-একা খেতে আমার ভাল লাগে না। তারপর আমি তোমাকে হস্টেলে পৌঁছে দেব।"

রাধা বলল, "আমি নিজেই যেতে পারব, পৌঁছে দিতে হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে। তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, এটা যদি ওরা টের পেয়ে যায়? রাধা, তুমি খুব সাবধানে থাকবে। হস্টেল থেকে এক পাও বেরোবে না এখন কিছুদিন। মন দিয়ে পড়াশুনো করবে, স্মাগলিং টাগলিং নিয়ে একদম চিন্তা করবে না।"

নীচের রেস্তরাঁয় না গিয়ে কাকাবাবু রুম সার্ভিসে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন।

ফলের রস, কর্ন ফ্লেক্স, টোস্ট, ওমলেট, সসেজ এসে গেল একটু পরেই। রাধা অনেকখানি ভুরু তুলে বলল, "ওমা, এত খাবার?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আমার অতিথি, তোমাকে তো খাতির করতেই হবে।"

রাধা বলল, "আমাদের হস্টেলে ভাল খাবার দেয়। কিন্তু আমার খেতেই ইচ্ছে করে না। বাড়ির কথা ভাবলেই আমার মনখারাপ হয়ে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি শিগ্‌গিরই বড় হয়ে উঠবে। তখন নিজের ইচ্ছেমতন জীবনটা গড়ে তুলবে।"

ছুরি-কাঁটা হাতে নিয়ে রাধা কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার সামনে বসে কোনওদিন খাব, এ-কথা কল্পনাও করিনি। আপনি তো আমার স্বপ্নের মানুষ। আচ্ছা, সন্তুদাদা কেন এল না?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুর এখন পরীক্ষা চলছে, তাই সঙ্গে আনিনি।

আচ্ছা রাধা, তুমি ছেলেবেলা বাংলা শিখেছিলে, এখনও মনে রেখেছ কী করে ?”

“আমি যে বই পড়ি ! এখানে আমাদের স্কুলে দুটি বাঙালি মেয়ে আছে তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলি, তাদের কাছ থেকে বই চেয়ে নিই। এই পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে বই পড়তে। বই আমার একমাত্র বন্ধু।”

“আচ্ছা, তুমি কীরকম বাংলা পড়ো, একটু পরীক্ষা নিই তো ! বলো, এটা কার লেখা ?

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি....”

“এটা তো কবিতা। আমি কবিতা বেশি পড়িনি।”

“কবিতা না পড়লে কিন্তু কোনও ভাষা ভাল করে শেখাই যায় না। কবিতা পড়লে কল্পনাশক্তি বাড়ে। আচ্ছা, তুমি ‘যখের ধন’ পড়েছ ?”

“হ্যাঁ, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা। কাকাবাবু, আপনি আমাকে বাচ্চা ভাবছেন নাকি ? আমি ওর চেয়ে বড়দের বই পড়েছি।”

“যেমন ?”

“বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’। খুব চমৎকার। বইটা আমার আছে। শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’, ‘রামের সুমতি’, এই তো সেদিন পড়লাম বিমল করের একটা বই, আর মতি নন্দীর ‘কোনি’ কী ভাল লেগেছে !”

খেতে-খেতে গল্প চলতে লাগল, ইংরেজি বইও বেশ কয়েকটা পড়েছে রাধা।

কাকাবাবু ওকে ‘মবি ডিক’-এর গল্পটা শোনালেন।

খাবার শেষ হতে কাকাবাবু বললেন,

“তুমি যেমন বই ভালবাস, আমিও তেমনই ভালবাসি। দেখলে তো, বইয়ের কথা বলার সময় চোর, ডাকাত, খুনিদের কথা আমাদের একবারও মনে পড়েনি !”

উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, “চলো, তোমার হস্টেলটা দেখে আসা যাক।”

হোটেলের গেটের কাছেই ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। সতর্কভাবে চারদিকটা

একবার দেখে নিয়ে কাকাবাবু একটা ট্যাক্সিতে উঠলেন, সেটা চলল সমুদ্রের ধার দিয়ে।

এই বেলাভূমির নাম দেওয়া হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ বিচ। এখন এখানে অনেক লোকজন। এই বেলাভূমিতে অবশ্য কেউ স্নান করে না, প্রচুর এবড়োখেবড়ো পাথর রয়েছে, জলে নামা বিপজ্জনক।

খানিকদূর যাওয়ার পর ট্যাক্সি ঢুকে গেল শহরের দিকে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে এতক্ষণ বাইরে রইলে, তোমায় কেউ কিছু বলবে না?"

রাধা মুচকি হেসে বলল, "একটু বকুনি দিতে পারে। বেশি না।"

কাকাবাবু বললেন, "আর এরকম বেরিয়ো না। সাবধানে থাকবে।"

হস্টেলটা প্রায় একটা মাঠের মধ্যে। চারদিক ফাঁকা। বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়, বেশ বড়লোকের মেয়েরাই শুধু এখানে থাকতে পারে। গেটের কাছে রয়েছে বন্দুকধারী দরোয়ান।

কাকাবাবু রাধার হাত ছুঁয়ে আবার বললেন, "খুব সাবধানে থাকবে কিন্তু।"

রাধা বলল, "আপনিও তাই থাকবেন।"

ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, "সমুদ্রের ধার দিয়েই আবার হোটেলে ফিরে চলো।"

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কাকাবাবুর মনে হল, এই বঙ্গোপসাগরেরই এক প্রান্তে শ্রীলঙ্কা, আগে যে দেশের নাম ছিল সিংহল বা সিলোন। এখন সেখানে সরকারি সৈন্যদের সঙ্গে জঙ্গি তামিলদের মারামারি কাটাকাটি চলছে। ওই জঙ্গিরা এ-দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে অকারণে মেরে ফেলল, তবু একদল লোক ওদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে। পৃথিবীর যেখানেই যুদ্ধ চলুক, একদল লোক সেখানে অস্ত্র পাঠিয়ে বড়লোক হতে চায়। কত মানুষ যে মরে, তা তারা গ্রাহ্যও করে না!

হোটেলে ফিরে কাকাবাবু লবিতে একটা কাচের ঘরে ঢুকে অধ্যাপক ভার্গবের বাড়িতে ফোন করলেন।

ভার্গব ফোন ধরতে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছেন? আর কোনও হামলা হয়নি তো?"

ভার্গবের গলার স্বর খুব মিনমিনে। তিনি ক্লান্তভাবে বললেন,

"না, হামলা হয়নি, পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু ওরা আবার ভয় দেখিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? কী করে ভয় দেখাল ?"

ভার্গব বললেন, "টেলিফোনে। একজন খুব বিশ্রী ভাষায় গ্যালাগালি দিয়ে বলল, 'বাঁচতে চাস তো কর্নাটকে ফিরে যা। এখানে থাকলে পুলিশও তোকে বাঁচাতে পারবে না!' এইরকম ভাষা শুনলেই আমার বুক কাঁপে। ভাবছি, ব্যাঙ্গালোরেই চলে যাব। সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকব।"

কাকাবাবু বললেন, "আর একটা কাজ করা যায়। আমরা আরাকু ভ্যালিতে চলে যেতে পারি। সেখানে তো এসব উপদ্রব থাকবে না। আজই গেলে কেমন হয় ?"

ভার্গব টেনে-টেনে বললেন,

"রায়চৌধুরী, তা বোধ হয় আমি পারব না। মনের জোর পাচ্ছি না। ব্যাঙ্গালোরে চলে যাওয়াই এখন আমার পক্ষে ভাল মনে হয়। প্লেনের টিকিট পেলেই চলে যাব।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তা হলে আমি কি একলাই ঘুরে আসতে পারি ? আমিও আর ভাইজাগে থাকতে চাই না। ওখানে ক'টা দিন নিরিবিলিতে কাটাব, গুহার মধ্যে মূর্তিগুলো দেখে আসব।"

ভার্গব বললেন, "তা যেতে পারেন। আপনার কাছে যে ম্যাপটা পাঠিয়েছি, সেটা দেখে আপনার খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। আমি তো মাস চারেক সেখানে যাইনি, আপনি গিয়ে দেখে আসুন মূর্তিগুলো কী অবস্থায় আছে।"

ফোন রেখে দিয়ে কাকাবাবু তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজের বেশিরভাগ জিনিসপত্র রেখে দিতে বললেন হোটেলের লকারে। একটা ব্যাগে দু'-একটা জামা-প্যান্ট গুছিয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করে দিলেন।

॥ ৫ ॥

আরাকু ভ্যালিতে সাধারণত সবাই ট্রেনে চেপেই যায়। দু' পাশের দৃশ্য অতি সুন্দর। কিন্তু কাকাবাবু একটা জিপগাড়ি ভাড়া নিলেন। ওখানকার পাহাড়ি রাস্তায় তিনি বেশি হাঁটাচলা করতে পারবেন না ক্রাচ নিয়ে। গাড়ি লাগবেই।

ড্রাইভারটির নাম সুলেমান খান। এখানকার অধিকাংশ লোক হিন্দি জানে না, ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি জানে। যারা ইংরেজিও শেখেনি, তাদের সঙ্গে কথা বলা খুব মুশকিলের ব্যাপার। সুলেমান কিছু-কিছু হিন্দিও বলতে পারে। সুলেমানের বাড়ি অনন্তগিরিতে, সেইজন্য সে এদিককার রাস্তাঘাট ভাল চেনে।

প্রথমদিকে বেশ কিছুটা সমতলের রাস্তা, তারপর পাহাড়ে উঠতে হয়। সুলেমানের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে কাকাবাবু বই খুলে পড়তে লাগলেন।

পৌঁছতে-পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। দুপুরে এক জায়গায় থেমে রুটি-মাংস খেয়ে নিয়েছেন দু'জনে। জিপটাও মাঝখানে একবার গণ্ডগোল করেছিল।

আগে থেকেই খবর নিয়েছিলেন যে, এখানে একটা টুরিস্ট গেস্ট হাউস আছে। সেটার নাম 'ময়ূরী'। নামের বাহার থাকলেও সেটার বেশ জরাজীর্ণ অবস্থা। একটা ঘর পাওয়া গেল অবশ্য, দেওয়াল নোনা ধরা, জানলার পরদা ছেঁড়া, বিছানার চাদর নোংরা। কাকাবাবু ওসব গ্রাহ্য করলেন না। যখন যেমন পাওয়া যায়, তেমন জায়গাতেই থাকতে তিনি অভ্যস্ত।

আজ আর কোথাও বেরোবেন না বলে সুলেমানকে তিনি ছুটি দিলেন।

তারপর স্নানটা সেরে গেস্ট হাউসের বাইরে একটা গোল, বাঁধানো চাতালে এসে বসলেন।

সন্ধে হতে একটু বাকি আছে। আকাশ শেষ-সূর্যের আলোয় লাল।

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন চারদিকটা। সবদিকেই পাহাড়। গোল করে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে এই উপত্যকা। এরকম জায়গা খুব কমই দেখা যায়। বেশ একটা শান্ত সৌন্দর্য আছে। এখনও হোটেল-টোটেল তেমন হয়নি বলে বেশি লোক এখানে আসে না।

দিনের বেলায় যথেষ্ট গরম ছিল, এখন বাতাসে শীত-শীত ভাব। ঘর থেকে একটা চাদর নিয়ে এলে ভাল হয়। কিন্তু কাকাবাবু উঠলেন না। একটু-একটু করে আলো কমে আসছে, দিগন্তের পাহাড়গুলো মিলিয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্যটা তাঁর দেখতে ভাল লাগছে।

হঠাৎ তিন-চারজন লোক সেখানে এসে জোরে-জোরে গল্প শুরু করে দিল।

টুরিস্ট হাউসে সাইকেলে চেপে লোক আসছে। এত লোক এখানে নিশ্চয়ই আসে না। ওরা বোধ হয় এখানে খেতে আসে। কিন্তু মাত্র সাড়ে ছ'টা বাজে, এখনও তো খাওয়ার সময় হয়নি।

এটা বোধ হয় স্থানীয় লোকদের একটা আড্ডাখানা।

অনেক লোকই কাকাবাবুর দিকে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছে। এখানে নিশ্চয়ই তাঁকে কেউ চিনতে পারবে না। তবু তাঁর মতন একজন লম্বা-চওড়া লোক, ক্রাচ নিয়ে হাঁটেন, এতেই লোকে কৌতূহলী হয়।

কাকাবাবু এখানে এসে ম্যানেজারের সঙ্গে দু-একটা কথা বলা ছাড়া আর কারও সঙ্গেই কথা বলেননি।

এক-একদিন তাঁর লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছেই করে না।

বকবক-করা লোকগুলো থেকে খানিকটা সরে গিয়ে কাকাবাবু আর একটা নির্জন জায়গায় বসে রইলেন অনেকক্ষণ। আকাশে তারা ফুটছে একটা-একটা করে। চাঁদও উঁকি মারছে দিগন্তে। এইরকম সময়ে চুপচাপ বসে থাকতেই ভাল লাগে।

রাত দশটা বাজতেই কাকাবাবু সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন নিজের ঘরের। শীত বেশ বেড়েছে, এখন আর বাইরে বসা যাবে না।

ঘরের আলোটা টিমটিম করছে, এই আলোতে বই পড়া যাবে না, এখন ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

দরজাটা একবার পরীক্ষা করে নিলেন কাকাবাবু। মোটেই মজবুত নয়। ছিটকিনিটা ঠিকমতো লাগে না। একটিমাত্র জানলারও তারের জাল ছেঁড়া। এখানে আশা করা যায়, কেউ উপদ্রব করতে আসবে না, তবু সাবধানের মার নেই, কাকাবাবু রিভলভারটা রেখে দিলেন বালিশের তলায়।

মাঝরাতেই একবার তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

কারা যেন হইহল্লা করছে পাশের ঘরে। তিনি জোর করে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সারারাতই তাঁর ভাল করে ঘুম হল না।

সকালবেলা সুলেমানকে ন'টার মধ্যে গাড়ি নিয়ে চলে আসতে বলেছিলেন, সে আর আসে না। সাড়ে ন'টা, দশটা বেজে গেল, কাকাবাবু অস্থির বোধ করতে লাগলেন। তিনি তৈরি হয়ে বসে আছেন।

এখানকার লোকগুলোর সময়জ্ঞান নেই একেবারে!

সুলেমান শেষপর্যন্ত এল সওয়া এগারোটায়।

তাকে বকুনি দেওয়ার আগেই সে কাঁচুমাচুভাবে জানাল যে, জিপটা কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছিল না। এখানে একটাই মোটে গাড়ি সারাবার জায়গা আছে। সেটা খোলে দশটায়। সেখান থেকে গাড়ি সারিয়ে আনতে দেরি হল।

কাকাবাবু বললেন, "এখন ঠিকঠাক চলবে তো?"

সুলেমান বলল, "হ্যাঁ সার, আর কোনও গোলমাল নেই।"

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু বললেন, "বোরা কেভ্‌স-এ যাব। রাস্তা চেনো তো?"

সুলেমান বলল, "বোরাগুহালু? হ্যাঁ, চিনি। আগে অনেক লোককে নিয়ে গেছি।"

গাড়িটা বড় রাস্তায় পড়ে ডান দিকে কিছুটা এগোতেই আর-একটা জিপগাড়ি খুব জোরে ওভারটেক করে সামনে গিয়ে থেমে পড়ল। সেটা পুলিশের গাড়ি।

সেই গাড়ি থেকে একজন লম্বা লোক নেমে এসে বলল,

"গুড মর্নিং সার। আমি আরাকু থানার ও. সি.। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "আমার সঙ্গে? কেন বলুন তো!"

লোকটি একগাল হেসে বলল,

"বাঃ, আপনি বিখ্যাত লোক। আমাদের এলাকায় এসেছেন, আলাপ করব না?"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, "আমার কথা কে বলেছে আপনাকে? আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?"

লোকটি কাকাবাবুর ক্রাচ দুটির ওপর নজর বুলিয়ে বলল, "আপনাকে দেখলেই চেনা যায়। আপনি টুরিস্ট গেস্ট হাউসে উঠেছেন, সে-খবর পেয়েছি।

"ভাইজাগ থেকে ডি. আই. জি. সাহেব রাজমহেন্দ্রী ফোন করে আপনার কথা জানালেন।"

এবার বোঝা গেল। রাজমহেন্দ্রী নিশ্চয়ই ভার্গবকে ফোন করেছিলেন। ওঁর কাছ থেকেই কাকাবাবুর এখানে আসার কথা জেনেছেন।

ও. সি. বলল, "সার, আমার নাম বিসমিল্লা খান। আপনার এখানে দেখাশুনোর সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। যা দরকার হয় আমাকে হুকুম করবেন।"

কাকাবাবু এবার সামান্য হেসে বললেন, "আমি বেড়াতে এসেছি। দেখাশুনো করার তো কিছু দরকার নেই। ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লাগল। নমস্কার।"

বিসমিল্লা খান বলল, "আমার কোয়ার্টার্র কাছেই। একবার আসুন সার, একটু চা খেয়ে যাবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক বেলা হয়ে গেছে, এখন আর চা খাব না। আমি বোরা কেভ্‌স দেখতে যাচ্ছি।"

বিসমিল্লা বলল, "সে তো অনেকক্ষণ খোলা থাকবে। একটু পরে যাবেন। চা না খান, শরবত খাবেন চলুন সার।

"রাজমহেন্দ্রী সাহেব বলে দিয়েছেন, আপনার যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়। আপনি সি. বি. আই.-এর বড় অফিসার।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আমি সি. বি. আই.-এর কেউ না। শুনুন বিসমিল্লা সাহেব, বেশি যত্ন করার দরকার নেই। আমি এখন শরবতও খাব না। বোরা কেভ্‌স ঘুরে আসি। ওবেলা আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

বিসমিল্লা খান আরও কিছুক্ষণ ঝুলোঝুলি করল, সময় নষ্ট হল অনেকটা।

গাড়ি আবার স্টার্ট দেওয়ার পর কাকাবাবু সুলেমানকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বিসমিল্লা কি সানাই বাজাতে পারে?"

সুলেমান বুঝতে না পেরে বলল, "না তো! এ-কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন সার?"

কাকাবাবু বললেন, "বিসমিল্লা খান নামে ভারতবিখ্যাত একজন সানাইবাদক আছেন, শোনোনি বুঝি?"

সুলেমান বলল, "না সার, শুনিনি। তবে এই ও. সি. সাহেব আপনার সঙ্গে অত হেসে কথা বললেন, কিন্তু এমনিতে খুব কড়া। সবাই ওঁকে ভয় পায়।"

কাকাবাবু মনে-মনে বললেন, 'ওর ওপরওয়ালা রাজমহেন্দ্রী ভাইজাগ থেকে ফোন করেছে বলেই এত খাতির করছে। না হলে আমাকে পাত্তাই দিত না।'

খানিকটা পরে সুলেমান আবার বলল, "সার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? আপনি বোরাগুহালু যাচ্ছেন কেন ? সেখানে তো আপনি গুহার মধ্যে নামতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "পারব না ?"

সুলেমান বলল, "আপনি খোঁড়া মানুষ। সে-গুহা তো অনেক গভীর, একেবারে পাতালে নেমে গেছে প্রায়। সেখানে নামা আপনার পক্ষে অসম্ভব !"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, "হুঁ, পা-টা খোঁড়া হয়ে গিয়ে ওই তো মুশকিলে পড়েছি। এখন অনেক কিছুই পারি না। তবু চলো, গুহার মুখটা অন্তত দেখে আসি। বেড়াতে এসেছি, আমার তো অন্য কোনও কাজ নেই।"

বোরা কেভ্স বা বোরাগুহালু বেশ বিখ্যাত জায়গা। অনেক টুরিস্ট আসে। মূল রাস্তা ছেড়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ দিয়ে বেশ কিছুটা ভেতরে যেতে হয়।

সেখানে মস্ত বড় একটা গুহামুখ আছে। প্রকৃতির খেয়ালে ভেতরের চুনাপাথরে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে অনেক ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। মনে হয় শিবলিঙ্গ বা নানা ঠাকুর দেবতার মূর্তি। ঠিক যেন মানুষের তৈরি। লোকের ধারণা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতাও একসময় থেকে গেছেন এই গুহায়।

দশ টাকার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে হয়। লম্বা লাইন পড়েছে। গাড়িটা ছেড়ে দিতে হয়েছে খানিকটা আগে, কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে হেঁটে-হেঁটে গেটের দিকে এগোতেই কয়েকজন তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

কাকাবাবু মনে-মনে বললেন,

"পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, তা অনেকে জানে না। ক্রাচ বগলে নিয়ে মাউন্ট এভারেস্টেও ওঠা যায়।"

তিনি গেটের কাছে দাঁড়াতেই টিকিট কাউন্টারের পাশ থেকে একটা লোক এগিয়ে এসে বলল, "সার, আপনাকে তো যেতে দেওয়া হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন ?"

লোকটি বলল, "আপনি, মানে, আপনি কী করে যাবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি খোঁড়া বলে ভাবছ তো ? আমি যদি নিজে ঝুঁকি নিয়ে যেতে চাই, তাতে তোমার কী আপত্তি ? পারব কি না সে আমি নিজেই বুঝব।"

লোকটি বলল, "তবু আপনার কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমরাই দায়ী হব। তাও ভেতরে আলো থাকলে আপনি গাইড নিয়ে যেতে পারতেন। কাল থেকে ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়ে গেছে, আলো জ্বলছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে আমি টিকিট কাটতে চাইলেও আপনারা টিকিট দেবেন না ?"

লোকটি বলল, "না, সার। দুঃখিত সার।"

কাকাবাবু আর তর্ক করলেন না। তিনি এই গুহা দেখতেও আসেননি।

তবু তিনি নিরাশ হওয়ার ভান করে বললেন, "ইস, এতদূর থেকে এসেছি, তবু দেখা হবে না ? শুধু-শুধু এত পয়সা খরচ হয়ে গেল।"

ঠুক-ঠুক করে তিনি ফিরে গেলেন গাড়ির কাছে।

সুলেমানকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমাকে টিকিট কাটতেই দিল না।"

সুলেমান বলল, "এটা খুব ফেমাস জায়গা সার। অনেক সাহেব-মেম দেখতে আসে। ওয়ার্ল্ডে এত বড় ন্যাচারাল গুহা আর নেই।"

কাকাবাবু মনে-মনে হাসলেন। এরকম গুহা, এর চেয়ে অনেক বড় আর গভীর প্রাকৃতিক গুহা এ-দেশেও আছে, পৃথিবীতে অনেক জায়গায় আছে। আমেরিকায় লুরে ক্যাভার্ন মাটির নীচে এক-দেড় মাইল নেমে গেছে, সেখানেও জল চুঁইয়ে বিস্ময়কর সব জিনিস তৈরি হয়েছে, কাকাবাবু সেসব দেখে এসেছেন। এ-দেশের লোকেরা সবকিছু বড্ড বাড়িয়ে বলে।

জিপে উঠে বললেন, "এদিকে এসেছিই যখন, আশপাশটা একটু ঘুরে দেখে যাই। সামনের ওই পাহাড়টা কচ্ছপের মতন, ওইদিকে চলো তো।"

এই অঞ্চলে ঢেউয়ের মতো অসংখ্য পাহাড় ছড়িয়ে আছে। কোনওটা গাছপালা ঢাকা, কোনওটা একেবারে ন্যাড়া। মাঝখান দিয়ে একটাই পথ, কখনও খুব খাড়াই, কখনও দারুণ ঢালু। সুলেমান খুব ভাল ড্রাইভার, ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাকাবাবু পেছনের সিটে বসেছেন। ব্যাগ থেকে একটা ম্যাপ বার করে কোলের ওপর রেখেছেন, সুলেমান সেটা দেখতে পাচ্ছে না। কাকাবাবু ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন কোনটা কোন পাহাড়।

এক জায়গায় তিন-চারটে গাছভর্তি গাঢ় হলদে রঙের ফুল ফুটে আছে, কাকাবাবু সেখানে গাড়িটা থামাতে বললেন। নেমে পড়ে তিনি ছিঁড়ে নিলেন একগুচ্ছ ফুল। গন্ধ শুঁকলেন। একটু দূরে ক্যাকটাসের ঝোপ। সেখান

থেকেও ভেঙে নিলেন একটু ক্যাকটাস।

যেন তিনি এইসব দেখার জন্যই এসেছেন। তাঁর অন্য কোনও কাজ নেই।

আবার গাড়িটা খানিকটা চলার পর এক জায়গায় দেখা গেল রাস্তার ওপর বড়-বড় পাথর পড়ে আছে। মনে হয় পাহাড় থেকে ধস নেমেছিল। গাড়ি আর ওদিকে যাবে না।

এদিকে গাড়ি-টাড়ি বিশেষ চলেও না। এ-পর্যন্ত আর একটাও গাড়ি দেখা যায়নি। চারদিকেই শুধু পাহাড় নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

সুলেমান জিজ্ঞেস করল, "গাড়ি ঘুরিয়ে নেব, সার?"

কাকাবাবু ম্যাপটা গুটিয়ে ফেলে বললেন, "জায়গাটা ভারী সুন্দর। এক্ষুনি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি একটু পায়ে হেঁটে ঘুরে আসি।"

সুলেমান বলল, "আপনার হাঁটতে কষ্ট হবে সার। আমি সঙ্গে আসব?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তার দরকার নেই। আমার অভ্যেস আছে।"

কাকাবাবু পাথরগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে খানিকটা পরে একটা বাঁক ঘুরে গেলেন। সুলেমানকে আর দেখা গেল না।

কাকাবাবু পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে আবার খুললেন।

ম্যাপে এখানকার রাস্তার বাঁকগুলোর এক দুই করে নম্বর দেওয়া আছে। সাত নম্বর বাঁকে একটা তারকা-চিহ্ন।

কাকাবাবু গুনে-গুনে সাত নম্বর বাঁকে এসে থামলেন। এখানে পাহাড়ের পাশ দিয়ে একটা সরু পথ। সেটা ধরে একটুখানি যেতেই চোখে পড়ল, একটা মস্ত বড় বটগাছ, তার পাশেই দৈত্যের মুখের হাঁয়ের মতো একটা গুহা। ওপর থেকে ঠিক যেন দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে।

এতটা রাস্তা হেঁটে আসতে কাকাবাবু হাঁফিয়ে পড়েছিলেন, এবার বুক ভরে শ্বাস নিলেন।

এটাই প্রোফেসর ভার্গবের আবিষ্কার করা গুহা। এই গুহার কথা এখনও বিশেষ কেউ জানে না। এই গুহার ভেতরে পাথরের গায়ে খোদাই করা আছে অনেক মূর্তি। প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, মানুষের তৈরি। হাজার বছর আগে হিন্দু আর বৌদ্ধদের খুব লড়াই হয়েছিল। অনেক বৌদ্ধ পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এইরকম সব নির্জন গুহায়। সেখানে সময় কাটাবার জন্য ছবি এঁকেছে, মূর্তি গড়েছে।

প্রোফেসর ভার্গব এটা আবিষ্কার করেছেন সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে। ইংরেজিতে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন এই গুহাটা সংরক্ষণের জন্য। এর মধ্যে অমূল্য শিল্পসম্পদ রয়েছে। কিন্তু সরকারের এখনও টনক নড়েনি।

কাকাবাবু গুহামুখের দিকে এগিয়ে গেলেন। বটগাছের ডালে সামনের

অনেকটা অংশ ঢাকা। গুহামুখে একটা লোহার গেট, তাতে কাঁটাতার জড়ানো। টিনের বোর্ডে একটা নোটিশ ঝুলছে। তাতে লেখা আছে, 'প্রবেশ নিষেধ'। গুহার মধ্যে ধস নেমেছে। সম্পূর্ণ গুহাটিই বিপজ্জনক।

এবারে কাকাবাবু সত্যি-সত্যিই নিরাশ হলেন। এখান থেকেও ফিরে যেতে হবে?

ভার্গব এখানে কয়েক মাস আসেননি, গুহাটার এই অবস্থা তিনি জানেন না। সরকার এটা দেখাশুনোর ভার নেয়নি, তা হলে লোহার গেট বসিয়ে নোটিশই বা দিল কে? হয়তো এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট এই ব্যবস্থা নিয়েছেন।

কাকাবাবু কাঁটাতার সরিয়ে লোহার গেটে মুখ চেপে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলেন। একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। গুহাটা কতদূর চলে গেছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। কাকাবাবুর ধারণা ছিল, এই গুহাটা তেমন বড় হবে না, প্রোফেসর ভার্গব অন্তত আট-দশবার এর ভেতরে গেছেন। তবে উনি রোগা-পাতলা ছোট্টখাট্টো মানুষ, ওঁর পক্ষে ওঠানামা করা সহজ।

লোহার গেটে একটা তালা লাগানো আছে। কাকাবাবু হাত দিয়ে দেখলেন, সেটা ভেঙে ফেলা এমন কিছু শক্ত নয়। তাঁর খুব ইচ্ছে হল, ভেতরে ঢুকে খানিকটা অন্তত গিয়ে দেখে আসার। কিন্তু টর্চ আনেননি। আর একজন কেউ সঙ্গে থাকলে ভাল হত।

কাকাবাবুর মনে পড়ে গেল সন্তুর কথা। সন্তু এখন কাছে থাকলে অনেক সুবিধে হত। সন্তু তালা না ভেঙেও গেটটা টপকে গিয়ে ভেতরটা ঘুরে আসতে পারত।

কাকাবাবু ভেবে দেখলেন, তাঁর হাতে অনেক সময় আছে। কাল আবার ফিরে আসা যেতে পারে। বড় একটা টর্চ, খাবারদাবার সঙ্গে রাখতে হবে, আর থানার ও. সি.-র কাছে চাইতে হবে একজন বিশ্বাসী শক্ত-সমর্থ লোক।

আজ দুপুর আড়াইটে বেজে গেছে, খিদেও পেয়েছে, আজ ফিরে যাওয়াই ভাল।

কাকাবাবু আবার ফেরার পথ ধরলেন।

গাড়ির কাছে এসে দেখলেন, সুলেমান এঞ্জিনের ডালা খুলে ফেলে কীসব খুটখাট করছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল সুলেমান?"

সুলেমান বলল, "গাড়িটার মুখ ঘুরিয়ে রাখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাড়াতাড়ি করো। বেলা হয়ে গেছে অনেক। তোমার খিদে পায়নি?"

সুলেমান খুটখাট, ঘটাংঘট করেই চলল। এক-একবার স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রথম-প্রথম ঝ্যান-ঝ্যান শব্দ হচ্ছিল, তারপর আর কোনও শব্দই হয়

না ।

কাকাবাবু বসে রইলেন একটা ছাতিম গাছের ছায়ায় । বেশ বিরক্ত লাগছে তাঁর । কাল থেকেই গাড়িটা গড়বড় করছে । ভাড়ার গাড়ি এরকম খারাপ অবস্থায় থাকবে কেন ? পাহাড়ের দেশে ঘোরাঘুরি করতে হবে, তিনি তো বলেই রেখেছেন আগে । পয়সা নেবে অনেক ।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, "আমি ঠেলে দিলে কিছু লাভ হবে ?"

অপরাধীর মতো মুখ করে সুলেমান বলল, "যদি সার দয়া করে একবার ঠেলে দেন । আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি ।"

সুলেমান স্টিয়ারিংয়ে বসল, কাকাবাবু ঠেলতে লাগলেন । খোঁড়া পা নিয়ে গাড়ি ঠেলা কি সহজ কথা ! তবু তিনি ঠেলতে লাগলেন, গাড়ি গড়াতে লাগল, তিন-চারবার এদিক-ওদিক করেও এঞ্জিনে কোনও শব্দই হল না । সারা মুখ ঘামে ভরে গেল কাকাবাবুর ।

নেমে পড়ে সুলেমান বলল, "নাঃ, এতে হবে না । টাই রড কেটে গেছে, এ.সি. পাম্প কাজ করছে না, একটা প্লাগ খারাপ হয়ে গেছে... । এইসব পার্টস কিনে একজন মেকানিক ডেকে আনতে হবে ।"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে কতক্ষণ লাগবে ? তুমি যাবে কী করে ?"

সুলেমান বলল, "আমি দৌড়ে চলে যাব । বোরাগুহালুর কাছে কয়েকটা গাড়ি আছে । ওর কোনও একটা গাড়িতে লিফ্‌ট নিয়ে মেইন রোড চলে যাব, তারপর যেখানে মেকানিক পাই ।"

কাকাবাবু বললেন, "এদিকে যে প্রায় বিকেল হয়ে গেল !"

সুলেমান বলল, "আর তো কোনও উপায় নেই সার । এই পাহাড়ি রাস্তায় তো গাড়ি ঠেলেও নিয়ে যাওয়া যাবে না বেশিদূর । খাড়াই পথে উঠবে না । এর পর বোরাগুহালুও বন্ধ হয়ে যাবে । আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসব সার, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন ।"

সুলেমান এক দৌড় লাগাল ।

কাকাবাবু বিরক্তি চেপে রাখলেন । গাড়ি ঠিক না হলে তো তাঁর ফেরার উপায় নেই । যে রাস্তা দিয়ে বাস যায়, সেই বড় রাস্তা থেকে প্রায় কুড়ি-একুশ কিলোমিটার ভেতরে চলে এসেছেন । পুরোটাই পাহাড়ি চড়াই-উতরাই । ক্রাচ বগলে নিয়ে এতখানি রাস্তা কি হাঁটা যায় ?

আর একটাও গাড়ি এ পর্যন্ত আসেনি, কোনও সাহায্য পাওয়ারও আশা নেই ।

সুলেমান কতক্ষণে ফিরতে পারবে কে জানে ? এখানে সে গাড়ির পার্টস বা মেকানিক কোথায় পাবে ? সন্ধে হয়ে গেলে এখানে ফিরে আসবেই বা কী করে ?

পাহাড়ে সন্ধে হয় বেশ তাড়াতাড়ি। বিকেল শেষ হতে না হতেই সূর্য চলে গেছে পশ্চিমের একটা পাহাড়ের আড়ালে। কিছু পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায় না। দুপুরে কিছুই খাওয়া হয়নি। পাউরুটি, জ্যাম, জেলি আর বিস্কুট সঙ্গে রাখা উচিত ছিল।

যদি পেটে খিদে না থাকত আর সঙ্গে আর দু-একজন থাকত, তা হলে এখানকার এই দৃশ্যটা এই সময় বেশ উপভোগ করা যেত। ঠিক যেন ছায়ার ডানা মেলে নেমে আসছে রাত্রি।

আজ আকাশে পাতলা-পাতলা মেঘ, তারা ফোটেনি, তবে একটু-একটু জ্যোৎস্না আছে। একেবারে মিশমিশে অন্ধকার নয়। এইরকম আবছায়ার মধ্যে সবকিছুরই চেহারা বদলে যায়। একটা পাথরের স্তূপকে মনে হচ্ছে একটা হাতি। বুনো ঝোপের দিকে তাকালে মনে হয় একদল মানুষ উবু হয়ে বসে আছে।

এই পাহাড়ি জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার কিছু আছে কি না কে জানে! ভালুক থাকতে পারে। প্রোফেসর ভার্গব একবার একটা ভালুক দেখার কথা বলেছিলেন। বড়-বড় সাপ তো আছেই। কাকাবাবুর অবশ্য জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই। একবার তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে একটা সাপ চলে গিয়েছিল, তিনি নিঃসাড় হয়ে বসে ছিলেন, সাপটা কামড়ায়নি।

সন্ধের পরেই এখানে বেশ শীত লাগে। কাকাবাবু আজ কোট পরে এসেছেন। অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন, তারপর দাঁড়ালেন গাড়িতে হেলান দিয়ে।

ক্রমশ সাতটা বাজল, আটটা বাজল। কাকাবাবুর দৃঢ় ধারণা হল, আজ রাতের মধ্যে সুলেমান আর ফিরতে পারবে না। কাকাবাবুকে এখানেই রাতটা কাটাতে হবে।

সুলেমান কি ইচ্ছে করে তাঁকে এখানে রেখে পালাল? তাতে তার লাভ কী? সে কিছু টাকা নিয়েছে, কিছু টাকা এখনও বাকি আছে। গাড়িটাও রয়েছে এখানে। কাকাবাবু যখন গুহাটা দেখতে গিয়েছিলেন, তখনই তো সে পালাতে পারত। না, সেরকম কোনও মতলব ওর নেই। গাড়িটাই বাজে।

কাকাবাবু যখন বুঝতে পারলেন যে, সুলেমানের আর ফেরার আশা নেই, রাত্তিরে কোনও খাবারও জুটবে না, তখন তিনি ঠিক করলেন যে গাড়িতেই শুয়ে থাকা ভাল।

পেছনের সিটে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে তিনি সবেমাত্র আরাম করছেন, এমন সময় দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।

কাকাবাবুর মনটা আনন্দে ভরে গেল। সুলেমান তা হলে ফিরেছে! আর একটা গাড়ি জোগাড় করে এনেছে। ওর চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই। তা হলে ও-গাড়িতেই ফেরা যাবে।

তবু কাকাবাবুর সন্দেহপ্রবণ মন। তিনি তাড়াতাড়ি জিপ থেকে নেমে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বসে রইলেন। হাতে রিভলভার।

পাহাড় দিয়ে এঁকেবেঁকে আসছে একটা গাড়ি, দেখা যাচ্ছে হেড লাইটের আলো। কাছে আসতে বোঝা গেল, সেটা একটা জোংগা জিপ। থামতেই তার থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ছ'-সাতজন লোক। ছুটে গেল জিপটার দিকে। ভেতরে ঢুকে, চারপাশ ঘুরে, এমনকী তলাতেও উঁকি মেরে দেখল। তারপর জোরে-জোরে কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। ভাষাটা ইংরেজি নয় বলে কাকাবাবু একটা শব্দও বুঝতে পারলেন না।

তবে, এটুকু বুঝলেন যে, এদের মধ্যে সুলেমান নেই, এরা খালি জিপটা দেখে অবাক হয়েছে। এরা কারা ? সকলেই প্যান্ট-শার্ট পরা, কারও মুখই দেখা যাচ্ছে না ভাল করে।

এবার সবাই সামনের দিকে ছুটল। কাকাবাবু আড়ালে থেকে তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন। ওরা গুহাটার দিকেই যাচ্ছে। একজন চাবি দিয়ে খুলে ফেলল লোহার গেটের তালা। জ্বলে উঠল চার-পাঁচটা টর্চ, ওরা ধুপধাপ করে ঢুকে পড়ল গুহার মধ্যে।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু ভাবলেন, ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওরা এই গুহার মধ্যে আগেও অনেকবার গেছে। ভেতরটা চেনা। গেটের চাবিও আছে ওদের কাছে। গুহার মধ্যে এত অন্ধকার যে রাত আর দিন সমান। তবু রাত্তিরবেলা ওরা গুহার মধ্যে যায় কেন ?

জিপটা খারাপ না হলে কাকাবাবু এখন এখানে থাকতেন না, ওদের দেখতেও পেতেন না।

তিনি বটগাছটার আড়ালে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। জিপটার কাছে ফিরে যাওয়া চলে না। লোকগুলো যে-কোনও সময় বেরিয়ে এসে আবার হয়তো জিপটা তল্লাশ করবে। লুকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে গুহার মধ্যে গুম গুম করে দু'বার শব্দ হল। অনেকটা ভেতরে। গুলির শব্দ নয়, মনে হয় যেন বিস্ফোরণ। ডিনামাইট ফাটানো হচ্ছে ?

কাকাবাবু ভুরু কোঁচকালেন। ডিনামাইট ফাটাচ্ছে কেন ? এরা মূর্তি চোর ? মূর্তি চুরি খুব লাভজনক ব্যাপার। বিদেশে পাচার করলে অনেক টাকাপয়সা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রোফেসর ভার্গব বলেছেন, এখানকার মূর্তিগুলো ভুবনেশ্বর-কোনারকের মন্দিরের মতন আলগা-আলগা নয়। পাথরের দেওয়ালে খোদাই করা। খুলে নিতে গেলে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে। তবু এরা ভাঙছে কেন ?

আর একবার বিস্ফোরণের শব্দ হতেই কাকাবাবু আর কৌতূহল সামলাতে

পারলেন না। সব লোক ভেতরে চলে গেছে, বাইরে কেউ নেই। গুহার মুখটায় গিয়ে একবার ভেতরে উঁকি মেরে দেখার দারুণ ইচ্ছে হল তাঁর।

লোহার গেটটা খোলা। কাকাবাবু মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই পেছন থেকে কেউ এসে খুব ভারী কোনও জিনিস দিয়ে জোরে মারল তাঁর মাথায়। তিনি মুখ ঘোরাবারও সময় পেলেন না। 'আঁক' করে একটা শব্দ করে তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

কালো প্যান্ট-শার্ট পরা একজন লোক কাকাবাবুর পা ধরে ছ্যাঁচড়াতে-ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেল গুহার মধ্যে।

কতক্ষণ পরে কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরে এল, তিনি জানেন না। মাথার পেছনে দারুণ ব্যথা। আবছা-আবছাভাবে টের পেলেন যে তিনি শুয়ে আছেন একটা চলন্ত গাড়িতে।

তিনি ভাবলেন, সুলেমানের জিপ ঠিক হয়ে গেছে, তিনি সেই জিপে ফিরে যাচ্ছেন গেস্ট হাউসে।

তারপরেই মনে পড়ল, মূর্তি-গুহার সামনে কেউ তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে।

তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সত্যিই তিনি শুয়ে ছিলেন একটা জিপের পেছন দিকে। সেটা চলছেও বটে, তবে সেটা সুলেমানের জিপ নয়। তাঁর সামনেই লোহার ডান্ডা হাতে নিয়ে বসে আছে একজন লোক।

কাকাবাবু একবার মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে সামনের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমায় কে মেরেছে, তুমি ?"

লোকটি কাকাবাবুর প্রশ্ন গ্রাহ্য না করে সামনের ড্রাইভারদের উদ্দেশে বলল, "মঞ্চাম্মা, এ লোকটা জেগে উঠেছে। আর বেশিদূর নিয়ে গিয়ে কী হবে, এখানেই শেষ করে দিই ? এখান থেকে কেউ লাশ খুঁজে পাবে না।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "বলো না, আমার মাথায় কে মেরেছে, তুমি ?"

লোকটি এবার বিকট মুখভঙ্গি করে বলল, "হ্যাঁ, মেরেছি। আবার মারব।"

কাকাবাবু এত তাড়াতাড়ি আর এত জোরে একটা ঘুসি চালালেন যে, সে বাধা দেওয়ার সময়ই পেল না। পড়ে গেল হাত-পা ছড়িয়ে।

কাকাবাবু বললেন, "অন্যকে মারো। নিজে মার খেতে কেমন লাগে, এবার দেখো।"

লোকটা আবার আস্তে-আস্তে উঠে বসল। লোহার ডান্ডাটা তুলে নিল। কাকাবাবু সেটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন না।

লোকটির চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে বললেন, "লোহার ডান্ডা দিয়ে মারবে ? মারো। আমার এই হাত দুটোও লোহার তৈরি।"

লোকটি ডান্ডা চালাতেই কাকাবাবু খপ করে সেটাকে এক হাতে ধরে

ফেললেন। অন্য হাতে লোকটির থুতনিতে আবার এমন ঘুসি চালালেন যে, সে নিজেকে সামলাতে পারল না, তার মাথাটা ঝুঁকে গেল জিপের বাইরে। কাকাবাবু তাকে ধরবার চেষ্টা করলেন, তার আগেই সে পড়ে গেল রাস্তায়।

গাড়িটা ঘচাং করে ব্রেক কষল।

কাকাবাবু আগেই এক নজর দেখে নিয়েছিলেন যে, গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি ড্রাইভারের দিকে ফিরতেই সেও মুখ ফিরিয়ে একটা রিভলভার উঁচিয়ে বলল, "মাথার ওপর হাত তোলো, একটু নড়লেই গুলি চালাব।"

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "স্ত্রীলোক?"

ড্রাইভারটি প্যান্ট-শার্ট ও মাথায় একটা টুপি পরা। কিন্তু গলার আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়।

কাকাবাবু বললেন, "আমি কোনও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলি না। তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?"

মহিলাটি ধমক দিয়ে বলল, "দু' হাত উঁচু করো। গাড়ি থেকে নামো। আমি ঠিক পাঁচ গুনব, তার মধ্যে না নামলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "মাথার খুলি উড়ে গেলে খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। গাড়ির মধ্যে রক্ত, ঘিটু-টিলু ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক আছে, আমি নামছি।"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো খুঁজে পেলেন না। এমনিই নামলেন। মহিলাটি এরই মধ্যে দৌড়ে গাড়ির পেছনদিকে চলে এসেছে। রিভলভারটা স্থির রেখে হুকুম করল, "রাস্তার একেবারে ধারে চলে যাও। আগে তোমাকে খতম করিনি, লাশটা সেখানে ফেলতে চাইনি। এখানে তোমাকে মেরে ফেলে দিলে সাতদিনের মধ্যেও তোমার লাশ কেউ খুঁজে পাবে না। তার আগেই শকুনে খেয়ে ফেলবে।"

কাকাবাবু শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "ইস ছি ছি, শকুনে খাবে? ভাবতেই কেমন লাগে। তুমি সত্যি-সত্যি গুলি করবে নাকি? ও রিভলভারটা কার? আমারই মনে হচ্ছে। আমাকে ফেরত দেওয়া উচিত।"

মহিলাটি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "খাদের ধারে যাও, এক...দুই..."

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে মারবে কেন, আমি কী দোষ করেছি, সেটাও জানতে পারব না?"

অন্য লোকটি একটু দূরে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। সে একটা গোঙানির শব্দ করে উঠল।

মহিলাটি সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে তীব্র গলায় ডাকল, "এই ইগলু, উঠে আয়, অপদার্থ কোথাকার!"

লোকটি জড়ানো গলায় বলল, "মঞ্চাম্মা, হাঁটুতে খুব চোট লেগেছে!"

মহিলাটি বিরক্তভাবে বলল, "তোকে আমি ঘাড়ে করে গাড়িতে তুলব নাকি ?"

তারপর সে রিভলভার নাচিয়ে কাকাবাবুকে বলল, "ওকে তুলে নিয়ে এসো। গাড়িতে রাখো।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "মারবার আগে আমাকে দিয়ে খাটিয়ে নিতে চাও।"

খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে গিয়ে তিনি লোকটিকে পাঁজাকোলা করে তুললেন। সে ফুঃ ফুঃ করল, আর তার মুখ থেকে রক্ত আর ভাঙা দাঁত বেরিয়ে এল কয়েকটা।

ওকে নিয়ে ফিরে আসার পর কাকাবাবু গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মহিলাটি হুকুমের সুরে বলল, "ওকে গাড়িতে বসিয়ে দাও!"

কাকাবাবু সে হুকুম না শুনে লোকটিকে উঁচু করে তুললেন নিজের বুকের কাছে।

তারপর বললেন, "মেয়ে হয়ে তুমি খুনি-গুন্ডাদের দলে ভিড়েছ। শুধু ভিড়লেই কী হয়, আগে সব শিখতে হয়। হাতে রিভলভার থাকলেই কি গুলি চালানো যায় ? এখন তুমি কোথায় গুলি করবে ? আগে এই লোকটাকে মারতে হবে। পারবে ?"

কাকাবাবু লোকটাকে ঢালের মতন ধরে রেখে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগলেন।

মহিলাটির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তবু সে চেঁচিয়ে বলল, "মাথায় গুলি করব, পায়ে গুলি করব।"

কাকাবাবু এবার গর্জন করে উঠলেন, "চালাও গুলি, চালাও! দেখি কেমন পারো।"

মহিলাটিও একটু-একটু পিছিয়ে যাচ্ছে। একবার তাকিয়ে দেখল, পেছনে খাদ। সে আর যেতে পারবে না। সে থামতেই কাকাবাবু 'এই নাও' বলে লোকটিকে ছুড়ে মারলেন মহিলাটির গায়ের ওপর।

দু'জনেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

কাকাবাবু ক্ষিপ্রভাবে গিয়ে মহিলাটির হাত থেকে রিভলভারটি কেড়ে নিলেন। সেটার ডগায় ফুঁ দিতে-দিতে বললেন, "হুঁ, যা ভেবেছিলাম, এটা আমারই। কতবার কত লোক কেড়ে নিয়েছে, আবার আমার হাতে ফিরে এসেছে। এবার উঠে দাঁড়াও।"

মহিলাটি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ভয়ে তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে একেবারে।

কাকাবাবু বললেন, "এবারে বলো তো, আমার ওপর তোমাদের এত রাগ কেন ? আমি তোমাদের চিনি না, কোনও ক্ষতিও করিনি!"

মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের মতলব কী ? গুহার মধ্যে ঢুকে মূর্তিগুলো নষ্ট করছিলে কেন ?"

মেয়েটি এবারেও চুপ ।

কাকাবাবু বললেন, "আমি মেয়েদের গায়ে হাত দিই না। তোমাকে ধরে টানাটানি করতে পারব না । গাড়িতে ওঠো, থানায় গিয়ে যা বলবার বলবে ।"

অন্য লোকটি গড়িয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে গেছে। খাদটি অবশ্য খাড়াই নয়, ঢালু। সে আটকে আছে এক জায়গায়। কাকাবাবু উঁকি দিয়ে একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, "ও থাক। ওকে তুলতে পারব না। তুমি ওঠো গাড়িতে।"

মহিলাটি তবু নড়ল না একটুও ।

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে আমি প্রাণে মারব না। কিন্তু পায়ে গুলি চালিয়ে আমার মতন খোঁড়া করে দিতে পারি। দেখবে ? মানুষের বুকে গুলি চালানো যায়, কিন্তু পায়ে মারা খুব শক্ত। পুলিশদের বলা থাকে, চোর-ডাকাতদের বা মিছিলের লোকদের শুধু পায়ে গুলি চালাতে। কিন্তু তারা ফসকে বুকে গুলি করে কত মানুষ মেরে ফেলে ! আমার টিপ দেখো।"

কাকাবাবু ট্রিগার টিপলেন। মহিলাটির ডান পায়ের ঠিক আধ ইঞ্চি পাশ দিয়ে একটা ঝোপ উড়িয়ে দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দ হল পাহাড়ে-পাহাড়ে ।

মহিলাটি লাফিয়ে উঠল, মুখ দিয়ে একটা ভয়ের আর্তনাদ বের হল ।

পাশের খাদ থেকে লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "মঞ্চাম্মা, জাম্প, জাম্প, জাম্প, ধরা দিয়ো না !"

মহিলাটি ঝাঁপ দিল খাদে। দু'জনেই গড়িয়ে-গড়িয়ে নামতে লাগল নীচে। কাকাবাবু ইচ্ছে করলেই ওদের গুলি করতে পারেন, কিন্তু গুলি করে মানুষ মারার প্রবৃত্তি তাঁর কখনও হয়নি ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপনমনে বললেন, "পালাল ? কী আর করা যাবে !"

গাড়িটার হেডলাইট জ্বলছে। ধক-ধক করছে এঞ্জিন। কাকাবাবু গাড়ি চালাতে ভালই জানতেন একসময়, অনেকদিন চালাননি। খোঁড়া পা-টা দিয়ে ক্লাচ চাপতে খানিকটা অসুবিধে হয় ।

কিন্তু এখানে থাকার তো মানে হয় না। ওরা দু'জনে গড়িয়ে নেমে গেল, কাছাকাছি যদি ওদের কোনও আস্তানা থাকে, তা হলে দলবল নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে ।

কাকাবাবু ড্রাইভারের সিটে বসলেন ।

চাঁদ পাতলা মেঘে ঢেকে গেছে, জ্যোৎস্না এখন খুব অস্পষ্ট। এ-জায়গাটা কোথায় কাকাবাবু জানেন না, সামনের দিকে না পেছনের দিকে গেলে আরাকু ভ্যালি পৌঁছবেন, সে সম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই। পাহাড়ের রাস্তায় ঘন-ঘন

বাঁক। আগে থেকে না জানলে বা একটু অসাবধান হলে গাড়ি পড়ে যায় খাদে। রাস্তাও ভাল দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু উপায় তো নেই, এই জায়গাটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া দরকার।

কাকাবাবু ফার্স্ট গিয়ারে আস্তে-আস্তে চালাতে লাগলেন গাড়ি। তাঁর সামনে অচেনা, অন্ধকার পথ।

॥ ৬ ॥

করমণ্ডল এক্সপ্রেসে মুখোমুখি দুটি জানলার ধারে সিট পেয়েছে সন্তু আর জোজো। দু'জনেই পরে আছে জিন্‌সের প্যান্ট আর টি-শার্ট। জোজোরটা হলুদ আর সন্তুরটা মেরুন।

ওদের পরীক্ষা চলছিল বলে কাকাবাবু এবারে সঙ্গে নিতে চাননি। ফাইনাল পরীক্ষা নয়, ক্লাশ টেস্ট। এর মধ্যে কলেজের জলের ট্যাঙ্কে একটা ধেড়ে ইঁদুর পড়ে গিয়ে মরে পচে উঠেছিল, তাই শেষ দুটি পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্লাশ চলতে পারে না। তাই গ্রীষ্মের ছুটি দিয়ে দেওয়া হল দু'দিন আগে। বাকি পরীক্ষা হবে ছুটির পর।

আকস্মিকভাবে এরকম ছুটি পেয়ে সন্তু বলেছিল, "ইস, যদি ট্রেনের টিকিট জোগাড় করা যেত, তাহলে কালই ভাইজাগ গিয়ে কাকাবাবুকে চমকে দিতাম। ভাইজাগ শহরটাও আমার খুব দেখার ইচ্ছে, ওখানে পাহাড় আর সমুদ্র একসঙ্গে দেখা যায়, ইন্ডিয়াতে এরকম জায়গা আর কোথাও নেই।"

জোজো ঠোঁট উলটে বলেছিল, "টিকিট জোগাড় করা তো ইজি। আমার বড়মামা রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইন্ডিয়ার যে-কোনও জায়গার যে-কোনও ট্রেনের টিকিট উনি পাঁচ মিনিটে জোগাড় করে দিতে পারেন। চল তোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

পর মুহূর্তেই মনে-পড়া ভঙ্গিতে বলেছিল, "ওঃ হো, ব্যাড লাক। বড়মামা যে এখন ছুটিতে, হিমালয়ে গেছেন, কী করে হবে?"

শেষপর্যন্ত সন্তুই তাদের পাড়ার বিমানদাকে বলে দুটো টিকিট পেয়ে গেছে। বিমানদার একটা ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে চেনা আছে। ছুটি পড়ে গেছে, আর কাকাবাবুর কাছে যাচ্ছে শুনে বাবা-মাও আপত্তি করেননি।

দু'জনে দু' ঠোঙা চিনেবাদাম কিনে ভেঙে-ভেঙে খাচ্ছে আর খোসা ফেলছে জানলা দিয়ে।

জোজো পরপর তিনটে খোসা ভাঙল, তিনটেরই ভেতরের বাদাম পোকায় ধরা, চিমসে মতো।

জোজো বলল, "জানিস সন্তু, একবার আমি ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়েতে যাচ্ছিলাম, সবসুদ্ধু ন'দিন লাগে, পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা ট্রেন জার্নি, সেই সময়

এক প্যাকেট বাদাম কিনেছিলাম, তোকে কী বলব, প্রত্যেকটা বাদামের দানা ধপধপে সাদা আর মাখনের মতো মুখে গলে যায়। অত ভাল বাদাম জীবনে খাইনি।”

সন্তু বলল, “রাশিয়ার বাদাম এত বিখ্যাত, তা তো জানতাম না!”

জোজো বলল, “আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট ছিল জিমি কারটার, জানিস তো? সে আমার বাবার শিষ্য। ওই জিমি কারটারের চিনেবাদামের ব্যবসা, সে একবার বাবাকে বিরাট এক বস্তা বাদাম পাঠিয়েছিল, সেও খুব ভাল, কত লোককে যে বিলিয়েছি সেই বাদাম!”

সন্তু বলল, “আমি একটাও পাইনি।”

জোজো বলল, “তুই তো তখন কাকাবাবুর সঙ্গে আফ্রিকা গিয়েছিলি!”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “তুই কখনও আফ্রিকা গেছিস?”

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, “অনেকবার। অন্তত সাত-আটবার তো হবেই। লাস্টবার যখন উগান্ডায় গিয়েছিলাম, রাত্তিরবেলা আমাদের তাঁবুতে একটা সিংহ ঢুকে পড়েছিল। ভাগ্যিস আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। কী করে বেঁচে গেলাম বল তো?”

সন্তু বলল, “এ গল্পটা আগে একবার শুনেছি মনে হচ্ছে। সবটা মনে নেই। কী করে বাঁচলি?”

জোজো বলল, “শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। আমার বাবা তো দারুণ ঝাল খান, যেখানেই যান একটা কৌটো ভর্তি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে যান। আমি দু' মুঠো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছুড়ে দিলাম সিংহটার চোখে। তখন সে বেচারা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে হাঁচতে লাগল আর ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল।”

সন্তু বলল, “হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তারপর তোর বাবা সেই সিংহটার গলায় দড়ি বেঁধে, কুকুরের মতন তাকে নিয়ে রোজ বেড়াতে যেতেন, না?”

জোজো বলল, “রোজ মানে মাত্র তিনদিন যাওয়া হয়েছিল। তারপর সিংহটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। আর একটু হলেই পোষ মেনে যেত।”

সন্তু বলল, “তার চেয়ে বরং একটা গোরিলাকে পোষ মানিয়ে নিয়ে আসতে পারতিস। এখানে কাজে লেগে যেত।”

জোজো প্রসঙ্গ বদল করে, গলা নিচু করে বলল, “সন্তু, ডান দিকের কোণে জানলার কাছের লোকটাকে দেখ। বেশিক্ষণ তাকাসনি, একবার শুধু দেখে নে। খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার।”

সন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে একঝলক দেখে নিল লোকটিকে। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একজন মাঝারি চেহারার লোক, এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে একটা ইংরেজি সিনেমার পত্রিকা খোলা।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কেন, সন্দেহজনক কেন?”

জোজো বলল, "হাতে ম্যাগাজিন, কিন্তু পড়ছে না, বারবার তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। নির্ঘাত স্পাই। আমাদের ফলো করছে।"

সন্তু বলল, "আমাদের কেউ ফলো করতে যাবে কেন ?"

জোজো বলল, "কাকাবাবুর অনেক শত্রু আছে। আমাদের ফলো করে ওঁর কাছে পৌঁছতে চায়।"

সন্তু বলল, "ধ্যাত ! আমরা যে এই ট্রেনে চাপব, তা কালকেও ঠিক ছিল না। ওই লোকটাও বোধ হয় বাঘ-সিংহ পোষে, তোর গল্প শুনে কান খাড়া করেছে।"

জোজো বলল, "সরোজ চৌধুরী নামে ওড়িশার এক ফরেস্ট অফিসার একটা বাঘ পুষেছিলেন। আমাদের সঙ্গে খুব চেনা ছিল।"

সন্তু নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, "কার সঙ্গে চেনা ছিল, বাঘটার সঙ্গে, না সরোজ চৌধুরীর সঙ্গে ?"

জোজো বলল, "সরোজবাবু আমাদের বাড়িতে অনেকবার এসেছেন। বাঘটাকে আমি তিন-চারবার দেখেছি। হঠাৎ বাঘটা কিছুদিনের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিল। একদম ডাকত না। বাঘ যদি মাঝে-মাঝে হালুম না করে, তবে তো সেটাকে বাঘ বলে মনেই হয় না। তেমন বাঘ পুষে লাভ কী ? আমার বাবা তখন সরোজবাবুকে বুদ্ধি দিলেন, বাঘটাকে যে মাংস খাওয়ানো হয়, তার সঙ্গে বেশ কয়েক গণ্ডা বারুইপুরের কাঁচালঙ্কা বেটে মিশিয়ে দেবেন তো ! সেই লঙ্কা-মেশানো মাংস খেয়ে বুঝলি, বাঘটার যা তেজী গর্জন শুরু হয়ে গেল !"

সন্তু বলল, "বারুইপুরের কাঁচালঙ্কা কেন ? অন্য জায়গার কাঁচালঙ্কা হবে না ?"

জোজো বলল, "নাঃ, তা হবে না। বারুইপুরের কাঁচালঙ্কা যে ঝালের জন্য ওয়ার্ল্ড ফেমাস !"

সন্তু বলল, "আমি কোনওদিন বারুইপুরের কাঁচালঙ্কা খাব না। খেলে যদি বাঘের মতন গর্জন শুরু করি !"

জোজো বলল, "ওই লঙ্কার অনেক গুণও আছে। একবার সুন্দরবনে...."

পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটি উঠে এসে ওদের পাশ দিয়ে বাথরুমে গেল।

জোজো চোখ বড়-বড় করে বলল, "শুনতে পেলি, শুনতে পেলি, ক্লিক-ক্লিক শব্দ হল ?"

সন্তু বলল, "না, আমি শুনিনি তো ?"

জোজো বলল, "ওর হাতটা পাঞ্জাবির ডান পকেটে ছিল। গোপন ক্যামেরায় আমাদের ছবি তুলে নিল।"

সন্তু বলল, "ওকে আমাদের নাম-ঠিকানা দিয়ে বলব ছবির কপি পাঠিয়ে দিতে ?"

জোজো বলল, "তুই গুরুত্ব দিচ্ছিস না সন্তু। কিন্তু আমি লোক চিনতে

পারি। আমার চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত।"

খানিক পরে খড়গপুর স্টেশন এল। সেই লোকটি নেমে গেল পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে।

সন্তু জোজোর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল।

জোজো বলল, "চেন সিস্টেম। আমরা ওকে চিনে ফেলেছি তো, তাই লোকটা নেমে গিয়ে অন্য একজনকে পাঠাবে। সে ফলো করবে আমাদের।"

তিনজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা উঠল, তাদের প্রত্যেকের আপাদমস্তক দেখে নিল জোজো।

তারপর ফিসফিস করে বলল, "এই কামরায় ওঠেনি, ইচ্ছে করেই পাশের কামরায় উঠেছে। দেখবি, একটু পরেই একবার এসে ঘুরে যাবে।"

ট্রেনে যাওয়ার সময় অনবরত খিদে পায়। ফেরিওয়ালাও ওঠে নানারকম। ওরা মশলা মুড়ি, আঙুর ও শোনপাপড়ি খেতে-খেতে গল্প করতে লাগল।

মাঝে-মাঝে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে। একজন দাড়িওয়ালা প্যান্ট-শার্ট পরা লম্বা লোককে দেখে জোজো সন্তুর পায়ে একটা খোঁচা দিল। চোখের ইঙ্গিতে জানাল, 'এই সেই স্পাই!'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই কী করে বুঝলি?"

জোজো বলল, "ওর দাড়িটা ফল্‌স। আমি দেখেই বুঝেছি।"

সন্তু ফিসফিস করে বলল, "টেনে দেখব নাকি?"

জোজো বলল, "এমন ভাব কর, যেন আমরা কিছুই বুঝিনি। একবার কী হয়েছিল জানিস, বাবার সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছি রাজস্থান দিয়ে, সেই সময় আমাদের পেছনে স্পাই লেগেছিল।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কেন, স্পাই লেগেছিল কেন?"

"আমাদের কাছে যে একটা দারুণ দামি জিনিস ছিল।"

"দামি জিনিস থাকলে চোর-ডাকাত পিছু নিতে পারে। তারা স্পাই হবে কেন?"

"কারণ আছে। জয়সলমিরের রাজা মারা গেছেন কিছুদিন আগে। তাঁর বিষয়সম্পত্তি কে পাবে, তাই নিয়ে তাঁর তিন ছেলে আর এক ভাইপোর মধ্যে লড়ালড়ি লেগে গেছে। এদের মধ্যে যে মেজোকুমার, সেই সূরজপ্রসাদ আমার বাবার শিষ্য, খুব ভাল লোক, সবকিছু তারই প্রাপ্য, কারণ তার দাদাটা পাগল। সূরজপ্রসাদ বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। বাবা তার জন্য এমন একটা মন্ত্রপূত মাদুলি তৈরি করেছিলেন, যেটা হাতে দিলে তার ভাগ্য খুলে যাবেই। অন্য ভাইগুলো জেনে ফেলেছিল সেই মাদুলির কথা। তারা চাইছিল কিছুতেই যেন আমরা জয়সলমিরে ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারি। সেইজন্যই তিনটে স্পাই—"

"একজন নয়, তিনজন?"

"অন্য তিন ভাইয়ের তিনজন। আমি ঠিক চিনে ফেলেছি। বাবাকে চুপিচুপি জানিয়ে দিলুম। বাবা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, তা হলে কী হবে ? আমি বললুম, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি !"

"তুই কী ম্যানেজ করলি ?"

"আমি করলুম কী, তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে নিজে ইচ্ছে করে তার সঙ্গে ভাব করলুম। সেবার আমাদের সঙ্গে প্রচুর পেস্তা-বাদাম আর কিশমিশ ছিল। পাকিস্তান থেকে ইমরান খান পাঠিয়েছিল বাবাকে। সেই একমুঠো পেস্তা বাদাম আর কিশমিশ নিয়ে লোকটাকে বললুম, খান না, খান না—"

"ইমরান খান পাঠিয়েছিল। তুই আমাকে একটুও দিলি না ?"

"তুই তখন কাকাবাবুর সঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলি ....আগে শোন না ঘটনাটা। লোকটা তো দিব্যি খেতে লাগল। অন্য দু'জন লক্ষ করছে। তারা ভাবল, আমরা নিশ্চয়ই ওর দলে ভিড়ে গেছি। খানিকটা বাদে দেখি যে, সেই লোকটা নেই।"

"কোন লোকটা ?"

"সেই প্রথম স্পাইটা। যাকে আমি পেস্তা বাদাম কিশমিশ দিয়েছি। অন্য দু'জন তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।"

"কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ! লোকটা মরে গেল ?"

"তা কে জানে ! স্পাইরা চলন্ত ট্রেন থেকে অনেকবার পড়ে যায়, সাধারণত ওদের কিছু হয় না।"

"আর বাকি দু'জন ?"

"একে বলে বিভেদনীতি, বুঝলি। বাকি দু'জনের মধ্য থেকে আমি আবার একজনকে বেছে নিয়ে ভাব জমালুম। তাকে দিলুম দু' মুঠো পেস্তা, বাদাম আর কিশমিশ। সেও হাসতে-হাসতে খেয়ে নিয়ে বলল, আর আছে ? ব্যস ! খানিক বাদে দেখি যে অন্য স্পাইটা একে আক্রমণ করেছে, দু'জনে দারুণ মারামারি শুরু হয়ে গেছে। একবার দু নম্বর জেতে, তিন নম্বর হারে, আর একবার তিন নম্বর জিতে যায়, দু নম্বর গড়াগড়ি দেয়। কামরার সব লোক দেখে-দেখে হাততালি দিতে লাগল। দু'জনেই প্রায় সমান-সমান। লড়াই শেষ হল না, তার মধ্যেই ট্রেন ঢুকে গেল জয়সলমির স্টেশনে। সেখানে মেজোকুমারের লোকজন অপেক্ষা করছিল, আমরা টপ করে তাদের গাড়িতে উঠে পড়লাম।"

সন্তু মুচকি হেসে বলল, "দারুণ গল্প, ভাল সিনেমা হয়। তুই গল্প লিখিস না কেন রে জোজো !"

জোজো বলল, "লিখব, লিখব, যখন লেখা শুরু করব, তখন দেখবি সব লেখকের ওপর টেক্কা দেব !"

জোজো আর সন্তুর ওপরে আর নীচে বাঙ্ক। জোজো আগেই বলে রেখেছে,

সে ওপরে শোবে। রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর কামরার সবাই যখন শুয়ে পড়ার ব্যবস্থা করছে, জোজো বলল, "দু'জনে একসঙ্গে ঘুমোব না, বুঝলি সন্তু। দাড়িওয়ালা স্পাইটা আরও দু-তিনবার ঘুরে গেছে। ওর কী মতলব কে জানে!"

সন্তু বলল, "তুই এবারেও যদি অনেকটা পেস্তা, বাদাম আর কিশমিশ আনতিস সঙ্গে, তা হলে ওর সঙ্গে ভাব জমানো যেত!"

জোজো এ-কথাটা না-শোনবার ভান করে বলল, "তুই প্রথম রাতটা ঘুমিয়ে নে, আমি জেগে পাহারা দেব। রাত দুটোর পর তুই জাগবি, আমি ঘুমোব।"

সন্তু চাদর পেতে আর একটা বালিশ ফুলিয়ে শুয়ে পড়ল। স্পাই নিয়ে সে মাথাই ঘামাচ্ছে না। কাকাবাবু এবার কোনও অভিযানে যাননি, কীসব মূর্তিটুর্তি দেখতে গেছেন। আর ওরা দু'জনও যাচ্ছে বেড়াতে। অন্য কেউ ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

একটু পরে সে ওপরের বাঙ্কে উঁকি দিয়ে দেখল, জোজো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কোনওদিনই জোজো বেশি রাত জাগতে পারে না।

সন্তুও চোখ বুজে এক ঘুমে রাত কাবার করে দিল।

ঘুম ভাঙল লোকজনের চলাফেরায় আর কুলিদের চিৎকারে। একটা বড় স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, সেই স্টেশনের নাম ওয়ালটেয়ার। সন্তু চমকে গিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওয়ালটেয়ার আর ভাইজাগ পাশাপাশি। এখানে নেমে ভাইজাগ যেতে হয়। জোজোকে ঠেলা মেরে সন্তু বলল, "ওঠ, শিগ্‌গির ওঠ, এখানে নামতে হবে।"

চোখ মুছতে-মুছতে নেমে জোজো বলল, "তোকে আর ডাকিনি, আমিই সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছি। ঘুমিয়েছি তো এই মাত্র। সেই দাড়িওয়ালাটা দু-তিনবার আমাদের কাছ থেকে ঘুরে গেছে, আমি জেগে আছি দেখে—"

সন্তু বলল, "ভোরবেলা থেকেই গল্প শুরু করিস না জোজো। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার আগে গল্প শোনা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।"

সন্তু জানে, কাকাবাবু এখানকার পার্ক হোটেলে সাতদিনের জন্য ঘর বুক করেছেন। সেই হোটেল থেকে কলকাতায় ফোনও করেছিলেন। স্টেশনের বাইরে এসে একজন অটো রিকশা চালককে সেই হোটেলের নাম বলতে সে কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দিল।

রিসেপশন কাউন্টারে রয়েছে একটি মেয়ে। সন্তু তাকে জিজ্ঞেস করল, "রাজা রায়চৌধুরীর রুম নাম্বার কত?"

মেয়েটি বলল, "উনি তো নেই। মিস্টার রায়চৌধুরী এই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন!"

সন্তুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সাতদিনের জন্য ঘর বুক করা, আজ

নিয়ে মোটে চারদিন। কাকাবাবু কোথায় চলে গেলেন ?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কি আসবার কথা ছিল ? উনি কিছুই বলে যাননি তো। ওঁর কিছু জিনিসপত্র রেখে গেছেন, আবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন, কিন্তু ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।"

সন্তু আড়ষ্টভাবে বলল, "না, আমরা হঠাৎ এসে পড়েছি। উনি অন্তত সাতদিন থাকবেন জানতাম।"

মেয়েটি দু'দিকে মাথা নাড়ল।

সন্তু তাকাল জোজোর দিকে। এখন উপায় !

কাকাবাবু কবে ফিরবেন, না ফিরবেন, কিছু ঠিক নেই। অনিশ্চিতভাবে এই হোটেলে দিনের পর দিন ঘরভাড়া নিয়ে থাকা যায় না। হোটেলটা বেশ বড়। সন্তু আর জোজো দু'জনের কাছে মিলিয়ে সবসুদ্ধু সাড়ে ছ'শো টাকা আছে, তাতে এখানকার একদিনের খরচও কুলোবে না। কোনও শস্তার হোটেল বা ধর্মশালা খুঁজতে হবে।

কাউন্টারের মেয়েটি বাঙালি। সে বুঝতে পেরেছে যে, এই কিশোর দুটি কোনও খবর না দিয়ে এসে বিপদে পড়েছে। সে বলল, "মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী ফিরবেন ঠিকই, তবে কবে ফিরবেন বলেননি। খুব সম্ভবত উনি আরাকু ভ্যালিতে গেছেন। তুমি কি ওঁর আত্মীয় ?"

সন্তু বলল, "উনি আমার কাকা হন।"

মেয়েটি ঝলমলে হাসিমুখে বলল, "ও, তুমিই সন্তু ? তোমার কথা জানি। তোমার কাকাবাবুর আমি ভক্ত। তোমরা ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে থাকতে পারো। ওখানে তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। শুধু-শুধু কেন হোটেলে পয়সা খরচ করবে ?"

এখন মাত্র সাতটা বাজে। এর মধ্যেই হোটেলের লবিতে অনেক লোক ঘোরাফেরা করছে। একটু দূরে একজন লোক কাগজ পড়ছিল, সে এবার হঠাৎ উঠে এল কাউন্টারের কাছে। বেশ লম্বা। বলশালী চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, দেখলে মনে হয় পুলিশ।

সেই লোকটি সন্তুকে বলল, "তুমি রাজা রায়চৌধুরীর ভাইপো ? উনি তো আরাকু ভ্যালি গেছেন। তোমরা সেখানে চলে যেতে পারো।"

কাউন্টারের মেয়েটিও বলল, "হ্যাঁ, উনি একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন আরাকু ভ্যালি এখান থেকে কত দূর।"

সন্তু বলল, "কত দূর ?"

কাউন্টারের মেয়েটি কিছু বলার আগেই লোকটি বলল, "বেশি দূর নয়, ট্রেনে ঘণ্টাচারেক লাগবে। সাড়ে আটটায় ট্রেন ছাড়বে। তোমরা এখনও গেলে ধরতে পারবে। রাজা রায়চৌধুরী ওখানেই আছেন আমি জানি।"

কাউন্টারের মেয়েটি বলল, "ট্রেনের নাম কিরনডোল এক্সপ্রেস। আরাকু

ভ্যালি এখান থেকে ১১৯ কিলোমিটার।”

এখানে আর দেরি করার কোনও মানে হয় না। ওরা দু’জনে হোটেল থেকে বেরিয়ে আবার একটা অটো রিকশা নিল।

জোজো জিজ্ঞেস করল, “আরাকু ভ্যালিতে কী আছে রে সন্তু ?”

সন্তু বলল, “ঠিক জানি না। ভ্যালি যখন, নিশ্চয়ই পাহাড় আছে। এখানকার সমুদ্রই দেখা হল না।”

জোজো বলল, “আমার পাহাড় বেশি ভাল লাগে। একবার আল্‌পস পাহাড়ে...”

সন্তু তাকে বাধা দিয়ে বলল, “দাঁড়া, স্টেশনে পৌঁছে আগে কিছু খেতে হবে।”

জোজো বলল, “আর একটা অটো রিকশায় আমাদের একজন ফলো করছে।”

সন্তু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, “আর জ্বালাসনি তো জোজো। অনেক রিকশা আসছে ! কাকাবাবু আরাকু ভ্যালিতে আছেন, এ তো কত লোকই জানে। হঠাৎ আমাদের কেউ ফলো করতে যাবে কেন ?”

জোজো বলল, “কিছু একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। পেছনের রিকশার একটা লোককে আমি হোটেলে দেখেছিলুম।”

সন্তু বলল, “হোটেলের আর কেউ স্টেশনে যেতে পারে না ?”

জোজো তবু বারবার তাকাতে লাগল পেছনে।

স্টেশনে পৌঁছে ওরা আগে দুটো টিকিট কেটে নিল। এক জায়গায় গরম-গরম পুরি ভাজছে, সেখানে পাঁচখানা করে পুরি আর আলুর তরকারি খাওয়ার পর সন্তু বলল, “জোজো, আরও খাবি নাকি ? পেট ভরে খেয়ে নে। দুপুরে খাবার পাওয়া যাবে কি না, তা তো জানি না !”

জোজো বলল, “কেন, ফক্কা ভ্যালিতে খাবার পাওয়া যায় না ?”

সন্তু বলল, “ফক্কা ভ্যালি না, আরাকু ভ্যালি। সে জায়গাটা কী রকম আমি জানি না। শহর না গ্রাম, তা জানি না। কাকাবাবু কোথায় উঠেছেন, তা জানি না। কাকাবাবু এর মধ্যে সে জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারেন, তাঁর দেখা পাব কি না জানি না।”

জোজো বলল, “এত জানি না বলছিস, তা হলে আমরা সেখানে যাচ্ছি কেন ?”

সন্তু বলল, “বাঃ, কাকাবাবুর খোঁজ করতে হবে না ? এখানে শুধু-শুধু পড়ে থেকে লাভ কী ?”

জোজো বলল, “সেখানেও যদি আমরা থাকার জায়গা না পাই ?”

সন্তু বলল, “গাছতলায় শুয়ে রাত কাটাব। পারবি না ?”

জোজো ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, “কেন পারব না ? কত রাজা-মহারাজার

বাড়িতে থেকেছি। ফাইভ স্টার হোটেলে থেকেছি। আবার গাছতলাতেও অনায়াসে থাকতে পারি।"

ট্রেন এবার ছাড়বে। সিট রিজার্ভ করা নেই, যে-কোনও কামরায় ওঠা যায়। ওদের সঙ্গে একটা করে বড় ব্যাগ, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। হাঁটতে-হাঁটতে একটা কামরা একটু ফাঁকা দেখে সন্তু উঠতে যাচ্ছে, জোজো তাকে বাধা দিয়ে বলল, "এটাও নয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কেন, এটা কী দোষ করল?"

জোজো চোখ ঘুরিয়ে বলল, "দু'জন সন্দেহজনক চেহারার লোক বসে আছে।"

সন্তু হেসে ফেলে বলল, "আঃ জোজো, তোকে নিয়ে আর পারি না! সব জায়গায় তুই ভূত দেখছিস!"

জোজো সন্তুকে টেনে নিয়ে আবার তিনটে কামরা ছাড়িয়ে, চতুর্থটায় উঠল। সেটায় বেশ ভিড়। প্রথমটায় বসবার জায়গাই পাওয়া গেল না, ট্রেন চলতে শুরু করার পর দু'জনে আলাদা-আলাদা চেপেচুপে কোনওরকমে বসল। জোজোর থেকে সন্তু অনেকটা দূরে, এইরকম অবস্থায় চেঁচিয়ে গল্প করা যায় না।

বেশ কিছুক্ষণ সমতলে চলার পর ট্রেনটা উঠতে লাগল পাহাড়ে। কামরায় ভিড়ও কমে এল। দুপাশেই পাহাড়, প্রচুর গাছপালায় ভরা, অজস্র বুনো ফুল ফুটে আছে। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট ঝরনা কিংবা নদী। খুব ছোট্ট-ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন থামছে, দু-একজন করে লোক নেমে যাচ্ছে, দু-একজন লোক উঠছে। অন্য কামরা থেকেও লোক যাতায়াত করছে মাঝে-মাঝে।

পাশের লোকদের সঙ্গে জোজো ভাব জমাবার চেষ্টা করেও পারল না। শহরের লোকেরা তবু কিছু-কিছু ইংরেজি জানে, গ্রামের লোকেরা তো তেলুগু ভাষা ছাড়া কিছুই বোঝে না।

সন্তু বলল, "তুই পাহাড় ভালবাসিস, দেখ না দু'পাশটা কী সুন্দর। দার্জিলিং-এ ছোট ট্রেন, আস্তে-আস্তে যায়, এখানে বড় ট্রেন পাহাড়ের ওপর দিয়ে কত জোরে যাচ্ছে দেখেছিস? আশ্চর্য না?"

জোজো বলল, "আমি আল্‌পস আর রকি অ্যান্ডিজ পাহাড়ে এ রকম ট্রেনে কতবার চেপেছি!"

সন্তু বলল, "'ধ্যানগম্ভীর ঐ যে ভূধর। নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর। হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে...' এটা কার লেখা বল তো?"

জোজো অবহেলার সঙ্গে বলে বসল, "পরের লাইনটা বলে দিচ্ছি 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।"

সন্তু বলল, "তুই আল্‌পস বা রকি অ্যান্ডিজ ঘুরে আসতে পারিস। আমি তো অত জায়গায় যাইনি। আমাদের দেশেই কত অপূর্ব সুন্দর জায়গা আছে।

দেখে-দেখে শেষ করা যায় না।”

জোজো বলল, “একটা ভুল হয়ে গেছে। বেশ কয়েক প্যাকেট বিস্কিট আর কাজুবাদাম কিনে আনা উচিত ছিল ভাইজাগ থেকে। দুপুরে আর কিছু পাওয়া না গেলে ওইগুলোই খেতাম।”

সন্তু বলল, “এর মধ্যেই তোর খাবার চিন্তা! এই তো কিছুক্ষণ আগে অত পুরি খেলি!”

জোজো বলল, “ভাল-ভাল দৃশ্য দেখলেই আমার খিদে পেয়ে যায়। এটা বিচ্ছিরি ট্রেন, কোনও ফেরিওয়ালা ওঠে না।”

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। ট্রেন একটা টানেলে ঢুকেছে। একটু পরেই আর-একটা।

সন্তু বলল, “একবার দিল্লি থেকে সিমলা যাওয়ার সময় এ রকম টানেল দেখেছি।”

জোজো বলল, “ব্রাজিলে একবার ট্রেনে চেপেছিলাম, সেখানে কত যে টানেল, একত্রিশ-বত্রিশটা তো হবেই।”

সন্তু বলল, “এখানে ক'টা টানেল পড়ে, গোনা যাক তো!”

জোজো বলল, “কোনও স্টেশনে বাদামও পাওয়া যায় না?”

সন্তু বলল, “তিন নম্বর টানেল গেল!”

এর পর ঘন-ঘন টানেল আসতে লাগল। কোনওটা ছোট, কোনওটা বেশ লম্বা। ট্রেন বেশ উঁচু দিয়ে চলেছে, এক-এক জায়গায় দেখা যায় গভীর খাদ, অনেক নীচে গ্রাম।

জোজো বলল, “পাহাড় ভাল, কিন্তু বেশিক্ষণ ভাল নয়। এখন পৌঁছে গেলেই ভাল লাগবে।”

সন্তু বলল, “তুই একত্রিশ-বত্রিশটা টানেল দেখার কথা বলেছিলি। এখানে এর মধ্যেই চৌত্রিশটা আমি গুনেছি। মনে হচ্ছে আরও আছে।”

কামরায় এখন সবসুদ্ধ দশ-বারোজন যাত্রী। কেউ কথা বলছে না। কয়েকজন বসে-বসে ঢুলছে, দু'জন মুখোমুখি বসে তাস পেটাচ্ছে। টানেলের মধ্যে ট্রেনটা ঢুকলে যখন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হয়ে যায়, তখন নিজের হাতটাও দেখা যায় না।

সন্তু বলল, “এখানে ট্রেন লাইন বানাতে অনেক খরচ হয়েছে। এত টানেল, আবার অনেক ব্রিজও দেখলাম।”

জোজো বিরক্তভাবে বলল, “কয়েকটা ভাল ভাল স্টেশন আর ভাল-ভাল দোকান বানাতে পারেনি? স্টেশনগুলোর যা বিচ্ছিরি চেহারা, আমার মনে হচ্ছে সন্তু তামান্না ভ্যালিতেও কিছু পাওয়া যাবে না।”

সন্তু বলল, “তামান্না ভ্যালি আবার কোথায়? আমরা যাচ্ছি আরাকু ভ্যালিতে।”

জোজো বলল, "এক-একটা জায়গার নাম কিছুতেই মনে থাকে না। আরাকু, আরাকু, আর ভুলব না।"

সন্তু বলল, "তোর এরকম নিরিবিলি খুদে স্টেশন ভাল লাগে না? আমার দেখলে এমন মায়া লাগে, ইচ্ছে হয় সেখানেই নেমে পড়ি, সেখানেই থেকে যাই।"

আবার একটা লম্বা টানেল, মিশমিশে অন্ধকার। ট্রেনটা আস্তে চলছে। সন্তু চুপ করে গেছে। জোজো বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারে না। সে বলল, "এই টানেলটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড়, তাই না?"

সন্তু কোনও উত্তর দিল না।

জোজো বলল, "দিনের বেলা অন্ধকার আমি একেবারে পছন্দ করি না।"

সন্তু তাও কিছু বলল না।

ট্রেনটা আবার টানেলের বাইরে এল। দিনের আলোয় ভরে গেল কামরাটা। যেন হঠাৎ রাত্তির, হঠাৎ দিন।

জোজো দেখল উলটো দিকের সিটে সন্তু নেই।

সমস্ত কামরাটা সে চোখ বুলিয়ে দেখল, সন্তুকে খুঁজে পেল না। তা হলে নিশ্চয়ই বাথরুমে গেছে।

পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেল, তবু সন্তু ফিরল না। বড় বাথরুম? সন্তু কিছু বলে গেল না কেন?

অস্থিরভাবে সে উঠে গিয়ে দেখল, দুটি বাথরুমের দরজা খোলা।

জোজো চেঁচিয়ে ডাকল, "সন্তু, সন্তু!"

কেউ সাড়া দিল না। সন্তু কি তার সঙ্গে মজা করার জন্য লুকিয়ে পড়েছে? কোথায় লুকোবে? এর মধ্যে ট্রেন কোথাও থামেনি। জোজো বেঞ্চগুলোর তলায় উঁকি মেরে দেখল।

জোজো এবার কামরার লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "আমার বন্ধু কোথায় গেল? আপনারা কেউ দেখেছেন?"

লোকগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

হঠাৎ জোজোর সমস্ত শরীর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল।

ট্রেন থামেনি, সন্তু ছাড়াও কামরায় লোক যেন কমে গেছে এর মধ্যে। যে-লোকদুটি তাস খেলছিল, সেই দু'জনও নেই।

জোজো খোলা দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকল, "সন্তু, সন্তু—"

॥ ৭ ॥

জোজোর বুকটা ধকধক করছে। সন্তু এতটা রসিকতা করবে না তার সঙ্গে। সে নেই, নিশ্চয়ই তার কোনও বিপদ হয়েছে। কাকাবাবুকে সে কী বলবে ? যে লোকদুটো তাস খেলছিল, তারাই ছিল স্পাই। জোজো কতবার বলেছে, তবু সন্তু বিশ্বাস করতে চায়নি।

কাকাবাবু যে জায়গাটায় আছেন, সে জায়গাটার নাম যেন কী ? ফক্কা ভ্যালি ? তামান্না ভ্যালি ? কুঝিকমিক ভ্যালি ? একটু আগে এত করে মুখস্থ করল, তবু এখন মনে পড়ছে না। মনে না পড়লে সেই স্টেশনে নামবে কী করে ? নামটা লিখে রাখা উচিত ছিল। টিকিটও তো সন্তুর কাছে। যাঃ, কী হবে, বিনা টিকিটের যাত্রী হিসেবে তাকে পুলিশে ধরবে ?

সন্তুর ব্যাগটাও রয়ে গেছে। তার মানে সে ইচ্ছে করে কোথাও নামেনি। এক হতে পারে, সন্তু কোনও কারণে, অন্য কামরায় লুকিয়ে পড়েছে, ঠিক স্টেশনে এসে পড়বে। তাই আসুক, তাই আসুক। তারপর সন্তুকে জোজো বেশ কয়েকটা গাঁট্টা মারবে, আগে তো সন্তু আসুক !

দুটো-তিনটে ছোট-ছোট স্টেশনে দাঁড়াবার পর ট্রেনটা একটা মাঠের মধ্যে থামল। জোজো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে একটা লোক সেখানেই নেমে পড়তে-পড়তে বলল, 'অ্যার্কু ভ্যালি।"

জোজো চমকে উঠল। নামটা মনে পড়ে গেছে। কিন্তু আরাকু আর অ্যার্কু কি একই জায়গা ?

মাঠের মধ্যে একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। সে জোজোর দিকে হাতছানি দিয়ে বলল, "কাম কাম, অ্যার্কু ভ্যালি।"

ট্রেন আবার হুইশ্‌ল দিয়েছে। জোজো ব্যাগদুটো নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল। স্টেশন নেই, প্ল্যাটফর্ম নেই, টিকিট চেকারও নেই। শুধু একটা বোর্ডে লেখা আছে আরাকু ভ্যালি। স্টেশন এখনও তৈরিই হয়নি।

সেই ছেলেটি জোজোর ব্যাগদুটো বইবার ভঙ্গি করে বলল, "টুরিস্ট লজ ?"

জোজোর মতো শহুরে পোশাক পরা যাত্রী আর সেই কামরায় ছিল না। সেইজন্যই জোজোকে দেখে সে ভেবেছে, এখানেই নামবে। বাইরের লোকরা এখানে বেড়াতে আসে, এই ছেলেটি জিনিসপত্র বইবার কাজ করে।

চলন্ত ট্রেনটার দিকে চেয়ে রইল জোজো। শেষ মুহূর্তেও সন্তু নামল না। জোজোর বুকটা হতাশায় ভরে গেল। একা-একা সে এখন কী করবে ?

টুরিস্ট লজ যখন আছে, সেখানেই কাকাবাবুর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

যত এলেবেলে জায়গা ভেবেছিল জোজো, তেমন নয়। পাকা রাস্তা দিয়ে বাস চলে, একটা বাসস্ট্যান্ডও আছে। রাস্তার দু'ধারে বেশ কিছু দোকানপাট, ভাতের হোটেলও রয়েছে। হোটেলের বাইরের বোর্ডে লেখা আছে কী-কী

খাবার পাওয়া যায়। জোজো দেখে নিল, চিকেন কারি, মাটন কারি, ডিমের ঝোল কিছুরই অভাব নেই। খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়, কিন্তু খাওয়া তো যাবে।

টুরিস্ট লজ বেশ বড় হয়, এটা টুরিস্ট গেস্ট হাউস। সেখানে পৌঁছে জোজো আর-একটা দুঃসংবাদ পেল।

রাজা রায়চৌধুরী এখানে একটি ঘর নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দু'দিন ধরে তিনি ফেরেননি। তিনি যে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই গাড়ির ড্রাইভার ফিরে এসেছে। গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সে পরদিন মেকানিক নিয়ে গিয়ে সারিয়েছে, কিন্তু সেখানে রাজা রায়চৌধুরীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

গেস্ট হাউসের ম্যানেজার রাগ-রাগ ভাব করে বলল, "সেই ঘরের তালা খুলে দেখা গেছে, একটা ব্যাগে দু-তিনটে জামা-কাপড় ছাড়া দামি জিনিস কিছু নেই। আগে থেকে ভাড়ার টাকা নেওয়া হয়নি, খোঁড়া লোকটি নিশ্চয়ই ভাড়া ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।"

কাকাবাবুর নামে এরকম অপবাদ সহ্য করতে পারল না জোজো। তার কাছে এখনও সাড়ে তিনশো টাকা আছে। এখানকার ঘরভাড়া ষাট টাকা। সে বলল, "তিনদিনের ঘরভাড়া আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি। উনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। ওই ঘরে আমি থাকব।"

ঘরে ঢুকে খাটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল জোজো। বুকটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। সন্তুকে ছাড়া সে কোথাও একা যায়নি। সন্তুও নেই, কাকাবাবুও নেই, এখন সে কী করবে? মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে।

এখানে দুপুরের খাবার পাওয়া যাবে না। খেতে হবে বড় রাস্তার ধারের কোনও হোটেলে। জোজোর যদিও খিদে পেয়েছে, তবু যেতে ইচ্ছে করছে না। একলা-একলা হোটেলে বসে খেতে কেমন যেন বোকা-বোকা লাগে।

বাথরুমের কলে টপ-টপ করে জল পড়ছে। জোজো একবার উঠে গিয়ে কলটা বন্ধ করার চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা টাইট হয় না। অনবরত জল পড়ার শব্দ শুনলে বিচ্ছিরি লাগে।

ভেবেচিন্তে কিছুই ঠিক করতে না পেরে জোজো শুয়েই রইল। খিদেয় পেট চিনচিন করছে। তবু সে মনে-মনে বলল, "সন্তু কিছু খেয়েছে কি না জানি না। সেইজন্য আমিও খাব না।"

সে আশা করতে লাগল, কাকাবাবু নিশ্চয়ই যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসবেন। কাকাবাবু এলেই নিশ্চিন্ত। কাকাবাবু ঠিক সন্তুকে খুঁজে বার করবেন।

এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভাঙল দরজায় ঠক-ঠক শব্দ শুনে। ধড়মড় করে উঠে বসে সে দেখল, এর মধ্যে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার।

আলো জ্বেলে সে দরজা খুলল।

একজন বেশ লম্বা-চওড়া লোক কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি কটমটে ধরনের।

জোজোর বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল, 'এও একজন স্পাই?'

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "রাজা রায়চৌধুরী কোথায়?"

জোজো শুকনো মুখে বলল, "উনি ফেরেননি।"

লোকটি কড়া গলায় বলল, "ফেরেননি মানে? দু' দিন ধরেই তো ফেরেননি শুনেছি। কোথায় গেছেন তুমি জানো না? তুমি কে?"

জোজো বলল, "আমি ওঁর ... মানে উনি আমার কাকা।"

লোকটি বলল, "পরশু যখন ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তো কোনও ভাইপো-টাইপো ছিল না। তুমি কোথা থেকে এলে?"

জোজো বলল, "কলকাতা থেকে। আপনি কে?"

লোকটি বলল, "আমার নাম বিসমিল্লা খান। এখানকার থানার ও. সি.।"

জোজো হাঁফ ছেড়ে বলল, "ওঃ পুলিশ। যাক, বাঁচা গেল। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আপনি ভেতরে এসে বসবেন?"

বিসমিল্লা খান ভুরু নাচিয়ে বলল, "তাই নাকি, আমার সঙ্গে কথা আছে। কিন্তু আমি তো এখানে বসতে পারব না। তুমি আমার সঙ্গে থানায় চলো। ভাইজাগ থেকে ঘন-ঘন ফোন আসছে। মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীকে খুঁজে বার করতে না পারলে আমার চাকরি চলে যাবে।"

জিপে চড়ে একটুক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল থানায়।

নিজের চেয়ারে বসে বিসমিল্লা বলল, "আমার সন্ধেবেলায় চা খাওয়া হয়নি। তুমি চা খাও তো?"

জোজো ঘাড় হেলাতেই বিসমিল্লা চায়ের জন্য হাঁক দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝনঝন করে ফোন বাজল।

দু'কাপ চায়ের সঙ্গে এল এক প্লেট বিস্কুট। বিসমিল্লা এখনও ফোনে কথা বলে যাচ্ছে, জোজো লোভীর মতো চার-পাঁচখানা বিস্কুট খেয়ে ফেলল।

ফোন নামিয়ে রেখে বিসমিল্লা বলল, "আবার ডি আই জি সাহেব খোঁজ নিচ্ছিলেন। রাজা রায়চৌধুরী কোথায় গেলেন, তুমি কিছু জানো না?"

জোজো বলল, "না, জানি না। আমার বন্ধু সন্তুও হারিয়ে গেছে।"

বিসমিল্লা দু'হাত ঝাঁকিয়ে বলল, "অ্যাঁ? আবার একজন হারিয়ে গেছে? সবাই এখানে হারাতে আসে কেন? অন্য জায়গায় হারালেই পারে। আমি এত পারব কী করে? আমার এখানে একখানা মাত্র জিপ। তা দিয়ে আমি থানা সামলাব, না লোক খুঁজতে বেরোব।"

জোজো ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে গেল।

বিসমিল্লা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পরে বলল, "আর তুমি? তুমিও হারিয়ে গেছ নাকি?"

জোজো বলল, "আজ্ঞে না। আমি হারিয়ে যাইনি। আমি তো আপনার সামনেই বসে আছি।"

বিসমিল্লা জিজ্ঞেস করল, "তোমার বন্ধু, তার কী হয়েছে, সে কোথায় হারিয়েছে?"

জোজো বলল, "সে আমার সঙ্গে আসছিল। চলন্ত ট্রেন থেকে তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বিসমিল্লা এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "চলন্ত ট্রেন থেকে? বাঁচা গেল! সেটা আমার দায়িত্ব নয়। রেল-পুলিশকে খবর দাও। স্টেশনমাস্টারকে জানিয়েছ?"

জোজো বলল, "আরাকু ভ্যালিতে নামলুম, সেখানে স্টেশনই নেই। স্টেশনমাস্টারকে পাব কোথায়?

বিসমিল্লা বলল, "হুঁ, ওখানে স্টেশন নেই বটে। কিন্তু আর-একটু দূরে শুধু আরাকু নামে একটা স্টেশন আছে। সেখানে স্টেশনমাস্টার আছে। সেখানে গিয়ে যা বলার বলো! অবশ্য সেখানে খবর দিলেও কিছু লাভ হবে না। তারা কিছুই করতে পারবে না। চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ হারাতে পারে নাকি? নিশ্চয়ই অন্য কোনও স্টেশনে নেমে গেছে।"

জোজো বলল, "ট্রেনটা একটা অন্ধকার টানেলের মধ্যে ঢুকেছিল, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।"

বিসমিল্লা বলল, "তা হলে হারিয়ে যায়নি, অদৃশ্য হয়ে গেছে। এটা আলাদা কেস। তোমার কাছে সেই বন্ধুর কোনও ছবি আছে?"

জোজো বলল, "না, ছবি তো নেই।"

বিসমিল্লা বলল, "বা বা বা বা। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার ছবিও তোমার কাছে নেই। তা হলে কী করে বুঝব যে তোমার সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল? যদি বলি, কেউ ছিল না? কিংবা, তুমিই তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ?"

জোজো আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ! না না, সন্তু আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাকে আমি ফেলে দেব কেন?"

বিসমিল্লা বলল, "লোকে কেন খুন করে, কেন ডাকাতি করে, সে তারাই ভাল জানে! মোট কথা, চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ কখনও অদৃশ্য হয় না। তুমি যা বললে, তাতে তোমাকেই জেলে ভরে দেওয়া উচিত।"

জোজো কাঁচুমাচু মুখে চুপ করে গেল।

বিসমিল্লা বলল, "তোমাদের ব্যাপার কী বলো তো? তোমার কাকা অদৃশ্য

হয়ে গেছেন। তোমার বন্ধু অদৃশ্য হয়ে গেল। তুমিও কি এখানে অদৃশ্য হওয়ার জন্য এসেছ ? এর আগেও তো এখানে অনেক বাঙালি এসেছে, তারা তো কেউ অদৃশ্য হয়নি।”

জোজো মিনমিন করে বলল, “আমার অদৃশ্য হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই, বিশ্বাস করুন !”

বিসমিল্লা বলল, “তা হলে যাও, টুরিস্ট লজে গিয়ে শুয়ে থাকো। এই রাত্তিরে তো কিছু করা যাবে না। ভাল করে দরজা-টরজা বন্ধ করে ঘুমোবে। খবরদার, অদৃশ্য হোয়ো না। কাল সকালে তোমার কাকাবাবুকে খুঁজতে বেরোব। চতুর্দিকে এত পাহাড়, এর মধ্যে কোথায় খুঁজব, তাই-বা কে জানে ! ভাইজাগের বড়কর্তারা তো কিছু বুঝবে না।”

আর দু'জন লোক ঘরে ঢুকে বিসমিল্লার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। একটু পরে সে মুখ তুলে বলল, “তুমি আর বসে রইলে কেন, তোমাকে তো ধরে রাখছি না। তুমি যেতে পারো।”

জোজোর খুব অভিমান হল। ফেরার সময়ে আর তাকে গাড়ি দেবে না ? তাকে হেঁটে যেতে হবে। সে এখানকার রাস্তা চেনে না।

আস্তে-আস্তে সে বেরিয়ে এল থানা থেকে। রাস্তা একেবারে অন্ধকার। কিছু লোক অবশ্য হাঁটছে টর্চ জ্বেলে। দূরে দেখা যাচ্ছে কিছু দোকানের আলো।

ঠিক কোনও কারণ নেই, তবু জোজোর গা ছমছম করতে লাগল। সন্তু কোথায় গেল সে কিছুই বুঝতে পারছে না। পুলিশও কোনও সাহায্য করল না। কাকাবাবুও কোথায় লুকিয়ে রইলেন ?

টুরিস্ট গেস্ট হাউসের ঘরটা কেমন স্যাঁতসেঁতে, এমনিতেই দমবন্ধ হয়ে আসে। রাত্তিরে ওই ঘরে তাকে একলা থাকতে হবে ? জোজো কোনওদিনই রাত্তিরে একা শুতে পারে না। অন্যরা শুনলে হাসবে তাই সে বলে না, কিন্তু সে ভূতের ভয় পায়। এরকম অচেনা জায়গায় একা থাকা তো আরও ভয়ের ব্যাপার। সন্তু তাকে কী বিপদেই না ফেলে গেল !

একটা দোকানে ঢুকে জোজো পেট ভরে রুটি-মাংস খেয়ে নিল। পেটে খিদে থাকলে ঘুমই আসত না। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে চাদর মুড়িসুড়ি দিয়ে কোনওমতে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে।

জোজো ঘরে তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল, তালা নেই। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

জোজোর বুকটা কেঁপে উঠল খুব জোরে। একবার সে ভাবল, পেছন ফিরে দৌড় মারবে কি না। তার বিছানায় কে যেন শুয়ে আছে !

দরজা ঠেলার শব্দ পেয়ে লোকটি মুখ ফেরাল। যেমন ভয় পেয়েছিল, তেমনই হঠাৎ জোয়ারের মতো আনন্দে জোজোর বুক ভরে গেল। সে

ব্যাকুলভাবে ডেকে উঠল, "কাকাবাবু ! আপনি ফিরে এসেছেন ?"

কাকাবাবুও বেশ অবাক হয়ে বললেন, "জোজো, তুই ! ওরা যে বলল, একজন ছেলে এসেছে। তাই আমি ভাবলাম, সন্তু বুঝি চলে এসেছে হঠাৎ। তোরা দু'জনেই এসেছিস ? সন্তু কোথায় ?"

জোজো এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, দু'হাত চাপা দিল মুখে।

কাকাবাবু উঠে এসে বললেন, "এ কী রে জোজো, কী হল। কাঁদছিস কেন ?"

জোজো আর কথা বলতেই পারছে না।

কাকাবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "তোকে তো কখনও কাঁদতে দেখিনি। জোজোকে মহা বীরপুরুষ বলেই তো জানি। কত দেশ-বিদেশ ঘুরেছিস !"

একটু পরে কিছুটা সামলে নিয়ে জোজো চোখ মুছতে-মুছতে বলল, "সন্তু নেই। আমরা একসঙ্গে ট্রেনে আসছিলাম, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে.... সন্তু কোথায় চলে গেল... নিশ্চয়ই কেউ ধরে নিয়ে গেছে.... থানা থেকে কোনও সাহায্য করল না।"

কাকাবাবু বললেন, "বোস তো ! সবটা খুলে বল।"

জোজোর মুখে সব ঘটনাটা শুনে কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আপন মনে বললেন, "সন্তুকে ধরে নিয়ে গেছে। তোকে আর সন্তুকে ওরা চিনল কী করে ? আমি ওদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর ওরা নিশ্চয়ই এই গেস্ট হাউস আর ভাইজাগের হোটেলে নজর রেখেছিল। ভেবেছিল আমি এর কোনও এক জায়গায় ফিরব। ভাইজাগের পার্ক হোটেলের লবিতে ওদের কোনও লোক ছিল, সে তোদের কথাবার্তা শুনেছে।"

জোজো বলল, "একটা লোক বারবার আমাদের আরাকু ভ্যালিতে যাওয়ার কথা বলছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "সে-ই অন্য দু'জন লোককে তোদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছে।"

জোজো উত্তেজিতভাবে বলল, "আমি বলেছিলুম, আমি বলেছিলুম, স্পাইরা আমাদের ফলো করছে, সন্তু বিশ্বাস করেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু যে বেশি-বেশি সাহস দেখাতে চায়।"

জোজো বলল, "এখানকার থানার ও. সি., কী যেন নাম, বড়ে গোলাম আলি না কী যেন, তিনি কোনও সাহায্য করতে রাজি হলেন না। সন্তুর কথা শুনলেনই না ভাল করে। তবে, আপনার জন্য খুব চিন্তিত।"

কাকাবাবু সে-কথা না শুনে বললেন, "সন্তু ঘাবড়াবে না, আগেও অনেকবার এরকম হয়েছে। কিন্তু এই লোকগুলো খুব নিষ্ঠুর। আমাকে তো মেরে ফেলার

অনেক চেষ্টা করেছে, পারেনি। সন্তু পালাবার চেষ্টা করলে যদি প্রাণে মেরে ফেলে ?"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ওরা কারা ?"

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "ওদের তো চিনি। কিন্তু ওরা যে কেন আমার সঙ্গে এত শত্রুতা করছে, সেটাই বুঝতে পারছি না। হয়তো পুরনো কোনও রাগ আছে। হয়তো ওদের দলের কাউকে আগে কখনও শাস্তি দিয়েছি।"

হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন, "জোজো, শিগ্‌গির সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নে। একটু পরেই একটা ট্রেন আছে, তাতে ফিরে যাওয়াই ভাল। আমি যে এখানে ফিরে এসেছি তা ওরা টের পেয়ে যাবে। রাত্তিরে এখানে হামলা হতে পারে। চল, চল, পালাই। ওদের বোঝাতে হবে যে, আমরা ভয় পেয়েছি।"

হুড়োহুড়ি করে জামাকাপড় ব্যাগে ভরে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন দু'জনে।

কাকাবাবু বললেন, "এ-যাত্রায় টর্চ আনিনি সঙ্গে, এটা একটা মস্ত ভুল হয়েছে। দেখিস জোজো, অন্ধকারে যেন হোঁচট খেয়ে পড়িস না।"

তিনটে ব্যাগই জোজোকে নিতে হয়েছে, কাকাবাবু হাঁটছেন ক্রাচ নিয়ে, এক হাতে রিভলভার। তীক্ষ্ণ নজরে দেখছেন, কেউ পেছনে আসছে কি না।

লাইনের ধারে মিনিট দশেক দাঁড়াবার পরই ট্রেনটা এসে গেল।

অধিকাংশ কামরাই ফাঁকা। জোজো আর কাকাবাবু যে কামরায় উঠলেন, সেটাতে আর একজনও যাত্রী নেই। তবে আলো জ্বলছে।

কাকাবাবু বললেন, "টিকিট কাটা হল না.... চেকার এলে ভাড়া মিটিয়ে দিলেই হবে।"

জোজো বলল, "সন্তু যেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেই জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিতে পারব।"

কাকাবাবু বললেন, "দেখলেও বিশেষ লাভ হবে না। এখানে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়। এর মধ্যে কোনও মানুষ লুকিয়ে থাকলে খুঁজে বার করা অসম্ভব!"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এই দু'দিন আপনি কোথায় ছিলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে খুব রোমহর্ষক কাহিনী। এত ঝঞ্ঝাটে আমিও আগে কখনও পড়িনি।"

সংক্ষেপে তিনি জোজোকে ব্যাপারটা জানালেন।

অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাতে-চালাতে কাকাবাবু কোথায় যে চলে গিয়েছিলেন তার ঠিক নেই। পাহাড় ছেড়ে নীচে নামার রাস্তা কিছুতেই খুঁজে পাননি। দু-একবার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল। একবার তো খাদে পড়ে

যাচ্ছিলেন প্রায়।

তারপর হঠাৎ গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল এক জায়গায়। আর কিছুতেই স্টার্ট নেয় না। কাকাবাবু দেখলেন গাড়িতে আর এক ফোঁটাও পেট্রল নেই। রাত তখন তিনটে।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গাড়িতে বসে থাকা আরও বিপজ্জনক। মঞ্চাম্মা নামে সেই মহিলা আর তার দলবল তাঁকে ধরার জন্য ধাওয়া করে আসবেই।

তিনি গাড়ি ছেড়ে, কোনওরকমে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে রাস্তা থেকে উঠে গেলেন খানিকটা ওপরে। একটা বড় পাথরের আড়ালে বসে রইলেন। এখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। খোঁজাখুঁজির জন্য ওরা ওপরে উঠে এলেও তিনি পাথরের আড়াল থেকে গুলি চালাতে পারবেন।

ভোরের আলো ফোটার একটু পরেই আর-একটা গাড়ি চলে এল সেখানে। তার থেকে তিনজন লোক আর সেই মঞ্চাম্মা নামের মহিলাটা নামল। পরিত্যক্ত জিপটায় উঁকিঝুঁকি মেরে তারা তাকাল পাহাড়ের দিকে। খানিকটা কাছাকাছি খোঁজাখুঁজি করল। কাকাবাবু ওপর থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছেন, ওরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না।

তারপর নিজেদের গাড়ির সঙ্গে অন্য জিপটাকে বেঁধে নিয়ে ওরা চলে গেল।

কাকাবাবু তখনও বুঝতে পারছেন না, তিনি কোনদিকে গেলে আরাকু ভ্যালি পৌঁছবেন। ম্যাপটা হারিয়ে গেছে। তবু ভাগ্যিস জিপটার মধ্যে তাঁর ক্রাচদুটো পাওয়া গিয়েছিল।

রাস্তাটা যেদিকে ঢালু হয়ে গেছে, সেদিকে খানিকটা এগিয়েও লাভ হল না। হঠাৎ সেটা খাড়া হয়ে আবার উঠে গেছে ওপরের দিকে।

খানিক পরে আর একটা গাড়ির আওয়াজ পেতেই তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন। অন্য কারও গাড়ি হলে তিনি লিফ্ট চাইতে পারেন, কিন্তু যদি গুন্ডাদেরই গাড়ি হয়?

সাবধানের মার নেই। কাকাবাবু আবার রাস্তা ছেড়ে ওপরের দিকে উঠে একটা পাথরের আড়াল খুঁজলেন। যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি এল, দুটোই গুন্ডাদলের। তারা পাগলের মতো কাকাবাবুকে খুঁজছে। কিছুতেই যেন তাঁকে বেঁচে ফিরতে দেবে না।

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, পাকা রাস্তা দিয়ে তাঁর হাঁটা চলবে না। যে-কোনও সময় একটা বাঁকের আড়াল থেকে ওদের গাড়ি এসে পড়তে পারে, তখন গা-ঢাকা দেবেন কী করে?

তাঁকে এগোতে হবে রাস্তা ছেড়ে ওপরের ঝোপঝাড় ঠেলে। দু' বগলে ক্রাচ নিয়ে সেভাবে চলা কি সহজ কথা? এক ঘণ্টা হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে যান।

সারাদিন ধরে ওদের দলের সঙ্গে কাকাবাবুর লুকোচুরি খেলা চলল।

অন্ধকার নেমে আসার পর তিনি আর এক-পাও এগোতে সাহস করলেন না। যে-কোনও মুহূর্তে খাদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। শরীরও আর বইছিল না। প্রায় দু'দিন কিছু খাওয়া হয়নি। মাঝে-মাঝে গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির জল পান করতে বাধ্য হয়েছেন। খাদ্য জুটবে কোথায় ? পাহাড়ের কোনও গাছেই ফল নেই, গাছের পাতা তো খাওয়া যায় না !

সারারাত তিনি একটা বড় গাছের তলায় ঘুমোলেন।

পরদিন কিছুটা ঘোরাঘুরি করার পর তিনি দেখতে পেলেন একটা ছোট্ট ঝরনা। সেটা দেখে তিনি অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ঝরনার জল নিশ্চিন্তে পান করা যাবে, তা ছাড়া ঝরনা সবসময় নীচের দিকে যায়। অনেক ঝরনা মিলে সমতলে গিয়ে নদী হয়। ঝরনাটাকে অনুসরণ করতে পারলে সমতলে গিয়ে পৌঁছবেন।

ঝরনায় নেমে তিনি ছপছপ করে এগোচ্ছিলেন। তবু একটা মুশকিল হল। মাঝে-মাঝে সেই ঝরনাটা বয়ে যাচ্ছে একেবারে রাস্তার পাশ দিয়ে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দু-একটা গাড়ি। সে-গাড়ি ওই গুন্ডাদের, না অন্যদের, তা বুঝবার উপায় নেই, ঝুঁকিও নেওয়া যায় না। ওরা এখনও খুঁজছে, হাল ছাড়েনি, তাই দূরে গাড়ির আওয়াজ পেলেই কাকাবাবুকে লুকোতে হয়েছে।

শেষপর্যন্ত সমতলে পৌঁছে, একটা ট্রাক ধরে তিনি কাকুতি-মিনতি করেছেন। সেই ট্রাকটা ছিল কাঠবোঝাই, তারা একজন খোঁড়া মানুষকে দেখে দয়া করে নামিয়ে দিয়ে গেছে গেস্ট হাউসের কাছে।

কাকাবাবু বললেন, "জানিস জোজো, একবার ওরা আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। ঝরনাটার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এক জায়গায় দেখি, ওদের তিনজন গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নেমে কীসব শলাপরামর্শ করছে। আমি চট করে লুকিয়ে পড়লাম। ওরা যতক্ষণ না চলে যায়, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি আড়াল থেকে গুলি চালিয়ে ওদের জখম করে গাড়িটার দখল নিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু নেহাত প্রাণরক্ষার জন্য শেষ মুহূর্তে ছাড়া মানুষের ওপর গুলি চালাতে ইচ্ছে করে না। তাই এত কষ্ট পেয়েও আমি ওদের ছেড়ে দিয়েছি।"

জোজো বলল, "মূর্তি-চোরগুলো এত মরিয়া হয়ে উঠেছে, ওই মূর্তিগুলো খুব দামি বুঝি ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা জানি না। আমি তো ভাল করে দেখিইনি। প্রোফেসর ভার্গব বলেছিলেন, এই মূর্তিগুলোর ইতিহাসের দিক থেকে খুব দাম আছে, কিন্তু বাজারে বিক্রি করলে বা বিদেশে বিক্রি করলে কত দাম পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে কিছু শুনিনি। এবারে গিয়ে ওঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে।"

কাকাবাবু একটা হাই তুলে বললেন, "এবারে বড্ড পরিশ্রম গেছে রে ! দু' রাত্তির ঠিকমতন ঘুমোতে পারিনি। খুব ক্লান্ত লাগছে।"

জোজো বলল, "এত জায়গা, আপনি শুয়ে পড়ুন না!"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা ঝটপট চলে এসেছি। ওরা বোধ হয় আমাদের ট্রেনে ওঠাটা টের পায়নি। তবু সাবধানে থাকতে হবে। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তুই পাহারা দিতে পারবি?"

জোজো বললে, "কেন পারব না? আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার রিভলভারটা যদি তোর কাছে রাখি, দরকার হলে তুই গুলি চালাতে পারবি তো?"

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "ইজি! একবার সাহারা মরুভূমিতে তিন-তিনটে বেদুইন-ডাকাত আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। আমাদের সঙ্গে যে আর্মড গার্ড ছিল, সে বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। আমি তার হোলস্টার থেকে টপ করে রিভলভারটা তুলে নিয়ে চোখের নিমেষে গুলি চালালুম। তিনটে ডাকাতই ঘায়েল।"

কাকাবাবু হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, "বাঃ, এই তো ঠিক জোজোর মতন কথা। এতক্ষণ বড্ড চুপচাপ ছিলি। তোর মুখে এইরকম কথা শুনতেই আমার ভাল লাগে।"

॥ ৮ ॥

ভাইজাগে ট্রেনটা পৌঁছল মাঝরাতের পর।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে কাকাবাবু 'পার্ক হোটেল'-এর দিকে গেলেন না। 'হংসরাজ' নামে আর একটা ছোটখাটো হোটেলে উঠলেন, দুটো ঘর ভাড়া নিলেন। দুটো ঘরের মাঝখান দিয়ে একটা দরজা রয়েছে।

কাকাবাবু জোজোকে বললেন, "এখানে দুটো খাট রয়েছে, তুই ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে এ-ঘরে শুতে পারিস। পাশের ঘরেও থাকতে পারিস। কাল সন্ধের আগে আমাদের কোনও কাজ নেই। আমি স্রেফ ঘুমোব। কাল সন্ধের আগে তুই ঘর থেকে এক-পাও বেরুবি না। ফোন করে ঘরে খাবার আনাবি। তোর যখন ইচ্ছে খাবি, আমার জন্য অপেক্ষা করবি না।"

তারপর সত্যিই কাকাবাবু পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোলেন। তারপর ব্রেকফাস্ট খেয়ে, স্নানটান করে আবার শুতে গেলেন। দুপুরবেলা জোজো একবার ডাকল, তবু তিনি চোখ না মেলেই বললেন, "আমি লাঞ্চ খাব না, তুই খেয়ে নে।"

বিকেলবেলায় উঠে বসে চা-বিস্কুট খেলেন।

জোজোকে বললেন, "প্যান্ট-শার্ট পরে নে, আমরা এখন বেরুব। শোন জোজো, এর পর তোকে আমি যা-যা করতে বলব, তুই চটপট করে যাবি। কোনও প্রশ্ন করবি না। মনে থাকবে?"

জোজো মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু নিজেও তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

হোটেলের সামনে একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, "আগে একটা বাজারে চলো।"

ট্যাক্সিটা শহরের মাঝখানে একটা বাজারের কাছে এসে থামল। কাকাবাবু নিজের মানিব্যাগটা জোজোকে দিয়ে বললেন, "তুই ভেতরে গিয়ে খুঁজে তিন-চারটে নাইলনের দড়ি আর তিন-চারটে গামছা কিনে নিয়ে আয়। চারটে করেই আনিস।"

কাকাবাবু গাড়িতেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরে জোজো জিনিসগুলো কিনে আনার পর কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, "সমুদ্রের ধারে চলো!"

একটু-একটু বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তা ফাঁকা। সন্ধে হয়ে গেছে। বেলাভূমি অনেকটা পার হওয়ার পর কাকাবাবু ডান দিকে বেঁকতে বললেন। তারপর একটু এদিক-ওদিক ঘুরে একটা মাঠের ধারে থামতে বললেন।

ড্রাইভারকে বললেন, "এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের বেশিক্ষণ লাগবে না।"

জোজোকে বললেন, "জিনিসগুলো নিয়ে আয় আমার সঙ্গে।"

সেই মাঠের মধ্যে একটি মেয়েদের হস্টেল। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দরোয়ান। বৃষ্টির জন্য সে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে, বন্দুকটা পাশে নামানো।

কাকাবাবুরা কাছে আসতেই সে জিজ্ঞেস করল, "কী চাই?"

কাকাবাবু বললেন, "সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দরোয়ানটি রুক্ষভাবে বলল, "এখন হবে না।"

কাকাবাবু মিনতি করে বললেন, "আমার বিশেষ দরকার। পাঁচ মিনিটের জন্য।"

দরোয়ানটি বলল, "বলছি তো হবে না। ছ'টার মধ্যে আসতে হবে।"

কাকাবাবু ফস করে রিভলভার বের করে বললেন, "মাথার ওপর হাত তোলো, ভেতরে চলো, একটু চেঁচালে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

ভয়ে লোকটার চোখ কপালে উঠে গেল, কাকাবাবু তাকে প্রায় ঠেলে নিয়ে চললেন। ভেতরের একটা প্যাসেজে ঢোকার পর কাকাবাবু বললেন, "জোজো, গামছা দিয়ে এর মুখ বেঁধে ফেল, তারপর হাত আর পা বেঁধে দে!"

দরোয়ানটিকে দাবড়ানি দিলেন, "একটুও নড়বে না।"

জোজো চটপট ওকে বেঁধে ফেলল। সে আস্তে-আস্তে বসে পড়ল মাটিতে।

ভেতরে একটা বেশ বড় উঠোন। তার একপাশে সুপারিনটেনডেন্টের

অফিসঘর। তিনি একজন মাঝবয়সী মহিলা, তাঁর চেয়ে কিছু কমবয়সী এক মহিলা তাঁর সহকর্মী, দু'জনেই কাকাবাবু ও জোজোকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন।

বয়স্কা মহিলাটি বললেন, "কী চাই? কে আপনাদের ভেতরে আসতে দিয়েছে?"

কাকাবাবু রিভলভারটা তুলে বললেন, "এটার জোরে ঢুকেছি। এটা কী জানেন তো?"

জোজো বলল, "রোজ দুপুরে হিন্দি সিনেমা দেখায় টিভিতে। রিভলভার কী, তা সব মেয়েও জানে। সব হিন্দি সিনেমায় থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোকে এত কথা বলতে হবে না। তুই দরোয়ানের বন্দুকটা নিয়ে এসে দাঁড়া। আর কোনও দরোয়ান বা গার্ড দেখলে সোজা গুলি করবি।"

মহিলা দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চেঁচাবেন না, মুখ খুললেই সোজা গুলি চালাব। আমার কথা লক্ষ্মী মেয়ের মতন শুনলে কোনও ক্ষতি করব না। মাথার ওপর হাত তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন। দু'জনেই।"

ওই একটি দরোয়ান ছাড়া এই হস্টেলে আর কোনও পুরুষকর্মী নেই। উঠোনের একপাশে ঝুলছে একটা লোহার ঘণ্টা।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে সবসুদ্ধু ক'জন মেয়ে আছে?"

বড় দিদিমণি বললেন, "এখন আছে বিয়াল্লিশজন।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাইকে নীচে ডাকুন। এই ঘণ্টা বাজালে সবাই নেমে আসবে? বাজিয়ে দিন!"

ছোট দিদিমণিটি খুব জোরে-জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

হুড়মুড় করে নেমে এল মেয়েরা। পাহাড়ি নদীর ঢলের মতন। কলকল-কলকল শব্দ করে। সকলে একই রকম ফ্রক পরা, একই বয়সী, প্রায় একই রকম চেহারা।

কাকাবাবু একটা থামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে বড় দিদিমণিকে বললেন, "সবাইকে সার বেঁধে পাশাপাশি দাঁড়াতে বলুন।"

মেয়েরা সকলেই একসঙ্গে কথা বলছে, হাসছে, গোলমাল করছে। বড় দিদিমণির কথা তারা শুনতেই পাচ্ছে না। তিনি বারবার বললেন, "লাইন করে দাঁড়াও।" কয়েকটি মেয়ে চেঁচিয়ে বলছে, "কেন, কেন, কী হয়েছে, কী হয়েছে?"

কাকাবাবু আড়াল থেকে সামনে এসে রিভলভারটা ওপরে তুলে একবার ফায়ার করলেন।

মেয়েরা ভয়ে শিউরে উঠে আঁ-আঁ করে উঠল।

জোজো বন্দুকটা তুলে বলল, "চুপ, সবাই চুপ।"

সঙ্গে-সঙ্গে সব কলকলানি থেমে গেল। মেয়েরা কেউ কিছু বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, "রাধা গোমেজ কার নাম ? সামনে এগিয়ে এসো।"

রাধা দু'পা এগিয়ে দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বাংলায় বলল, "আপনি ? কাকাবাবু, আপনি..."

কাকাবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ ! একটাও কথা বলবে না।"

জোজোকে বললেন, "ওই মেয়েটার মুখটা বেঁধে ফেল। হাত ধরে টেনে নিয়ে আয়।"

কাকাবাবু বড় দিদিমণির ঘাড়ে রিভলভার ঠেকিয়ে বললেন, "আমরা শুধু এই একটি মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি। কারও কোনও ক্ষতি করব না। আমরা চলে যাওয়ার পর দশ মিনিট পর্যন্ত কেউ নড়বে না। আমার কথার অবাধ্য হলে বোমা দিয়ে পুরো বাড়িটা উড়িয়ে দেব।"

জোজো টানতে-টানতে মুখবাঁধা অবস্থায় নিয়ে এল রাধাকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিলেন কাকাবাবু। তারপর গেট পেরিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে দ্রুত এগোতে-এগোতে বললেন, "জোজো, এবার ওর মুখের বাঁধনটা খুলে দে। ট্যাক্সি ড্রাইভার যেন কিছু সন্দেহ না করে। বেশ সহজেই কাজটা হয়ে গেল।"

গামছাটা খোলা হতেই রাধা অভিমানের সঙ্গে বলল, "কাকাবাবু আপনি ডাকলেই তো আমি চলে আসতাম। আমার মুখ বাঁধতে বললেন কেন ?"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "বেশ একটা নাটক হল, না ? সবাই দেখল একটা খোঁড়া লোক, কিন্তু দারুণ হিংস্র, কথায়-কথায় গুলি চালাতে পারে, সে একটা ফুটফুটে মেয়েকে জোর করে লুঠ করে নিয়ে গেল। পুলিশের কাছে বর্ণনা দিতে ওদের অসুবিধে হবে না। আমি এটাই চেয়েছিলাম।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমার সম্পর্কে ওরা কিছু বলবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "সব মেয়েই তোর সম্পর্কে বলবে, একটা বেশ সুন্দর মতন ছেলে সঙ্গে ছিল, খুব স্মার্ট। আমরা দু'জনে মিলে একটা ডাকাতের টিম।"

ট্যাক্সিতে উঠে তিনি বললেন, "হোটেলে ফিরে চলো।"

ট্যাক্সিতে কাকাবাবু ওদের চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করলেন। হোটেলের ঘরে এসে তিনি বললেন, "রাধা, তোমাকে কেন ধরে এনেছি সেটা তোমার জানা উচিত। তার আগে বলো, মঞ্জাম্মা কি তোমার নতুন মায়ের নাম ?"

রাধা বলল, "হ্যাঁ। দলের সব লোক বলে মঞ্জাম্মা। বাবা বলেন মঞ্জি। নতুন মা কী করেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ওপর তার খুব রাগ, কেন জানি না। আমাকে প্রায় খতম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।"

রাধা বলল, “আমি বলেছিলাম না ? আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি বলেছিলে ওদের স্মাগলিংয়ের কারবার। কিন্তু এর মধ্যে যে ওরা আবার মূর্তি চুরি করার কারবারে লেগে পড়েছে, তা জানব কী করে ?

রাধা জোজোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, “তুমি সন্তুদাদা ?”

কাকাবাবু বললেন, “না, ও সন্তুর বন্ধু জোজো।”

রাধা বলল, “ও হ্যাঁ, হ্যাঁ জোজোকে চিনি। জোজোর কথাও জানি।”

কাকাবাবু বললেন, “সন্তুকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত তোমার বাবা-মায়েরই দলের লোক। সেইজন্য তোমাকে আমি জামিন হিসেবে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ-খবর ওদের কাছে পৌঁছে যাবে। তোমাকে আমি যতক্ষণ ধরে রাখব, ততক্ষণ ওরা সন্তুর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না !”

রাধা জিজ্ঞেস করল, “সন্তুদাদাকে কি আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেছে ? তা হলে আমি সে-বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারি।”

কাকাবাবু বললেন, “সেটা ওরাও বুঝবে। তোমাকে ধরে আমি বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারি, সেইজন্য ওখানে সন্তুকে রাখবে না। ওখানে কোনও প্রমাণও রাখবে না।”

জোজো বলল, “আমার মনে হয়, আরাকু পাহাড়ের ওখানেই কোথাও সন্তুকে লুকিয়ে রেখেছে।”

কাকাবাবু বললেন, “সে এলাকায় আমি দু’দিন কাটিয়েছি। আমাদের পক্ষে সেখান থেকে সন্তুকে বার করা অসম্ভব ! পুলিশও পারবে না। রাধা, রাত জাগলে তোমার কষ্ট হয় ?”

রাধা বলল, “না, ইচ্ছে করলে আমি রাত জাগতে পারি।”

কাকাবাবু বললেন, “আজ সহজে ঘুমোবার আশা নেই। এখন পাশের ঘরটায় গিয়ে তুমি জোজোর সঙ্গে গল্প করতে পারো। একটু বাদে আমরা কিছু খেয়ে নেব। রাত বারোটার পর আমরা বেরোব।”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাব ?”

কাকাবাবু বললেন, “বেড়াতে।”

রাধা আর জোজো দু’জনেই একসঙ্গে বলে উঠল, “বেড়াতে ?”

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, “বেশি রাতেই তো বেড়াতে ভাল লাগে। তখন আমরা সমুদ্র দেখব। গান গাইতেও পারি। রাধা, তুমি গান জানো ?

রাধা বলল, “না। আমি পিয়ানো শিখছি।”

কাকাবাবু বললেন, “জোজো বেশ ভাল গান গায়। আমরা জোজোর গান শুনব। এখন বরং একটু বিশ্রাম করে নাও।”

রাধা আর জোজো দু'জনেই উত্তেজনায় ছটফট করছে। কাকাবাবু এমন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন কিছুই হয়নি। চেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন।

রাধা আর জোজো চলে গেল পাশের ঘরে।

একটু পরে কাকাবাবু টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন। দু-তিনবারের চেষ্টায় পাওয়া গেল রাজমহেন্দ্রীকে। হালকা গলায় তিনি বললেন, "হ্যালো, রাজমহেন্দ্রী, খবর কী? খানিকটা বৃষ্টি পড়ে আজ হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাই না?"

রাজমহেন্দ্রী দারুণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি কোথায়? দু'দিন ধরে আপনার কোনও সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। আরাকু ভ্যালির ও. সি. কিছু বলতে পারছে না। এদিকে দিল্লি থেকে আপনার খোঁজ করা হচ্ছে, দু-তিনটে মেসেজ এসেছে। আপনাকে খুঁজে বার করার জন্য আমরা একটু বাদে পুলিশ বাহিনী পাঠাচ্ছিলাম।"

কাকাবাবু ওসব কথার পাত্তাই না দিয়ে বললেন, "আজ সন্ধেবেলা মেয়েদের হস্টেল থেকে কারা যেন একটি কিশোরী মেয়েকে রিভলভার দেখিয়ে লুঠ করে নিয়ে গেছে, সে-খবরটা শোনেননি?"

রাজমহেন্দ্রী খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, মানে সেই খবর তো একটু আগেই রেডিয়োতে বলল, আপনারই মতন ডেসক্রিপশানের একজন লোক, সঙ্গে একটি অল্পবয়সী ছেলে, সন্ধের পর মেয়েদের হস্টেলে ঢুকে...একটা মেয়েকে গাপ করা হয়েছে...আপনি সে-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝবেন, বুঝবেন, আস্তে-আস্তে বুঝবেন। মেয়েটিকে যে গাপ করা হল, পুলিশ খোঁজাখুঁজি করবে নিশ্চয়!"

রাজমহেন্দ্রী বললেন, "বাঃ, খুঁজবে না? এটা পুলিশের ডিউটি!"

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, "তা তো বটেই। কিন্তু আপনাদের পুলিশ কতটা ডিউটিফুল? আজ রাত থেকেই খোঁজাখুঁজি শুরু করবে?"

রাজমহেন্দ্রী অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার পুলিশদের বলুন, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, সে-মেয়েটি ভাল আছে, নিরাপদে আছে। কালকেই ফিরে যাবে।"

রাজমহেন্দ্রী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথায় আছেন? দিল্লি থেকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে—"

কাকাবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কাল সকালে, কাল সকালে অন্য কথা হবে। আমিই আবার ফোন করব।"

রাজমহেন্দ্রীকে আর কিছু বলতে না দিয়ে তিনি ফোন রেখে দিলেন।

রাত বারোটার সময় তিনি বললেন, "জোজো, রাধা, এবার চলো বেরুনো যাক।"

বাইরে এসে বললেন, "চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, ট্যাক্সি নিয়ে কী হবে, চলো আমরা হেঁটেই যাই।"

সন্ধেবেলা একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। এত রাতে রাস্তায় মানুষজন প্রায় নেই। দু-একটা গাড়ি যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।

একটা ঢালু রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের দিকে নামতে-নামতে কাকাবাবু বললেন, "রাধা, তুমি সব সময় আমার পাশে-পাশে থাকবে, একটুও দূরে চলে যেয়ো না, কেমন ?"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, রাধাকে ছেলে সাজিয়ে আনলে ভাল হত না ? তা হলে ওকে কেউ চিনতে পারত না। আমার শার্ট-প্যান্ট ওকে ফিট করে যেত।"

রাধা বলল, "আমাদের ইস্কুলের থিয়েটারে আমি পুরুষের পার্ট করেছি। গোঁফ লাগিয়ে দিয়েছিল। আমার বাবাও প্রথমে বুঝতে পারেননি।"

কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন।

সমুদ্রের ধারটা একেবারেই নির্জন। সন্ধের সময় বেশ ভিড় থাকে, অনেক ফেরিওয়ালা ঘোরে, এখন কেউ নেই।

মাঝে-মাঝেই বাঁধানো বসবার জায়গা। একটা জায়গা বেছে নিয়ে কাকাবাবু বসলেন, মাঝখানে রাধা। কাকাবাবু পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর একটা চাদর জড়িয়ে এসেছেন। রাধাকে বললেন, "তোমার শীত করলে আমার চাদরটা নিতে পারো।"

এখন ঢেউয়ের শব্দ বেশ জোর। দূরে ডলফিন্‌স নোজ পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। তার ওপারে লাইট হাউসের আলো ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে। বাঁ দিকে, দূরের পার্ক হোটেলের পাশেও আর একটা লাইট হাউস। আজ অবশ্য সমুদ্রে কোনও জাহাজ দেখা যাচ্ছে না।

রাধা বলল, "আমাদের শহরটা খুব সুন্দর, না ? একসঙ্গে পাহাড় আর সমুদ্র। জোজো, তুমি এরকম আর কোনও শহর দেখেছ ?"

জোজো বলল, "কত দেখেছি! ইতালির ক্যাপ্রিতে। একবার মেক্সিকোতে পাহাড় থেকে সমুদ্রে ডাইভ দিলাম, জলের তলায় একটা প্রবাল দ্বীপ।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব গল্প এখন থাক। গান হোক। জোজো, তুই এই গানটা জানিস, 'যাবই, আমি, বাণিজ্যেতে যাবই...' "

জোজো বলল, "খানিকটা জানি, সব কথা মনে নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি, 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা। শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা...।" '

জোজোর গানের গলাটি বেশ ভাল। সে পরপর গান গেয়ে যেতে লাগল।

রাধা গান জানে না বলেছিল, সেও মোটামুটি ইংরেজি গান গাইতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, "আমিও কয়েকটা ইংরেজি গান জানি। শুনবে? '...মাই হার্ট ইজ ডাউন, মাই হেড ইজ টার্নিং অ্যারাউন্ড, আই হ্যাড টু লিভ আ লিট্‌ল গার্ল ইন কিংস্টন টাউন...।' একজন লোক তার ছোট মেয়েকে রেখে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।"

গান থামিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা রাধা, এখন তোমার বাবা এসে পড়ে যদি বলেন, রাধা, উঠে এসো। আমার কাছে চলে এসো! তখন তুমি কী করবে?"

রাধা চট করে কোনও উত্তর দিতে পারল না।

জোজো বলল, "আমি তো শুনলুম, ওর বাবা—"

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "তুই এখন চুপ কর। ওকে ভেবেচিন্তে বলতে দে।"

রাধা খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে বলল, "আমার বাবা, আর যাই হোক, আমাকে ভালবাসে। বিশ্বাস করুন।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন বিশ্বাস করব না? বাবা মেয়েকে ভালবাসবে, মেয়ে বাবাকে ভালবাসবে। এটাই তো স্বাভাবিক। বাবার কথাও তোমার শোনা উচিত। আমাকে তো তুমি দু'দিন মাত্র দেখেছ। কিন্তু আমিও তো সন্তুকে খুব ভালবাসি। যে-কোনও উপায়ে আমি সন্তুকে উদ্ধার করতে চাইব, তাই না?"

রাধা বলল, "সে তো নিশ্চয়ই!"

কাকাবাবু বললেন, "সুতরাং সন্তুকে ফেরত না পেলে আমি তোমাকে যেতে দেব না। তোমার বাবা এসে ডাকলেও আমি তোমাকে জোর করে ধরে রাখব। কিন্তু তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি ভয় পেয়ো না যেন!"

রাধার চোখ ছলছল করে উঠল। ধরা গলায় সে বলল, "কাকাবাবু, আপনার পাশে থাকলে আমি মোটেই ভয় পাব না!"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো, তোকেও কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না।"

মানুষজন নেই, তবে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। দু-একটা ট্যাক্সি। রাস্তার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে ওরা। জোজো আবার গান ধরল।

আরও ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর একটা গাড়ি খুব জোরে ব্রেক কষে থামল।

মুখ না ফিরিয়েই কাকাবাবু বললেন, "এসে গেছে মনে হচ্ছে। ঠিক যা ভেবেছিলাম!"

জোজো চট করে দেখে নিয়ে সভয়ে বলল, "কাকাবাবু, ওরা পাঁচজন!"

কাকাবাবু এবার ধীরেসুস্থে রাস্তার দিকে ফিরলেন। গাড়ি থেকে পাঁচজন

নেমে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'পাশে দু'জনের হাতে রিভলভার। মাঝখানে একজন রিভলভার হাতে এগিয়ে আসছে।

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক হিন্দি সিনেমার মতন, তাই না!"

জোজো বলল, "ইংরেজি সিনেমার নকল।"

যে-লোকটি এগিয়ে আসছে, তার দিকে তাকিয়ে রাধা অস্ফুট স্বরে বলল, "বাবা!"

কাকাবাবু বললেন, "ইনিই তা হলে মিস্টার গোমেজ! নমস্কার। অস্ত্রশস্ত্রগুলো পকেটে ভরে রাখুন। তারপর আলোচনা করা যাক!"

গোমেজ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "মিস্টার রায়চৌধুরী। তোমার খেলা শেষ। একবার তুমি হাত ফসকে পালিয়েছ। এবার কোনও চালাকি করলে তোমায় গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।"

কাকাবাবু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "কতবার যে কতজন আমাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে বলে শাসিয়েছে! একবারও কিন্তু কেউ পারেনি।"

গোমেজ বলল, "আগে তুমি কাদের পাল্লায় পড়েছ জানি না। এবার তুমি আর বাঁচবে না। রাধা, উঠে আয়!"

কাকাবাবু বললেন, "রাধা এখন যাবে না। আগে কথাবার্তা শেষ হোক!"

গোমেজ বলল, "কথা কীসের? মেয়েকে আগে ছাড়ো, নইলে তিন দিক থেকে গুলি চলবে। তোমার পালাবার কোনও রাস্তা নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার মেয়েকে ধরে রাখার ইচ্ছে আমার নেই। খুব ভাল মেয়ে, চমৎকার স্বভাব। ওকে ছেড়ে দিচ্ছি, তার আগে আমার ভাইপো সন্তুকে এনে দাও!"

গোমেজ বলল, "আমি কি এখানে দরাদরি করতে এসেছি নাকি? আমি ঠিক তিন গুনব, তার মধ্যে রাধাকে ছেড়ে না দিলে ওপাশের ছেলেটিকে প্রথমে মারব।"

কাকাবাবু এক ঝটকায় গায়ের চাদরটা সরিয়ে ফেললেন, দেখা গেল, তাঁর রিভলভার রাধার কানের কাছে ঠেকানো।

তিনি বললেন, "আমি কি ভ্যাবাগঙ্গারামের মতন তোমাদের হাতে ধরা দেওয়ার জন্য এখানে বসে আছি? আমি কি ঘাস খাই? টোপ ফেলে তোমাদের এখানে টেনে এনেছি। জানতাম, তোমরা ঠিক সন্ধান পাবে। মেয়েকে উদ্ধার করা তোমার কাছে সম্মানের প্রশ্ন। নিয়ে যাও মেয়েকে, তার আগে সন্তুকে এনে দাও। ব্যস, সব চুকে যাবে, আমি তোমাদের ব্যাপারে আর মাথা ঘামাব না!"

গোমেজ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "আমার রিভলভারের সেফ্‌টি ল্যাচ খোলা। আমার মায়াদয়া নেই। তোমরা আর একটু এগোলে আমি গুলি চালাব, ওর মাথাটা

ছাতু হয়ে যাবে। মেয়েকে কোনওদিন ফেরত পাবে না। বেশিক্ষণ সময় নেই। পুলিশকে সব বলা আছে। তাজ হোটেলের সামনের গলিতে দু' গাড়ি পুলিশ অপেক্ষা করছে। আমাকে মারার চেষ্টা করলে তোমরাও পালাতে পারবে না। সন্তু কোথায়?"

গোমেজ শুকনো গলায় বলল, "সে কোথায়, আমরা জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের লোকই তাকে ধরেছে। আমার ওপর তোমাদের রাগ। অন্য কেউ তাকে ধরতে যাবে কেন?"

গোমেজ বলল, "আমাদের হাতে সে এখন নেই। সে পালিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "মিথ্যে কথা। তোমাকে বিশ্বাস করি না।"

রাধাকে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, "শোনো গোমেজ, তোমাকে আমি ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। কাল ঠিক এই সময়ে, এইখানে সন্তুকে হাজির করবে, তখনই তোমার মেয়েও ফিরে যাবে তোমার কাছে। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময়।"

গোমেজের একজন সহকারী একটু এগোবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু প্রবল ধমক দিয়ে বললেন, "এবার আমি পাঁচ গুনব। তার মধ্যে তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে না দিলে এ-মেয়েটা মরবে, গুলির শব্দ পেলেই পুলিশের গাড়ি ছুটে আসবে। পেছন ফিরে তাকালেই পুলিশের গাড়ি দেখতে পাবে।"

গোমেজ হাত তুলে তার সঙ্গীদের থামার ইঙ্গিত করে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, আমার মেয়ের গায়ে যদি একটি আঁচড়ও লাগে, তা হলে তুমি পৃথিবীর যেখানে পালাও, তোমায় আমি ঠিক শেষ করব!"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে দেখো যেন আমার ভাইপো সন্তুর গায়েও একটি আঁচড়ও না লাগে! আমার প্রতিশোধও অতি সাঙ্ঘাতিক। কাল এখানে সন্তুকে নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জেন্টলম্যান্স ওয়ার্ড দিচ্ছি, রাধাকেও অক্ষতভাবে ফেরত পাবে।"

তিনি রাধার কানে রিভলভারটা ঠেকিয়ে রেখে এগোতে লাগলেন। গোমেজরা সরে গেল।

খানিকটা এগিয়ে তিনি বললেন, "জোজো, আমার একটা ক্রাচ পড়ে আছে, সেটা তুলে নিয়ে আয়। আলো জ্বেলে একটা কী গাড়ি আসছে দেখ তো, ট্যাক্সি নাকি? হাত তুলে থামা।"

সেটা নয়, কিন্তু পরের গাড়িটা ট্যাক্সি। আগে জোজো আর রাধাকে তুলে দিয়ে কাকাবাবু পেছন ফিরে গোমেজকে বললেন, "আমাদের ফলো করার চেষ্টা কোরো না। কোনও লাভ নেই।"

ট্যাক্সিতে উঠে কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, "পিস্তল দেখে ঘাবড়িয়ো না ভাই। সিনেমার শুটিং হচ্ছে। তোমার গাড়িরও ছবি উঠে যাবে। এখন খুব জোরে চালাও তো!"

মাথা হেলান দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "রাধা, ভয় পেয়েছিলে নাকি ?"

রাধা জোরে-জোরে দু'দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, "না, একটুও না।"

জোজো বলল, "আপনি যখন বললেন, 'সেফ্‌টি ল্যাচ খোলা', তখন আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত ?"

কাকাবাবু রিভলভারটার মুখ জানলার বাইরে দিয়ে ট্রিগার টিপলেন। শুধু খট-খট শব্দ হল।

হাসতে-হাসতে তিনি বললেন, "আমি গুলি ভরিইনি ওইজন্য ! সাবধানের মার নেই। রাধার গায়ে গুলি লাগবার ঝুঁকি কি আমি নিতে পারি ?"

জোজো বলল, "উরি সর্বনাশ ! গুলিই ভরেননি ! যদি ওদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত ফাইট করতে হত ? আমি জানি, আপনি ইচ্ছে করলে ওদের তিনজনকেই আগে গুলি করতে পারতেন, অরণ্যদেবের মতন।"

কাকাবাবু বললেন, "অরণ্যদেব প্রত্যেকবার পারেন, আমি মাঝে-মাঝে ফসকে যাই। দরকার কী ওসব ঝঞ্ঝাটের। ওদের ভয় দেখিয়েই তো কাজ আদায় করা গেল।"

জোজো বলল, "পুলিশের গাড়ি কি সত্যি ছিল ? না কি সেটাও ওদের ভয় দেখালেন মিথ্যে কথা বলে ?"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "মাঝে-মাঝে ওরকম বলতে হয়। এটাকে বলতে পারিস সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার। ওদের মনের জোরের সঙ্গে আমার মনের জোরের যুদ্ধ। ক্রিমিন্যালদের সাধারণত মনের জোর কম হয়। ওরা আসলে ভিতু।"

ট্যাক্সিটাকে নানা রাস্তায় ঘুরিয়ে তারপর হোটেলের কাছে এনে ছেড়ে দিলেন। পেছনে কোনও গাড়ি আসেনি।

এত রাত্তিরেও হোটেলের লবিতে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা লোক। পুরোদস্তুর সুট-টাই পরা, মাথায় টুপি।

কাকাবাবুকে দেখে মাথা থেকে টুপিটা খুলে তিনি বললেন, "নমস্তে রাজা রায়চৌধুরী। এত রাতে কোথায় বেরিয়েছিলেন ?"

কাকাবাবু একটুও অবাক না হওয়ার ভান করে বললেন, "নরেন্দ্র ভার্মা যে ! তুমি এত রাতে কোথা থেকে এলে ? আমরা তিনজনে একটু সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কী চমৎকার হাওয়া !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এত রাতে এই শহরে কেউ বেড়াতে যায় বলে শুনিনি। তা ছাড়া চতুর্দিকে তোমার সব বন্ধু ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কারুর সঙ্গে দেখা হল না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ, কোনও বন্ধুর সঙ্গে তো দেখা হল না ! এখানে এসে দেখা হল, তুমিই তো আমার একমাত্র বন্ধু !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, তোমার কী কাণ্ড বলো তো ! আরাকু ভ্যালির

গেস্ট হাউসে তুমি নেই। এখানকার পার্ক হোটেলে তোমার জিনিসপত্র পড়ে আছে। সেখানেও ফেরোনি। অন্য হোটেলে উঠেছ, সে-কথা পুলিশকে জানিয়ে রাখবে তো ? আমরা খুঁজে-খুঁজে হয়রান !"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশকে জানাব ? তোমাকে বলেছিলাম না, সরষের মধ্যে ভূত থাকে অনেক সময় ? কেন, আমাকে এত খোঁজাখুঁজি করার কী আছে ? তোমারও তো বম্বে না কোথায় খুব কাজ ছিল, ফিরে এলে কেন ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ফিরতে হল দিল্লির ঠেলা খেয়ে। রাজা, তোমার সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। এই ছেলেমেয়ে দুটিকে ওপরে পাঠিয়ে দাও।"

কাকাবাবু বললেন, "এত রাতে আবার কাজের কথা কীসের ? কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা, আর ঘুমের সময় ঘুম, এই না হলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। তোমার জরুরি কথাটা চটপট সংক্ষেপে বলে ফেলো তো !"

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুকে একপাশে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "ভাইজাগের স্মাগলিং নিয়ে দিল্লি খুব চিন্তিত। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে গেছেন। এখান থেকে প্রচুর অস্ত্র, বিশেষত হাত-বোমা পাচার হচ্ছে শ্রীলঙ্কায়। এটা বন্ধ করতেই হবে, না হলে দু' দেশের সম্পর্ক আরও খারাপ হবে। সারা দেশের পুলিশকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির কর্তারা তোমারও সাহায্য চান। তোমাকে সবরকম ক্ষমতা দেওয়া হবে। তুমি এখানকার চোরাচালান-বিরোধী অভিযানটা পরিচালনা করবে।"

কাকাবাবু কঠিন মুখ করে বললেন, "দেখো নরেন্দ্র, তুমি জানো না বোধ হয় যে, ওরা সন্তুকে ধরে রেখেছে। সন্তুর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমি কোনও কিছুই করতে পারব না। সন্তুকে উদ্ধার করা আমার প্রথম কাজ। তার আগে আমি স্মাগলিং-টাগলিং নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। আমার পক্ষে অসম্ভব !"

॥ ৯ ॥

সন্তু কিছু বুঝবার আগেই অন্ধকারের মধ্যে কেউ একজন তার মুখ চেপে ধরল। আর একজন তার কাঁধ ধরে তুলে নিল সিট থেকে।

টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সন্তু ছটফট করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না। টানেলটা শেষ হওয়ার একটু আগে লোক দুটো সন্তুকে নিয়ে ঝাঁপ দিল বাইরে।

ট্রেনের গতি এখানে বেশি নয়, ওদের তেমন লাগল না। ঝোঁক সামলে উঠে দাঁড়াবার আগেই একজন সন্তুর হাত দুটো পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর দুর্বোধ ভাষায় হুকুম দিল কী যেন।

সন্তু এখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ যে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে, এরকম সে কল্পনাও করেনি একবারও। জোজো বারবার স্পাই-স্পাই করছিল বটে, ওটা তো জোজোর বাতিক। সব জায়গাতেই ও স্পাই দেখে।

এখানে সন্তু আর জোজোকে কে চেনে ? ওদের পেছনে স্পাই লাগবে কেন ?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, আমাকে কোথায় ধরে নিয়ে যাচ্ছ ?"

লোক দুটো ইংরেজি বা হিন্দি কিছু বোঝে না। ওরা কী যে উত্তর দিতে লাগল, তারও এক অক্ষর সন্তুর বোধগম্য হল না।

খুব একটা লম্বা-চওড়া চেহারা নয় ওদের। সন্তু ক্যারাটে জানে। কিন্তু হাত দুটো পেছনে বেঁধে ফেললে খুব মুশকিল হয়। হাত দুটো সামনে বাঁধা থাকলেও তবু ব্যবহার করা যায়, অনেক কিছু আটকানো যেতে পারে। বাধা দেওয়ার আগেই ওরা হাত দুটো পিছমোড়া করে দিল !

টানেলের বাইরে জঙ্গল, তার মধ্য দিয়ে ওরা সন্তুকে হাঁটাচ্ছে। পরিষ্কার দিনের আলো, এখন বেলা সাড়ে বারোটা-একটা হবে। এর মধ্যে দিয়ে ওরা সন্তুকে হাত-বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাবে, কেউ দেখবে না ? জঙ্গলের মধ্যে মানুষজন দেখা যাচ্ছে না অবশ্য, কিন্তু কোথাও কি থাকবে না মানুষ ?

সন্তু ভাবল, জোজো এখন কী করবে ? ও বেচারি তো কিছুই বুঝতে পারবে না। প্রথম মুখ চেপে ধরার সময় সন্তু একবার শুধু বুঁ-বুঁ শব্দ করতে পেরেছিল, ট্রেনের আওয়াজে জোজো তা শুনতে পায়নি বোধ হয়। জোজো মুখে যতই বড়-বড় কথা বলুক, একা হয়ে পড়লে খুব ঘাবড়ে যায়।

লোক দুটো মাঝে-মাঝে ধাক্কা দিচ্ছে সন্তুকে। এই করে তারা ডাইনে কিংবা বাঁয়ে বোঝাচ্ছে। পাহাড় থেকে নীচের দিকে নামছে ওরা। যদিও কোনও পথ নেই।

এক জায়গায় কাঠ কাটার শব্দ শোনা গেল। দেখতেও পাওয়া গেল দু'জন কাঠুরে একটা গাছ কাটছে। এই লোক দুটো লুকোবার চেষ্টা করল না, ওদের কাছ দিয়েই এগোচ্ছে। সন্তু চিৎকার করে উঠল, "হেল্প্, হেল্প্। বাঁচাও, বাঁচাও !"

কাঠুরে দুটো এদিকে ফিরল। ওদের হাতে কুড়ুল, তবু তারা সন্তুকে বাঁচাবার জন্য এক-পাও এগোল না, বরং এই লোক দুটোর একজন ওদের দিকে চেঁচিয়ে কী যেন বলল, অন্যজন প্রথমে সপাটে এক চড় কষাল সন্তুর গালে। তারপর আর একটা জোর ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল মাটিতে।

অর্থাৎ বোঝা গেল, এই লোকদুটো নিষ্ঠুর গুন্ডা হিসেবে এখানে পরিচিত, নিছক পরোপকার করার জন্য কেউ তাদের বাধা দেবে না।

সন্তু ভাবল, এবার নিশ্চয় ওরা তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলবে।

ঠিক তাই, একজন চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল, তারপর নিজের জামা তুলে

কোমরে গোঁজা রিভলভার দেখাল।

লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথা নেড়ে সন্তু বলল, "বুঝেছি।" শুধু শুধু আর ওদের হাতে মার খেয়ে লাভ নেই। দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করবে। দেখাই যাক, কোথায় নিয়ে যায়।

পাহাড় থেকে খানিকটা নীচে নামার পর একটা পাকা রাস্তা দেখা গেল। ওরা দাঁড়িয়ে রইল একটা গাছের আড়ালে। এই রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে ট্রাক যাচ্ছে। দূর থেকে একটা ট্রাকের নম্বর দেখে ওদের মধ্যে একজন রাস্তার মাঝখানে গিয়ে থামাল সেটাকে। ড্রাইভার এদের চেনা। তার সঙ্গে কী যেন কথা হল। তারপর তিনজনেই উঠে পড়ল ট্রাকে। ড্রাইভারটি সন্তু সম্পর্কে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করল না।

ট্রাকটা অবশ্য ওদের বেশিদূর নিয়ে গেল না, নামিয়ে দিল এক জায়গায়। সেখান থেকে আবার একটা ট্রাক ধরে খানিকদূর যাওয়ার পর নেমে পড়ে শুরু হল হাঁটা। এখানেও চতুর্দিকে পাহাড়, তবে জঙ্গল বিশেষ নেই।

সন্তু মনে-মনে ভাবল, এইসব পাহাড়ের মাঝখানেই কোথাও কি আরাকু উপত্যকা ? সেই জায়গাটা কেমন দেখতে, তা সন্তু জানে না, এদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করাও যাবে না।

প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পর ওরা একটা গুহার মুখে পৌঁছল। সেখানে লোহার গেটে তালা ঝুলছে। ওদের মধ্যে একজন একটা পাথর নিয়ে গেটে ঠং ঠং করে একটুক্ষণ ঠোকার পর ভেতর থেকে একটা লোক এল। তার পিঠে বন্দুক ঝোলানো। সে তালা খুলে দিল।

গুহার ভেতরটা একেবারে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। ঢালু হয়ে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। সন্তু দু-একবার হোঁচট খেয়ে পড়ল, হাত দিয়ে দেওয়াল ধরারও উপায় নেই। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর একটু-একটু আলো দেখা গেল। আলোটা কোথা থেকে আসছে, তা বোঝা যাচ্ছে না, কিংবা অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে। গুহাটা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে, সন্তু দেখল, দেওয়ালের গায়ে কীসব যেন মূর্তি রয়েছে। কয়েকটা মূর্তি ভেঙে পড়ে আছে মেঝেতে। কাকাবাবু এই মূর্তিগুলোর কথাই বলেছিলেন ? এরা তা হলে মূর্তি-চোর ?

একটা জায়গায় হ্যাজাক বাতি জ্বলছে, সেখানে আর একটি লোক বসে আছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে। সেখানে ওরা থামল, একজন সন্তুর চুল ধরে জোর করে বসিয়ে দিল।

ওরাও বসল খানিকটা দূরে।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর একজন খাবার নিয়ে এল ; গোল হয়ে বসে ওরা খাবার খেতে লাগল। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, সন্তুর মনে হচ্ছে, অনন্তকাল ধরে চলছে ওদের খাওয়া।

সন্তুকে কিছু দেয়নি। সন্তু ভাবল, ওদের খাওয়া হয়ে গেলে নিশ্চয়ই

দেবে। কিন্তু ওদের শেষই যে হচ্ছে না! এতক্ষণ খাওয়ার কথা মনে পড়েনি। কিন্তু ওদের খেতে দেখে সন্তুর বেশ খিদে পেয়ে গেছে। অতিথিকে আগে খাবার দেওয়া উচিত ছিল না? বন্দিও তো এক হিসেবে অতিথি!

ওরা চেটেপুটে খেয়ে কোথায় যেন হাত ধুতে গেল। ফিরে এসে বিড়ি ধরিয়ে গল্প জুড়ে দিল আবার। সন্তুকে খাবার দেওয়ার কোনও নামই নেই।

আরও কিছুক্ষণ পরে সন্তু বুঝতে পারল, ওরা সত্যিই তাকে খাবার দেবে না। নিজেরা বসে-বসে খেল, একটু চক্ষুলজ্জাও নেই। একজন আবার নির্লজ্জের মতো মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে সন্তুর দিকে।

সন্তু ঠিক করল, খিদের কথা ভাববে না। ভাবলে বেশি কষ্ট হবে। মানুষ একদিন-দু'দিন না খেয়ে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে। বিপ্লবীরা দেশের জন্য কতদিন অনশন করেছেন। মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই না খেয়ে থাকতেন। উঁহুঃ, এসবও খাওয়ার চিন্তা, অন্যদিকে মন ফেরাতে হবে।

জোজো এখন কী করছে? জোজো আরাকু ভ্যালিতে পৌঁছে গেছে বহুক্ষণ আগে। নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে সব খুলে বলেছে। এই জায়গাটা আরাকু ভ্যালি থেকে কতদূরে, তা সন্তু জানে না। কাকাবাবু ঠিক খুঁজে বার করবেন। কতক্ষণ লাগবে, সেই হচ্ছে কথা। ততক্ষণ না খেয়ে থাকতে হবে!

কপালটা চুলকোচ্ছে। কী একটা পোকা চলে গেল। হাত দুটো পেছন দিকে বাঁধা। চুলকোবার উপায় নেই। এ তো মহা মুশকিল! খাবার দিলে হাতের বাঁধন খুলতে হত, সেইজন্য দিল না?

চারটে লোককেই মনে হচ্ছে নিছক নিচু ধরনের গুন্ডা বা ডাকাত। লেখাপড়া জানে না। বুদ্ধিসুদ্ধি বিশেষ নেই। এখান থেকে মূর্তি ভেঙে-ভেঙে বিক্রি করে। এরা কাকাবাবুকে চিনবে কী করে? সন্তুকেই বা ধরে রাখবে কেন? এদের নেতা-টেতা কেউ নেই? এদের সঙ্গে যে কোনও কথাই বলা যাচ্ছে না!

যে দু'জন লোক সন্তুকে ধরে এনেছিল, তারা একটু পরে চলে গেল। অন্য দু'জন শুয়ে পড়ল পাশাপাশি। খাওয়া হয়েছে, এবার ঘুমোবে।

সন্তু আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। গুহার মুখটার দিকে যেতে গেলে ওই লোক দুটোর পাশ দিয়ে যেতে হবে। আগেই সে-ঝুঁকি না নিয়ে সে পা টিপে-টিপে হেঁটে গেল গুহার আরও ভেতরের দিকে।

সেদিকে অন্ধকার বেশ পাতলা। ক্রমেই আলো বাড়ছে, ওপরের কোনও জায়গা দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে। এদিককার দেওয়ালে কোনও মূর্তি নেই। সব খুলে নিয়েছে। সন্তু দেখল, এক জায়গায় চায়ের পেটির মতো বড়-বড় অনেক কাঠের বাক্স। ভেতরে কী আছে বোঝবার উপায় নেই, সন্তুর হাত বাঁধা। মূর্তিগুলোই ভরে রেখেছে মনে হয়!

আরও একটু এগোতে দেখা গেল এক জায়গায় জল জমে আছে। একটা

ছোটখাটো পুকুরের মতো। নিশ্চয়ই ওপরে কোথাও ফাটল আছে, সেখান থেকে বৃষ্টির জল আসে। ফাটল অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। জল বেশ পরিষ্কার।

সেই জলাশয়টা পেরোবার পর এক জায়গায় গুহাটা শেষ হয়ে গেছে। এখানে আবার আলো কম। শেষের জায়গাটায় পরপর তিনটে খুপরির মতো। মানুষ তৈরি করেনি, দেখলেই বোঝা যায়, আপনাআপনি তৈরি হয়েছে। একটা খুপরির দেওয়ালে পোড়া-পোড়া দাগ। সেখানে সন্তু বারুদের গন্ধ পেল। এই দেওয়ালে অনেক মূর্তি ছিল ? বারুদের গন্ধ কেন ?

পাশের খুপরিটাও একই রকম। তৃতীয় খুপরিটার সামনের দিকটা একটা বড় পাথর ফেলে আড়াল করা। সেখানে উঁকি দিয়েই সন্তু ঘেন্নায় নাক কুঁচকে পিছিয়ে এল, বিচ্ছিরি বিকট গন্ধ। খুব সম্ভবত ওটা বাথরুম।

সন্তু আবার ফিরে এল। লোক দুটো কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? গুহার মুখটার কাছে পৌঁছতে পারলে লোহার গেট পার হওয়ার একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবেই। কিন্তু কাছে আসতেই দেখল, ওদের মধ্যে একজন উঠে বসে বিড়ি খাচ্ছে। বন্দুকটা কোলের ওপর রাখা।

সন্তু কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "ওয়াটার ? পানি ? বহুত পিয়াস লাগা।"

লোকটা বন্দুকটা তুলে সন্তুর দিকে তাক করে পাশের লোকটিকে ডাকল। সে লোকটি কাঁচা ঘুম ভাঙায় বিরক্ত হয়ে উঠে এল সন্তুর কাছে। এমন আচমকা ঘুসি মারল যে, সন্তুর মাথা ঠুকে গেল দেওয়ালে। তারপর সন্তু বসে পড়তেই সে একটা শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে সন্তুর পা দুটোও বেঁধে ফেলল। সন্তু পা সরিয়ে নিতে পারছে না, কারণ অন্য লোকটির বন্দুকের নল তার বুকের দিকে।

এরা একেবারে যাচ্ছেতাই লোক। সন্তু চাইল জল, তা তো দিলই না, এখন পা দুটোর স্বাধীনতাও চলে গেল।

সন্তু সেখানেই পড়ে রইল একভাবে। লোক দুটি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোল খানিকক্ষণ। সন্তুর চোখে ঘুম নেই। সে দেখতে লাগল বাইরের থেকে যে দিনের আলো আসছিল তা ফুরিয়ে গেল আস্তে-আস্তে।

সেই লোক দুটো সন্তুর দিকে আর মনোযোগ দিল না একবারও। ওদের এখানে পাহারা দেওয়া ছাড়া কাজ নেই। এক সময় ওরা চা তৈরি করে বিস্কুট ভিজিয়ে খেল। এরা তো মূর্তি ভাঙার কাজও করে না ? ভাল-ভাল মূর্তি সব ভাঙা হয়ে গেছে ! এরা শুধু বাক্সগুলো পাহারা দিচ্ছে ?

সন্ধের কিছু পরে আরও মানুষের গলার শব্দ পাওয়া গেল। একসঙ্গে ঢুকল দু'জন লোক। সাধারণ গুন্ডার মতো চেহারা এদের নয়। একজন সুট পরা। এদের মধ্যে একজন আবার মহিলা, সে পরে আছে জিন্‌স আর টি-শার্ট। মাথার চুল খোলা। সকলের হাতে টর্চ।

অন্যরা চলে গেল জলাশয়ের দিকে। শুধু মহিলাটি সন্তুর কাছে এসে উঁকি মারল। সন্তু তার চোখে চোখ রাখল। নিষ্ঠুর ধরনের দৃষ্টি সেই মহিলাটির। এর কাছ থেকে দয়া-মায়া পাওয়ার আশা নেই।

তবু সন্তু ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "ম্যাডাম, আমাকে ধরে রাখা হয়েছে কেন, জানতে পারি কি ?"

মহিলাটি কর্কশ গলায় বলল, "সময় হলেই জানতে পারবে।"

সন্তু আবার বলল, "কখন সেই সময় হবে ?"

মহিলাটি বলল, "তোমার আঙ্কলকে আগে এখানে আসতে হবে। সে এলেই তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে।"

সন্তু বলল, "আমার আঙ্কল কি খবর পেয়েছেন ?"

মহিলাটি এবার ধমকে বলল, "শাট আপ !"

তারপর সে চলে গেল ভেতরের দিকে।

খানিক বাদে সন্তু দড়াম-দড়াম করে খুব জোর শব্দ শুনে চমকে উঠল। কেউ গুলি চালাচ্ছে ? আওয়াজ আসছে গুহার শেষ প্রান্ত থেকে। ওখানে কে গুলি চালাবে ? সন্তুর মনে পড়ল, দুটো কুঠরিতে সে পোড়া-পোড়া দাগ দেখেছিল। এরা এখানে গুলি চালানো প্র্যাক্টিস করে ?

সন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না।

দশ-বারোবারের পর শব্দ থেমে গেল।

সবাই ফিরে এল হ্যাজাক বাতির কাছে। মেঝেতেই গোল হয়ে বসে কথা বলতে লাগল গম্ভীরভাবে। যেন কোনও গুরুতর বিষয় আলোচনা হচ্ছে। সন্তু কানখাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। তার বিষয়েই কিছু বলছে ? ওরা কথা বলছে তেলুগু ভাষায়, সন্তুর বোঝার সাধ্য নেই। মাঝে-মাঝে দু-একটা ইংরেজি শব্দ। 'টেস্টিং', 'কোয়ালিটি', 'স্ট্যান্ডার্ড', 'টুমরো' এইরকম কয়েকটা শুধু শব্দ শুনেও কিছু বোঝা যায় না।

এক সময় সন্তু মাটিতে গড়াগড়ি দিতে-দিতে ওঃ ওঃ শব্দ করতে লাগল। বাচ্চারা অভিমান করে যেমন গড়াগড়ি দেয় সেইভাবে। সেইসঙ্গে কান্না। এবার ওরা সন্তুর দিকে মনোযোগ না দিয়ে পারল না।

মহিলাটি কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ? কুকুরের মতন চ্যাঁচাচ্ছ কেন ?"

সন্তু বলল, "বাথরুম, বাথরুম। সারাদিন আমাকে বাথরুমে যেতে দেওয়া হয়নি।"

মহিলাটি সুট-পরা পুরুষটির দিকে তাকাল। সে বলল, "বাঃ, বাথরুমে যাবে না ? এই জায়গাটা নোংরা করবে নাকি ? পাঠাবার ব্যবস্থা করো।"

একজন লোক এসে সন্তুর হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দিল। তার এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে বড় টর্চ। খানিকটা গিয়ে এক জায়গায় টর্চের আলো

ফেলে বলল, "ওইখান থেকে মগটা তুলে নাও। জল ভরো।"

গুহার শেষে এখনও তীব্র বারুদের গন্ধ ভাসছে, তাতে বাথরুমের দুর্গন্ধ অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। সন্তুকে বাইরে জামা-প্যান্ট খুলতে হল। ভেতরে একটা গর্ত করা আছে, আর নিরেট পাথরের দেওয়াল। এদিক দিয়ে বেরোবার কোনও উপায় নেই।

সন্তুর সত্যিই খুব বাথরুম পেয়েছিল। মানুষ না খেয়ে তবু থাকতে পারে, কিন্তু বাথরুমে না গিয়ে কি পারে? সন্তুর বেশ আরাম লাগল।

বেরিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরার পর সন্তুকে আবার আনা হল আগের জায়গায়। সুট-পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে সন্তু বলল, "আমাকে সারাদিন একফোঁটা জল খেতে দেয়নি। কোনও খাবারও দেয়নি। তোমরা কীরকম মানুষ? পৃথিবীর সব দেশেই বন্দিদের খেতে দেওয়ার নিয়ম আছে।"

সেই লোকটি এক পলক সন্তুকে দেখেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বিরক্তভাবে বলল, "মঞ্চি, একে কিছু খেতে দাওনি কেন? এ ছোকরাটা অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেক ঝঞ্ঝাট হবে। কাউকে বলো, আমার গাড়িতে কিছু কেক আছে, নিয়ে আসুক!"

সারাদিন কিছু খেতে না দিয়ে এখন একেবারে কেক? এ যে রাজার মতো খাতির। সন্তু পেট ভরে কেক খেয়ে, দু' গেলাস জল শেষ করে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

তারপর সে শুয়ে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। আর তো কিছু করার নেই। এখন শরীর বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে।

তার ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। সবাই চলে গেছে, শুধু রয়েছে দু'জন প্রহরী। তারা বসে-বসে চা খাচ্ছে।

সন্তু হ্যাংলার মতো তাকিয়ে রইল। ওদের মালিকরা নিশ্চয়ই নির্দেশ দিয়ে গেছে, আজ এক ভাঁড় চা আর দুটো বিস্কুট নিয়ে এল একজন।

সন্তু বলল, "হাত বাঁধা, খাব কী করে?"

হাত খুলল না, লোকটা নিজেই খাইয়ে দিল সন্তুকে।

তৃপ্তি করে খেয়ে, সন্তু মিষ্টি হেসে বলল, "অনেক ধন্যবাদ, মেনি, মেনি থ্যাঙ্কস, বহুত শুক্রিয়া, আপনাদের ভাষায় কী যেন বলে তা আমি জানি না ভাই।"

অন্য লোকগুলো হয়তো আবার রাত্তিরে আসবে, সারাদিন এদের দু'জনের সঙ্গে কাটাতে হবে। এদের বোঝাতে হবে সে অতি শান্ত আর নিরীহ ছেলে। এবং ভিতু। না হলে মার খেতে হবে এদের হাতে। সুট-পরা লোকটার কথা শুনে বোঝা গেছে, সন্তুকে মেরে ফেলা হবে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখাই উদ্দেশ্য। ওরা কাকাবাবুকে এখানে টেনে আনতে চায়।

খানিক পরে সন্তু বাথরুমে যেতে চাইল। একজন নিয়ে গেল তাকে। সন্তু

কোনওরকম চালাকি না করে বাধ্য ছেলের মতো ফিরে এল। আবার হাত-পায়ের বাঁধন মেনে নিয়ে বসে রইল।

খানিকক্ষণ পরে একটা বাসন উলটে পড়ার ঢনঢন শব্দে চমকে উঠল সন্তু। একটা বানর লাফাচ্ছে ভেতর দিকে। কোথাও কিছু রান্নাবান্নার জিনিসপত্র রাখা ছিল, তা নিয়ে টানাটানি করছে, প্রহরীরা রে-রে করে তেড়ে গেল। একটা নয়, তিনটে বানর, ওরা এল কোথা থেকে ? বানরগুলো হুপ-হুপ শব্দে লাফালাফি করে এক সময় পালাল। ওরা কোথা থেকে এল, কোথায় গেল, ঠিক বোঝা গেল না।

বানরগুলোর জন্য তবু কিছুক্ষণ মজা পাওয়া গেল। প্রহরীরা ইচ্ছে করলেই বানরদের গুলি করতে পারত, কিন্তু এরা বানর মারে না। ভক্তি করে।

বসে-বসে সময় কাটবে কী করে ? কতদিন এখানে থাকতে হবে ?

এক সময় প্রহরীরা রান্নার উদ্যোগ করতে লাগল। ওদের কাছে শুধু একটা স্টোভ আছে। আটা মেখে রুটি তৈরি করল, আর আলুর তরকারি। দূর থেকে সন্তু গুনছে, ক'টা রুটি সেঁকা হল। সবসুদ্ধু পনেরোটা। ওরা সন্তুকে দেবে নিশ্চয়ই। সন্তুর তিনখানা পেলেই চলবে !

দুপুরে খাওয়ার সময় সন্তুর পিছমোড়া বাঁধন খুলে দিয়ে হাত দুটো সামনে এনে বেঁধে দিল। তা হলে সন্তুকে খাইয়ে দিতে হবে না। ওই অবস্থায় সে নিজেই খেতে পারে। সন্তু ঠিক যা ভেবেছে, তাই। ওরা নিজেরা ছ'খানা করে রুটি নিয়ে সন্তুকে দিল তিনখানা। ওর আর লাগবে কি না, তা জিজ্ঞেসও করল না। ওরা নিজেরা হাত ধুয়ে এল, সন্তুকে জল দিল না।

ওরা যখন শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করছে, তখন সন্তু বলল, "আর একবার বাথরুম যাব, প্লিজ !"

বাথরুম শব্দটা এরা এখন বুঝে গেছে। বন্দুকধারীটি শুয়ে রইল, আর-একজন রিভলভার নিয়ে চলল সন্তুর সঙ্গে-সঙ্গে। সন্তু গুনগুন করে একটা গান গাইছে।

বাথরুমে ঢুকেও সন্তু গান গাইতে লাগল। এবার তার বাথরুম পায়নি। তবু দুর্গন্ধের মধ্যে বসে রইল প্রায় দশ মিনিট। বাইরে থেকে লোকটা তাড়া দিয়ে কিছু বলছে। সন্তু তবু আরও খানিকটা দেরি করে বেরোল। লোকটা অধৈর্য হয়ে গেছে। প্যান্ট-শার্ট পরে নিয়ে সন্তু হাত দুটো বাড়িয়ে দিল বাঁধার জন্য।

লোকটি রিভলভারটা নামিয়ে রেখে দু' হাত দিয়ে সন্তুকে যেই বাঁধতে গেল, সন্তু লাথি কষাল তার থুতনিতে। সে ছিটকে পড়ে যেতেই সন্তু এক লাফে তার বুকের ওপর বসে মাথাটা কয়েকবার ঠুকে দিল পাথরে। লোকটার জ্ঞান চলে গেল। নিজের দড়ি দিয়ে সন্তু বেঁধে ফেলল ওর হাত আর পা।

এবার সন্তুর দু' হাত খোলা, তার হাতে অস্ত্র আছে। তাকে কে আটকাবে ? অন্য লোকটাকে পার হয়ে যেতে হবে গুহার মুখে।

অন্য লোকটা কী করে যেন টের পেয়ে গেছে। রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কী যেন বলল, তার সঙ্গীর সাড়া না পেয়ে সে গুলি চালাল সন্তুর দিকে। সন্তু ততক্ষণে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে, রাইফেলের টিপ করা অত সহজ নয় সে জানে, গুলিটা চলে গেল অনেক দূর দিয়ে।

লোকটা এবার দৌড়ে আসছে সন্তুর দিকে। অন্য কোনও উপায় নেই, সন্তু অন্ধকারে সরে গিয়ে লোকটির দিকে গুলি চালাল। পরপর দু'বার। লোকটি পড়ে গেল ধপাস করে। সন্তুর বুকটা ধকধক করতে লাগল। লোকটা মরে গেল নাকি ? সে মানুষ খুন করল ? সে না মারলে এই লোকটা নির্ঘাত তাকে মারত।

কাছে গিয়ে দেখল, দুটো গুলি লেগেছে লোকটার ডান কাঁধে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। তবে ও বেঁচে যাবে। ওর হাত-পা বাঁধার দড়ি নেই, সন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাল না, ওর এখনই জ্ঞান ফিরবে না। ওর পাশ থেকে টর্চটা তুলে নিল।

গুহার মুখের দিকে যাওয়ার আগে সন্তু উলটো দিকে গেল। একটা কৌতূহল তাকে মেটাতেই হবে। ওই বাক্সগুলোর মধ্যে কী আছে !

একটা বাক্সের ডালা খুলতেই দারুণ বিস্ময়ের চমক লাগল। মূর্তিটুর্তি কিছু নেই। থরে-থরে সাজানো রয়েছে হ্যান্ড গ্রেনেড। যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয় যেসব হাতবোমা। এমনি কখনও এই বোমা দেখেনি সন্তু, অনেক যুদ্ধের ফিল্মে দেখেছে। লম্বা লম্বা আতার মতো।

এত বোমা এখানে কেন ? এইসব বোমা তৈরি করে মিলিটারি। এই লোকগুলো বোমা তৈরি করে বিক্রি করবে। কাল রাত্তিরে তা হলে গুলির শব্দ শোনেনি, এই বোমাগুলোর কয়েকটা পরীক্ষা করছিল। তাই টেস্টিং শব্দটা কয়েকবার বলছিল ওরা। এইরকম মাটির অনেক নীচে, গভীর গুহার মধ্যে বোমা তৈরি করলেও পরীক্ষা করে দেখা খুব নিরাপদ। কেউ টের পাবে না।

বাক্সগুলো দেখে মনে হল, এখানে কয়েক হাজার বোমা আছে।

আর দেরি করার উপায় নেই। বাক্সটা বন্ধ করে সন্তু সুড়ঙ্গের মুখের দিকে দৌড় শুরু করল। এদিকে একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। টর্চ না থাকলে সন্তু একটুও এগোতে পারত না। বারকয় ধাক্কা খেতে হত। গুহাটা কোথাও বেশ সরু, কোথাও অনেক চওড়া। এই অন্ধকার জায়গাতেই দেওয়ালের গায়ে রয়েছে নানারকম মূর্তি।

গেটের তালার চাবি আনতে ভুলে গেছে সন্তু। কিন্তু গেটের ওপর দিকে খানিকটা খোলা। তরতর করে গেট বেয়ে উঠে সে অন্যদিকে লাফিয়ে পড়ল। মুক্তি, মুক্তি ! এরা সন্তুকে চেনে না, চিনলে আরও সাবধান হত।

রাত্তিরবেলা লোকগুলো কোথা থেকে এসেছিল, তারা কতদূরে থাকে, তা

জানে না সন্তু। হয়তো কাছাকাছি তাদের আস্তানা আছে। এখন লুকিয়ে পড়তে হবে। কোনও রাস্তাটাস্তা না খুঁজে সন্তু পাহাড়ের ওপরদিকে উঠে গেল। বড়-বড় পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দেওয়া সোজা, কেউ দেখতে পাবে না।

মাঝে-মাঝে কিছু ঝোপঝাড় ছাড়া এ-পাহাড়ে বড় গাছ বিশেষ নেই। তবে চারদিকে যেরকম ঢেউয়ের মতো পাহাড়ের পর পাহাড়, এর মধ্যে থেকে কোনও লোককে খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয় !

সন্তু কাঠবিড়ালির মতো তরতর করে উঠে যেতে লাগল এক পাথর থেকে অন্য পাথরে। তারপর একটা ছায়াঘেরা জায়গা দেখে বিশ্রাম করতে লাগল।

ওই লোকগুলো তাকে ধরে রেখেছিল কেন, সন্তু চিন্তা করতে লাগল। এরা মূর্তি-চোর নয়, বোমার চোরাকারবারি। মানুষ খুনের ব্যবসা। দেশের কত জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লড়াই হয়, সেইসব জায়গায় এরা বোমা বিক্রি করে। হয়তো দু' পক্ষের কাছেই। সীমান্ত অঞ্চলে কত বিদ্রোহী, উগ্রপন্থী দল আছে, এইসব বোমা চলে যাবে তাদের হাতে। তারা যে এ-দেশের কত ক্ষতি করছে, তা নিয়ে এই ব্যবসায়ীরা মাথা ঘামায় না। হাজার-হাজার মানুষ মরুক, এরা নিজেদের টাকা পেলেই খুশি।

কিন্তু এদের সঙ্গে কাকাবাবুর সম্পর্ক কী ? কাকাবাবুর মুখে বোমাটোমার কথা তো কিছু শোনেনি সন্তু। কাকাবাবু কতকগুলো নতুন আবিষ্কার করা মূর্তি দেখতে এসেছিলেন। সেগুলো কি এই গুহার দেওয়ালের গায়ের মূর্তি ? কাকাবাবু এই গুহায় আসতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে এরা এই গুহাটা দখল করে নিয়ে এখানে বোমা তৈরি করছে। কাকাবাবু সেটা জেনে ফেললে ওদের মহা বিপদ। হুঁ, ব্যাপারটা আসলে তাই। কিন্তু কাকাবাবুর তো এর মধ্যেই এই গুহায় চলে আসা উচিত ছিল, উনি এখনও পৌঁছলেন না কেন ? ভাইজাগ থেকে চলে এসেছেন তিনদিন আগে...তা হলে কি উনি এদের কথা টের পেয়ে গেছেন ? তৈরি হয়ে নিচ্ছেন ?

কাল দুপুরে যে দুটো লোক সন্তুকে ধরে এনেছিল, তারা কি আজও আসবে ? এলেই সন্তুর পালানোর ব্যাপারটা জেনে যাবে। নিশ্চয়ই মালিকদের ভয়ে তারা মরিয়া হয়ে খুঁজবে সন্তুকে। সন্তুর পক্ষে এক্ষুনি পাহাড় ছেড়ে রাস্তায় নামা ঠিক হবে না। সে শুয়েই রইল।

আরও একটা কথা মনে হল সন্তুর। এই গুহার মধ্যে বোমার স্টকের কথা সন্তু জেনে ফেলেছে। সন্তু যদি আবার ধরা না পড়ে, তা হলে ওরা নিশ্চয়ই এইসব বোমা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আবার কোনও জায়গায় লুকোবে। কিংবা বিক্রি করে দেবে ! হাজার-হাজার বোমা, কত মানুষ মরবে, কত বাড়ি ধ্বংস হবে। এইসব জিনিসের ব্যবসা যারা করে, তারা তো আসলে নরপশু !

সন্তুর হাত নিশপিশ করছে। ইস, কেন সে বোমাগুলো নষ্ট করে দিয়ে এল না! কোনওরকমে জায়গাটায় আগুন ধরিয়ে দিলে হত। কিন্তু সন্তু পালাবার চিন্তায় ব্যস্ত ছিল। খালি মনে হচ্ছিল, আরও যদি কেউ এসে পড়ে!

বিকেল ফিকে হয়ে এল ক্রমশ। সন্তু শুয়ে-শুয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক করে যাচ্ছে। তার মনের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগ বলছে, "ছিঃ সন্তু, তুমি অত মানুষ মারার অস্ত্র দেখেও কিছু না করে চলে যাবে?"

অন্য ভাগ বলছে, "আমি কী করব? তখন পালানোটাই ছিল বড় কথা। মানুষ আগে নিজে বাঁচতে চায়।"

"স্বার্থপরের মতন কথা বোলো না। কত লোক এই বোমার আঘাতে মরবে, তার তুলনায় তোমার নিজের জীবনটা বড় হল? ইচ্ছে করলে তুমি এখনও সেই লোকদের বাঁচাতে পারো।"

"কী করে?"

"ওই গুহার মধ্যে আবার ফিরে যাও!"

"আবার? সাধ করে কেউ আর ওখানে মাথা গলায়? ধরা পড়লে এবার নির্ঘাত খুন হয়ে যাব।"

"ধরা পড়বে কেন?"

"বারবার কি একই রকম ভাবে বাঁচা যায়?"

"ভয় পাচ্ছ সন্তু? তুমি রাজা রায়চৌধুরীর ভাইপো সুনন্দ রায়চৌধুরী। তোমার এরকম ভয় পাওয়াটা মানায় না।"

"ভয়ের কথা হচ্ছে না। শুধু-শুধু গোঁয়ার্তুমি করার কী মানে হয়? আবার ফিরতে হলে, ওই সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে, ভেতরে অত অন্ধকার, টর্চ না জ্বেলে উপায় নেই। ভেতরে কেউ থাকলে সেই টর্চের আলো দেখে খুব সহজে আমাকে গুলি করতে পারবে।"

"হয়তো অন্য কোনও পথ আছে। বানরগুলো ঢুকেছিল কী করে? তারা কোনদিক দিয়ে পালাল? সেই পথটা খুঁজে দেখো।"

"বানরটানরের কথা ছাড়ো তো! আবার ফিরে যাওয়ার গোঁয়ার্তুমিটা কাকাবাবু সমর্থন করতেন?"

"কাকাবাবু তোমার জায়গায় থাকলে ঠিক আবার ফিরে যেতেন। কাকাবাবু তো এইরকমই গোঁয়ার! জেদি!"

"ভেতরে যদি অনেক লোক এসে থাকে, আমি একা কী করে লড়ব?"

"অনেক সময় একাই দাঁড়াতে হয় সন্তু। যতই লোক থাকুক বিপক্ষে, তবু সত্যের জন্য একা দাঁড়াতে হয়। ইবসনের 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপ্‌ল' নাটকটা তুমি কিছুদিন আগেই তো পড়েছ, মনে নেই? যে-নাটকের শেষে আছে, যে একলা দাঁড়াতে পারে, সে-ই সবচেয়ে শক্তিশালী। দ্য স্ট্রংগেস্ট ম্যান ইজ হি, হু স্ট্যান্ডস অ্যালোন।"

সন্তু ধড়মড় করে উঠে বসল, সত্যি তো, বানরগুলো ঢুকেছিল কোথা দিয়ে ? তারা গুহার মুখের দিকেও ছুটে পালায়নি। তা হলে সত্যি আর একটা রাস্তা আছে ঢোকার। একটা বানর বেশ বড় ছিল।

সন্তুর মনের দুটো ভাগ একসঙ্গে মিলে গেছে। সে ঠিক করে ফেলেছে, সে এখন এখান থেকে যাবে না। আজ রাতের মধ্যেই যদি ওরা বোমার বাক্সগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, সন্তু ওদের অনুসরণ করবে। ওগুলো কোথায় নিয়ে যায়, তা দেখতে হবে। আর যদি বোমাগুলো না সরায় আজ, তা হলে কাল সকালে সে আবার ওই গুহায় ফিরে যাবে। বানরদের ঢোকার পথটা খুঁজে বার করতে হবে।

পাহাড় থেকে খানিকটা নেমে এল সন্তু। যাতে গুহার প্রবেশপথটায় নজর রাখা যায়। জেগেই বসে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে-মাঝে ঝিমুনি আসছে, আবার উঠে বসছে। ভাগ্যিস দুপুরে তিনটে রুটি খেয়েছে, তাই তেমন খিদে পাচ্ছে না।

রাতে কেউ এল না। সেই পাঁচ-ছ'জন এলে নিশ্চয় কোনও গাড়ির শব্দ পাওয়া যেত, তারা তো হেঁটে আসবে না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল সন্তু।

চোখে রোদ লাগায় তার ঘুম ভাঙল।

একটু এগিয়ে এসে দেখল, গুহার মুখের লোহার গেটটা খোলা। দু'জন লোক একটা রবারের চাকা লাগানো ছোট ঠেলা গাড়ি সেই গুহার মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। সন্তু চমকে উঠল। ওই ঠেলাগাড়িতে করেই বাক্সগুলো বার করবে। এর আগেও কিছু বার করে ফেলেছে নাকি ?

আর সময় নেই। ঠেলাগাড়িটাকে শেষপর্যন্ত নিয়ে যেতে বেশ কিছুক্ষণ লাগবে, কারণ গুহার অনেক বাঁক, কোথাও বেশ উঁচু-নিচু। ওটা পৌঁছবার আগেই সন্তুকে বানরদের ঢোকার পথ খুঁজে বার করতে হবে।

সন্তু গুহার ছাদের ওপর দিয়ে দৌড়ল।

এক জায়গায় একটা বেশ বড় ঝুপসি বটগাছ, তাতে দোল খাচ্ছে অনেক বানর। এইখানেই তা হলে পাওয়া যেতে পারে।

প্রথমে সন্তু গর্ত-টর্ত কিছু দেখতে পেল না। তবে এক জায়গায় দেখল পাথরের দুটো ভাঁজ। মাঝখানটায় ফাঁক। ইচ্ছে করলে কোনও মানুষ শুয়ে পড়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে সেই ভাঁজের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। সন্তু আগে একবার পা গলিয়ে দেখে নিল।

কয়েকটা বানর কাছাকাছি এসে খ্যাঁক-খ্যাঁক করছে। তাদের নিজস্ব যাতায়াতের পথটা অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দিতে চায় না। রিভলভারটা কোমরে গুঁজে, এক হাতে টর্চ নিয়ে চিত হয়ে শুয়ে সেই ভাঁজের মধ্যে ঢুকে পড়ল সন্তু।

বেশ খানিকটা যেতে হল। এইখান দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ে, শ্যাওলা জমে

আছে, এখনও ভিজে-ভিজে। হঠাৎ পাথর শেষ হয়ে গেল, তারপরেই গুহা।

সন্তু প্রথমে খুব সন্তর্পণে মাথাটা বার করে দেখল। তলাতেই সেই জলভর্তি জায়গাটা। ভালই হল, প্রহরীরা খানিকটা দূরে বসে। কিন্তু এখান থেকে গুহার মেঝে অনেক নিচু, নামা যাবে কী করে ? ঝাঁপ দিলে একেবারে জলাশয়ে পড়তে হবে। বানরগুলো নিশ্চয়ই সেইভাবে নামে না।

এদিক-ওদিক হাত বুলিয়ে সন্তু পেয়ে গেল গাছের মোটা শিকড়। ওপরেই একটা বটগাছ রয়েছে। বটের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত যায়। সেই শিকড় ধরে যা থাকে কপালে ভেবে ঝুলে পড়ল সন্তু।

শিকড়গুলো ঝুলছে, একেবারে শেষপর্যন্ত পৌঁছয়নি। শেষের দিকে সন্তুকে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে নীচে নামতে হল। সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট।

কাল যেখানে সন্তু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে ছিল, সেখানে বসে আছে দুটো লোক। এদিকে পিঠ ফেরানো। ঠেলাগাড়িটার জন্য অপেক্ষা করছে। যে লোক দুটো গাড়িটা ঠেলে আনছে, তাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা এসে পড়লে চারজন হবে।

সন্তু নিঃশব্দে ছুটে গেল কাঠের বাক্সগুলোর দিকে। একটা হ্যান্ড গ্রেনেড তুলে দেখল। সিনেমায় সে দেখেছে, সৈন্যরা মুখ দিয়ে কী যেন একটা খুলে তারপর ছুড়ে মারে। সন্তু এগুলোতে খোলার কিছু দেখল না। এগুলো বোধ হয় উন্নত ধরনের।

বাঁ হাতে রিভলভারটা নিয়ে ডান হাতে সন্তু সেই বোমাটা ছুড়ে মারল খুব জোরে। লোক দুটোর গায়ে নয়, পাশের দেওয়ালে।

বিরাট শব্দে সেটা ফাটল, খসে পড়ল পাথরের চাপড়া, দেখা গেল আগুনের ঝলকানি। বোমাটা যে এতখানি শক্তিশালী, তা সন্তু আন্দাজ করতে পারেনি।

লোক দুটো আর্তনাদ করে শুয়ে পড়েছিল, আবার উঠে দাঁড়াতেই সন্তু আর একটা বোমা ছুড়ল ওদের পায়ের কাছে। ওরা আর রাইফেল তুলে নেওয়ার সময় পেল না, সুড়ঙ্গের মুখের দিকে দৌড় দিল।

সন্তু তাড়া করে গিয়ে আরও দুটো বোমা পরপর ছুড়ে দিল ওদের দিকে। বোমা ফাটার শব্দ ছাড়াও হুড়মুড় করে আর একটা শব্দ হল। ওরা অন্ধকারে গিয়ে পড়েছে সেই ঠেলা গাড়িটার ওপর। আঁ-আঁ করে একটা কাতর চিৎকারও শোনা গেল, একজন বোধ হয় পড়ে গেল খাদে।

ওদের দিকে আরও একটা বোমা ছুড়ে সন্তু ফিরে এল বাক্সগুলোর কাছে। সাত-আটটা বোমা প্যান্টের দু' পকেটে আর জামার মধ্যে ভরে সন্তু বটগাছের শেকড় ধরে সরসর করে উঠে এল ওপরে। সেই পাথরের ভাঁজের আড়ালে গিয়ে সে একটা একটা করে বোমা ছুড়ে মারতে লাগল কাঠের বাক্সগুলোর দিকে। প্রথম দুটো ফসকে গেল। তৃতীয়টা ছুড়ল মাথা ঠাণ্ডা করে। এবারে

ঠিক লাগল, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গুহাটা কেঁপে উঠল। বাক্সটায় আগুন ধরে গিয়ে বাজির মতন অন্য বোমাগুলো ফাটছে। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে পাথর।

আরও কয়েকটা বোমা ছুড়ে সন্তু উঠে পড়ল। তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এই বোমায় আর মানুষ মরবে না। এই বোমাগুলো আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

এর পরের দৃশ্যটি ভারী সুন্দর। দু' গাড়ি পুলিশ এসে গেছে সেই মুহূর্তে। কাকাবাবু, নরেন্দ্র ভার্মা আর রাজমহেন্দ্রী হেঁটে আসছেন আগে-আগে। গুহা থেকে ছুটতে-ছুটতে বেরোল তিনজন, সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। গুহার মধ্যে তখনও বিস্ফোরণ চলেছে। কাকাবাবুরা থমকে দাঁড়ালেন।

জোজোই প্রথম দেখতে পেয়ে বলল, "ওই তো সন্তু।"

গুহার ছাদের ওপর সন্তু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। কাকাবাবুকে দেখেই তার মনে হয়েছে, সব পরিশ্রম সার্থক!

লাফিয়ে-লাফিয়ে সে নীচে নেমে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "গুহার ভেতরে কী হচ্ছে রে সন্তু?"

সন্তু বলল, "বোমা ফাটছে। এই যে, এই বোমা।"

তার পকেটে এখনও একটা আছে, সে বার করে দেখাল।

নরেন্দ্র ভার্মা আর কাকাবাবু চোখাচোখি করলেন। কাকাবাবু বললেন, "কাল রাত্তিরে আমার মনে হয়েছে, এই গুহার মধ্যে ওরা বোমার কারবার করছে। সেইজন্যেই আমাকে আর ভার্গবকে আসতে দিতে চায়নি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আর দু'-একদিন পরে এলে কিছুই দেখতে পেতেন না। ওদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজই সব বোমা পাচার করে দিত। ওদের ব্যাড লাক যে, আপনি এর মধ্যেই মূর্তি দেখার জন্য এসে পড়লেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "কত বোমা ছিল এর মধ্যে?"

সন্তু বলল, "গুনিনি। কয়েক হাজার তো হবেই। তবে আমি সব শেষ করে দিয়েছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা শিস দিয়ে উঠলেন। তারপর সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বললেন, "ব্রাভো। ওয়েল ডান, সন্তু! তুমি একাই তো কেল্লা ফতে করে দিলে!"

কাকাবাবু সস্নেহে বললেন, "আজকাল ও একাই অনেক কিছু পারে। আমার সাহায্যের দরকার হয় না। তোর লাগেনি তো কোথাও? ডান হাতে কী হয়েছে, রক্ত পড়ছে?"

কোনও এক সময় পাথরে ঘষে গিয়ে ডান কাঁধের কাছটা খুবলে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে। সন্তু এতক্ষণ খেয়ালই করেনি। সে বলল, "ও কিছু না।"

জোজো সন্তুকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কাকাবাবু

হারিয়ে গিয়েছিলেন, আমিই তাঁকে খুঁজে বার করেছি, বুঝলি ! কাল রাত্তিরে আমি কাকাবাবুকে বললুম, মূর্তি-চুরিটুরির কথা এখন থাক। আগে সন্তুকে উদ্ধার করতে হবে। আমি ঠিক জানতুম, তোকে একটা গুহার মধ্যে আটকে রেখেছে। আমার কথাতেই তো পুলিশ নিয়ে এখানে আসা হল।"

সন্তু জোজোর কাঁধে হাত রেখে বলল, "তাই নাকি ? ভাগ্যিস তোরা এসে পড়েছিস, না হলে আমার খুব বিপদ হত ! তুই ঠিক বুদ্ধি দিয়েছিস জোজো। আমি জানতুম, তুই যখন আছিস, আমি উদ্ধার পাবই। তুই-ই তো এবারের হিরো।"

জোজো বলল, "রাধা গোমেজ নামে একটা মেয়েকে আমরা ধরে রেখেছিলাম, আমিই বুদ্ধি দিয়েছিলাম কাকাবাবুকে বুঝলি ? এই রাধার বাবাই হচ্ছে চোরা চালান চক্রের সর্দার। কাল শেষ রাতে আমাদের হোটেল খুঁজে ওই গোমেজ সর্দার দলবল নিয়ে এসে আক্রমণ করে। আগেই পুলিশের ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিল, সবাই ধরা পড়ে গেছে। গোমেজ এমন হিংস্র যে ওই অবস্থাতেও আমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল আর কি ! নরেন্দ্র ভার্মা ঠিক সময় আটকে দিলেন, তিনি এক গুলিতে গোমেজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিচ্ছিলেন, কাকাবাবু বাধা দিয়ে বললেন, যাক, যাক। ওকে প্রাণে মারতে হবে না। আমি রাধাকে কথা দিয়েছি। আমি অবশ্য এক ঘুসিতে পাঁচখানা দাঁত ভেঙে দিয়েছি ওর।"

কাকাবাবু গুহার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন, "জোজো, গুনে দেখেছিলে, ঠিক পাঁচটা ?"

জোজো বলল, "অন্তত চারটে তো হবেই !"

কাকাবাবু বললেন, "ওপরের দাঁত না নীচের দাঁত ?"

জোজো বলল, "ওপরের দুটো আর নীচের একটা তো আমি মাটিতে পড়ে থাকতেই দেখেছি !"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার ঘুসিটা ফসকে গিয়ে আমার গায়ে লেগেছিল। আমার কিন্তু একটা দাঁতও ভাঙেনি।"

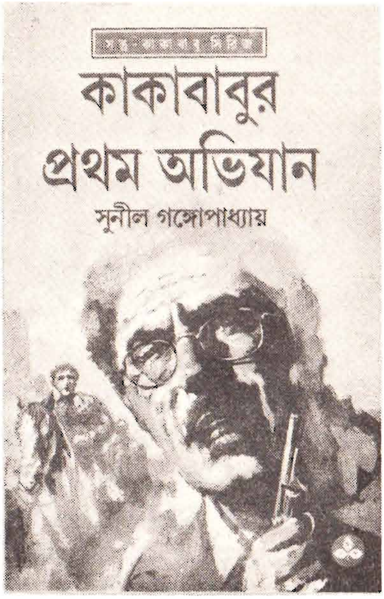

কাকাবাবুর প্রথম অভিযান

সন্তুর ঘরখানা তার নিজস্ব পৃথিবী। তিনতলার ছাদে ওই একখানাই ঘর, ছাদে বিশেষ কেউ আসে না। ঘরের মধ্যে সন্তু লম্ফঝম্ফ করে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে, কিংবা একলা-একলা তলোয়ার খেলে, কেউ দেখবার নেই। সন্তু যখন আরও ছোট ছিল, কালি দিয়ে মুখে গোঁফ-দাড়ি এঁকে কিংবা নিজেই একটা মুখোশ বানিয়ে কখনও ফ্যান্টম বা ম্যানড্রেক সাজত, কখনও সুপারম্যান, আবার কখনও তীর-ধনুক হাতে অর্জুন। খাটের মাথার দিকটায় উঠে সে ঘোড়া চালাত খুব জোরে, আর মাঝে-মাঝে চেঁচিয়ে উঠত, "হো নীল ঘোড়াকা সওয়ার। হো নীল ঘোড়াকা সওয়ার !"

সন্তু নিজের একটা নাম দিয়েছিল, সেটা খুব গোপন, আর কেউ জানে না। ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গো। সে বাঙালি নয়, এ-পৃথিবীরই কেউ নয়, দূর মহাকাশ থেকে মাঝে-মাঝে পৃথিবীতে বেড়াতে আসে। ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গোর মুখের ভাষাও তৈরি করেছিল সন্তু। 'বিলিবিলি খাণ্ডা গুলু ? বুমচাক, বুমচাক ডবাংডুলু ! উসুখুসু সাকিনা খিনা ? কামুলু টামুলু জামুলু। ফিংকা চিংমিনিমিনি মাজুনু জানুনু লাকুনু।' পিঠে একটা সাদা চাদর বেঁধে ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গো আকাশে উড়ে বেড়ায়, চন্দ্র-সূর্য, এমনকী মেঘের সঙ্গেও সে কথা বলে। ওই ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গোর ভাষা সন্তু একটা খাতাতেও লিখে রেখেছিল, তখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ে। এখন সেই লেখাটা দেখলে তার হাসি পায়।

এখন আর সন্তু ওরকম কিছু সেজে খেলা করে না বটে, কিন্তু একলা ঘরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে কবিতা আবৃত্তি করে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময়েই সে মেঘনাদবধ কাব্য পুরো মুখস্থ করে ফেলেছিল, অনেক শব্দেরই মানে বুঝত না, তাতে কিছু আসে যায় না। এখন তার একটা নতুন শখ হয়েছে, সে নাচ শিখছে। কারও কাছে শিখতে যায় না, ঘরের দরজা বন্ধ করে ক্যাসেট প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা ইংরিজি গান চালিয়ে সে নিজে-নিজে নাচে। তার এই নাচের কথা আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না।

ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা বড় বোর্ড। তাতে সন্তু তার প্রিয় সব

খেলোয়াড়, গায়ক, লেখকদের ছবি পিন দিয়ে আটকে রাখে। ছবিগুলো মাঝে-মাঝেই বদলে যায়। একটা সাদা কাগজে প্রতি সপ্তাহে সে এক-একটা বাণী লিখে রাখে। বাণীটা তার নিজের জন্য, নিজেরই বানানো। গত সপ্তাহে লেখা ছিল, 'কফি গরম, আইসক্রিম ঠাণ্ডা, দুটোই একসঙ্গে খাওয়া যায়। খুব রাগ হলেও হো-হো করে হাসি প্র্যাকটিস করো।' এ সপ্তাহে তার বদলে লেখা আছে, 'খিদে পেলে গান গাও, প্রাণ খুলে গান গাও, খুব যদি গান পায়, খুব কষে ঝাল খাও, ঝাল চানাচুর খাও।'

সন্তুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র জোজো এই তিনতলার ঘরে আসে। পরশুই এসেছিল। সে সন্তুর ওই বাণীর তলায় লিখে রেখেছে, "খুব যদি ঝাল লাগে, নদীতে সাঁতার দাও!"

সন্তু অনেক রাত জেগে বই পড়ে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, সমস্ত পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তখন বই পড়তে বেশি ভাল লাগে। পড়ার বই, গল্পের বই। ভূতের গল্প পড়তে একটু গা-ছমছম করে বটে, কিন্তু সন্তু জোজোর মতন ভূতে বিশ্বাস করে না। জোজো কক্ষনও একলা ঘরে শুতে পারে না। জোজোদের বাড়ির ঠিক পেছনেই খানিকটা ফাঁকা জমি আর একটা ভাঙা বাড়ি আছে। জোজোর ধারণা, তিনটে ভূত থাকে ওই বাড়িতে। কোনওদিন নিজের চোখে দেখেনি, তবু কী করে জানল যে, ঠিক তিনটে ভূত, তা কে জানে। জোজোর বাবা অবশ্য এমন জোরালো মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন যে, ভূতে কোনওদিন জোজোর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

বই পড়তে-পড়তে রাত দুটো-আড়াইটে বেজে গেলেও কিন্তু বেশি বেলা করে ঘুমোবার উপায় নেই সন্তুর। ছাদে অনেক ফুলের টব আছে। প্রত্যেক দিন ঠিক পৌনে ছ'টায় মা সেই ফুলগাছগুলোতে জল দিতে আসেন। আগে ডেকে তোলেন সন্তুকে। ঘরের দরজা ভেজানো থাকে, মা ঘরের মধ্যে এসে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বই, গেঞ্জি, রুমাল, কলম সব গুছিয়ে রাখেন। তারপর সন্তুর শিয়রের কাছে এসে তার গালটা বেশ জোরে টিপে ধরে বলেন, "ঘুমপরী এবার বাড়ি যাও, আমার খোকাটি এবার ছোলা গুড় খাবে। অ্যাই সন্তু, ওঠ!"

সত্যি-সত্যি সন্তুকে রোজ সকালে ভেজানো ছোলা আর আখের গুড় খেতে হয়। তার ভাল লাগে না অবশ্য। তবু এটাই তাদের বাড়ির নিয়ম। সবাই খায়। কাকাবাবু মাঝে-মাঝে আপত্তি করে বলেন, "বউদি, এসব তো উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভাল, আমাকে জোর করে খাওয়াচ্ছ কেন?" মা শুনবেন না, খেতেই হবে।

তার আগে, চোখ-মুখ না ধুয়েই সন্তু মাকে গাছে জল দেওয়ায় সাহায্য করে। ট্যাঙ্ক থেকে জল এনে দেয়, কোনও-কোনও গাছের গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে দিতে হয়। এক-একদিন সে মাকে বলে, "মা, তুমি রোজ-রোজ কষ্ট করে ওপরে আসো কেন? আমিই তো সব গাছে জল দিয়ে দিতে পারি!"

মা হেসে বলেন, "আমি না এলে তোর আরও অনেকক্ষণ নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার খুব সুবিধে হয়, তাই না ?"

তারপর একটা গাছে আদর করে হাত বুলোতে-বুলোতে আবার বলেন, "সারা দিনে তো একবারই ছাদে আসি। যে গাছগুলো লাগিয়েছি, তা একবারও দেখব না ? ফুল তো দেখবার জন্যই। জানিস সন্তু, গাছকে আদর করলে গাছ ঠিক বোঝে। তাতে তাড়াতাড়ি ফুল ফোটে।"

তিনতলায় বাথরুম নেই, সকালবেলা সন্তু মায়ের সঙ্গেই নীচে নেমে যায়।

ছুটির দিনগুলোতে প্রায় সারাদিনই সন্তু নিজের ঘরে কাটায়। রান্নাঘর, খাবার জায়গা একতলায়, খিদে-তেষ্টা পেলে সেখানে যেতে হয় সন্তুকে। ছেলেবেলা থেকে তাকে শেখানো হয়েছে, বাড়ির কাজের লোককে এক গেলাস জলও এনে দিতে বলা চলবে না। নিজেরটা নিজেকে করে নিতে হবে। দরকার হলে সন্তু ডিম সেদ্ধ করতে পারে, কফি বানাতে পারে।

দোতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরটা কাকাবাবুর। ভেতরের দিকে দিদির ঘরটা এখন খালি পড়ে থাকে, অন্যটা মা-বাবার। বাবা অবশ্য বেশিরভাগ সময়ই নীচের বৈঠকখানা ঘরে কাটান। তার পাশে একটা লাইব্রেরি ঘরও আছে।

কাকাবাবুর সঙ্গে বাবার স্বভাবের কত তফাত। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও পাহাড়ে-জঙ্গলে কত অ্যাডভেঞ্চারে যান, আর বাবা বাড়ি থেকে বেরোতেই চান না। একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন, হোটেল বুক করা ছিল সাতদিনের, দু'দিন থেকেই শীতের ভয়ে পালিয়ে এলেন। মায়ের তাড়নায় বাবাকে বাধ্য হয়ে কয়েকবার বেড়াতে যেতে হয়েছে বটে, প্রত্যেকবার ফিরে এসে বলেছেন, "উঃ কী ঝকমারি ! কুলির মাথায় জিনিস চাপাও, ঠিক সময় ট্রেনে ওঠো, ঠিক-ঠিক স্টেশনে নামো, আবার কুলি, গাড়ি নিয়ে দরাদরি, হোটেলে গিয়ে দেখবে বাথরুমে জল নেই...। কী দরকার বাপু এতসব ঝামেলা করার। বই পড়লেই তো সব জানা যায়।"

বাবা ভ্রমণকাহিনী পড়তে খুব ভালবাসেন। বিছানায় শুয়ে সেইসব বই পড়তে-পড়তে তিনি মনে-মনে সাহারা মরুভূমি, আফ্রিকার জঙ্গল, হিমালয় পাহাড় কিংবা আলাস্কা ঘুরে আসেন। কাকাবাবু ভ্রমণকাহিনী পড়েন না, তিনি সময় পেলেই সামনে মেলে ধরেন নানা দেশের ম্যাপ। হিসেব করেন, কোথায়-কোথায় তাঁর এখনও যাওয়া হয়নি। এ-পৃথিবীর প্রায় অনেকখানিই তাঁর দেখা।

আজ একটা ছুটির দিন। সকালবেলা জলখাবারের টেবিলে কাকাবাবুর সঙ্গে সন্তুর দেখা হয়েছিল। মাঝে-মাঝে কাকাবাবু দুপুরের খাওয়াটা বাদ দেন, আজ শুধু একবাটি সুপ খেয়েছেন নিজের ঘরে বসে। সকালবেলা সন্তু দেখেছিল, কাকাবাবুর গালে খরখরে দাড়ি। তাতে সে বেশ অবাক হয়েছিল। প্রতিদিন কাকাবাবু মর্নিংওয়াকে যান, তারপর আর বাড়ি থেকে না বেরোলেও তিনি দাড়ি

কামিয়ে রোজ ফিটফাট থাকেন।

সন্তুর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পেরে কাকাবাবু নিজের গালে হাত বুলোতে-বুলোতে বলেছিলেন, "দাড়ি কামাবার সাবান ফুরিয়ে গেছে—"

বাবা বললেন, "তুই আমারটা নিলেই পারিস।"

কাকাবাবু বললেন, "না, তোমার ওই সাবানে আমার চলবে না। আমার ফোম সাবান ব্যবহার করা অভ্যেস হয়ে গেছে। সন্তু, তুই যখন বাড়ি থেকে বেরোবি, আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাস, একটা ওই সাবান কিনে আনিস।"

সারাদিন সন্তু পড়াশুনো করেছে, খানিকটা নেচেছে, খানিকটা ঘুমিয়েছে, ঘর থেকে আর বেরোয়নি। কাকাবাবুর কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। বিকেলবেলা তার ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলতে যাওয়ার কথা, সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে মনে পড়ে গেল। সারাদিন কাকাবাবুর দাড়ি কামানো হয়নি!

কাকাবাবুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তোমার ফোম সাবান কিনে আনব, টাকাটা দাও।"

কাকাবাবুর লেখাপড়ার টেবিলটা জানলার পাশে। রিভলভিং চেয়ারে বসে কাকাবাবু জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। মুখটা ফেরালেন। কাকাবাবুর মুখের মধ্যে ওটা কী?

সন্তু ভাল করে দেখল, কাকাবাবুর মুখে একটা থার্মোমিটার।

এই অবস্থায় কোনও কথা বলা যায় না। কাকাবাবু নিঃশব্দে ড্রয়ার খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলেন সন্তুর দিকে।

টাকাটা নিয়েও সন্তু নড়ল না।

কাকাবাবুর টেবিলের ওপর বেশ বড় একটা গ্লোব। একদিকের দেওয়ালজোড়া এভারেস্ট-এর চূড়ার ছবি। আর একদিকের দেওয়ালে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ। এই ম্যাপ কাকাবাবু প্রায়ই বদলান। কাকাবাবু কি এবার অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন? সন্তুর বেশ আনন্দ হল। তা হলে এবার অস্ট্রেলিয়া দেখা হয়ে যাবে।

মুখ থেকে থার্মোমিটারটা বার করে নিয়ে কাকাবাবু দেখতে লাগলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কত?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু না। দেখছিলাম এই ঘরের টেম্পারেচারের সঙ্গে আমার শরীরের টেম্পারেচারের কোনও তফাত হয় কি না!"

কথাটা সন্তুর বিশ্বাস হল না।

কাকাবাবুর চোখ দুটো লালচে দেখাচ্ছে। চুল উসকোখুসকো। দেখলেই মনে হয়, বেশ জ্বর হয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, "সর্দারি করে দাদা-বউদিকে কিছু বলতে হবে না। আমার কিচ্ছু হয়নি। তুই খেলতে যা।"

সন্তু কাকাবাবুকে কখনও অসুখে ভুগতে দেখেনি। কাকাবাবুর শুধু একটা পা জখম, কিন্তু স্বাস্থ্য দারুণ ভাল। একবার শুধু তাঁর শত্রুরা তাঁকে গুলি করেছিল, সেটাও আবার বাঘকে ঘুম পাড়াবার গুলি। সেবার কাকাবাবু বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। তখনও অনেকে বলেছিল, "ওই গুলিতে মানুষের বাঁচা প্রায় অসম্ভব," কাকাবাবু সেরে উঠেছিলেন বেশ তাড়াতাড়ি।

নীচে নেমেই সন্তু মাকে বলল, "মা, কাকাবাবুর খুব জ্বর হয়েছে। তোমাদের বলতে বারণ করলেন।"

বাবাও খুব অবাক। জলের মাছের সর্দি হওয়ার মতনই যেন কাকাবাবুর জ্বর হওয়াটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

মা আর বাবা দু'জনেই ওপরে উঠে এলেন সঙ্গে-সঙ্গে।

মা কাকাবাবুর কপালে হাত দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বেশ জ্বর। একশো তিন-চার হবে বোধ হয়।"

বাবা বললেন, "কবে থেকে জ্বর হচ্ছে ? রাজা, তুই আমাদের কাছে কিছু বলিস না কেন ? ডাক্তার দেখাতে হবে না ?"

সন্তু লুকিয়ে রইল দরজার আড়ালে।

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা আবার ব্যস্ত হলে কেন, এমন কিছু হয়নি।"

মা বললেন, "ইস, কিছু হয়নি ? জ্বরে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে। তুমি শুয়ে পড়ো, তোমার মাথা ধুইয়ে দেব।"

বাবা বললেন, "তা হলে তো ডাক্তারকে খবর দিতে হয়। চতুর্দিকে ম্যালেরিয়া হচ্ছে।"

কাকাবাবু আর্তস্বরে বলে উঠলেন, "না না, ডাক্তার ডাকতে হবে না। জ্বর হয়েছে, এমনই সেরে যাবে। ডাক্তার এলেই একগাদা ওষুধ দেবে, পটপট ইঞ্জেকশান ফুঁড়ে দেবে!"

সন্তু মুচকি হাসল। কাকাবাবু রিভলভারের সামনে বুক পেতে দিতে ভয় পান না, কিন্তু ইঞ্জেকশান নিতে বড় ভয়। আফ্রিকা যাওয়ার সময় ইয়োলো ফিভারের ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল, তখন তিনি আড়ষ্ট মুখে চোখ বুজে ছিলেন।

টেলিফোনটা তুলতে-তুলতে বাবা বললেন, "রাজা, তুই কি মনে করিস, তুই ভীম না হারকিউলিস ? সব মানুষেরই মাঝে-মাঝে অসুখ-বিসুখ করে, ডাক্তার দেখাতেও হয়। না হলে ডাক্তারদেরই বা চলবে কী করে ?"

কাকাবাবু গজগজ করতে-করতে বললেন, "এবার আমার অসুখের কথা চারদিকে ছড়াবে, আর দলে দলে আত্মীয়-বন্ধুরা দেখতে আসবে। বাঙালিদের এই এক স্বভাব, অসুস্থ লোকের ঘরে ভিড় করে বসে থাকবে আর চেনাশুনো মানুষরা কে কোন অসুখে মরে গেছে, সেই গল্প করবে। আর চা-মিষ্টি খাবে!"

ডাক্তার রথীন বসু কাকাবাবুরই বন্ধু। তিনি ঘরে ঢুকতে-ঢুকতেই বললেন,

“বা বা বা, রাজার অসুখ হয়েছে। খুব খুশি হয়েছি। এমনকী ডাক্তারদেরও কখনও সখনও অসুখ হয়, আর রাজা রায়চৌধুরীর কোনওদিন অসুখ হবে না, এতে আমাদের হিংসে হয় না? আমরা বিছানায় পড়ে থাকি আর ও জঙ্গলে-পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়ায়। এবার রাজা, তোকে অন্তত সাতদিন শুইয়ে রাখব, আর রোজ দু'বেলা ইঞ্জেকশান!”

কাকাবাবু বললেন, “ইঞ্জেকশান না দিলে রোগ সারে না? তুই কি ঘোড়ার ডাক্তার? ইঞ্জেকশান দেওয়ার চেষ্টা করে দেখ না, ঘুসিতে তোর নাক ফাটিয়ে দেব!”

দু'জন বয়স্ক লোক বাচ্চাদের মতন খুনসুটি করতে লাগলেন।

কাকাবাবুকে সত্যিই কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হল। শরীর বেশ দুর্বল। রক্ত পরীক্ষায় জানা গেছে, ম্যালেরিয়া নয়, তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছে।

বাবা বললেন, “অনেকদিন এ-রোগটার নামই শুনিনি। তুই এ-রোগ কী করে বাধালি রাজা?”

কাকাবাবু অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, “কিছু না, বুকে একটু ঠাণ্ডা বসে গেছে, তাই রথীন বলে দিল নিউমোনিয়া। ওরা বড়-বড় নাম দিতে ভালবাসে। ওষুধগুলোর নাম দেখো না, কীরকম শক্ত-শক্ত।”

কয়েকদিন আগে কাকাবাবু ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন পড়াশুনো করতে। ফেরার পথে দারুণ বৃষ্টি নেমেছিল। কাকাবাবু বৃষ্টি গ্রাহ্য করেন না, ট্যাক্সি পাননি, ইচ্ছে করেই বাসে না উঠে ময়দান দিয়ে হেঁটে এসেছেন চৌরঙ্গি পর্যন্ত। তারপর সেই ভিজে জামা পরেই গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র ভার্মার সঙ্গে দেখা করতে। বুকে ঠাণ্ডা বসে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

অনেক ওষুধ খেতে হচ্ছে। কাকাবাবুর ধারণা, ওষুধগুলোর জন্যই তাঁর শরীর বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

অসুখের কথা কী করে রটে যায় কে জানে! সত্যিই, দলে-দলে লোক কাকাবাবুকে দেখতে আসতে লাগল সকালে-বিকেলে। নরেন্দ্র ভার্মা খুব হতাশ। তিনি দিল্লি থেকে এসেছিলেন একটা রহস্য সন্ধানের ব্যাপারে কাকাবাবুকে নাগাল্যান্ডে নিয়ে যেতে। দেখতে এসে বললেন, “রাজা রায়চৌধুরীর অসুখ, এ যেন আগুনের পেট গরম! তুমি নাগাল্যান্ডে যেতে চাও না, সেইজন্য অসুখের ভান করোনি তো?”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি আমার বদলে সন্তুকে নিয়ে যাও!”

ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা পড়ার পর নরেন্দ্র ভার্মা সস্নেহে সন্তুর দিকে তাকালেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, “হ্যাঁ, সন্তু এখন প্রায় হিরো হয়ে উঠেছে বটে। দু'দিন বাদে তোমাকে-আমাকে টেক্কা দেবে! কিন্তু তোমার অসুখের সময় সন্তুকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমাকে আজই রওনা দিতে হবে।”

আজ সকালে চার-পাঁচজন দেখা করতে এসেছে। কেউ মাসতুতো ভাই, কেউ পিসতুতো দাদা। একজন মহিলা মায়ের সঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন। বহুদিন এঁদের দেখা যায়নি। কাকাবাবুর কথা মিলে গেছে, মা এঁদের চা ও মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। তাই খেতে-খেতে এঁরা অন্যদের অসুখের গল্প করছেন।

মাঝখানের চেয়ারে গম্ভীরভাবে বসে আছেন একজন হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ। কাকাবাবুর বয়েসী হবেন, মুখে মোটা গোঁফ আর চাপদাড়ি, বেশ দামি সুট পরা।

তিনি সকলের কথা শুনছেন, নিজে কিছু বলছেন না। আর সবাই একে-একে চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন, "আমিও এবার উঠব রাজা, শরীরের অযত্ন কোরো না। কিছুদিন বিশ্রাম নাও।"

এরকম উপদেশ শুনতে-শুনতে কাকাবাবুর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি আবার বললেন, "শুধু ওষুধ খেলে অসুখ সারে না। এই রোগের আসল চিকিৎসা হল শুয়ে থাকা। অন্তত সাতদিন শুয়ে থাকতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ!"

লোকটি উঠে দাঁড়ালেন। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। এ-ঘরে ঢোকার সময় সবাই বাইরে জুতো খুলে আসে, এঁর পায়ে চকচকে কালো জুতো। বাঁ হাতটা আগাগোড়া কোটের পকেটেই ছিল, একবার বার করতেই সন্তু লক্ষ করল, সেই হাতটায় পাতলা রবারের দস্তানা পরা।

তিনি বললেন, "তা হলে আমি চলি? কোনও দরকার-টরকার হলে আমাকে খবর দিয়ো। আমি সপ্তাহখানেক পরে আবার আসব।"

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতেই কাকাবাবু চোখের ইঙ্গিতে মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কে?"

মা বললেন, "জানি না তো। জন্মে দেখিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী! আমিও তো চিনি না। আমি ভাবলাম, তোমাদের কোনও আত্মীয়-টাত্মিয় হবে বুঝি।"

মা বললেন, "আমিও তো ভেবেছি, তোমার কোনও বন্ধু!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার বন্ধুর চেয়ে শত্রু বেশি। তুমি-তুমি বলে কথা বলল, যেন কতদিনের চেনা। অথচ আমি একেবারেই চিনতে পারলাম না? মুখভর্তি অবশ্য দাড়ি-গোঁফ।"

চোখ বুজে কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন।

তারপর বললেন, "উহুঃ, মনে পড়ছে না। সন্তু এক কাজ কর তো। দেখে আয় তো লোকটা কোথায় যায়। সঙ্গে আর কেউ আছে কি না!"

সন্তু দৌড়ে নীচে নেমে গেল।

ভদ্রলোকটি ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি নেই। তিনি হাঁটতে লাগলেন বড় রাস্তার দিকে। সন্তু তাঁর পিছু নিল।

সন্তু ইচ্ছে করলে ছুটে গিয়ে ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াতে পারে। তারপর সে কী করবে ? 'আপনার নাম কী, কোথা থেকে এসেছেন, কাকাবাবুকে আপনি কী করে চিনলেন', এসব কথা কি ওরকম একজন রাশভারী চেহারার লোককে জিজ্ঞেস করা যায় ?

লোকটির দুটি হাতই এখন পকেটের বাইরে। বাঁ হাতের পাতলা দস্তানাটা সন্তুর আবার নজরে পড়ল। একজন লোক শুধু একহাতে দস্তানা পরে থাকে কেন ?

সন্তু আর-একটু কাছে যেতেই ভদ্রলোক পেছন ফিরে তাকালেন এবং বাঁ হাতটা চট করে পকেটে ভরে ফেললেন।

সন্তু যেন কোনও জিনিস কিনতে বেরিয়েছে, এইরকম ভাব করে একটুখানি হাসল। ভদ্রলোক হাসলেনও না, কোনও কথাও বললেন না।

এইসময় একটা কালো রঙের গাড়ি এসে থামল লোকটির কাছে। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। ড্রাইভারটির মাথায় একটা খাকি রঙের টুপি।

ভদ্রলোক পেছনের দরজা খুলে উঠে পড়লেন গাড়িতে। তারপর সেটা চলতে শুরু করতেই জানলা দিয়ে কেমন যেন কটমট করে তাকালেন সন্তুর দিকে।

॥ ২ ॥

আগে সন্তু প্রতি বছর গরমকালে সকালবেলায় সাঁতার কাটতে যেত। সাঁতারের প্রতিযোগিতায় দু'বার পুরস্কারও পেয়েছে। এখন পড়াশুনোর চাপে আর সাঁতার কাটতে যাওয়া হয় না। সাঁতার ক্লাবের ছেলেরা তাকে মাঝে-মাঝে ডাকতে আসে।

আজ বালিগঞ্জ লেকে সন্তুদের সেই ক্লাবে একটা কবিতা পাঠের আসর হবে। নামকরা কবিরা এসে কবিতা পড়বেন। সন্তু সেই অনুষ্ঠানটা শুনতে যাবে ঠিক করে রেখেছিল, যাওয়ার আগে ভাবল, জোজোকেও নিয়ে গেলে হয়।

জোজো একেবারেই সাঁতার জানে না। জলে নামতেই ভয় পায়। মুখে অবশ্য তা স্বীকার করবে না। সাঁতারের কথা উঠলেই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, "আরে আমি বসফরাস প্রণালী আর কাস্পিয়ান হ্রদে সাঁতার কেটে এসেছি। তোদের এখানকার এইসব ছোটখাটো সুইমিং পুলে কী নামব ! আমার ঘেন্না করে !"

জোজো খেলাধুলোও কিছু করে না, শুধু বই পড়ে। কবিতা পড়তেও

ভালবাসে।

সন্তু ওর বাড়িতে গিয়ে ডাকতেই জোজো নেমে এল। ওর ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা, একটু-একটু খোঁড়াচ্ছে।

কলেজে এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, তাই জোজোর সঙ্গে চার-পাঁচদিন দেখা হয়নি। সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তোর পায়ে কী হল রে ?"

জোজো অবহেলার সঙ্গে বলল, "এমন কিছু না। হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে একটা পা একটু মচকে গেছে।"

সন্তু বলল, "হেলিকপ্টার থেকে আবার কোথায় লাফালি ?"

জোজো বলল, "বাঃ, এর মধ্যে আমাকে লাদাখ ঘুরে আসতে হল জানিস না ? খুব জরুরি কাজে যেতেই হল।"

সন্তু বলল, "লাদাখ ? কাগজে দেখলাম সেখানে এখনও বরফ পড়ছে, সেখানে আবার তোর কী জরুরি কাজ ?"

জোজো বলল, "বাবার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার অরিজিৎ সিং ওখানে পোস্টেড, হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বুকে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা। কোনও ডাক্তারই কিছু করতে পারেনি। তখন অরিজিৎ সিং বাবাকে ফোন করে কাতরভাবে বললেন, 'বন্ধু, তোমার কবিরাজি ওষুধ পাঠিয়ে আমাকে বাঁচাও।' বাবা তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তোকে একটা গোপন কথা বলে দিচ্ছি সন্তু, কাউকে জানাবি না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন ভোটে জেতার জন্য বাবার কাছে একটা মাদুলি চেয়েছেন, বাবা সেইটা তৈরি করছিলেন। তাই বাবা বললেন, 'জোজো, তুই ওষুধটা পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবি ?' একটা লোককে বাঁচাবার জন্য আমাকে যেতেই হল। প্লেনে দিল্লি হয়ে শ্রীনগর, সেখানে আর্মির হেলিকপ্টার আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।"

"তুই হেলিকপ্টার থেকে লাফাতে গেলি কেন ?"

"আহা বুঝলি না, জীবন-মরণ সমস্যা। আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে অরিজিৎ সিংকে বাঁচানো যেত না। ওখানে তখন খুব বরফ পড়ছে, হেলিকপ্টারটা ল্যান্ড করতে পারছে না। তিরিশ ফুট ওপরে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, বরফের জন্য কিছু দেখাই যাচ্ছে না, আমি তখন 'জয় মা দুর্গা' বলে জাম্প দিলাম। তোকে কী বলব সন্তু, ওষুধটায় ঠিক ম্যাজিকের মতন কাজ হল। একটা ট্যাবলেট খেয়েই অরিজিৎ সিং বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নীচে নেমে এল, গোরিলার মতন নিজের বুক চাপড়ে বলতে লাগল, 'সব ঠিক হো গিয়া, বিলকুল ঠিক হো গিয়া' !"

গল্পটা হজম করে নিয়ে সন্তু বলল, "বাঃ, ভাল কাজ করেছিস। কিন্তু একটা মুশকিল হল, তুই তো হাঁটতে পারবি না। ভেবেছিলাম তোকে আমাদের সাঁতারের ক্লাবে কবিতা পাঠ শোনাতে নিয়ে যাব।"

জোজো চোখদুটো গোল-গোল করে বলল, "সাঁতারের ক্লাবে কবিতা পাঠ ? এরকম অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি !"

সন্তু বলল, "কেন, যারা সাঁতার কাটে, তারা বুঝি কবিতা পড়তে বা কবিতা শুনতে পারে না ? যারা ক্রিকেট খেলে, তারা কি গান শোনে না ? যারা গান গায় কিংবা কবিতা লেখে, তারা কি খেলা দেখে না ?"

জোজো বলল, "বাংলায় একটা কথা আছে, 'যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না ?'"

সন্তু বলল, "আমার মা রান্না করেন, চুলও বাঁধেন। চুল বাঁধতে-বাঁধতে গান করেন, আর রাঁধতে-রাঁধতে উপন্যাস পড়েন।"

"তা হলে সত্যিই তোদের ক্লাবে কবিতা পড়া হচ্ছে ? আমি ভেবেছিলাম, তুই গুল মারছিস !"

"ভাই জোজো, গুল মারার কায়দাটাই আমি জানি না। ওটা পুরোপুরি তোর ডিপার্টমেন্ট।"

"হাঁটতে আমার অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু সাইকেল চালাতে পারি। চল, যাই তা হলে !"

সন্তুও সাইকেল নিয়ে এসেছে। দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল।

খানিকদূর যাওয়ার পরেই জোজো বলল, "এই যাঃ, মানিব্যাগটা ফেলে এলাম যে। কী হবে ?"

সন্তু বলল, "তাতে কী হয়েছে ? টাকা-পয়সার তো দরকার নেই, ওখানে টিকিট কাটতে হবে না।"

জোজো বলল, "সেজন্য নয়। একটা করে চিকেন কাটলেট খেয়ে নেওয়া যেত। বিকেলবেলা কিছু খাইনি। খালি পেটে কি কবিতা শোনা যায় ?"

সন্তু বলল, "তাই বল, তোর কাটলেট খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। ঠিক আছে, আমার কাছে টাকা আছে।"

জোজো বলল, "আমি কিন্তু খাওয়াব। টাকাটা তোর কাছে ধার রইল।"

লেক মার্কেটের কাছে একটা দোকানের চপ-কাটলেট খুব বিখ্যাত। দোকানটায় বেশ ভিড়। ভেতরে বসে খাওয়ার জায়গা নেই। দু'খানা কাটলেট নিয়ে ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল।

খেতে-খেতে জোজো বলল, "আমার পা-টা যখন মুচকে গেল, জানিস, প্রথম দু'দিন এমন ব্যথা যে, আমি উঠে দাঁড়াতেই পারছিলাম না। ভয় হয়েছিল, সারাজীবনের মতনই খোঁড়া হয়ে যাব নাকি ! তখন কাকাবাবুর কথা খুব মনে পড়ত। কাকাবাবু ওই খোঁড়া পা নিয়েই কতবার পাহাড়ে উঠেছেন, জলে ঝাঁপিয়েছেন, হ্যাঁ রে সন্তু, কবে থেকে খোঁড়া হয়েছেন বল তো ?"

সন্তু বলল, "আমি ঠিক জানি না। ছেলেবেলা থেকেই তো এরকম দেখছি।"

"কীভাবে পা-টা ওরকমভাবে খোঁড়া হল ?"

"তাও ঠিক জানি না। কখনও জিজ্ঞেস করিনি।"

"কেন জিজ্ঞেস করিসনি ? তুই বড় হওয়ার আগে কাকাবাবু নিশ্চয়ই একা-একা অনেক অভিযানে গেছেন। সেই গল্পগুলো শুনিসনি ?"

"দু-একটা শুনেছি।"

"তা হলে এই পা ভাঙা নিয়েও নিশ্চয়ই কোনও গল্প আছে। তুই জিজ্ঞেস করতে না পারিস, আমি করব।"

"হ্যাঁ, কর না। কাকাবাবু তোকে খুব পছন্দ করেন।"

কাটলেট খাওয়া হয়ে গেছে। রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে জোজো ডান পাশে তাকাল। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক আইসক্রিমওয়ালা।

জোজো বলল, "কাটলেটের পর একখানা আইসক্রিম না খেলে কি জমে, বল ?"

সন্তু বলল, "চল, চল, আর আইসক্রিম খেতে হবে না। ওখানে যেতে দেরি হয়ে যাবে।"

জোজো অভিমানের ভান করে বলল, "সন্তু, আমি পয়সা আনিনি বলে তুই এরকম অবজ্ঞা করছিস ? একটা আইসক্রিম খেতে কতটা সময় লাগে ? আইসক্রিমের পয়সাটাও তোর কাছে আমার ধার থাকবে।"

সন্তু বলল, "এটা সত্যিই ধার। আমার হাতখরচ ফুরিয়ে যাচ্ছে।"

আইসক্রিম শেষ করে ওরা এসে পৌঁছল সাঁতার ক্লাবে। সেখানে বেশ ভিড়। কবিতা পাঠ শুরু হয়ে গেছে। একজন লম্বা চেহারার কবি উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করছেন।

ওরা দু'জনে বসল একেবারে পেছন দিকে। একটু পরেই জোজো ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে সন্তু, এরা আমাকে একটা কবিতা পড়তে দেবে ?"

সন্তু বলল, "না।"

জোজো বলল, "কেন দেবে না, আমিও কবিতা লিখি।"

সন্তু বলল, "কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় না। যে খেলে, সে-ও খেলোয়াড় নয়। যে গান গায়, সেই কি গায়ক ?"

জোজো ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলল, "তোর কথাটা সত্যি বটে, আবার সত্যিও নয়। এ-নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে।"

সন্তু বলল, "এখন তর্ক করতে হবে না। মন দিয়ে শোন।"

দু-তিনজনের কবিতা শোনার পরই জোজো বলল, "ওঠ, উঠে পড়। চল, এবার যাই !"

সন্তু বলল, "তোর ভাল লাগছে না ?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ ভাল লাগছে। সত্যি ভাল লাগছে। কিন্তু ভাল জিনিস বেশিক্ষণ শুনতে নেই। এর পর যদি খারাপ লাগে ?"

জোজো হাত ধরে টানাটানি করাতে সন্তুকে উঠে পড়তেই হল।

বাইরে এসে জোজো বলল, "চল, তোদের বাড়ি যাই। কাকাবাবুর অসুখ,

আমার একবারও দেখতে যাওয়া হয়নি।”

সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে জমেছে কালো মেঘ, মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু শব্দ। বেশ ঝড়-বৃষ্টি আসছে।

বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামার পর জোজো গলা নিচু করে বলল, “সন্তু, সন্তু, একজন স্পাই! তোদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।”

সন্তু তাকিয়ে দেখল, উলটো ফুটপাথে বেশ খানিকটা দূরে একজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আপনমনে।

সে বলল, “ধুত! তুই সব জায়গায় স্পাই দেখতে পাস। লোকটা নিশ্চয়ই কারও জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখার কী আছে?”

জোজো মাথা নাড়তে-নাড়তে বলতে লাগল, “উঁহুঃ, উঁহুঃ, আমি স্পাই দেখলেই চিনতে পারি।”

লোকটি এবার উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করল। সন্তুও জোজোকে নিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

মা জোজোকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, “জোজো অনেকদিন আসোনি। ভাল হয়েছে আজ এসেছ। আজ মাছের চপ বানিয়েছি, এক্ষুণি ভেজে দিচ্ছি।”

জোজো বলল, “আঃ মাসিমা, বাঁচালেন, কী খিদেটাই না পেয়েছে!”

সন্তু অবাক হয়ে তাকাতেই জোজো আবার বলল, “মনে হচ্ছে যেন কতদিন কিছু খাইনি।”

ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে জোজোর, সন্তু তাকে ধরে-ধরে তুলল। উঠতে-উঠতে জোজো বলল, “আমি পেটুক নই, জানিস তো! এক একদিন রাক্ষসের মতন খিদে পায়, আবার সাতদিন কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। একবার আমি অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে তিনদিন একফোঁটা জলও না খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছি।”

কাকাবাবুর ঘরের দরজা ভেজানো। কাকাবাবু বিরক্ত হয়ে বলে দিয়েছেন যে, আর কোনও লোককে তাঁর অসুখ দেখার জন্য তাঁর ঘরে আসতে দেওয়া হবে না। যারা এখনও আসছে, তাদের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে চা-টা খাইয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একগাদা ওষুধ খেয়ে-খেয়ে কাকাবাবুর শরীরটা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। বাইরের লোকের সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

জোজোর কথা অবশ্য আলাদা। তাকে দেখে কাকাবাবু খুশিই হলেন। হেসে বললেন, “এসো, এসো জোজো, অনেক দিন তোমার গল্প শোনা হয়নি।”

জোজো বলল, “কাকাবাবু, অনেকদিন কোথাও অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া হচ্ছে না!”

কাকাবাবু বললেন, "আমার তো শরীর ভাল নয়। তুমি আর সন্তু কোনও জায়গা থেকে ঘুরে এসো এই ছুটিতে। দ্যাখো, যদি কোনও অ্যাডভেঞ্চার হয়!"

সন্তু বলল, "জোজো, তোর হেলিকপ্টার থেকে লাফানোর গল্পটা কাকাবাবুকে শুনিয়ে দে!"

জোজো বলল, "ওটা এমন কিছু না।"

কাকাবাবু বললেন, "শুনব, শুনব। কিন্তু তার আগে সন্তু বল তো, কালকের ওই লোকটা কে ছিল? মনে একটা খটকা লেগে আছে। আমি চিনি না, আর কেউ চেনে না, অথচ ঘরের মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। আমাকে তুমি-তুমি করে উপদেশ দিয়ে গেল! লোকটার আর হদিস পেলি না?"

সন্তু বলল, "লোকটি তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটুখানি হাঁটবার পরই একটা গাড়িতে উঠে পড়ল। আর দেখতে পাইনি।"

কাকাবাবু একটু ধমকের সুরে বললেন, "শুধু এইটুকু দেখেছিস? আর কিছু দেখিসনি? এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু দেখা যায়। লোকটার হাঁটার ভঙ্গি কেমন ছিল? যে-গাড়িটায় উঠল, তার নম্বর কত?"

সন্তু লজ্জা পেয়ে গেল। গাড়িটার নম্বর দেখতে সে ভুলে গেছে। কালো রঙের গাড়ি তো অনেক আছে।

সন্তু বলল, "হাঁটার ভঙ্গিতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সোজা হয়ে হাঁটছিল। তবে বাঁ হাতটা কোটের পকেটে ঢোকানো ছিল, একবার-দু'বার মাত্র বার করেছিল, সেই হাতে একটা দস্তানা পরা।"

কাকাবাবু বললেন, "দস্তানা? কীরকম দস্তানা?"

সন্তু বলল, "খুব পাতলা রবারের। ডাক্তাররা যেমন পরে।"

কাকাবাবু বললেন, "একহাতে দস্তানা পরে থাকবে কেন? হয় ওই হাতে কোনও ঘা আছে কিংবা একটা-দুটো আঙুল কাটা। তা লুকোতে চায়।"

সন্তু বলল, "আর একটা ব্যাপার, গাড়িতে ওঠার পর লোকটি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল। পরে আমার মনে হয়েছে, ওর চোখের মধ্যে যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওর চোখে কালো চশমা ছিল, তুই কী করে বুঝলি, কটমট করে তাকিয়েছে?"

সন্তু বলল, "তখন চশমা খুলে ফেলেছিল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে..."

কাকাবাবু বললেন, "আর-একটু ভেবে দ্যাখ, কেন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল?"

সন্তু বলল, "কয়েক সেকেন্ডের তো ব্যাপার, গাড়িটা হুশ করে চলে গেল, তার মধ্যেই লোকটা... কাকাবাবু, মনে পড়েছে, ওর দুটো চোখ দু'রকম!"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে ? দু'চোখের রং আলাদা ?"

সন্তু বলল, "তা দেখিনি। অত তাড়াতাড়ি কি রং বোঝা যায় ? তবু এটা আমার ধারণা, দু'চোখের দৃষ্টি একরকম নয় !"

জোজো জানলার ধার থেকে বলে উঠল, "একটা চোখ পাথরের হতে পারে !"

কাকাবাবু জোজোর দিকে প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললেন, "এটা তো জোজো ঠিক বলেছে। একটা চোখ পাথরের হলে... সেইজন্যই লোকটা ঘরের মধ্যেও কালো চশমা পরে ছিল। কিন্তু... কিন্তু, পাথরের চোখওয়ালা কোনও লোক, এক চোখ কানা, এরকম কোনও লোককেও তো আমি চিনি না ! অবশ্য, পাথরের চোখ হলেই যে সে খারাপ লোক হবে, তার কোনও মানে নেই !"

বাইরের দিকে তাকিয়ে জোজো বলল, "সেই লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "সেই লোকটা মানে কোন লোকটা ? তাকে তো জোজো দেখেনি।"

সন্তু বলল, "জোজোর ধারণা একজন স্পাই আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।"

কাকাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, "আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখার কী আছে ? এটা এমন কিছু আহামরি বাড়ি নয় !"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

কাকাবাবু বললেন, "কী ? তোমার আবার অনুমতি লাগে নাকি ?"

জোজো বলল, "আপনার একটা পা খোঁড়া হয়ে গেল কী করে ? কেউ কি পায়ে গুলি করেছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "ও, এই কথা। না, কেউ গুলি করেনি। প্রায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলতে পারো। একবার আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম একটা কাজে, এক জায়গায় গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলাম পাহাড় থেকে। অনেক চিকিৎসাতেও সারেনি।"

জোজো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "শুধু এইটুকু বললে চলবে না। ঠিক কী হয়েছিল, কেন পাহাড় থেকে পড়ে গেলেন, সবটা শুনতে চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "পুরো কাহিনীটা তোমাকে শোনাতে হবে ? তাতে যে অনেকটা সময় লাগবে। ঘটনাটা আমি কাউকে সাধারণত বলি না।"

জোজো জোর দিয়ে বলল, "আমাদের বলুন। সময় লাগুক না !"

কাকাবাবু এতক্ষণ বসে ছিলেন। এবার বালিশে মাথা হেলান দিলেন। তারপর বললেন, "আফগানিস্তান দেশটা এক সময় কী সুন্দর ছিল। মানুষগুলো লম্বা-চওড়া, কিন্তু ভারী সরল। ওরা যদি কারও বন্ধু হয়, তবে সেই বন্ধুর জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে। আবার কেউ যদি শত্রু হয়, তবে দারুণ নিষ্ঠুরভাবে

তাকে খুন করতেও ওদের হাত কাঁপে না। কোনও কাবুলিওয়ালার সঙ্গে আমার শত্রুতা হয়নি, বরং বন্ধু হয়েছিল অনেক।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ওখানে আপনি কত বছর আগে গিয়েছিলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "দশ বছর, না, না, এগারো। তখন তোমরা খুব ছোট ছিলে। এখন ওদেশটায় খালি মারামারি চলছে, অন্য দু-একটা দেশ গোলমাল পাকাচ্ছে। এখন তো আর যাওয়াই যায় না। আমার আর-একবার খুব যেতে ইচ্ছে করে।"

এই সময় রঘু থালাভর্তি গরম-গরম মাছের চপ নিয়ে এল।

একটা কাগজের প্লেটে দুটো চপ তুলে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "মা আপনাকে আগে খেয়ে নিতে বলেছেন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই তো বলবেন, খাব না !"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলে দুটো ? পারব না, একটা দে।"

রঘু বলল, "বেশি বড় নয়, দুটোই খান !"

এত ওষুধের জন্য কাকাবাবুর মুখে রুচি নেই, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। মা তাই প্রত্যেকদিন কাকাবাবুর জন্য নতুন-নতুন খাবার তৈরি করছেন।

জোজো দু'হাতে দুটো চপ তুলে নিয়ে একটায় কামড় দিয়ে বলল, "গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড, দারুণ ! আগে খেয়ে নিই, তারপর আফগানিস্তানের গল্পটা শুনব।"

সন্তু একটা চপ নিয়ে জানলার কাছে চলে এল। পুরনো আমলের বাড়ি, জানলায় গ্রিল নেই, ফাঁক-ফাঁক লোহার শিক। শুধু এই জানলার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় ছবি তুললে মনে হবে, জেলখানার গরাদের মধ্যে কয়েদি !

সন্তু জোজোর সেই 'স্পাই'-কে দেখার চেষ্টা করল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা সত্যিই ফিরে এসেছে, আস্তে-আস্তে পায়চারি করছে। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা।

হঠাৎ একটা কালো রঙের গাড়ি এসে থামল। জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত। সেই হাতে একটা বন্দুক। সাধারণ বন্দুকের মতন লম্বা নয়, বেশ বেঁটে, নলটা অনেকটা মোটা। ঠিক গুলির শব্দের মতন নয়, চাপা ধরনের দুপ-দুপ শব্দ হল দু'বার।

কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। গাড়ির জানলায় বন্দুকসুদ্ধু হাতটা দেখেই সন্তু মাথা নিচু করে বসে পড়েছে মাটিতে, চেঁচিয়ে উঠল, "সাবধান !"

সঙ্গে-সঙ্গে একটা কিছু ঠং করে জানলার শিকে লেগে পড়ে গেল রাস্তার দিকে, আর-একটা এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। সেটা গুলি নয়, একটা ছোট টিনের কৌটোর মতন, তার থেকে ভস-ভস করে বেরোতে লাগল ধোঁয়া।

কাকাবাবু বিদ্যুদ্বেগে নেমে এলেন খাট থেকে। একহাতে নিজের নাক টিপে ধরে তুলে নিলেন কৌটোটা।

লাফাতে-লাফাতে চলে গেলেন বাথরুমে। সেখানে এক বালতি জল ছিল,

তার মধ্যে কৌটোটা ডুবিয়ে দিলেন।

যেটুকু গ্যাস বেরিয়েছে, তাতেই মাথা ঝিমঝিম করছে সন্তুর। জোজো ঢলে পড়েছে মাটিতে।

অজ্ঞান হওয়ার ঠিক আগে সন্তু শুনতে পেল, বাইরের রাস্তায় গুড়ুম-গুড়ুম করে শব্দ হল দু'বার। এবারে সত্যিকারের রিভলভারের গুলি ছোড়ার শব্দ।

তারপরই একজন মানুষের আর্ত চিৎকার।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালে অনেকখানি জানা গেল ঘটনাটা।

বিষাক্ত ধোঁয়ায় সন্তু আর জোজো জ্ঞান হারালেও কাকাবাবু ঠিক ছিলেন। তিনি ওদের চোখে-মুখে জলের ছিটে দেওয়ায় একটু পরেই জ্ঞান ফিরেছিল। তারপর রাত্রে আর কিছু ঘটেনি। রাস্তায় গুলিটুলি চললেও কারও কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। জোজোকে আর রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেওয়া হয়নি, সে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল।

সকালবেলাতেই নরেন্দ্র ভার্মা এসে হাজির। যত বড় ঘটনাই ঘটুক, তবু তাঁর হালকা ইয়ার্কির সুরে কথা বলা স্বভাব। তাঁর পোশাকও সবসময় নিখুঁত, ভাঁজটাজ লাগে না। মেরুন রঙের সুট তাঁর বেশি পছন্দ।

তিনি এসে কাকাবাবুকে বললেন, "আঃ রাজা, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। তোমার জন্য কি কলকাতার লোক শান্তিতে থাকতে পারবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আবার কলকাতার লোকের কাছে কী দোষ করলাম ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার বাড়ির সামনে গোলাগুলি চলে, তাতে পাড়ার লোকের ঘুম নষ্ট হয় না ? একগাদা শত্রু তৈরি করে রেখেছ, কে যে কখন তোমাকে মারতে আসবে, তার কি কোনও ঠিক আছে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কাল কারা এসে হামলা করল, তুমি কিছু জানো ?"

"কী করে জানব, আমি কি তখন উপস্থিত ছিলাম ! নাগাল্যান্ড থেকে ফিরেছি অনেক রাতে। তখনই খবর পেলাম।"

"কী করে তুমি অত রাতে খবর পেলে ? কে খবর দিল ?"

"পুলিশ খবর দিয়েছে। তোমার অসুখ দেখেই আমার আশঙ্কা হয়েছিল, এবার তোমার ওপর একটা অ্যাটেমপ্ট হতে পারে। সুস্থ অবস্থায় তোমার শত্রুরা তোমাকে কব্জা করতে পারে না। তুমি দুর্বল হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলে তোমাকে মারবার চেষ্টা করবে। সেইজন্যই তোমার বাড়ির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার জন্য আমি পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম। কাল

রাতে দুটোর সময় এসে এই রাস্তাটা আমি একবার দেখেও গেছি।"

সন্তু জোজোর দিকে তাকাল। জোজো যাকে স্পাই ভেবেছিল, সে আসলে পুলিশের লোক!

নরেন্দ্র ভার্মা আবার বললেন, "তোমার ঘরের মধ্যে দুটো গ্যাস বোমা ছুড়ে চলে গেল। একটা বোমা তাও ঘরের মধ্যে পড়েনি, শিকে লেগে বাইরে পড়েছে। যদি দুটোই ঘরের মধ্যে এসে পড়ত, আর পাঁচ-সাত মিনিট গ্যাস বেরোত, তা হলে তোমরা তিনজনেই বাঁচতে না!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ওপর কার যে এত রাগ তা তো বুঝতে পারছি না। আমি তো কয়েক মাস ধরেই চুপচাপ বসে আছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "পুরনো শত্রুরা প্রতিশোধের জন্য পাগল হতে পারে না? তোমার দোষ কি জানো রাজা, তুমি সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক লোকগুলোকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দাও, ক্ষমা করে দাও। কিছুতেই তোমার শিক্ষা হয় না!"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "তবু দেখলে তো, আমাকে মারা সহজ নয়!"

নরেন্দ্র ভার্মাও হাসতে-হাসতে বললেন, "একবার-না-একবার ঠিক ঘায়েল হয়ে যাবে, এই আমি বলে দিচ্ছি!"

সন্তু বলল, "নরেন্দ্রকাকা, কাল রাস্তায় কেউ কি রিভলভারের গুলি ছুড়েছিল? আমি শব্দ শুনেছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমাদের পুলিশের লোকটি ছুড়েছিল। একজনের গায়েও লেগেছে। কিন্তু কালো গাড়িটাকে আটকাতে পারেনি। আহত লোকটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। গাড়ির নাম্বারটা নোট করেছিল সেই পুলিশ, কিন্তু বুঝতেই পারছ, সেটা ফল্‌স। চেক করে দেখা গেছে, ওই নাম্বারে কোনও গাড়ি নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "গ্যাস বোমা। আইডিয়াটা নতুন। ছাত্র বয়েসে আমরা দেখেছি, পুলিশে টিয়ার গ্যাস বোমা ছুড়ত। দারুণ চোখ জ্বালা করত তাতে। আমি প্রথমে সেরকমই ভেবেছিলাম।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, আগেকার দিনে লোকে অসুখে পড়ার পর চেইঞ্জে যেত মনে আছে? হাওয়া বদলালে উপকার হয়। কলকাতার হাওয়া ছেড়ে তুমি কিছুদিন অন্য জায়গার হাওয়া খেয়ে এসো বরং। এ-বাড়িতে আবার হামলা হলে তোমার দাদা-বউদিও বিপদে পড়তে পারেন!"

কাকাবাবু বললেন, "কে আমাকে মারার চেষ্টা করছে সেটা বুঝতে পারলে তাকে ধরে ফেলা শক্ত হত না। যাই হোক, এখন কিছুদিন এ-বাড়ি থেকে দূরে থাকাই ভাল। জানো তো নরেন্দ্র, আমি আমার দাদাকে অনেকবার বলেছি, আমার জন্য যাতে তোমাদের বিপদে না পড়তে হয়, সেইজন্য আমার অন্য

বাড়িতে থাকা উচিত। সল্ট লেকে একটা বাড়ি ঠিকও করেছিলাম। দাদা কিছুতেই যেতে দিলেন না। বউদিরও খুব আপত্তি।"

সন্তু বলল, "আমারও।"

নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে বললেন, "সন্তু মাস্টার, এখন তো কলেজে সামার ভ্যাকেশন। তোমার কাকাকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো। জোজো, তুমিও যাবে নাকি ?"

জোজো বলল, "বাবার সঙ্গে আমার হাওয়াই যাওয়ার কথা আছে। সেখান থেকে তাহিতি দ্বীপে। সামনের সোমবারই স্টার্ট করার কথা।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরে বাবা, আমরা তো অতদূরে যেতে পারব না। কাছাকাছি কোনও জায়গা ঠিক করা যাক।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "পুরীতে যেতে পারো। সমুদ্রের ধারে। আর যদি পাহাড় যেতে চাও, কালিম্পং-এ ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিংবা দিল্লি কিংবা বম্বে (থুড়ি মুম্বই) তো যাওয়ার ইচ্ছে হয়, আমার মতে দিল্লিতে যাওয়াটাই ভাল, আমি কাছাকাছি থাকব।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "সাতনা ! মধ্যপ্রদেশে সাতনা নামে একটা জায়গা আছে জানো ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "জানব না কেন ? খাজুরাহো যাওয়ার রাস্তায় পড়ে। তুমি সেখানে যেতে চাও ? মধ্যপ্রদেশে তো এখন খুব গরম।"

কাকাবাবু বললেন, "গরমে আমার কিছু আসে যায় না। কলকাতা কি কম গরম নাকি ? দিল্লি আরও গরম। নরেন্দ্র, তোমার কামালুদ্দিন হোসেনকে মনে আছে ? আমরা যাকে কামাল আতাতুর্ক বলে ডাকতাম ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, মনে আছে। তোমার সঙ্গে আফগানিস্তানে গিয়েছিল। ওর আর-একটা নাম ছিল কাটমিনস্কি। অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে কাটমিনস্কি ছিল, যে-কোনও সময়ে যে-কোনও জিনিস চাইলে যে জোগাড় করে আনত, আমাদের কামালুদ্দিনেরও সেই গুণ ছিল। সে বুঝি এখন সাতনায় থাকে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেইরকমই তো জানি। ওখানে কামাল ব্যবসা করে। অনেকদিন যোগাযোগ নেই। ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সাতনায় একটা ভাল হোটেল আছে। ডাক বাংলো বা গেস্ট হাউসেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "হোটেলের চেয়ে আলাদা গেস্ট হাউসই ভাল। সন্তু, তোকে খাজুরাহোর মন্দিরও দেখিয়ে আনব।"

জোজো বলে উঠল, "তা হলে আমি আর হাওয়াই-তাহিতি দ্বীপে যাব না। আমিও সাতনায় যেতে চাই।"

সন্তু বলল, "সে কী রে ? শুনেছি হাওয়াই অতি চমৎকার জায়গা।"

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "ওসব জায়গায় আমি যে-কোনও সময় যেতে পারি। এবার তোদের সঙ্গে বরং খাজুরাহো মন্দির দেখে আসি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা হলে ওই ঠিক হল। কালই ভোরবেলায় যাত্রা শুরু। আজ রাতটা সাবধানে থাকবে। আজ অবশ্য একগাড়ি ভর্তি পুলিশ পাহারা দেবে এই বাড়ি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি যে নাগাল্যান্ডে গিয়েছিলে, সেখানে কী হল?"

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওখানে সীমান্তের ওপার থেকে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র চালান করছে একটা দল। সেই গ্যাংটাকে ধরার কথা ছিল। কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাওয়া গেল না, তাই সুবিধে হল না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে নিয়ে গেলে কী সুবিধে হত? আমি অস্ত্র চালানটালান ব্যাপারে কিছুই জানি না।"

নরেন্দ্র ভার্মার ঠোঁটের কোণে একটু ঝিলিক দিয়ে গেল। তিনি বললেন, "কী সুবিধে হত জানো? একফোঁটা মধু ফেললে যেমন অনেক মাছি উড়ে আসে, সেইরকম তুমি যেখানেই যাও, সেখানকার দুর্বৃত্তদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তোমাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তোমাকে মারতে এলে আগে থেকে ফাঁদ পেতে তাদের সবক'টাকে জালে ফেলা যায়। তুমি গেলে না, তাই তারাও দূরে-দূরে রইল।"

কাকাবাবু তেড়ে উঠে বললেন, "ও, তার মানে আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করো তোমরা? আমার প্রাণের কোনও দাম নেই তোমাদের কাছে?"

নরেন্দ্র ভার্মা একটু সরে গিয়ে জোরে-জোরে হাসতে-হাসতে বললেন, "দেশের উপকারের জন্য প্রাণ দেবে, এটা তো পুণ্য কাজ!"

কাকাবাবু বললেন, "মোটেই আমার প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছে নেই। তোমাদের কাজে আর কোথাও যাব না!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কাল ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সবাই রেডি থাকবে।"

পরদিন হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপার বদলে ওরা একটা গাড়িতে রওনা হল খড়্গপুরের দিকে। সাবধানের মার নেই। ট্রেন ধরা হবে খড়্গপুর থেকে।

গাড়ি যখন বিদ্যাসাগর সেতু পার হচ্ছে, তখন জোজো বলল, "কাকাবাবু, সেদিন আর আফগানিস্তানের গল্পটা শেষ হল না। এখন বলুন।"

কাকাবাবু বললে, "সাতনায় গিয়ে বলব। সেইজন্যই তো কামালের কথা মনে পড়ল। সে আমার সঙ্গে ছিল। সব কথা নিজের মুখে বলা যায় না। কিছুটা কামালের কাছ থেকে শুনবে। আমরা দু'জনে একসময় সহকর্মী ছিলাম। কামালকে তোমাদের ভাল লাগবে।"

দুপুরের আগেই পৌঁছে যাওয়া গেল খড়্গপুরে। সেখানে লাঞ্চ খাওয়া হল। পুলিশের এস. পি. সাহেবের বাংলোতে। নরেন্দ্র ভার্মা সব ব্যবস্থা করে

দিয়েছেন, কিন্তু নিজে আসেননি। তিনি ব্যস্ত মানুষ, দিল্লি ফিরে গেছেন।

বিকেলবেলা ট্রেনে ওঠার সময় জোজো যথারীতি একজন স্পাইকে দেখে ফেলেছে।

কাকাবাবু বললেন, "বলা যায় না। স্পাইয়ের ব্যাপারে জোজো এক্সপার্ট। সন্তু, নজর রাখিস। আমি ট্রেনে বই পড়ব, আর ঘুমোব।"

ওদের টিকিট হয়েছে একটা ফার্স্ট ক্লাস বগিতে। একটা কিউবিক্‌ল-এ চারটে বার্থের মধ্যে তিনটি ওদের তিনজনের, অন্য বার্থটিতে একজন মহিলা। মাঝবয়েসী মহিলাটি কেমন যেন গোমড়ামুখো, একটা পত্রিকা খুলে পড়তে লাগলেন। ট্রেন ছাড়ার একটু পরেই তিনি উঠে গেলেন বাইরে, তারপর একজন টাকমাথা বেঁটে লোক এসে সেখানে বসে চেয়ে রইল জানলার বাইরে।

সেই লোকটিও মিনিটপাঁচেক পরে ধড়মড়িয়ে উঠে চলে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকল একজন দাড়িওয়ালা লম্বা লোক। লোকটি বেশ ট্যারা। এই লোকটিকে দরজার কাছে দেখেই ট্রেনে ওঠার সময় জোজো স্পাই বলে শনাক্ত করেছিল।

জোজো সন্তুর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

কাকাবাবু ওপরের বাঙ্কে শুয়ে বই পড়তে-পড়তেও এইসব লোকজনদের আসা-যাওয়া লক্ষ করছেন।

ট্যারা লোকটি প্যান্ট ও হাফশার্ট পরা, বসে পড়েই পা দোলাতে লাগল জোরে-জোরে। উলটো দিকেই সন্তু ও জোজো পাশাপাশি। লোকটি ওদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কোনও কথা বলছে না। অথচ কিছু যেন বলতে চায়।

সন্তু নিয়ে এসেছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনাবলী। 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন'-এর মতন পুরনো লেখাগুলো তার আবার পড়তে ইচ্ছে করে। মাঝে-মাঝে হাসি পায়। জোজো তাকে পড়তে দিচ্ছে না, মাঝে-মাঝেই হাঁটুতে ধাক্কা মারছে।

ট্যারা লোকটি একসময় সন্তুর দিকে চেয়ে বলে উঠল, "ইয়ে, তোমরা ভাই কতদূর যাবে ?"

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো ফস করে বলে দিল, "কন্যাকুমারিকা !"

ওপরের বাঙ্কে কাকাবাবু খুক করে একটু হেসে ফেললেন। জোজো তার স্পাইটিকে ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত দৌড় করাতে চায়। এই ট্রেন যাবে মোটে জব্বলপুর পর্যন্ত।

লোকটি খানিকটা অবাক হয়ে বলল, "এই ট্রেন কি অতদূর যাবে ?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "মাঝপথে নামতে হবে, আমাদের কাজ আছে।"

এই লোকটিও উঠে চলে গেল বাইরে।

জোজো বলল, "দেখলি, দেখলি, সন্তু, আমাদের কাছ থেকে খবর জেনে

নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কেমন গুলিয়ে দিলাম।"

ওপর থেকে কাকাবাবু বললেন, "তোমরাও লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে না কেন, আপনি কতদূর যাবেন ? সেটাই ভদ্রতা।"

জোজো বলল, "সেটা সন্তুর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আমি ডিফেন্সে খেলি।"

আরও একজন লোক এল এর পর। কোঁচানো ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, মাথার চুল ঢেউখেলানো, নাকের নীচে সরু তলোয়ারের মতন গোঁফ। গায়ের রং ফরসা, গুনগুন করে গান গাইছে।

এই লোকটি বেশ হাসিখুশি ধরনের। বসে পড়েই বলল, "নমস্কার। আমাদের দলের মোট ন'খানা টিকিট, তার মধ্যে একখানা আপনাদের এখানে। এই সিটে কে বসবে তা ঠিক করতে পারছে না। আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে না তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, বসুন না ! আপনাদের যাত্রাপার্টি বুঝি ?"

লোকটি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বাগদেবী অপেরা। জব্বলপুরে পাঁচটা শো আছে।"

সন্তু আর জোজো দু'জনেই অবাক হল। "কাকাবাবু কী করে বুঝতে পারলেন ?"

কাকাবাবু লোকটিকে বললেন, "আপনি যে গানটি গাইছিলেন, সেটা 'কদমতলায় কে এসেছে হাতেতে তার মোহন বাঁশি' তাই না ? ছেলেবেলায় আমি খুব যাত্রা শুনতাম। এখন কি আর এইসব পুরনো পালা চলে ?"

লোকটি বলল, "এখন লোকে আবার আগেকার অনেক পালা দেখতে চাইছে। নতুনগুলো একঘেয়ে হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই বুঝি হিরো ? আপনার নাম কী ?"

লোকটি হেঁ-হেঁ করে হেসে বলল, "আমার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম যাদুগোপাল চক্রবর্তী, কিন্তু এ-লাইনে ওরকম নাম চলে না। তাই ডালিমকুমার নাম নিয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "ডালিমবাবু, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব খুশি হলাম। আপনি নামকরা লোক। আপনি ওই গানটা ভাল করে শোনান না !"

ডালিমকুমার দু'হাত নেড়ে মেজাজে গান ধরলেন। কাকাবাবুও খুব তারিফ করতে লাগলেন হাততালি দিয়ে-দিয়ে। সন্তু আর জোজোর মোটেই ভাল লাগল না। কেমন যেন নাকি-নাকি সুর।

গানটা হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়ে ডালিমকুমার বললেন, "এ-লাইনের ট্রেনে প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে, রাত্তিরবেলা সাবধানে থাকতে হবে।"

সন্তু বলল, "ট্রেনে ডাকাতির কথা খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে পড়ি। আমরা যতবার ট্রেনে চেপেছি, কখনও দেখিনি।"

http://banglaebooksclassics.blogspot.co

জোজো বলল, "বাঃ, আরাকু ভ্যালি যাওয়ার সময় কী হয়েছিল মনে নেই ?"

সন্তু বলল, "সে তো অন্য ব্যাপার। ডাকাতরা কি মানুষ ধরে নিয়ে যায় নাকি ?"

জোজো বলল, "একবার বাবার সঙ্গে রাজস্থানে যাচ্ছিলাম, ট্রেনটার নাম প্যালেস অন হুইল্‌স, গোটা দশেক দুর্দান্ত ডাকাত ঘোড়া ছুটিয়ে ট্রেনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে-যেতে গুলি ছুড়তে লাগল ..."

ডালিমকুমার চোখ বড়-বড় করে গল্পটা শুনে বললেন, "ঠিক সিনেমার মতন !"

তারপর বললেন, "যদি সত্যি ডাকাত পড়ে, তা হলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না ভাই। ঘড়ি, টাকা-পয়সা যা আছে দিয়ে দেওয়াই ভাল। নইলে প্রাণটা যাবে। এরা বড় নিষ্ঠুর, পট করে পেটে ছোরা বসিয়ে দেয়! আমার হাতে যে পাঁচটা আংটি দেখছ, এর একটাও সোনার নয়, সব গিল্টি করা। পকেটে থাকে মোটে একশো টাকা।"

কাকাবাবু বললেন, "দরজা ভাল করে লক করে দিলেই তো হয়। তা হলে আর ডাকাত ঢুকবে কী করে !"

ডালিমকুমার তক্ষুনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু খানিক বাদেই কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল বাইরে থেকে।

ডালিমকুমার ভয়-ভয় চোখে বললেন, "খুলব ?"

কাকাবাবু বললেন, "মোটে তো আটটা বাজে। দেখুন বোধ হয় আপনারই দলের লোক। তা ছাড়া খাবার দিতেও তো আসবে।"

ডালিমকুমার জিজ্ঞেস করলেন, "কে ?"

বাইরে থেকে উত্তর এল, "খুলুন, টিকিট চেকার !"

এবার ডালিমকুমার উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতেই তাঁকে ধাক্কা দিয়ে একজন ভেতরে ঢুকে এল। পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়েস হবে, খাকি প্যান্ট আর শার্ট পরা, মুখে একটা রুমাল বাঁধা। এক হাতে পাইপগান, অন্য হাতে একটা চটের থলে।

ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় সে বলল, "সব চুপ ! ট্যাঁ-ফোঁ করলে জানে মেরে দেব, কার কাছে টাকাকড়ি কী আছে ছাড়ো। ঘড়ি, টাকা-পয়সা সব এই থলিতে দাও !"

ডালিমকুমার সিঁটিয়ে গিয়ে বললেন, "দিচ্ছি ! দিচ্ছি !"

বাঙ্কের ওপর থেকে কাকাবাবু বললেন, "আরে, সত্যি-সত্যি ডাকাত এসে গেল। ও মশাই, আপনার কথা মিলে গেল যে !"

ডাকাতটি পাইপগানটা কাকাবাবুর দিকে উঁচিয়ে বলল, "অ্যাই বুড়ো, চুপ করে থাক। নো স্পিকিং। মানিব্যাগ বার কর, চটপট, চটপট।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছে তো টাকা রাখি না। ওই ছেলেটির কাছে

আছে। কী রে সন্তু, টাকা-পয়সা সব দিয়ে দিবি নাকি ?"

সন্তু বিরক্ত মুখ করে বলল, "তা হলে তো আবার সুটকেস খুলতে হবে !"

ডাকাতটি জোজো আর ডালিমকুমারের দিকে ঘুরে তাকাল। ডাকাতরা বড়দের সঙ্গেও তুই-তুই করে কথা বলে। সে ডালিমকুমারকে বলল, "আংটিগুলো খোল, টাকা বার কর।"

জোজো শুকনো মুখে বলল, "আমার কাছে একটা ডট পেন ছাড়া কিছু নেই !"

ডালিমকুমার পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে ছুড়ে দিলেন ডাকাতের থলির মধ্যে, তারপর আংটিগুলো খুলতে লাগলেন।

সন্তু নিচু হয়ে সিটের তলা থেকে সুটকেসটা বার করছে, ডাকাতটা তার পেছনে এক লাথি কষিয়ে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, "দেরি করছিস কেন ?"

স্প্রিংয়ের মতন পেছন দিকে ঘুরে সন্তু ডাকাতটার পা ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিল। সে দড়াম করে পড়ে একদিকের সিটে। সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে সে পাইপগানটা তোলার চেষ্টা করল সন্তুর দিকে। সন্তু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, সে প্রায় শূন্যে লাফিয়ে উঠে একপায়ে লাথি কষাল ডাকাতটির গলায়।

সন্তু এখন ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গো। সে আকাশে উড়তে পারে। মনে-মনে বলছে, "বিলিবিলি খান্ডা গুলু !"

ডাকাতটির হাত থেকে পাইপগানটা খসে গেছে, সন্তু তাকে ঠেসে ধরেছে একদিকের দেওয়ালে।

আর একটি ডাকাত মস্তবড় একটা ছোরা নিয়ে ঢুকে পড়ল। সে এমনভাবে তেড়ে গেল, যেন ছোরাটা এক্ষুনি বসিয়ে দেবে সন্তুর পিঠে।

কাকাবাবু ওপরের বাঙ্ক থেকে একটা ক্রাচ দিয়ে বেশ জোরে মারলেন দ্বিতীয় ডাকাতটির ঘাড়ে। সে আর্ত শব্দ করে বসে পড়ল মেঝেতে।

কাকাবাবু উৎফুল্লভাবে বললেন, "আর আছে নাকি ? আমাকে নামতে হবে ?"

পাশের কিউবিক্‌ল-এ চ্যাঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, সেখানেও ডাকাত পড়েছে। জোজো এবার লাফিয়ে গিয়ে চেনটা ধরে ঝুলে পড়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, "ডাকাত, ডাকাত !"

সন্তু প্রথম ডাকাতটির হাত থেকে পাইপগান কেড়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় ডাকাতটির হাতে ছোরাটা এখনও আছে। সে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, "এই যে দেখে নাও, আমার হাতে এটা কী রয়েছে।"

কাকাবাবুর রিভলভারটা ঠিক তার কপালের দিকে তাক করা।

সে একলাফে চলে গেল দরজার বাইরে। ট্রেনটা ছুটছে অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে, চেন টানার জন্য তার গতি কমে এল।

অন্য ডাকাতটা টপাটপ লাফিয়ে পড়ে পালালেও সন্তু যাকে ধরে আছে, সে পালাতে পারল না। সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এখন কী করব, একে ছেড়ে দেব ?"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "না, ধরে থাক, ওকে পুলিশে দিতে হবে। এই বেকার ছেলেগুলো মনে করে একটা পাইপগান আর দু-একটা ছোরাছুরি জোটালেই রেলের নিরীহ যাত্রীদের টাকা-পয়সা লুট করা যায়। এদের ধরে আচ্ছা করে মার দেওয়া দরকার। তারপর কিছুদিন জেলের ঘানি ঘোরালে উচিত শিক্ষা হবে !"

তারপর মুচকি হেসে বললেন, "ওহে, তোমাকে যদি আমি একটা চাকরি দিই, তা হলে সৎপথে থাকবে ?"

ছেলেটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "সার, আমাকে পুলিশের হাতে দেবেন না। আপনি নিজে শাস্তি দিন। আপনি যে কাজ দেবেন, তা-ই করতে রাজি আছি।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ-উ-উ ! অমনই অন্যরকম সুর বেরিয়েছে। আগে আমাকে বলেছিলে বুড়ো, তুই, আর এখন বলছ সার, আপনি ! ধরা পড়লেই দয়াভিক্ষা। কিন্তু নিজেরা কাউকে দয়া করো না !"

ট্রেনটা থেমে গেছে, শোনা যাচ্ছে হুইস্‌লের শব্দ, কারা যেন ছুটে আসছে এদিকে।

ডাকাতটি হাতজোড় করে বলল, "বাঁচান সার, মা-কালীর দিব্যি করে বলছি, আর কক্ষনও এ-কাজ করব না। আপনি যদি চাকরি দেন, আপনার পায়ে পড়ে থাকব—"

কাকাবাবু বললেন, "চটপট সিটের তলায় শুয়ে পড়ো। সাবধান, পুলিশ যেন টের না পায়। সন্তু, ওর পাইপগানটা জানলা দিয়ে ফেলে দে !"

॥ ৪ ॥

একটু পরেই সমস্ত বগি জুড়ে শোনা গেল পুলিশের বুটের আওয়াজ। গার্ডসাহেব হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। অনেক যাত্রী একসঙ্গে উত্তেজিতভাবে ডাকাতদের বিবরণ দিতে লাগল, কারও কথাই ঠিকমতন বোঝা যায় না।

দু'জন পুলিশ যখন এই কিউবিক্‌ল-এ উঁকি মারল, কাকাবাবু তখন ঘুমের ভান করে রয়েছেন, সন্তু আর জোজো বই খুলে বসে আছে, ডালিমকুমার আংটিগুলো আবার আঙুলে পরে ফেলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছেন।

পুলিশরা জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের কিছু খোয়া গেছে ?"

জোজো আর ডালিমকুমার বলে উঠলেন, "না, না কিচ্ছু না !"

পুলিশরা আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের এখানে কেউ ঢোকেনি ?"

জোজো বলল, "কেউ না। আমরা কিছু টের পাইনি। বাইরে চেঁচামেচি শুনেছি। কী হয়েছিল বলুন তো ?"

উত্তর না দিয়ে পুলিশরা চলে গেল। একজনকেও ধরতে পারেনি বলে তারা বেশ নিরাশ হয়েছে। ডাকাত ধরতে পারলে পুলিশদের বেশ লাভ হয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার চলতে শুরু করল ট্রেন। কাকাবাবু উঠে বসে বললেন, "যাক বাঁচা গেল, আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হল না। সন্তু, এবার দরজা বন্ধ করে দে, আর ছেলেটাকে বেরিয়ে আসতে বল। ওখানে ওর দমবন্ধ হয়ে যাবে।"

ডাকাত ছেলেটি মুখের রুমালটা খুলে ফেলেছে, এখন আর তাকে ডাকাত মনে হয় না, মনে হয় সাধারণ একটি যুবক। তেমন লম্বা-চওড়া নয়, দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথার চুল অবশ্য খুব বড়-বড়। থুতনিতে একটা কাটা দাগ। সন্তুদের পাশে সে বসল।

ডালিমকুমার বললেন, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনার এই ভাইপোটি তো খুব সাঙ্ঘাতিক ছেলে। জুডো ক্যারাটে-ফ্যারাটে সব জানে। জাপানিদের কাছে শিখেছে নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, নিজে-নিজেই শিখেছে। বইটই পড়ে প্র্যাকটিস করেছে। ওর ভরসাতেই তো আমি বাইরে বেরোই !"

জোজো বলল, "আর আমি কীরকম চেন টেনে দিলাম ! পুলিশ ডাকলাম !"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, জোজোর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। এ তো সামান্য ছিঁচকে ডাকাত, জোজো অনেকবার অনেক বড়-বড় বিপদ থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আচ্ছা ডালিমবাবু, আপনাদের যাত্রায় তো অনেক মারামারির দৃশ্য থাকে। হিরো হিসেবে আপনাকে ফাইট করতে হয়। আপনি তলোয়ার খেলা, ঘুসোঘুসি, বন্দুক চালানো এসব জানেন ?"

ডালিমকুমার লাজুকভাবে হেসে বললেন, "অত কী আর জানতে হয় ! পেছন থেকে বাজনা আর আলো দিয়ে ম্যানেজ করে দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "ইংরিজি সিনেমায় যারা পার্ট করে, তারা কিন্তু ওসব শিখে নেয়।"

ডাকাত ছেলেটির দিকে চেয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ও হে, তোমার নাম কী ?"

ছেলেটি বলল, "অংশুমালী দাস। ডাকনাম হেবো।"

কাকাবাবু বললেন, "খবরের কাগজে যত ছোটখাটো চোর-ডাকাতদের নাম দেখি, সব এইরকম, হেবো, কেলো, ল্যাংচা, ভোঁদড়, পচা—সবার এইরকম বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি নাম হয় কেন ?"

ডালিমকুমার বললেন, "ঠিক বলেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "কিংবা এইরকম বিচ্ছিরি নাম বাপ-মা দেয় বলেই কি এরা চোর-ডাকাত হয় ? অংশুমালী তো সুন্দর নাম, তার ডাকনাম হেবো কেন হবে ? ওহে অংশু, পুলিশ তো চলে গেছে, তুমি এবার পালাবার চেষ্টা করবে ?"

অংশু বলল, "আজ্ঞে না সার, আপনি যা বলেন তাই শুনব !"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কি একটা পাইপগান সম্বল করেই ডাকাতি করতে বেরিয়েছ ? আমার ভাইপো সন্তু তোমার চেয়ে বয়েসে কত ছোট, তার সঙ্গে গায়ের জোরে পারলে না ? কুস্তি-জুডো কিছু শেখোনি ?"

অংশু বলল, "ওসব কথা আর বলবেন না সার। এই কান মুলে বলছি, আজ থেকে ও-লাইন ছেড়ে দিচ্ছি একেবারে !"

কাকাবাবু বললেন, "এর মধ্যেই ভাল ছেলে ! দেশের কী অবস্থা, চোর-ডাকাতরাও শারীরচর্চা করে না ! তোমার বাড়িতে কে-কে আছেন ?"

অংশু সংক্ষেপে তার জীবনকাহিনী জানাল।

সে একজন ছুতোর মিস্তিরির ছেলে। মা সবসময় অসুস্থ থাকে, বাড়িতে সাতটি ভাইবোন। অভাবের সংসার। সে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। কোনও চাকরি পায়নি। বাড়ির কাছেই একটা বস্তির কিছু ছেলে তাকে ডাকাতির লাইনে নিয়ে এসেছে। এর আগে দু'বার ট্রেন-ডাকাতি করেছে, ধরা পড়েনি।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "তা হলে তো তোমাকে ঠিক বেকার বলা যায় না। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছ, কে চাকরি দেবে ? ছুতোর মিস্তিরির ছেলে, তুমি বাবার কাছ থেকে কাজ শেখোনি কেন ? কাঠের কাজের খুব ডিমান্ড, অনেক পয়সা রোজগার করা যায়। কেন সে-কাজ শেখোনি ?"

অংশু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "ভাল লাগেনি সার।"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "আসলে তুমি একটা বখা ছেলে। বাজে বন্ধুদের পাল্লায় পড়েছিলে। ভেবেছিলে ডাকাতি করাটাই সহজ। কম পরিশ্রমে বেশি টাকা। ধরা পড়লে পুলিশ মারতে-মারতে হাত-পা ভেঙে দেয় না ? এই সন্তুই তোমার একখানা হাত ভেঙে দিতে পারত। ওই পাইপগান দিয়ে কখনও কোনও লোককে গুলি করেছ ?"

অংশু দাঁড়িয়ে উঠে কাকাবাবুর পা ছুঁতে গিয়ে বলল, "না সার, কখনও মানুষ মারিনি, বিশ্বাস করুন, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।"

কাকাবাবু আবার ধমক দিয়ে বললেন, "পা ছুঁতে হবে না, বলো ! তোমাকে আমি একটা চাকরি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব, তুমি ঠিক পথে থাকতে পারো কি না। আপাতত তোমাকে আমাদের সঙ্গে অনেকদূরে যেতে হবে। রাত্তিরে যখন আমরা ঘুমোব, তখন পালাবার চেষ্টা কোরো না, কোনও লাভ হবে না।"

জোজো বলল, "পালাতে গেলেই ওর একখানা হাত ভেঙে দেওয়া হবে। আমার ঘুম একবারে কুয়াশার মতন পাতলা।"

কাকাবাবু বললেন, "ডালিমবাবু, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। একই রাতে একই ট্রেনে পরপর দু'বার ডাকাত পড়ার কোনও বিশ্বরেকর্ড নেই!"

ডালিমবাবু তবু অংশুর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন, "তবু একে এতটা বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? যদি ঘুমের মধ্যে গলা টিপে ধরে? কথায় আছে, কয়লাকে একশোবার ধুলেও তার কালো রং যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "ও সত্যিই কয়লা, না ধুলো-ময়লা-মাখা এমনিই একটা পাথর, সেটা আগে জানা দরকার।"

বাকি পথটায় আর তেমন কিছু ঘটল না। সন্তু আর জোজো ভাগাভাগি করে রইল নীচের বার্থে, ওপরের একটা বার্থ ছেড়ে দেওয়া হল অংশুকে। টিকিট চেকার আসার পর অংশুর জন্য একটা টিকিট কাটা হল, চারজনের রাত্তিরের খাবার ভাগাভাগি করে খেল পাঁচজন। এমনকী অংশু একবার একলা বাথরুমে গেল, ফিরেও এল।

জব্বলপুর থেকে গাড়ি বদল করে সাতনা যেতে হবে। ডালিমকুমাররা সদলবলে থেকে গেলেন সেখানে। বিদায় নেওয়ার সময় ডালিমকুমার বারবার কাকাবাবু ও সন্তু-জোজোকে বলে গেলেন একবার তাঁদের যাত্রা দেখতে যাওয়ার জন্য। কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই যাব, অনেকদিন যাত্রা দেখিনি।"

সাতনা স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন কামালসাহেব। নরেন্দ্র ভার্মার কাছ থেকে তিনি টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

কাকাবাবু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কামাল আতাতুর্ক, কতদিন পর দেখা হল! আমিও এদিকে আসিনি এর মধ্যে, তুমিও কলকাতায় যাওনি।"

কামাল বললেন, "আমি দু'বার গিয়েছিলাম কলকাতায়। আপনার খোঁজ করেছি, দু'বারই আপনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন!"

কাকাবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, "এই আমার ভাইপো সন্তু, ওর বন্ধু জোজো। আর অংশু নামে এই ছেলেটি আমাদের পথের সঙ্গী।"

কামালসাহেবের চেহারাটি দেখবার মতন। ছ' ফুটের বেশি লম্বা, বুকখানা যেন শক্ত পাথরের তৈরি, গায়ের রং বেশ ফরসা। হঠাৎ দেখলে বাঙালি বলে মনেই হয় না। অতবড় শরীর হলেও চোখ দুটি খুব কোমল।"

তাঁর ডান দিকের ভুরুর ওপর একটা গভীর কাটা দাগ। ভুরুর খানিকটা উঠেই গেছে। সেদিকে তাকিয়ে খানিকটা অবাক হয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার চোখের ওপরে ওটা কী হয়েছে? আগে তো দেখিনি।"

কামাল বললেন, "ও একটা ব্যাপার হয়েছে কিছুদিন আগে। আপনাকে পরে বলব।"

সবাইকে বাইরে এনে একটা স্টেশান-ওয়াগনে তুললেন কামালসাহেব। নিজেই সেটা চালাতে-চালাতে বললেন, "আমার বাড়িতে অনেক জায়গা আছে, আপনারা সেখানেই থাকতে পারতেন। কিন্তু নরেন্দ্র ভার্মা জানিয়েছেন

আপনারা গেস্ট হাউসে থাকতে চান। তাও ঠিক করে রেখেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা করে আসব, একদিন তার হাতের রান্নাও খাব। তোমার বিয়ের সময় আমি আসতে পারিনি।"

কামাল বললেন, "আমার দুটি ছেলেমেয়ে, তাদেরও আপনি দেখেননি!"

সাতনা শহরটি ছোট হলেও মাঝখানের এলাকাটা বেশ ঘিঞ্জি। অনেক দোকানপাট। গাড়ি, টাঙ্গা, ঠেলাগাড়ি, স্কুটারের যানজট। সেই জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার পর রাস্তাটা ভারী মনোরম, দু'পাশে লম্বা-লম্বা গাছ।

একটা টিলার পাশে অতিথি ভবনটি ঠিক ক্যালেন্ডারের ছবির মতো। সামনে বাগান, ডানপাশে একটা ছোট নদী, কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই। এই বাড়িটি ফিকে নীল রঙের দোতলা, দু' তলাতেই চওড়া বারান্দা। গেটের দু'পাশে দুটি মোটা-মোটা ইউক্যালিপটাস গাছ, সে-গাছের গুঁড়ির রং এমন ফরসা যে, মনে হয় সাহেব গাছ।

কামাল বললেন, "এখানেই আপনাদের জন্য রান্নাবান্নার সব ব্যবস্থা আছে। বাইরে যেতে হবে না। অবশ্য যখন ইচ্ছে বেড়াতে যেতে পারেন, সবসময় একটা গাড়ি থাকবে।"

একতলার বারান্দায় অনেক বেতের চেয়ার পাতা। কাকাবাবু একটা চেয়ারে বসে পড়ে আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আঃ! ভারী ভাল জায়গা। এখানে আমাকে কেউ চেনে না, কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। এখানে শুধু গল্প হবে। কামাল, তোমার কাছে আমরা গল্প শুনব।"

কামাল লাজুকভাবে হেসে বললেন, "আমি কি গল্প জানি!"

কাকাবাবু বললেন, "আফগানিস্তানের গল্প। এই ছেলেরা শুনতে চেয়েছে। এখন এককাপ করে চা খাওয়াও।"

কামাল গলা চড়িয়ে "ইউসুফ, ইউসুফ" বলে ডাকলেন।

একজন লোক এসে দাঁড়াল, তার মুখে ধপধপে সাদা দাড়ি, চুলও সব সাদা। দেখলে বুড়ো বলে মনে হলেও চেহারাটা বেশ শক্তপোক্ত, টানটান। লুঙ্গির ওপর ফতুয়া পরা।

কামাল বললেন, "এই হচ্ছে বিখ্যাত ইউসুফ মিঞা, এর হাতের রান্না খেলে আর ভুলতে পারবেন না। এটা তো কোল ইন্ডিয়ার গেস্ট হাউস, বড়-বড় সব অফিসাররা আসেন। তাঁরা ইউসুফের রান্না খেয়ে অনেক সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন।"

ইউসুফকে কাকাবাবু হাত তুলে সেলাম জানালেন।

কামাল হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "ইউসুফ, সাহেবরা তো এসে গেছেন। আজ কী খাওয়াবেন?"

ইউসুফ বললেন, "মোগলাই না ইংলিশ, কোনটা খাবেন বলুন। বাঙালি

রান্না ভাত, মাছের ঝোলও করে দিতে পারি।"

কাকাবাবু ছেলেদের দিকে তাকাতেই জোজো বলল, "মোগলাই!"

ইউসুফ বললেন, "তা হলে শাহি কাবাব, মুর্গ মশল্লা, বাদশাহি বিরিয়ানি, রোগন জুস, মটন কোপ্তা।"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "অত না, অত না। কোনও ভেজিটেব্‌ল নেই? আমি কোনও সব্‌জি বা তরকারি ছাড়া খেতে পারি না। এখন একটু চা দিন আমাদের।"

কামাল বললেন, "আপনাদের যা খেতে ইচ্ছে করে তাই-ই অর্ডার করবেন। নরেন্দ্র ভার্মা জানিয়েছেন, আপনাদের কোনও খরচ লাগবে না। সব তিনি দেবেন। যতদিন ইচ্ছে থাকবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এ যে দেখছি তোফা ব্যবস্থা। বহুদিন এরকম ছুটি কাটাইনি। কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। কামাল, এখান থেকে পান্না কতদূরে?"

কামাল বললেন, "বেশিদূর নয়। গাড়িতে নিয়ে যাব একদিন।"

কাকাবাবু বললেন, "জানিস সন্তু, এখানে পান্না নামে যে জায়গাটা আছে—"

কাকাবাবু শেষ করার আগেই সন্তু বলল, "পান্নায় হিরের খনি আছে। ভারতের একমাত্র হিরের খনি!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। সেখানকার মাঠে-মাঠে ঘুরলেও হঠাৎ একটা হিরে পাওয়া যেতে পারে। দ্যাখ যদি তোরা হিরে আবিষ্কার করে ফেলতে পারিস।"

জোজো উৎসাহের সঙ্গে বলল, "সেখানে কবে যাব?"

কাকাবাবু বললেন, "আজ বিশ্রাম। আজ কোথাও না।"

ইউসুফ একটা ট্রেতে সাজিয়ে পাঁচকাপ চা নিয়ে এলেন। কাকাবাবু একটা কাপ তুলে চুমুক দিয়েই বললেন, "এ কী, এ যে দেখছি বাদশাহি চা! শুধু দুধে তৈরি, এলাচ-দারচিনিরও গন্ধ আছে।"

কামাল বললেন, "আপনাদের জন্য স্পেশ্যাল।"

কাকাবাবু বললেন, "ইউসুফসাহেব, এতসব বাদশাহি খানাপিনা আমাদের সহ্য হবে না। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাকে খুব কম দুধ-চিনি দিয়ে পাতলা চা দেবে। আমি ঘন-ঘন চা-কফি খাই।"

কামাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনারা তা হলে এখন বিশ্রাম নিন। আমি সন্ধের দিকে আসব।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই ভাল, সন্ধের পরই গল্প জমে। আর হ্যাঁ, ভাল কথা। এই অংশু নামের ছেলেটিকে একটা চাকরি দিতে হবে, একটু খোঁজখবর নিয়ো তো!"

অংশু চা শেষ করে বাগানে ঘুরছে। কামাল চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু ডাকলেন, "অংশু, অংশু!"

অংশু সাড়া দিল না।

কাকাবাবু আবার ডাকলেন, "ও অংশু, এখানে একবার এসো, একটা কথা শুনে যাও !"

অংশু তবু ফিরে তাকাল না।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী ব্যাপার, ও শুনতে পাচ্ছে না ?"

জোজো বলল, "বুঝতে পারছেন না, ওর নাম অংশু নয়। আমাদের কাছে মিথ্যে নাম বলেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? সন্তু, ওকে ডেকে আন তো।"

সন্তু দৌড়ে গিয়ে ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, "তোমায় অংশু, অংশু বলে ডাকছিলাম, তুমি শুনতে পাওনি ?"

ছেলেটি বলল, "আপনি যেন কাকে ডাকছিলেন, আমি বুঝতে পারিনি যে আমাকেই ..."

হঠাৎ সে থেমে গেল। কেমন যেন করুণ হয়ে গেল মুখের চেহারা। তারপরে আস্তে-আস্তে বলল, "অনেকদিন আমায় কেউ ওই নামে ডাকেনি, সবাই হেবো-হেবো বলে, আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমায় কেউ ভাল নামে ডাকে না ?"

অংশু বলল, "না সার। পুলিশের লোকও আমাকে ওই নামেই জানে।"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ভাল নাম যখন রয়েছে, তখন কেউ সে-নামে ডাকবে না, এ ভারী অন্যায়। এখন থেকে তুমি আর হেবো নও, এখানে তোমার ও-নাম কেউ জানে না। এখন থেকে তুমি অংশু। নিজের মনে-মনে বারবার বলবে, আমি অংশু, আমি অংশু। আমার নতুন জীবন শুরু হচ্ছে।"

অংশু মাথা চুলকে বলল, "সার, আপনি আমাকে একটা চাকরি দেবেন বলেছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কথা পরে হবে। তোমার পুরো নাম অংশুমালী। এ-নামের মানে জানো ?"

অংশু কাঁচুমাচু ভাবে বলল, "আগে জানতাম বোধ হয়। এখন ভুলে গেছি !"

কাকাবাবু বললেন, "কী কাণ্ড, একজন মানুষ নিজের নামের মানেই জানে না !"

কাকাবাবু জোজো আর সন্তুর মুখের দিকে তাকালেন।

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "অংশু মানে চাঁদ।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আন্দাজে ঢিল মেরেছ। হয়নি কিন্তু। অংশু মানে কিরণ বা রশ্মি। অংশুমালী মানে যার কিরণ বা রশ্মি আছে। চাঁদের কি নিজস্ব রশ্মি বা আলো আছে ? সূর্যের আলো চাঁদের পাথরে গিয়ে ঠিকরে পড়ে, তাই আমরা চাঁদের আলো দেখি।"

সন্তু বলল, "অংশুমালী মানে সূর্য। জ্যোতির্ময়।"

কাকাবাবু বললেন, "ওহে অংশু, আর যেন ভুলে যেয়ো না। তুমি হেবো নও, তুমি অংশুমালী, তোমার নামের মানে সূর্য। আচ্ছা অংশু, তুমি কখনও কবিতা লিখেছ ?"

অংশু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কী বললেন সার ?"

জোজো হো-হো করে হেসে উঠল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি হাসলে কেন জোজো ?"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি মাঝে-মাঝে এমন সব অদ্ভুত কথা বলেন ! যে ট্রেনে ডাকাতি করত, সে কবিতা লিখবে ? কবিরা কখনও ডাকাত হয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "কবিরা ডাকাত হয় না বটে, কিন্তু কোনও ডাকাত যদি ডাকাতি ছেড়ে দেয়, তা হলে সে কবি হতে পারে। কী, পারে না ? আমাদের দেশে একজন ডাকাত মহাকবি হননি ?"

সন্তু কিছু বলতে যেতেই জোজো তার মুখ চেপে ধরে বলল, "এই, তুই সব বলবি কেন রে ? এটা আমি জানি। রত্নাকর থেকে বাল্মীকি !"

কাকাবাবু বললেন, "তবে ? শোনো অংশু, তোমাকে চাকরির জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমি যখন কথা দিয়েছি, এখানেই তোমার একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যাবে !"

অংশু ফ্যাকাসে মুখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "এখানে ? না, না সার, এতদূরে আমি চাকরি করতে পারব না !"

কাকাবাবু বললেন, "কেন পারবে না ? পঞ্জাবিরা পঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসে কতরকম কাজ করে। উত্তরবঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে দেখবে একজন মাড়োয়ারি দোকান খুলে বসে আছে। গুজরাতিরা আফ্রিকায় ব্যবসা করতে যায়। আর বাঙালিরা ঘরকুনো হয়ে বসে থাকবে ? এই দ্যাখো না, কামালও তো বাঙালি, সে এখানে থেকে গেছে।"

অংশু বলল, "আমি পারব না। আমার অসুবিধে আছে। বাড়িতে ছোট-ছোট ভাইবোন, তাদের টাকা দিয়ে আমি সাহায্য করি—"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ট্রেনে ডাকাতি করে তাদের টাকা দিয়েছ ?"

অংশু বলল, "হ্যাঁ, দিয়েছি।"

কাকাবাবুর মুখ এবার কৌতুকের হাসিতে ভরে গেল। তিনি বললেন, "এ যে দেখছি সত্যিই রত্নাকর ! তুমি ভাইবোনদের কিংবা বাবা-মাকে বলেছ যে ডাকাতি করে টাকা রোজগার করো ?"

অংশু সবেগে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "যদি বলতে, দেখতে, ওরা তোমাকে ঘেন্না করত ! যাই হোক, তোমাকে এখানেই চাকরি করতে হবে। যদি না চাও, তা হলে তোমাকে

পুলিশের হাতে তুলে দেব। কোনটা চাও, বেছে নাও।"

অংশু চুপ করে রইল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "তার আগে কিছুদিন তোমাকে পরীক্ষা করা দরকার। তোমার স্বভাব শুধরেছে কিনা সেটা জানতে হবে তো! সেইজন্য এক কাজ করো, তুমি কবিতা লিখতে শুরু করো।"

অংশু এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে দু' হাত নেড়ে বলতে লাগল, "পারব না সার। পারব না। কবিতা কাকে বলে আমি জানিই না!"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "আলবাৎ তোমাকে পারতেই হবে। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত যখন পড়েছ, তখন কবিতা পড়োনি? শোনো, তোমাকে আমি একটা লাইন বলে দিচ্ছি। তুমি পরের লাইনটি মিলিয়ে লিখবে। 'বনের ধারে ফেউ ডেকেছে, নাচছে দুটো উল্লুক', এর পরের লাইনটা তুমি ভাবো।"

জোজো বলল, "উল্লুকের সঙ্গে মেলাতে হবে। বেশ শক্ত আছে।"

কাকাবাবু জোজোকে বললেন, "এই, তোমরা কেউ কিছু বলবে না। ওকে সাহায্য করবে না। অংশু, তোমাকে আমি তিনদিন সময় দিলাম!"

॥ ৫ ॥

সন্ধের পর ওপরের বারান্দায় বসে শুরু হল গল্প।

চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। দুপুরে গরম ছিল, এখন শিরশিরে ভাব। এখানেও রয়েছে কতকগুলো বেতের চেয়ার। বাংলোটি সুন্দরভাবে সাজানো, কোনও কিছুরই অভাব নেই। কোল ইন্ডিয়ার অতিথি ছাড়া বাইরের লোকদের থাকতেই দেওয়া হয় না।

কাকাবাবু প্রথমে বললেন, "সন্তু আর জোজো আমার কী করে পা খোঁড়া হল, সেই ঘটনাটা শুনতে চেয়েছে। খুবই রোমহর্ষক ব্যাপার হয়েছিল। আমি সবটা নিজের মুখে বললে, হয়তো ওদের বিশ্বাস হত না। তাই কামাল আর আমি দু'জনে মিলে বলব। আমরা দু'জনে সেখানে একসঙ্গে ছিলাম।"

কামাল বললেন, "নরেন্দ্র ভার্মাও কিছুদিন ছিলেন, তারপর চলে এসেছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা তখন কাজ করতাম ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে। সরকার থেকে আমাদের আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছিল। কেন পাঠানো হয়েছিল, সেটা আগে বলব না। তার আগে একটু জিজ্ঞেস করে নিই, তোরা আফগানিস্তান সম্পর্কে কতটা জানিস। জোজো, তুমি তো তোমার বাবার সঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছ, আফগানিস্তানেও গিয়েছিলে কখনও?"

জোজো বলল, "না। আমার বাবা ঘুরে এসেছেন, সেবার একটুর জন্য আমার যাওয়া হল না!"

সন্তু বলল, "রবীন্দ্রনাথ 'কাবুলিওয়ালা' নামে একটা গল্প লিখেছেন, আমি সেটা পড়েছি।"

কামাল বললেন, "আহা, কী চমৎকার গল্প। কলকাতায় এক সময়ে অনেক কাবুলিওয়ালা দেখা যেত, এখনও কিছু-কিছু আছে। হিং, কিশমিশ, পেস্তা-বাদাম বিক্রি করত।"

কাকাবাবু বললেন, "কামাল, আমরা একটা জায়গায় পেস্তা-বাদাম গাছের প্রায় একটা বন দেখেছিলাম, মনে আছে?"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ, মনে আছে।"

জোজো বলল, "গোড়া থেকে বলুন। আপনারা কী করে গেলেন ও-দেশে?"

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে যাইনি। প্লেনে গিয়ে কাবুলে নেমেছিলাম। তখন অমৃতসর থেকে কাবুল পর্যন্ত প্লেন সার্ভিস ছিল। এখন আছে কি না জানি না। কাবুলে অবশ্য দু-একদিনের বেশি থাকিনি। তোরা আমুদরিয়া কাকে বলে জানিস?"

সন্তু বলল, "ভূগোলে পড়েছি। আমুদরিয়া আফগানিস্তানের একটা নদীর নাম।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই নদীর ধার দিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের যাত্রা।"

কামাল বললেন, "তখন তোমাদের এই কাকাবাবুর কী দারুণ স্বাস্থ্য ছিল। ঝকঝকে চেহারা। যেমন ঘোড়া ছোটাতে পারতেন, তেমনই বন্দুক-পিস্তল চালানো, এমনকী তলোয়ার খেলাতেও ওস্তাদ ছিলেন। রাজাসাহেব, আপনার মনে আছে, একবার আপনাকে তলোয়ার লড়তে হয়েছিল?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, খুব জোর বেঁচে গেছি। সেই লোকটির নাম ছিল জাভেদ দুরানি। আমাদের ইন্ডিয়ার ক্রিকেট টিমে একসময় সেলিম দুরানি নামে একজন খেলোয়াড় ছিল জানিস? সেও আসলে ছিল কাবুলি। আফগানিস্তানে অনেক দুরানি আছে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "তার সঙ্গে আপনার তলোয়ার লড়তে হয়েছিল কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সে যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল!"

কামাল বললেন, "রাজাসাহেব, আগেই ওটা বলে দিলে জমবে না। তার আগে একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাবুল থেকেই শুরু করা যাক। আমরা কাবুলে ছিলাম পাঁচদিন, সরকারি লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হল। আমাদের অভিযানের জন্য অনুমতি নেওয়ার দরকার ছিল। আগেই চিঠিপত্রে সব জানানো হয়েছিল অবশ্য। তবু একটা শর্তে আটকে গেল।"

কামাল বললেন, "সেই সময় নরেন্দ্র ভার্মা চলে এলেন দিল্লি থেকে। উনি

কাজ করতেন হোম ডিপার্টমেন্টে। ওঁর অনেক ক্ষমতা। তা ছাড়া নরেন্দ্র ভার্মা তুখোড় লোক, অচেনা মানুষের সঙ্গে নিমেষে ভাব জমিয়ে ফেলতে পারেন। কাবুলের যে দু'জন সরকারি অফিসার শর্তের খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের যাওয়া আটকে দিয়েছিলেন, সেই দু'জনকে নরেন্দ্র ভার্মা একদিন রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন ভারতীয় দূতাবাসে। আমাকে আগের দিন বললেন, 'ওদের শুধু পেটভরে নয়, প্রাণভরে খাওয়াতে হবে। এমন রান্না হবে, যা ওরা জীবনে খায়নি। কামাল, তুমি হরিণের দুধ জোগাড় করতে পারবে ? আর কচি ভেড়ার মাংস। সেই ভেড়ার বয়েস এক মাসের বেশি হলে চলবে না।'"

কাকাবাবু বললেন, "কামালকে তুমি যা বলবে, ও ঠিক জোগাড় করে আনবে।"

কামাল বললেন, "কচি ভেড়ার মাংস জোগাড় করা শক্ত কিছু নয়। ওখানকার গ্রামের দিকে অনেকেই ভেড়া চরায়। বেশি দাম দিয়ে একটা বাচ্চা ভেড়া কিনে ফেললাম। কিন্তু হরিণের দুধ পাই কোথায় ? জঙ্গলে গিয়ে তো হরিণ ধরতে পারি না। ধরলেও সেই হরিণের যে দুধ থাকবে, তার কোনও মানে নেই। আমি তখন কাবুল শহরের চিড়িয়াখানায় অনেকক্ষণ ঘুরলাম। সেখানে অনেকরকম হরিণ আছে, সেখানে একটা হরিণীর সদ্য বাচ্চাও হয়েছে দেখা গেল। কিন্তু তার দুধ নেব কী করে ? একজন পাহারাদারকে কথাটা বলতেই সে এমন কটমট করে তাকাল, যেন মেরেই ফেলবে। এর পর একটাই উপায় আছে। আমি রাত্তিরবেলা চিড়িয়াখানার পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লাম চুপিচুপি। সঙ্গে নিয়েছিলাম একটা বদনা। টর্চের আলোয় হরিণীটাকেও খুঁজে পেলাম, কিন্তু দুধ দুইতে গেলেই চ্যাঁচাবে। কোনওক্রমে রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেললাম তার মুখ। পেছনের পা দুটোও বাঁধতে হল। তারপর এক বদনা ভর্তি দুধ দুয়ে নিলাম। ওরই মধ্যে হরিণীটা শিং দিয়ে একবার ঢুঁ মেরেছিল আমার পেটে। আর একটু হলে পেটটা ফুটো হয়ে যেত !"

কাকাবাবু বললেন, "আঃ, কী অপূর্ব রান্না হয়েছিল ! এখনও জিভে লেগে আছে সেই স্বাদ। জল দেওয়াই হয়নি। শুধু দুধ দিয়ে রান্না করা নরম তুলতুলে মাংস, অসম্ভব ঝাল। তাই খেয়ে অফিসার দু'জন যাকে বলে কুপোকাত। পরদিনই অনুমতি পাওয়া গেল।"

কামাল বললেন, "নরেন্দ্র ভার্মা আমাদের সঙ্গে গেলেন না, তিনি ফিরে এলেন দিল্লিতে। আমরা দু'জনেই শুধু যাব শুনে অনেকে আমাদের নিষেধ করেছিল, ভয় দেখিয়েছিল। ও-পথে খুব ডাকাতের উৎপাত। কিন্তু তখন আমাদের কম বয়েস, বিপদ-টিপদ গ্রাহ্য করি না, বিপদের কথা শুনলে রক্ত আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আমাদের দেশে এত জায়গা থাকতে আপনারা আফগানিস্তানে অভিযানে গেলেন কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে একটু ইতিহাসের কথা বলতে হয়।"

জোজো বলল, "এই রে, হিস্ট্রি আমার খুব বোরিং লাগে, বড্ড সাল-তারিখ মুখস্থ রাখতে হয়।"

সন্তু বলল, "আমার কিন্তু ইতিহাস বেশ ভাল লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, খুব সংক্ষেপে বলব। যাতে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। সাল-তারিখও মনে রাখতে হবে না। আফগানিস্তান দেশটা যদিও পাহাড় আর মরুভূমিতে ভরা, আর বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য দেশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য বারবার বিদেশিরা এই দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। গ্রিস থেকে আলেকজান্ডার এসে আফগানিস্তান জয় করে ভারতের দিকে এগিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রিস সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। ভারতে তখন মৌর্য বংশের রাজারা খুব ক্ষমতাশালী, তাঁরা আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পাহাড় পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সম্রাট অশোকের সময়ও এ-দেশটা তাঁর অধীনে ছিল। এরপর কুশান নামে এক দুর্ধর্ষ জাত মধ্য এশিয়া থেকে এসে অনেক দেশ জয় করে নেয়। কুশানদের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাটের নাম কনিষ্ক।"

জোজো বলে উঠল, "মুণ্ডুকাটা কনিষ্ক!"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইতিহাসের বইতে তাঁর মুণ্ডু ভাঙা মূর্তির ছবি থাকে শুধু। কিন্তু তাঁর মুণ্ডু কেউ-কেউ দেখেছে। সন্তু, তোর মনে আছে ; সেই যে কাশ্মীরে—"

সন্তু বলল, "বাঃ, মনে থাকবে না ? সেবারই তো আমি প্রথম তোমার সঙ্গে গেলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "সে যাই হোক, সম্রাট কনিষ্কের রাজ্য ওদিকে তো অনেকখানি ছিলই, ভারতের মধ্যেও মথুরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এর পরের ইতিহাস আর আমাদের জানার দরকার নেই। কনিষ্কের আমলে আফগানিস্তানের অনেক উন্নতি হয়েছিল, তখনকার কিছু-কিছু ব্যাপার এখনও অজানা রহস্য রয়ে গেছে। সেইরকমই একটা কিছুর খোঁজে আমাদের যেতে হয়েছিল।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "একটা কিছু মানে কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা যথাসময়ে জানতে পারবে।"

কামাল বললেন, "কাবুল থেকে আমরা একটা জিপগাড়িতে পৌঁছে গেলাম ফৈজাবাদ। সেটা খুব ছোট শহর। সেখান থেকে আমাদের ঘোড়া ভাড়া নিতে হল। সঙ্গে অস্ত্র রাখতে হয়েছিল, আমার কাছে একটা রাইফেল, রাজাসাহেবের কাছে একটা রিভলভার।"

কাকাবাবু বললেন, "কামাল, তুমি আমাকে বারবার রাজাসাহেব, রাজাসাহেব বলছ কেন ? শুনলে অন্য কেউ ভাববে, আমি বুঝি সত্যি কোনও রাজা। তুমি

তো আগে আমাকে শুধু দাদা বলতে !”

কামাল বললেন, “ঠিক আছে, দাদাই বলব, দাদার তখন কী সুন্দর চেহারা ছিল, সবাই দেখলেই খাতির করত। আমরা সঙ্গে অনেক খাবারদাবার নিয়েছিলাম, শুকনো ফলই বেশি, আখরোট, পিস্টাশিও, কিশমিশ, খেজুর এইসব। কোথায় কী জুটবে তার ঠিক নেই। পাহাড় আর জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে চলেছে আমুদরিয়া নদী, মাইলের পর মাইল কোনও জনবসতি নেই।”

জোজো বলল, “সেই তলোয়ারের যুদ্ধটা হল কোথায় ? কাকাবাবুর সঙ্গে কি তলোয়ারও ছিল ?”

সন্তু বলল, “আঃ জোজো, তোর একদম ধৈর্য নেই। চুপ করে শোন না !”

কাকাবাবু বললেন, “আচ্ছা কামাল, সেই বাঘটা আমরা দেখেছিলাম কবে ? প্রথম দিনই ?”

কামাল বললেন, “না, দাদা। সেটা তো তৃতীয় দিন। প্রথম দিন শুধু পিঁপড়ে।”

কাকাবাবু বললেন, “ওরেবাব্বা, সেরকম পিঁপড়ে জীবনে দেখিনি ! বাঘের থেকে কম ভয়ঙ্কর নয়। সন্তু, তোর মনে আছে, একবার মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে আমরা পিঁপড়ের পাল্লায় পড়েছিলাম ? সে-পিঁপড়েও আফগানিস্তানের পিঁপড়ের তুলনায় কিছুই নয়।”

কামাল বললেন, “প্রথম দিনটায় কিছুই ঘটেনি। শুধু আমাদের আস্তে-আস্তে এগোতে হচ্ছিল। পাহাড়ি রাস্তায় তো জোরে ঘোড়া ছোটাবার উপায় নেই। সন্ধের সময় আমরা নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে নিলাম বিশ্রামের জন্য।”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “আপনাদের সঙ্গে তাঁবুও ছিল ?”

কামাল বললেন, “ছোট্ট নাইলনের হালকা তাঁবু। শুধু মাথা গোঁজবার জন্য। আফগানিস্তানে শীতকালে খুব শীত, আর গরম কালে খুব গরম। তখন ছিল গরমকাল। কম্বল-টম্বল নিতে হয়নি। বৃষ্টিও হয় খুব কম। পাথর দিয়ে উনুন বানিয়ে আমরা রুটিও সেঁকে নিয়েছিলাম। রুটি আর খেজুর, চমৎকার খাওয়া হল। একসময় ঘুমিয়েও পড়লাম। মাঝরাত্তিরে আক্রমণ করল পিঁপড়ে।”

কাকাবাবু বললেন, “হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ পিঁপড়ে। লাল লাল রং, এক-একটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, তাদের কামড়ে সাঙ্ঘাতিক বিষ। যন্ত্রণার চোটে আমরা নাচতে শুরু করেছিলাম। শেষপর্যন্ত আমরা ঝাঁপ দিলাম নদীতে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখলাম জলে।”

কামাল বলল, “দ্বিতীয় রাতে কিন্তু কিছুই হয়নি। পিঁপড়ে-টিপড়ে ছিল না, পরিষ্কার জায়গা। খুব ভাল ঘুমিয়েছিলাম।”

অংশু একটু দূরে একেবারে চুপচাপ বসে আছে, একটি কথাও বলেনি। কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী অংশু, শুনছ তো ? ভাল লাগছে ?”

অংশু শুকনো গলায় বলল, "হ্যাঁ সার।"

জোজো চুপিচুপি সন্তুকে বলল, "ও বেচারা কবিতার দ্বিতীয় লাইন ভেবে-ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছে!"

কামাল বলল, "তৃতীয় দিন দিনের বেলাতেই আমরা বাঘটাকে দেখলাম। আমরা তখন একটা টিলার ওপরে—"

সন্তু খানিকটা সন্দেহের সুরে বলল, "আফগানিস্তানে বাঘ আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "থাকবার কথা নয়। এককালে এই আমুদরিয়া নদীর ধারে-ধারে এক ধরনের বাঘ ছিল, তাদের বলা হত সাইবেরিয়ান টাইগার। সবাই জানে, তারা সব লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা চোখের সামনে একটাকে দেখলাম। নিশ্চয়ই দুটো-একটা তখনও রয়ে গিয়েছিল। মুখে ঝাঁটার মতন মস্ত গোঁফ, পিঠটা উঁচুমতন। আমরা তখন একটা টিলার চূড়া পেরিয়ে অনেকটা নেমে এসেছি, এই সময় একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাঘটা, আমাদের দেখে লেজ আছড়াতে লাগল। আমরা যদিও ওপরের দিকে আছি, বাঘটা লাফিয়ে আমাদের ধরতে পারবে না। কিন্তু আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হলে পেছন ফিরতেই হবে, তখন যদি ও তেড়ে আসে?"

জোজো বলল, "আপনাদের সঙ্গে তো রাইফেল ছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ছিল। কিন্তু সাইবেরিয়ান টাইগার দুর্লভ প্রাণী, তাকে মারব? ও আমাদের একবার দেখে ফেলেছে, এদিকে মানুষ খুব কমই যাতায়াত করে, আমাদের দেখে ও লোভ সামলাবে কী করে? শেষপর্যন্ত কামালই একটা ব্যবস্থা করল।"

কামাল বললেন, "কেন ও-কথা বলছেন দাদা? বাঘটাকে দেখে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। হিংস্রভাবে গরগর শব্দ করতে-করতে ল্যাজ আছড়াতে দেখলেই মনে হয়, এবার আর নিষ্কৃতি নেই। তখন তোমাদের কাকাবাবু আমার হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে বললেন, 'কামাল, তুমি টিলাটার ওপর দিকে চলে যাও, আমি একে সামলাচ্ছি।' উনি পরপর দুটি গুলি করলেন, একটাও বাঘটার গায়ে লাগল না, পাথরের বলটা ছিটকে গেল। বাঘটা অবশ্য একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। তখন আমি ভেবেছিলাম, রাজা রায়চৌধুরীর হাতে টিপ নেই, নতুন বন্দুক চালাতে শিখেছেন। পরে বুঝেছি, উনি ইচ্ছে করে বাঘটাকে মারেননি।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "বাঘটা তো আমাদের আক্রমণ করেনি, শুধু ল্যাজ আছড়েছিল। হয়তো বাঘটাও আমাদের দেখে অবাক হয়েছিল। ওর ঠিক কানের কাছে গুলি চালিয়েছিলাম।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "বাঘটা আর ফিরে আসেনি?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ! তার আগেই যে অন্য একটা ঘটনা ঘটল। গুলি না চালিয়েই বাঘটাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। পাহাড়ে গুলির শব্দ

অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যায়। আমার সেই গুলির শব্দ শুনে চলে এল একটা ডাকাতের দল।"

কামাল বললেন, "ওরা ছ-সাতজন ছিল। আমরা বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগই পেলাম না। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক, চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল আমাদের।"

জোজো বলল, "এ যে ওয়েস্টার্ন ফিল্মের মতন!"

বাংলোর সামনে একটা জিপ এসে থামল। তার থেকে দু'জন লোক নেমে চিৎকার করল, "চৌকিদার? কেয়ারটেকার!"

গল্পে বাধা পড়ল। কামালসাহেব উঠে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে নীচে উঁকি মারলেন।

গেটের কাছে একজন চৌকিদার সবসময় থাকে, সে এখন নেই। ওই লোকদের হাঁকডাক শুনে বেরিয়ে এলেন ইউসুফ বাবুর্চি।

একজন লোক তাকে বলল, "এখানে ঘর খালি আছে? একটা ঘর খুলে দাও!"

ইউসুফ বললেন, "এখানে তো রিজার্ভেশান ছাড়া কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না।"

লোকটি রুক্ষস্বরে বলল, "আমাদের রিজার্ভেশান আছে কি নেই, তা তুমি জানছ কী করে? আগে ঘর খোলো!"

ইউসুফ বললেন, "ঘর তো খালি নেই। আজই একটি পার্টি এসেছে।"

অন্য লোকটি বলল, "ঘর খালি নেই? ঠিক আছে, আমরা বারান্দায় বসছি, আমাদের চা করে দাও। আর চটপট রুটি-মাংস বানিয়ে দাও, আমরা নিয়ে যাব।"

ইউসুফ বললেন, "মাফ করবেন সার। এখানে বাইরের লোকদের খাবার দেওয়ার নিয়ম নেই।"

লোকটি দু'খানা একশো টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, "বেশি কথা বোলো না, এই নাও, যা বলছি করে দাও!"

ইউসুফ বললেন, "আমি পারব না। আপনারা বরং ডান দিকে এক কিলোমিটার চলে যান, সেখানে হোটেল আছে। খাবারদাবার সব পাবেন।"

একজন লোক এবার ইউসুফ মিঞার গলা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কোথায় আমরা যাব না যাব, তা তোমার কাছে কে শুনতে চেয়েছে? মারব এক থাপ্পড়!"

কামাল একবার ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, "ও কী হচ্ছে, ওকে ছেড়ে দিন!"

সন্তু দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

লোক দুটি কামালের কথা গ্রাহ্যই করল না। একজন ইউসুফকে চুলের মুঠি

ধরে বলল, "আমাদের চিনিস না ? মুখে-মুখে কথা ! টাকা দেব, খাবার তৈরি করে দিবি ।"

কাকাবাবুও উঠে এসে রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, "লোকদুটি তো বড় বেয়াদপ। শুধু-শুধু ইউসুফকে মারছে !"

সন্তু ততক্ষণে নীচে পৌঁছে গেছে। ইউসুফের কাছে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে লোক দু'টিকে বলল, "ওকে ছেড়ে দিন ।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু একা পারবে না। কামাল, তুমি নীচে গিয়ে লোক দুটিকে ধরো ।"

এবার ওদের একজন টর্চের আলো ফেলল দোতলায়।

অন্যজন অস্ফুট স্বরে বলল, "ও কে ? রাজা রায়চৌধুরী না ?"

অন্য লোকটি বলল, "হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে ।"

ইউসুফকে ছেড়ে দিয়ে ওরা দ্রুত ফিরে গেল জিপগাড়িটার দিকে। কামাল নীচে পৌঁছবার আগেই ওরা স্টার্ট দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল !

কামাল বিরক্তভাবে বললেন, "চৌকিদার গেল কোথায় ? ইউসুফ, তুমি বেরোতে গেলে কেন ? বাইরের লোক ডাকাডাকি করলেও তুমি বেরোবে না।"

ইউসুফ আস্তে-আস্তে বললেন, "এইসব লোক, বেআইনিভাবে পয়সা রোজগার করে, আর সব জায়গায় গায়ের জোর ফলায় ।"

সন্তু আর কামাল ফিরে এলেন দোতলায়।

জোজো বলল, "ওরা কাকাবাবুকে দেখেই ভয়ে পালাল ।"

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "ব্যাপারটা ভাল হল না রে জোজো। আমি ভেবেছিলাম, এই সাতনার মতন জায়গায় আমাকে কেউ চিনবে না ।"

কামাল বললেন, "সত্যিই তো, চিনল কী করে ? এখানে আপনি অনেকদিন আসেননি। এখানে হিরের খনি আছে, অনেকরকম ব্যবসা শুরু হচ্ছে, তাই গুণ্ডা-বদমাশদের উৎপাত বাড়ছে। লোক দুটোর ব্যবহার টিপিক্যাল গুণ্ডার মতন ।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন আগে সূরযপ্রসাদ নামে একটা লোক আমার কাছে জব্দ হয়েছিল। খাজুরাহো মন্দিরের মূর্তি ভেঙে-ভেঙে বিক্রি করা ছিল তার কাজ। ফাঁদে ফেলে তাকে আমি ধরেছিলাম। খুব একটা শাস্তি দিইনি। মূর্তিগুলো সব উদ্ধার করার পর সে আমার সামনে নাকে খত দিয়েছিল, তারপর তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম ।"

কামাল বললেন, "এই তো আপনার দোষ ! আপনার দয়ার শরীর, আপনি ক্ষমা করে দেন। তারা কিন্তু আপনার শত্রুই থেকে যায় ।"

কাকাবাবু অংশুর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "না, তা নয়। অনেক সময় ক্ষমা করে দিলে তারা ভাল হয়ে যায় ।"

কামাল বললেন, "ওই সূরযপ্রসাদ তো কুখ্যাত অপরাধী। চোরাচালান, মানুষ খুন, কিছুই বাকি রাখেনি। পুলিশের হাত থেকে দু'বার পালিয়েছে। আপনি ক্ষমা করে দিলেও সে একটুও শোধরায়নি। এখন তার মস্তবড় দল। তবে শুনেছি, তার নিজেরই দলের একজন লোক তার তলপেটে একবার ছুরি মেরেছিল, তাতেও সে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু শরীর ভেঙে গেছে। নিজে আর বেরুতে পারে না। কোনও জায়গায় লুকিয়ে থেকে সে দল চালায়। এ-লোকগুলো সূরযপ্রসাদের দলের লোক হতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আর কী করা যাবে ?"

কামাল বললেন, "সূরযপ্রসাদকে আপনি নাক-খত দিইয়েছিলেন, সেই অপমানের সে শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে না ? যখন সে শুনবে আপনি এখানে এসেছেন ... আমার মনে হচ্ছে দাদা, ওই লোক দুটো দলবল নিয়ে ফিরে আসবে, এখানে হামলা করবে !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো আর ওদের ঘাঁটাতে যাচ্ছি না। এখানে আমি গুণ্ডা দমন করতে আসিনি, এসেছি বিশ্রাম নিতে।"

কামাল জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহুঃ, ভাল বুঝছি না। এখানকার চৌকিদার তো দেখছি অপদার্থ। পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। নরেন্দ্র ভার্মা আমার ওপর আপনাদের দেখাশুনোর দায়িত্ব দিয়েছেন।"

জোজো বলল, "গল্পটার কী হল ? তারপর আফগানিস্তানের গল্পটা বলুন। ডাকাতের দল আপনাদের ঘিরে ধরেছিল—"

কামাল বললেন, "এখন তো আর গল্প হবে না ভাইটি। আমার এখনই থানায় যাওয়া দরকার। যদি রাত্তিরেই ওরা ফিরে আসে ?"

কামাল উঠে দাঁড়ালেন।

কাকাবাবু বললেন, "ভেবেছিলাম এখানে নিরিবিলিতে শান্তিতে থাকব। তা নয়, এর মধ্যে এসে গেল গুণ্ডা, তার ওপর পুলিশ। গল্পটা মাটি হয়ে গেল। তুমি যাও বঙ্গে, কপাল তোমার সঙ্গে ! অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায় !"

॥ ৬ ॥

সকালবেলা চা খেতে-খেতে কাকাবাবু অংশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হে, কবিতা মেলাতে পারলে ?"

অংশু কাঁচুমাচুভাবে বলল, "আমার দ্বারা হবে না সার। আমার সাতপুরুষে কেউ কখনও ও-কর্ম করেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কী করে জানলে ? সাতপুরুষের সকলের কথা জানো ? তোমার বাবা ছুতোর মিস্তিরি, ঠাকুর্দা কী ছিলেন ? ঠাকুর্দার বাবা ?"

অংশু বলল, "আমার ঠাকুর্দাকে আমি কখনও চোখেই দেখিনি। আগে আমাদের মেদিনীপুরের কোনও গ্রামে বাড়ি ছিল, বাবা চলে এসেছিলেন সোদপুরে।"

কাকাবাবু বললেন, "মেদিনীপুরের গ্রামে তোমার ঠাকুর্দা হয়তো কবিয়াল ছিলেন। অনেক ছুতোর মিস্তিরি, নৌকোর মাঝি, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান নিজেরা গান বানান। পোস্ট অফিসের এক পিওনের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক গান শিখেছিলেন, তা জানো?"

অংশু এসব কথায় কান না দিয়ে মুখ গোঁজ করে বলল, "তা যাই বলুন সার, কবিতা-ফবিতা আমি পারব না। আপনি আমাকে মাটি কাটতে বলুন, কাঠ কাটতে বলুন, কুয়ো থেকে জল তুলতে বলুন, সব পারব। শুধু কবিতা-ফবিতা, না, অসম্ভব, অসম্ভব!"

কাকাবাবু বললেন, "ফবিতা জিনিসটা কী আমি জানি না। সেটা আমিও পারব না। কিন্তু একটু মাথা খাটালে সবাই কবিতা মেলাতে পারে। শোনো, তোমাকে ছাড়া হবে না। যতক্ষণ না মেলাতে পারছ, ততক্ষণ চাকরি হবে না। এখান থেকে পালাতেও পারবে না। ভাবো, ভাবো। লাইনটা মনে আছে তো? 'বনের ধারে ফেউ ডেকেছে নাচছে দুটো উল্লুক'।"

অংশু বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে। ফেউ মানে কী সার?"

কাকাবাবু বললেন, "শেয়াল। শেয়ালের ডাক।"

অংশু বলল, "শেয়াল তো হুক্কা-হুয়া করে ডাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক। সন্ধে হলেই শেয়াল হুক্কা-হুয়া করে ডাকে। কিন্তু কাছাকাছি যদি বাঘ দেখা যায়, অমনি শেয়ালের গলা পালটে যায়। ভয়ের চোটে ডাকে ফেউ-ফেউ।"

অংশু জিজ্ঞেস করল, "এ-লাইনটা আপনি বানিয়েছেন, না কোনও বই থেকে নিয়েছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বানিয়েছি। কেন, আমি বানাতে পারি না? তুমিও পারবে।"

অংশু উঠে বাগানে চলে গেল।

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি বেচারাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছেন। কবিতা মেলাতে হবে ভেবে-ভেবে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে।"

সন্তু বলল, "প্রথমবারেই বড্ড শক্ত হয়ে গেল ওর পক্ষে। আর-একটু সোজা দিলে পারতে।"

কাকাবাবু বললেন, "এমন কিছু শক্ত না!"

জোজো বলল, "আমি এক মিনিটে মিলিয়ে দিতে পারি। বলব?"

কাকাবাবু বললেন, "খবর্দার না। তোমরা কেউ কিচ্ছু বলবে না।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, অংশু একটা জামা আর প্যান্ট পরে আছে।

আমাদের জামা-প্যান্ট ওর লাগবে না, ও বেশি লম্বা। ও কি দিনের পর দিন ওই এক জামা-প্যান্ট পরে থাকবে ? গা দিয়ে গন্ধ বেরোবে যে !"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছিস। ওকে দু'সেট জামা-প্যান্ট-গেঞ্জি কিনে দিতে হবে।"

একটু পরে একটি স্টেশান-ওয়াগন এসে গেল। কামালসাহেব নিজে আসেননি, একজন ড্রাইভার সেটা চালাচ্ছে। ড্রাইভারের হাতে একটা চিঠি। কামালসাহেব সবাইকে তাঁর বাড়িতে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে সকলে তৈরি হয়ে নাও। অংশুকে ডাকো।"

অংশু নিজেই এগিয়ে এসে কাকাবাবুকে বলল, "সার, হয়ে গেছে।"

যেন একটা কঠিন অঙ্ক দেওয়া হয়েছিল, সে কোনওরকমে করে ফেলেছে। হাসি ফুটেছে মুখে।

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? শুনি।"

অংশু বলল, "জল দিয়ে পতপত করে ভেসে যাচ্ছে একটা শালুক !"

সন্তু মুচকি হেসে ফেলল, আর জোজো হেসে উঠল খুব জোরে।

অংশু রেগে গিয়ে বলল, "কেন, মেলেনি ? ভাল্লুকের সঙ্গে শালুক মেলে না ?"

কাকাবাবু নিজে হাসি চেপে ওদের দু'জনকে ধমক দিয়ে বললেন, "এই, তোরা হাসছিস কেন ? হাসির কী আছে !"

তারপর অংশুকে বললেন, "না, তোমার হয়নি। প্রথম কথা, আমার লাইনটাতে ভাল্লুক ছিল না, ছিল উল্লুক। উল্লুকের সঙ্গে শালুক ভাল মিল হয় না। দ্বিতীয় কথা, কবিতার একটা ছন্দ থাকে। সেটা বুঝতে হবে আগে। আমি যে লাইনটা বলেছি, তার ছন্দ হবে এইরকম :

বনের ধারে
ফেউ ডেকেছে
নাচছে দুটো
উল্লুক

তোমাকেও এই ছন্দে বানাতে হবে লাইন।"

জোজো পেট চেপে হাসি সামলাতে সামলাতে বলল, "জল দিয়ে পতপত করে ভেসে যাচ্ছে একটা শালুক ! পতপত করে কিছু ভেসে যায় নাকি ? পতপত করে তো পতাকা ওড়ে ! আর শালুক ফুল তো ভেসে যায় না, একজায়গায় ফুটে থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, আর-একটু চিন্তা করলেই ঠিক পারবে। চেষ্টা তো করেছ। এবার চলো, যাওয়া যাক।"

বাংলোর গেট থেকে খানিকটা দূরে একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে।

কাকাবাবুদের গাড়িটা ছাড়তেই সেটা পেছনে পেছনে আসতে শুরু করল।

কাকাবাবু ড্রাইভারকে থামাতে বলে পুলিশের গাড়ির ইনস্পেক্টরকে ডেকে বললেন, "শুনুন, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসতে হবে না। আমি মন্ত্রীও নই, ভি. আই. পি-ও নই। রাত্তিরবেলা আপনাদের ইচ্ছে হলে পাহারা দেবেন, দিনের বেলা আপনাদের থাকার দরকার নেই।"

পুলিশটি বলল, "সার, আমাদের ওপর অর্ডার আছে, আপনাকে সর্বক্ষণ চোখে-চোখে রাখতে হবে। এটা আমাদের ডিউটি।"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "আমিই তো বারণ করছি আপনাদের। ওপরওয়ালাকে গিয়ে সেই কথা বলুন। সর্বক্ষণ আমি পুলিশ নিয়ে ঘুরতে পারব না।"

পুলিশের গাড়িটা থেমে রইল। এ-গাড়ির ড্রাইভার কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দিল কামালসাহেবের বাড়িতে।

হলুদ রঙের বাড়িটা তিনতলা। সামনে লোহার গেট। একতলা, দোতলা, তিনতলার বারান্দা গ্রিল দিয়ে ঘেরা। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝখানেও একটা লোহার দরজা।

একতলায় দুটো দোকান ঘর। সকলে এসে বসল দোতলায়।

কামালসাহেবের স্ত্রীর নাম জুলেখা। ছেলেমেয়ে দুটির নাম অরণ্য আর তিস্তা। ছেলের বয়েস এগারো, মেয়ের বয়েস সাড়ে আট।

কাকাবাবু ওদের আদর করে বললেন, "বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো!"

কামাল বললেন, "ওদের বাংলা নাম রেখেছি। এখানে থেকে থেকে যাতে অবাঙালি না হয়ে যায়, সেইজন্য আমার স্ত্রী রোজ ওদের বাংলা পড়ায়, বাংলা গান শেখায়।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা একটা গান শুনিয়ে দেবে না কি?"

কামাল বললেন, "না, না, দাদা। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে তাদের সামনে গান গাওয়ানো কিংবা কবিতা আবৃত্তি করা খুব হাসির ব্যাপার। আরও আসবেন মাঝে-মাঝেই, কোনও এক সময় সবাই মিলে গান গাওয়া হবে।"

ছেলেমেয়েদের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে কামাল জিজ্ঞেস করলেন, "কাল রাত্তিরে কোনও উৎপাত হয়নি তো?"

কাকাবাবু বললেন, "কিচ্ছু না। চমৎকার ঘুমিয়েছি।"

কামাল বললেন, "এদিকে দুটি অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। কাল আমি যখন থানায় গেলাম, আমাকে কিছু বলতেই হল না। থানার অফিসার বললেন, জব্বলপুর থেকে এক্ষুনি অর্ডার এসেছে, রাজা রায়চৌধুরী কোল ইন্ডিয়ার গেস্ট হাউসে রয়েছেন। সেখানে সর্বক্ষণ পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি যেখানেই যান, সেখানেই কি পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা থাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "কক্ষনও না। অনেক সময় পুলিশরা আমার কথা জানতেই পারে না। শুধু-শুধু আমাকে পাহারা দিতে হবে কেন ?"

কামাল বললেন, "থানার অফিসার কিন্তু বেশ গুরুত্ব দিয়েই বললেন। খুব ওপর মহল থেকে অর্ডার এসেছে মনে হচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এতে তো আমার সম্পর্কে লোকের কৌতূহল বাড়বে। যারা জানত না, তারাও জেনে যাবে।"

কামাল বললেন, "জানতে কারও বাকি নেই। এই দেখুন, এখানকার ইংরিজি খবরের কাগজ। তাতে আপনার ছবি বেরিয়েছে, খবরে লিখেছে যে, আপনি মধ্যপ্রদেশে কোনও রহস্যের সন্ধানে এসেছেন।"

কাকাবাবু অনেকখানি ভুরু তুলে বললেন, "সে কী ? আমি এত বিখ্যাত হলাম কবে থেকে ? তা ছাড়া, এত তাড়াতাড়ি আমার এখানে আসার কথা খবরের কাগজের লোকেরা জানবে কী করে ?"

সন্তু-জোজোরা ঝুঁকে পড়ে কাগজটা দেখল। প্রথম পাতায় ডান দিকের শেষ কলামে কাকাবাবুর ছবি, সেইসঙ্গে কাকাবাবু সম্পর্কে অনেকটা লেখা।

জোজো বলল, "ওই যাত্রার দলের লোকেরা নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে।"

সন্তু খবরের কাগজটার সবক'টা পাতা উলটেপালটে দেখে বলল, "কিন্তু ওই যাত্রার দলের কোনও খবর তো বেরোয়নি।"

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "তা হলে তো এখানে আর থাকা চলে না। নানারকম লোক এসে দেখা করতে চাইবে ! বিরক্ত করবে। এখান থেকে ঝাঁসি চলে গেলে কেমন হয় ? সেটাও বেশ ভাল জায়গা। এখানকার গেস্ট হাউসটা খুব পছন্দ হয়েছিল।"

জোজো বলল, "না, আমরা এখানেই থাকব। কাল রাত্তিরে দারুণ খাইয়েছে !"

কামাল বললেন, "পুলিশকে বলে দেওয়া হবে, কেউ যেন বাংলোর মধ্যে ঢুকতে না পারে। কয়েকটা দিন অন্তত দেখা যাক।"

কামালের স্ত্রী জুলেখা এই সময় টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিলেন। পাকা পেঁপে, ডিমসেদ্ধ, পরোটা, আলুর দম, মাংসের কিমা, পাকা খেজুর, ফিরনি, কাঁচাগোল্লা—

কাকাবাবু বললেন, "ওরে বাবা, এত খাবার ?"

জোজোর চোখ চকচক করে উঠল, সেও বলল, "সত্যিই, এত খাবার দেওয়ার কোনও মানে হয় ?" তারপরই সে একটা আস্ত ডিমসেদ্ধ মুখে পুরে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "কাল রাতে ইউসুফ মিঞা আমাদের বিরিয়ানি, কাবাব-কালিয়া কতরকম যে খাইয়েছে ! অতি সুস্বাদু বটে ! কিন্তু বাঙালির পেটে এত মোগলাই খাবার রোজ-রোজ সহ্য হবে না। একবেলা অন্তত আমার

ডাল-ভাত-মাছের ঝোল চাই।"

কাকাবাবু সামান্যই খেলেন। সন্তুও তাই। জোজো আর অংশু সবরকমই চেখে দেখল।

চা শেষ করে কাকাবাবু বললেন, "জুলেখা, তোমার হাতের চা চমৎকার। মাঝে-মাঝে এসে খাব। চলো কামাল, তোমার বাড়িটা ঘুরে দেখি। মস্ত বড় বাড়ি বানিয়েছ!"

জোজোর পায়ে এখন ব্যান্ডেজ নেই, সিঁড়ি দিয়ে দিব্যি তরতর করে উঠে যাচ্ছে। সত্যি তার পা মুচকেছিল, নাকি হেলিকপ্টার থেকে লাফাবার গল্পটা বলার জন্যই ওটা বেঁধেছিল, তা বুঝতে পারল না সন্তু।

সিঁড়িতে প্রত্যেক তলায় কোলাপসিব্‌ল গেট, জানলাগুলোয় গ্রিলের সঙ্গে মোটা তারের জাল, ছাদও পুরোটা খুব শক্ত জাল দিয়ে ঘেরা।

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাড়িটা দেখছি দুর্গের মতন দুর্ভেদ্য। ছাদটা এমনভাবে ঘেরা কেন? বাঁদর-হনুমানের উৎপাত হয় বুঝি?"

কামাল বললেন, "নাঃ, এখানে বাঁদর নেই। তবে মানুষের বাঁদরামি খুব বেড়েছে। সন্ধের পর রাস্তাঘাটে ছিনতাই হয়। একদিন আমার বাড়ির ছাদে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। মাঝরাত্তির পেরিয়ে গেছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ একটা ঠুক-ঠুক শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা হয়েই চলেছে। আমার বাড়ির নীচে সব দোকানঘর। রাত্তিরে কেউ থাকে না। আমিই একলা পুরুষমানুষ। জুলেখাকে না জাগিয়ে আমি উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। ছাদের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তখনও কেউ ঠুক-ঠুক শব্দ করছে। আমি দরজাটা খুলে ফেললাম!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি খালি হাতে ছাদে উঠে গেলে?"

কামাল বললেন, "আমার বন্দুকের লাইসেন্স আছে। রিভলভারও সঙ্গে রাখি। কিন্তু সে-রাত্তিরে ওগুলো নেওয়ার কথা মনে হয়নি। চোর-ডাকাত হলে তো ঠুক-ঠুক শব্দ করবে না। আমি কোনও জন্তু-জানোয়ারের কথাই ভেবেছিলাম। তাই সঙ্গে একটা লাঠি নিয়েছিলাম। ছাদের দরজাটা খুলে ফেললাম আস্তে-আস্তে। কাউকে দেখা গেল না। অমাবস্যার রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবু আমি ছাদের এদিক-ওদিক ঘুরলাম। হঠাৎ আমার পেছন দিক থেকে কে যেন আমার কাঁধে একটা কিছু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম মাটিতে। উঠে দাঁড়াবার আগেই একজন লোক আমার বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ে একহাতে গলা টিপে ধরল, তার অন্যহাতে একটা ছুরি। আমি তার ছুরিধরা হাতটা চেপে ধরলাম। কাঁধের সেই আঘাতের চোটে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল, প্রথমে গায়ে জোর পাইনি। লোকটার গায়ে খুব শক্তি। সে আমার বুকে ছুরিটা বসিয়ে দেওয়ার বদলে, মনে হল যেন সে আমার একটা চোখ খুবলে নিতে চায়। প্রায় পেরেও গিয়েছিল। এই যে

আমার ভুরুর ওপর কাটা দাগ দেখছেন, এই পর্যন্ত ছুরিটা বসিয়ে দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে আমি অন্য হাত দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঘুসি কষালাম ওর মুখে। এবার ও ছিটকে পড়তেই আমি উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। তারপর শুরু হল মারামারি। ওর হাতে একটা লম্বা ছুরি ছিল বটে, আমিও লাঠিটা তুলে নিতে পেরেছি। আপনি জানেন দাদা, আমার হাতে লাঠি থাকলে কেউ ছুরি কিংবা তলোয়ার দিয়েও সুবিধে করতে পারে না। লোকটাকে কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি কষালাম বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধরে ফেলা গেল না। হঠাৎ একবার লাফিয়ে ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাল। অন্ধকারে তার মুখও দেখতে পাইনি।

কাকাবাবু বললেন, "তোমার চোখটা খুব জোর বেঁচে গেছে।"

কামাল বললেন, "সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানেন দাদা, পরদিন সকালে আবার ছাদে এসে দেখি আমাদের সেই মারামারির জায়গাটায় একটা পাথরের চোখ পড়ে আছে। নিশ্চয়ই এটা সেই আততায়ীর চোখ। যখন আমি ঘুসি মেরেছিলাম, তখন খুলে পড়ে গেছে!"

জোজো উত্তেজিতভাবে বলল, "পাথরের চোখ! কাকাবাবু, আপনার কাছে সেই যে একটা লোক এসেছিল, তারও একটা চোখ পাথরের।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "তার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। সন্তুর মনে হয়েছিল, সেই লোকটির দু'চোখের দৃষ্টি দু'রকম, অন্য কারণেও হতে পারে। কামাল, তোমার এই ঘটনাটা কবে ঘটেছিল?"

কামাল বললেন, "মাসদেড়েক আগে। ঠিক একমাস একুশ দিন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছে মাত্র দু'-চারদিন আগে একজন লোক এসেছিল, সম্ভবত তার পাথরের চোখ। কিন্তু সেই লোকই যে এখানে এসেছিল, তা কি বলা যায়? আরও অনেকের পাথরের চোখ থাকতে পারে।"

কামাল বললেন, "লোকটা চুরি-ডাকাতি করতে আসেনি। আমাকে ছাদে টেনে এনে খুন করতে চেয়েছিল, তার আগে একটা চোখ খুবলে নিয়ে—"

কাকাবাবু বললেন, "ইংরিজিতে প্রতিশোধের ব্যাপারে বলে, অ্যান আই ফর অ্যান আই, আ টুথ ফর অ-টুথ। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। তুমি কি কখনও কারও একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছ?"

কামাল জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "কক্ষনও না। আমি এখন ব্যবসা করি। লোকের সঙ্গে মারামারি করতে যাব কেন? সে কীসের প্রতিশোধ নিতে এসেছিল, তা কিছুই বুঝতে পারিনি। যদি আবার হামলা করে, সেইজন্য ছাদ ঘিরে দিয়েছি জাল দিয়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ করেছ। সাবধানে থাকাই ভাল। ক্রিমিনালদের মধ্যে কতরকম পাগল যে থাকে তার ঠিক নেই। প্রতিশোধের নেশাতেই তারা পাগল হয়ে যায়। জানো কামাল, ক'দিন আগে কেউ একজন আমার ঘরে গ্যাস

বোমা ছুড়ে মেরেছিল।"

কামাল আঁতকে উঠে বললেন, "গ্যাস বোমা ? এরকম তো আগে শুনিনি !"

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন "তাকে চিনতে পারা যায়নি। সে যদি আবার আসে, তাকে আমি এমন শাস্তি দেব !"

কামাল বললেন, "আপনি এবারে ক্ষমা করা বন্ধ করুন। অন্তত জেলে ভরে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।"

অংশু এতক্ষণ হাঁ করে সব শুনছিল। কামালের শেষ কথাটা শুনে সে মাথা নিচু করে ফেলল।

সবাই মিলে নেমে আসা হল নীচে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কামালকাকু, আপনি কখন আসছেন আমাদের ডাকবাংলোতে ?"

কামাল বললেন, "আজ তো আমার ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। এখন তো যেতে পারব না।"

জেজো বলল, "আফগানিস্তানের সেই গল্পটা শুনতে হবে না ? মাঝখানে এমন একটা জায়গায় থামিয়ে রেখেছেন !"

কামাল বললেন, "ঠিক আছে, সন্ধের পর যাব। বাকি গল্প শোনানো যাবে তখন। দিনের বেলা তোমরা একটা কাজ করতে পারো। পান্নার হিরের খনি ঘুরে এসো। গাড়ি তো আছেই সঙ্গে, ড্রাইভার চিনিয়ে নিয়ে যাবে।"

সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল বাজারের দিকে। অংশুর জন্য কেনা হল দু'জোড়া প্যান্ট-শার্ট, আর গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া। জোজো কিনে ফেলল একজোড়া চটি, সন্তু কিনল একটা মাউথ অর্গান।

বাজারে কত লোকজন, সবাই ব্যস্ত হয়ে কেনাকাটা করছে, দোকানদাররা খাতির করে ডাকছে খদ্দেরদের। একদল স্কুলের ছেলে একরকম পোশাক পরে চলে গেল গান গাইতে-গাইতে। একজন মোটামতন লোক রাস্তায় একটি ষাঁড়কে আদর করে কলা খাওয়াচ্ছে। কোথাও কোনও অশান্তি নেই, এখন মনেই হয় না যে পৃথিবীতে কত চোর-ডাকাত, খুনে-বদমাশও ঘুরে বেড়ায়।

গাড়ি ছুটল পান্নার দিকে।

কাকাবাবুর পাশে বসেছে অংশু, কাকাবাবু তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, "কী হে, মুখটা এমন গোমড়া করে আছ কেন ?"

জোজো বলল, "আপনি ওর ওপর এমন দায়িত্ব চাপিয়েছেন ! কবিতা মেলাতে হবে, ভেবে-ভেবে বেচারা ঘেমে যাচ্ছে !"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওকে একটা সোজা লাইন দিলে হয় না ? ধরো এইরকম : 'বৃষ্টি পড়ে কলকল, ভরে ওঠে নদীর জল।' জলের সঙ্গে অনেক মিল দেওয়া যায় ! ও পেরে যাবে !"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু ! আমার মাথায় প্রথম যে লাইনটা এসেছে, সেটার

সঙ্গেই মেলাতে হবে !"

জোজো বলল, "উল্লুকের সঙ্গে খুব ভাল মিল হয় মু—"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "এই, চুপ ! তোমরা কেউ কিছু বলবে না !"

সন্তুর কথা শুনে অংশুর মুখখানা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আবার নিভে গেল !

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, "দেখি সন্তু, মাউথ অর্গানটা কেমন কিনলি ! সুর ঠিক আছে কি না বাজিয়ে দেখতে হয় ।"

কাকাবাবু সেটাকে ভাল করে মুছেটুছে বাজাতে লাগলেন । বেশ ভালই বাজাতে পারেন তিনি । একটু পরে মুখ তুলে বললেন, "এটা কী গানের সুর বাজাচ্ছি, বুঝতে পারছিস ?"

সন্তু-জোজো দু'জনেই দু'দিকে মাথা নাড়ল ।

কাকাবাবু বললেন, "নজরুলের গান, একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল, 'কে বিদেশি মন-উদাসী, বাঁশের বাঁশি বাজায় বনে—' এইটা শুনেছিস, 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল—' ।"

বাকিটা রাস্তা কাকাবাবু বাজাতে-বাজাতে গেলেন ।

পান্নায় অবশ্য দেখার কিছু নেই । হিরের খনির মধ্যে ঢোকা যায় না, খুব কড়াকড়ি । এখানে কাকাবাবুকেও কেউ চেনে না । বাইরে থেকে হিরের খনির ব্যাপারটা বোঝাই যায় না । খানিকটা জায়গা উঁচু পাঁচিল আর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, স্টেনগান হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছে পুলিশ । একটা জায়গায় মাঠের মধ্যে পোড়া কয়লা আর ছাই স্তূপ হয়ে আছে । তার পাশের জমিতে চাষ করছে কৃষকরা ।

সেইখানে সন্তু, জোজো আর অংশু গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ ঘুরল । যদি মাঠের মধ্যে হঠাৎ একটা হিরে পাওয়া যায় ! কত হাজার হাজার লোক যে আগে এখানে খুঁজে গেছে, তা ওদের খেয়াল নেই ।

কাকাবাবু গাড়িতেই বসে আছেন, একসময় জোজো কাছে এসে বলল, "কাকাবাবু, ডান দিকের সরু রাস্তাটায় দেখুন, বড় একটা তেঁতুলগাছের নীচে একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ওই গাড়িটাকে সারা রাস্তা আমাদের পেছনে-পেছনে আসতে দেখেছি । নিশ্চয়ই কোনও স্পাই আমাদের ফলো করছে ।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? গাড়িটাতে ক'জন লোক আছে দেখেছ ?"

জোজো বলল, "ড্রাইভার আর একজন । ড্রাইভারের খাকি পোশাক, আর অন্য লোকটির চোখে কালো চশমা, সারামুখে দাড়ি ।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, কালো চশমা আর সারামুখে দাড়ি থাকলে সন্দেহ হতে পারে ঠিকই । স্পাই হতে পারে, ডিটেকটিভ হতে পারে, ডাকাত হতে পারে । কী বলো ? ড্রাইভার ছাড়া মোটে একজন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই ।

আরও কিছুক্ষণ খেলিয়ে দেখা যাক !”

জোজোর কথাটা মিথ্যে নয়। ফেরার পথেও নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা দেখা গেল মাঝে-মাঝে। কখনও খুব কাছে আসছে না। এক-একবার চোখের আড়ালেও চলে যাচ্ছে।

সন্তু বলল, “কাকাবাবু এক কাজ করলে হয়। এ-গাড়িটা চট করে একবার থামিয়ে আমাকে নামিয়ে দাও। আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকব। ফিয়াট গাড়িটা এলে দেখে নেব ভেতরে কে আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “দুর, ওসব দরকার নেই। ওর যদি স্বার্থ থাকে, ও নিজেই একসময় দেখা দেবে।”

কাকাবাবু আবার মাউথ অর্গানটা বাজাতে লাগলেন আপন মনে।

॥ ৭ ॥

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, এর মধ্যে কাকাবাবুর চা খাওয়া হয়ে গেছে তিনবার। সন্তু আর জোজো কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরল। কামাল এখনও আসেননি।

জোজো আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সে ছুটে এসে বারান্দায়-বসা কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “আপনাদের ডাকাতের দল ঘিরে ধরল, তারপর কী হল ?”

কাকাবাবু হাত নেড়ে বললেন, “কামাল আসুক, কামাল আসুক। অংশু কোথায়, তাকে দেখছি না !”

জোজো বলল, “দুপুরে তো ওপরের ঘরে ঘুমোচ্ছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “কাজে ফাঁকি মেরে ঘুম ? ওকে ডেকে নিয়ে এসো—”

জোজো ওপরতলা ঘুরে খানিক বাদে বলল, “কাকাবাবু, সে ঘরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই, কোথাও নেই, সে পালিয়েছে !”

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, “সত্যি পালাবে, এত সাহস হবে ?”

জোজো বলল, “সব জায়গায় তো দেখলাম। ওর ঘরে চা দেওয়া হয়েছিল, সেই চাও খায়নি। একটা নতুন জামা-প্যান্ট পরে গেছে, বাকিগুলো ফেলে গেছে।”

কাকাবাবু বললেন, “গেটের বাইরে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে এসো তো, অংশুকে বেরোতে দেখেছে কি না। ওরা নিশ্চয়ই নজর রাখছে।”

সন্তু কাছে এসে সব শুনে বলল, “আমি বাড়ির পেছন দিকটা খুঁজে দেখছি।”

সমস্তটা বাগানটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একপাশে নদী। পেছন দিকের

বাগানে কাঁচালঙ্কা, বেগুনগাছ লাগানো হয়েছে, বড় গাছ নেই, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে না। পাঁচিলের ওপাশে ঝোপঝাড়, খানিক দূরে পাহাড় শুরু হয়েছে।

পাঁচিল বেশ উঁচু হলেও সন্তু অনায়াসে উঠে বসল। ওপাশে অনেক ঝোপঝাড়। সূর্য ঢলে পড়েছে। আকাশের পশ্চিম দিকটা লালে লাল হলেও ঝোপঝাড়ে নেমে এসেছে অন্ধকার। লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়ল সন্তু।

খানিকটা এদিক-ওদিক খুঁজতেই সে একটা খসখস শব্দ শুনতে পেল। কেউ পা টিপে-টিপে যাচ্ছে।

সন্তু চেঁচিয়ে ডাকল, "অংশুদা, অংশুদা!"

অমনই কেউ জোরে ছুটতে শুরু করল। হলুদ-নীল ডোরাকাটা নতুন শার্টটা চিনতে পারল সন্তু। সে আবার বলল, "অংশুদা, দাঁড়াও, যাচ্ছ কোথায়? এদিক দিয়ে কোথায় যাবে?"

সে-কথায় কান না দিয়ে আরও জোরে ছুটল অংশু। কিন্তু সে সন্তুর সঙ্গে পারবে কেন? ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গোর সঙ্গে কোনও মানুষ দৌড়ে পারে! বুমচাক ডবাং ভুলু, বুমচাক ডবাং ভুলু বলতে বলতে যেন ঝড়ের মতন উড়ে যেতে লাগল সন্তু। একটু পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অংশুর কোমর ধরে ফেলল।

অংশু হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "আমায় ছেড়ে দাও ভাই সন্তু, আমায় ছেড়ে দাও। আমি পারব না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

অংশু বলল, "কবিতার লাইন ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি পাগল হয়ে যাব। তোমার কাকাবাবু এর চেয়ে আর যে-কোনও শাস্তি আমাকে দিন, আমি মাথা পেতে নেব। কবিতা মেলানো, ওরে বাপ রে বাপ, আমার দ্বারা সম্ভব নয়!"

সন্তু হো-হো করে হেসে উঠল।

অংশু কাতরভাবে বলল, "তুমি হাসছ? আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে তুমি বুঝতে পারবে না। ভাল্লুক, মাল্লুক, জাল্লুক, কাল্লুক, খাল্লুক শুধু এইসব মাথার মধ্যে ঘুরছে! এই দিয়ে পদ্য হয়? আমাকে বাঁচাও ভাই!"

হাসি থামিয়ে সন্তু বলল, "কবিতার জন্য কাউকে এত কষ্ট পেতে জীবনে দেখিনি! ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। কাকাবাবু তো একটা লাইন মেলাতে বলেছে, আমি বলে দিচ্ছি, মুখস্থ করে নাও! প্রথম লাইনটা কী ছিল, 'বনের ধারে ফেউ ডেকেছে, নাচছে দুটো উল্লুক'। এই তো? পরের লাইনটা, পরের লাইনটা, হ্যাঁ, এরকম হতে পারে, 'বাঘের হালুম শুনেই ভয়ে কাঁপছে সারা মুল্লুক!' কী, ঠিক আছে? মুখস্থ করতে পারবে?"

অংশু ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, পারব?"

সন্তু বলল, "ভাল করে মুখস্থ করে নাও। আর পালাবার চেষ্টা কোরো না!"

ফেরার সময় অংশু বিড়বিড় করে লাইনটা মুখস্থ করতে লাগল। পাঁচিলে ওঠার আগে সন্তু একবার তার পরীক্ষা নিল। অংশু ঠিক-ঠিক বলে দিল লাইন দুটো।

পাঁচিল টপকে এপাশে এসে সন্তু একটা লঙ্কাগাছ থেকে কয়েকটা লঙ্কা ছিঁড়ে নিল। অংশুর হাতে দিয়ে বলল, "কাকাবাবুকে বলবে, তুমি এদিকে লঙ্কা তুলতে এসেছিলে। রাত্তিরে ভাতের সঙ্গে খাবে।"

অংশু বলল, "আমি যে একেবারে ঝাল খেতে পারি না! লঙ্কা মুখে দিলেই পেট জ্বালা করে।"

সন্তু বলল, "খেতে হবে না। থালার পাশে রাখবে। এখন একটা কিছু বলতে হবে তো। আমি একটা লঙ্কা খেয়ে নেব।"

কাকাবাবুর হাতে আর এক কাপ চায়ের পেয়ালা। ওদের দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় পাওয়া গেল?"

সন্তু কিছু বলবার আগেই অংশু বলল, "ওদিকে কত লঙ্কার গাছ, আর বেগুন। বেগুনগুলো এখনও ছোট-ছোট, কিন্তু কত লঙ্কা হয়েছে, লাল-লাল, দেখতে কী সুন্দর লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি, বাঃ! তুমি বুঝি খুব লঙ্কার ভক্ত?"

অংশু হাতের মুঠো খুলে দেখিয়ে বলল, "হ্যাঁ, লঙ্কা ছাড়া ভাত খেতে পারি না। অনেক তুলে এনেছি। কাকাবাবু, লঙ্কার খেতে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ আমার মাথায় পদ্য এসে গেল। লাইনটা মিলিয়ে ফেলেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "লঙ্কার খেতে কবিতার প্রেরণা? এরকম বোধ হয় পৃথিবীতে আগে কখনও হয়নি। তা হলে শুনিয়ে দাও!"

অংশু জামার কলারটা ঠিক করে নিল, একবার গলাখাঁকারি দিল, তারপর বেশ জোর দিয়ে বলল,

নদীর ধারে শেয়াল ডাকছে, নাচছে একটা ভাল্লুক,
আর সবাই ভয় পেয়ে গেল, একটা বাঘ ডাকল হালুম!

জোজো খুকখুক করে হেসে ফেলল।

কাকাবাবু হাসতে গিয়েও গম্ভীরভাবে বললেন, "এ আবার কী কবিতা? কতবার বলেছি, ভাল্লুক নয়, উল্লুক, উল্লুক! প্রথম লাইনটাই মনে রাখতে পারো না? আর যদি ভাল্লুকও হয়, তার সঙ্গে হালুম আবার কী ধরনের মিল?"

অংশু আড়চোখে সন্তুর দিকে তাকাল। সন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে মুখ নিচু করে তার নিজের পায়ের জুতো দেখছে।

অংশু বলল, "ঠিকই বানিয়েছিলাম সার, কিন্তু আমি বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারি না।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, ধরে নিন এটা গদ্য কবিতা!"

কাকাবাবু বললেন, "না, না। ওসব চলবে না। একটা জিনিস বুঝতে

পারছি। ও ছন্দটাই ধরতে পারছে না। যার কানে ঠিক ছন্দটা ধরা পড়ে না, সে কবিতা লিখতে পারে না, তাই না ? সেইজন্য সকলে কবিতা লিখতে পারে না। কেউ পারে, কেউ পারে না।"

অংশু সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "ঠিক বলেছেন সার। কেউ পারে না। আমি সাতজন্ম চেষ্টা করলেও পারব না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলে নিষ্কৃতি নেই। কবিতা যারা লিখতে পারে না, তারাও পড়তে পারে। পড়ে-পড়ে মুখস্থ করতে পারে। অংশু, তুমি যে-কোনও কবিতার চার লাইন আমাকে মুখস্থ শোনাতে পারো ?"

অংশু মাথা চুলকে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "না সার, শুধু একটা হিন্দি গানের দু'লাইন মনে পড়ছে। শোনাব ?"

কাকাবাবু প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, "না, না, না, হিন্দি গান শোনাতে হবে না। আমি বলছি বাংলা কবিতা। একটা কবিতাও জানো না ! যে বাঙালির ছেলে একটা বাংলা কবিতাও মুখস্থ বলতে পারে না, তার জেল হওয়া উচিত। জোজো, কাগজ-পেন্সিল এনে দাও তো ওকে !"

জোজো দৌড়ে একটা প্যাড আর ডট পেন নিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, "ওকেই লিখতে দাও। যদি বানান ভুল করে, ঠিক করে দিয়ো।"

তারপর কাকাবাবু ডিকটেশান দিলেন :

শুনেছো কী বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ
টক টক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে, একেবারে মিষ্টি !

জোজো দুষ্টুমি করে বলল, "কাকাবাবু, এই কবিতাটা আপনার খুব ফেভারিট, তাই না ? এটা সুর করে আপনাকে গান গাইতেও শুনেছি। আপনি বুঝি আর অন্য কোনও কবিতা জানেন না ?"

কাকাবাবু বললেন, "কী ? সুকুমার রায়ের সব কবিতা আমার মুখস্থ। শুনবে ?"

এই সময় গেটের সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। তার থেকে নামলেন কামালসাহেব। জোজো অমনই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "গল্প, এবার গল্প শোনা হবে।"

কাকাবাবু অংশুকে বললেন, "তোমাকে কাল দুপুর পর্যন্ত মুখস্থ করার সময় দিলাম।"

কামালসাহেব একটা বড় ঠোঙাভর্তি গরম-গরম শিঙাড়া নিয়ে এসেছেন। টেবিলের ওপর ঠোঙাটা রেখে বললেন, "সাতনার শিঙাড়া খুব বিখ্যাত, ভেতরে কিশমিশ আর পেস্তা, বাদাম দেওয়া থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে ইউসুফকে আর এক রাউন্ড চা বানাতে বলে দাও।"

একটু পরে শুরু হল আফগানিস্তানের গল্প।

কামাল জিজ্ঞেস করলেন, "কাল কোথায় যেন থেমে ছিল?"

জোজো বলল, "কাকাবাবু বাঘটাকে দেখে বন্দুক ছুড়লেন। বাঘটা পালাল কিন্তু সেই শব্দ শুনে ডাকাতের দল এসে ঘিরে ফেলল।"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ, ছ'-সাতজন ডাকাত। প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেল। ওরা ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ওই পথে যাতায়াত করে, ডাকাতের দল অতর্কিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সব লুটপাট করে নেয়। মেরেও ফেলে। আমরা অত কিছুই জানতাম না, আমাদের সঙ্গে দামি কোনও জিনিসও ছিল না। ছ'-সাতজন ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করারও প্রশ্ন ওঠে না। ওদের দেখেই আমরা হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের ভাষা কিছুই বুঝি না। আমি কিছুটা পুস্তু ভাষা শিখেছিলাম। কিন্তু ওইসব পাহাড়ের দিকে আরও অনেক ভাষা আছে। আমার কথাও ওরা বুঝল না। মারধোরও করল না বটে, ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল। কামাল, আমাদের নদীও পার হতে হয়েছিল, তাই না?"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ, এক জায়গায় পাহাড়ের বাঁকে নদী খানিকটা সরু হয়ে গেছে, কিন্তু খুব স্রোত। সেইখানে আমাদের ঘোড়াসুদ্ধু পার হতে হল। আমাদের অসুবিধে হয়নি, কিন্তু ডাকাত দলেরই একটা লোক নদীতে পড়ে গিয়ে খুব হাবুডুবু খেল!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ ঠিক। তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা গুহার মুখে। সেখানে আরও কিছু লোক আগুন জ্বেলে বসে আছে। যদিও গ্রীষ্মকাল, কিন্তু একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। সেখানেই বসে ছিল ডাকাত দলের আসল সর্দার, তার নাম জাভেদ দুরানি।"

কামাল বললেন, "তার চেহারার একটু বর্ণনা দিই? কাবুলিওয়ালারা এমনই সবাই লম্বা-চওড়া হয়, কিন্তু এই লোকটি যেন একটি দৈত্য। যেমন মোটা, তেমনই লম্বা, হাত দু'খানা গদার মতন, বুকটা যেন লোহার দরজা, সারা মুখের দাড়িতে মেহেদি রং লাগানো। চোখ দুটো ঠিক বাঘের মতন। একটা পাথরের ওপর বসে সে গড়গড়ার তামাক টানছিল। তাকে দেখলেই ভয় হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "জাভেদ দুরানি অবশ্য ইংরিজি জানে। তাতে খানিকটা সুবিধে হল। আমি কাকুতি-মিনতির সুরে সেই ডাকাতের সর্দারকে বললাম, 'আমরা সামান্য পর্যটক, আমাদের সঙ্গে দামি কোনও জিনিস নেই, আমাদের মতন চুনোপুঁটিকে মেরে আপনি হাত গন্ধ করবেন কেন? আমাদের ছেড়ে

দিন।’ তাই শুনে জাভেদ দুরানি অট্টহাস্য করে উঠল। ঠিক মেঘের ডাকের মতন সেই হাসির আওয়াজ। তারপর বলল, ‘এখানে তো কেউ এমনি-এমনি বেড়াতে আসে না। তোমরা কী মতলবে এসেছ, ঠিক করে বলো!’ আমি তখন বললাম, ‘আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে খুব আগ্রহ আছে। আফগানিস্তান আর রাশিয়ার সীমান্তের এক জায়গায় পাহাড়ে সম্রাট অশোকের শিলালিপি আছে বলে শুনেছি, মানে পড়েছি, আমরা সেই শিলালিপির ছবি তুলে আনব। এর অন্য কোনও দাম নেই। শুধু ইতিহাস নিয়ে যারা চর্চা করে, তাদের কাজে লাগবে!” ’

সন্তু বলল, “কিন্তু কাকাবাবু, তুমি বলেছিলে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য ছিল হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত। তুমি যে-জায়গাটার কথা বলছ, সেটা তো আরও অনেক দূরে। সেখানে অশোকের শিলালিপি থাকবে কী করে?”

কাকাবাবু আর কামাল পরস্পরের দিকে তাকালেন। দু'জনেই হাসলেন।

কামাল বললেন, “দাদা, আজকালকার ছেলেরা অনেক কিছু জানে। অনেক বেশি পড়ে। টিভিতে কতরকম ছবি দেখে। এদের ধোঁকা দেওয়া শক্ত।”

কাকাবাবু বললেন, “তুই ঠিক ধরেছিস সন্তু। অশোকের শিলালিপি-টিপির কথা আমরা বানিয়েছিলাম। সেসব কিছু নেই। আমরা আসলে অন্য একটা জিনিস খুঁজতে গিয়েছিলাম। সেটা ওদের বলতে চাইনি।”

কামাল বললেন, “ডাকাতদলের লোকরা সন্তুর মতন ইতিহাস-ভূগোল কিছু জানে না। তবু ওদের মধ্যে একজন আমাদের কথায় সন্দেহ করেছিল। সে বলে উঠল, “এত সামান্য কারণে কেউ এতদূর আসে না। নিশ্চয়ই এদের অন্য কোনও মতলব আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “সেই লোকটির নাম অবোধরাম পেহলবান। যদিও অবোধরাম নাম, মুখখানা সূচলো মতন, চোখ দুটো দুষ্টু বুদ্ধিতে ভরা। ওকে ডাকাতদলের মধ্যে দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। সে লোকটি ভারতীয়। আফগানিস্তানে অবশ্য হিন্দু-মুসলমানে কোনও ঝগড়া নেই, তখন ভারত থেকেও অনবরত লোকজন যাতায়াত করত। ওই ডাকাতদলের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক ছিল অবোধরামের। ডাকাতরা লুটপাট করে যেসব জিনিসপত্র পেত, সেসব বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে তো, অবোধরাম করত সেই কাজ। অবোধরামের চেহারাটাও বেশ শক্তিশালী, পেহলবান তো, তার মানে পালোয়ান।”

কামাল বললেন, “কেন জানি না, বাঙালিদের ওপরে অবোধরামের খুব রাগ। সে আবার বলল, ‘বাঙালিরা ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল হয়। তারা এতদূর এসেছে, তাও মাত্র দু'জন, এরা নিশ্চয়ই সরকারের চর। এদের বন্দুক-পিস্তল কেড়ে নিয়ে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হোক।’ ডাকাতের সর্দার জাভেদ দুরানিও বলল, ‘ঠিক। বাঙালি কাওয়ার্ড, বাঙালি লড়াই করতে জানে না, শত্রুর

সামনে পড়লে বাঙালি কাপড় নষ্ট করে ফেলে, তোমরা দু'জন মাত্র বাঙালি এই পথে এসেছ, জানো না, এখানে কত বিপদ হতে পারে ? কীজন্য এসেছ, ঠিক করে বলো !'"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তখন বললাম, 'সর্দার, তুমি বাঙালিদের এত নিন্দে করছ, তুমি জানো না, স্বদেশি আমলে বাঙালিরা কত লড়াই করেছে ইংরেজদের সঙ্গে ? বাঙালিরাই প্রথম বোমা বানাতে শিখিয়েছে। চট্টগ্রাম পাহাড়ে বাঙালি ছেলেরা ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।' তাই শুনে জাভেদ বলল, 'ওসব শুনতে চাই না। তোমরা আমার দলের কারও সঙ্গে লড়তে পারবে ? সে হিম্মত আছে ? যে-কেউ তোমাদের ঘাড় মটকে দেবে।' কামাল অমনই লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমি লড়তে রাজি আছি। কার সঙ্গে লড়তে হবে বলুন !'"

কামাল বললেন, "বাঙালিদের অত নিন্দে শুনে আমার রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম, এদের হাতে যদি মরতেই হয়, লড়াই করেই মরি !"

কাকাবাবু বললেন, "কামালের সঙ্গে যে লড়াই করতে এল, তার প্রায় ডবল চেহারা। থাবার মতন দুটো হাত তুলে তেড়ে এল। কিন্তু কুস্তি তো শুধু গায়ের জোরে হয় না, বুদ্ধি লাগে। লোকটা একেবারে মাথামোটা। কামাল তো মরিয়া হয়ে দারুণ কায়দায় লড়ে গিয়ে খানিক বাদেই তাকে উলটে ফেলে দিল। আমি কিন্তু প্রথমটায় ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু কামাল অসাধারণ সাহস দেখিয়েছে, বাঙালির মান রেখেছে।"

কামাল বললেন, "আর আপনি কী করলেন দাদা ? তার কোনও তুলনা হয় না। আমি জিতে যেতেই ডাকাতের সর্দারের মুখখানা রাগে গনগনে হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের খাপ থেকে সড়াত করে তলোয়ার টেনে বার করে তোমাদের কাকাবাবুকে সে বলল, 'এবার তুমি আমার সঙ্গে লড়ো !' তার যা গায়ের জোর, এক কোপেই সে মুণ্ডু কেটে ফেলতে পারে। এ তো কুস্তি নয়, ওদের তলোয়ার চালাবার কত অভ্যেস আছে। আমি ভাবলাম, এইবার শেষ, প্রথমে রাজাদাদাকে মারবে, তারপর আমাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের কলেজ জীবনে ওয়াই. এম. সি. এ-তে ফেনসিং শেখানো হত। আমি সেখানে দু'বছর শিখেছিলাম, মোটামুটি ভালই পারতাম। তারপর অনেকদিন অভ্যেস ছিল না। কী আর করি, রাজি হয়ে গেলাম। আমাকে একটা তলোয়ার দেওয়া হল, সবাই সরে গিয়ে মাঝখানের জায়গাটা খালি করে দিল। ওই বিশাল দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করার কথা ভাবতেই আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। ও যদি আমাকে একটা ঘা মারতে পারে, তা হলেই আমার শেষ ! চেষ্টা করতে হবে, যাতে ও কিছুতেই আমাকে ছুঁতে না পারে। তখন তো আর আমার পা খোঁড়া ছিল না, লাফাতে পারতাম, ছুটতে পারতাম খুব। আমি জাভেদ দুরানিকে ঘিরে লাফাতে লাগলাম শুধু, ও

তলোয়ার চালাচ্ছে আর আমি সরে যাচ্ছি। ইঁদুর-বেড়াল খেলা চলতে লাগল। মিনিট পনেরো এইরকম চালাবার পর একবার মাত্র ওকে একটু অন্যমনস্ক করে দিতেই আমি ওর ঠিক হাতের মুঠোর কাছে প্রাণপণে দিলাম এক আঘাত। ওর তলোয়ারটা শূন্যে উড়ে গিয়ে অনেক দূরে পড়ল, আমি আমার তলোয়ারের ডগা ঠেকালাম ওর বুকে।"

কামাল বললেন, "দাদা, আপনি মোটেই ভয় পাননি। প্রথম থেকেই আপনার ঠোঁটে হাসি ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ভেতরে ভয় ছিল ঠিকই। তবু মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে রাখতে হয়। তাতে প্রতিপক্ষ একটু হকচকিয়ে যায়।"

কামাল বললেন, "বুকে তলোয়ার ঠেকানো মানেই চূড়ান্ত পরাজয়। কিন্তু দাদা তবু ডাকাতের সর্দারকে বললেন, 'তলোয়ারটা কুড়িয়ে এনে আবার লড়তে চান?' সে খনখনে গলায় বলল, 'না, তুমি জিতেছ। এবার আমাকে মেরে ফেলো। আমাদের এখানকার নিয়ম, যে হারে, তাকে মরতে হয়। তুমি মারো আমাকে।' দাদা বললেন, 'না, আমি মানুষ মারি না।' সর্দার ধমক দিয়ে বলল, 'শিগ্‌গির মারো বলছি, নইলে আমার অপমান হবে।' দাদা বললেন, 'তলোয়ার খেলতে বলেছিলে, খেলেছি। তোমাকে মারব কেন? আমি কাউকে মারতে চাই না।' এই বলে দাদা নিজের হাতের তলোয়ারটাও ফেলে দিলেন। অন্য ডাকাতরা সবাই হাতে তলোয়ার কিংবা বন্দুক উঁচিয়ে ধরে আছে। অবোধরামের হাতে রিভলভার। জাভেদ দুরানি হাত তুলে সবাইকে বললেন, 'থামো!' তারপর দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার কাছে কী চাও বাঙালি? এ-পর্যন্ত আর কেউ আমার হাত থেকে তলোয়ার খসাতে পারেনি। বাঙালিদের সম্পর্কে আমার ভুল ধারণা ছিল।'"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তখন সর্দারকে একটু তোষামোদ করে বললাম, 'সর্দার, তুমি প্রকৃত বীর। যে-কোনও খেলাতেই জয়-পরাজয় আছে। জয়ের মতন পরাজয়টাও মেনে নিতে হয়। এবার আমি জিতেছি, পরেরবার নিশ্চয়ই তুমিই জিততে। এটা একটা খেলা, খুনোখুনি করার কী দরকার! আমরা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা চলে যাই।'"

কামাল বললেন, "সর্দার তখন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দাদার কাঁধ চাপড়ে বলেছিলেন, 'তোমরা শুধু-শুধু পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে যাবে কেন? আবার অন্য দলের হাতে পড়বে। তার চেয়ে বরং আমাদের দলে যোগ দাও। অনেক টাকা পাবে। অনেক টাকা।" '

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ ঠিক, আমাদেরও ডাকাতের দলে ভর্তি করে নিতে চেয়েছিল বটে। আমি হাত জোড় করে বলেছিলাম, 'মাফ করো সর্দার, ডাকাতি করা আমাদের ধাতে সইবে না। আমরা শহরের লোক, দু'-চারদিন পাহাড়ে

ঘোরাঘুরি করে আবার শহরে ফিরে যাব।' সর্দার তখন আমাকে একটা পাঞ্জা দিল। লোহার তৈরি একটা মেডেলের মতন। সেটা আমার বাড়িতে এখনও আছে। সর্দার বলেছিল, 'পথে অন্য ডাকাতের দল ধরলেও ওই পাঞ্জাটা দেখালে ছেড়ে দেবে। ওই অঞ্চলের সবাই জাভেদ দুরানিকে ভয় পায়।'"

কামাল বললেন, "অবোধরাম পেহেলবান তখনও বলেছিল, 'সর্দার, এদের এভাবে ছাড়বেন না। এরা এই আস্তানাটা চিনে গেল, এর পর এখানে পুলিশ নিয়ে আসবে।' সর্দার তাকে এক ধমক দিয়ে বলেছিল, 'চোপ! আমার কথার ওপর কেউ কথা বলবে না।'"

কাকাবাবু বললেন, "সর্দারের একজন লোক নদী পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে এল। নদী পার হয়ে শুরু হল আমাদের যাত্রা।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওই পথে যে তোমাদের ওরকম বিপদ হতে পারে, তা তোমরা আগে আন্দাজ করতে পারোনি?"

কাকাবাবু বললেন, "বিপদের ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ইতিহাসের যারা চর্চা করে, তাদের অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মহেঞ্জোদরো-হরপ্পা আবিষ্কার করছিলেন মরুভূমির মধ্যে, তখনও সেখানে ডাকাতরা আক্রমণ করেছিল।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ওই পাহাড়ে আর অন্য লোকজন যায় না?"

কাকাবাবু বললেন, "যাবে না কেন? লোকজন যাতায়াত না করলে ডাকাতরাই বা আসবে কেন? তবে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যায়, তারা যায় দল বেঁধে, অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জন, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র থাকে, ডাকাতরা তাদের কাছে ঘেঁষে না। ছোট দল হলেই বিপদ।"

সন্তু বলল, "তোমরা মাত্র দু'জন গিয়েছিলে কেন? সঙ্গে আরও অনেক লোক নিয়ে যেতে পারতে না?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক লোক নিতে অনেক টাকা লাগে। আমরা যে জিনিসটার খোঁজে যাচ্ছিলাম, সেটা যে আছেই, তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না। অনেকেই বিশ্বাস করেনি। অনেকটা ইংরিজিতে যাকে বলে, ওয়াইল্ড গুজ চেইজ। ভারত সরকার সেইজন্য আমাদের বেশি সাহায্য করেনি। আফগানিস্তান সরকারের সাহায্যও চেয়েছিলাম, তারা আমাদের প্রস্তাবে পাত্তাই দেয়নি। সেইজন্যই আমরা মাত্র দু'জন গিয়েছিলাম। ছোট দল থাকার সুবিধেও আছে। ইচ্ছেমতন যেখানে খুশি যাওয়া যায়, যে-কোনও জায়গায় লুকিয়ে পড়া যায়।"

জোজো বলল, "তারপর? তারপর?"

কামাল বললেন, "তার পরের দিন আমরা একটা গ্রামে পৌঁছে বিশ্রাম নিলাম। গ্রামের মানুষগুলো ভারী সরল হয়। ওই গ্রামের একটা লোক এক সময় কলকাতায় এসে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা করত। তখন বেশ বুড়ো হয়ে

গেছে। আমরা বাঙালি শুনে কী খাতিরই করল ! থাকার জন্য একটা ঘর দিল, খাওয়াদাওয়ার জন্য কিছুতেই পয়সা নিতে চায় না। সে কলকাতায় ভবানীপুরে থাকত, বারবার সেই গল্প করতে লাগল।”

কাকাবাবু বললেন, “শেষ পাহাড়টায় পৌঁছতে আমাদের আরও দু’দিন লেগেছিল, তাই না কামাল ?”

কামাল বললেন, “না, তিনদিন। পথে সেরকম কোনও বিপদ হয়নি। একটা গাছের ডালে চোট লেগে আমি একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলাম শুধু। আর ডাকাতের পাল্লায় পড়তে হয়নি। অন্য ডাকাতরা বোধ হয় জেনে গিয়েছিল যে, আমাদের কাছে জাভেদ দুরানির পাঞ্জা আছে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই মনে হত, কেউ আমাদের পেছন-পেছন আসছে। আমাদের অনুসরণ করছে। একবারও দেখতে পাইনি, কিছু-কিছু শব্দ শুনে সন্দেহ হত। শজারুটার কথা মনে আছে দাদা ?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, তোরা শজারু দেখেছিস ? এখন বিশেষ দেখা যায় না, প্রাণীটা খুব কমে গেছে। সারা গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা থাকে, যখন দৌড়ে যায়, ঝমঝম শব্দ হয়। একদিন রাত্তিরে তাঁবুতে শুয়ে ওইরকম ঝমঝম শব্দ শুনে চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, কোনও মেয়ে নাচছে বুঝি ! কামাল বলেছিল, ‘এরকম বনের মধ্যে এত রাতে মেয়ে কোথা থেকে আসবে, নিশ্চয়ই কোনও পেত্নি !’”

কামাল হেসে বলল, “হ্যাঁ, সেরকমই মনে হয়েছিল বটে ! তারপর টর্চের আলো ফেলে সেটাকে দেখা গেল। গায়ে অত কাঁটা থাকলেও শজারুর মাংস খুব সুস্বাদু। এক গুলিতে ওটাকে মেরে ফেলা যেত। কিন্তু বন্দুকের শব্দ হলে যদি আবার কোনও ঝঞ্ঝাট হয়, তাই লোভ সামলেছি।”

গল্পের মাঝখানে ইউসুফ মিঞা এসে বললেন, “এখন আপনাদের খাবার দেব সার ?”

সন্তু চেঁচিয়ে বললেন, “না, এখন না, এখন না, একটু পরে।”

ইউসুফ মিঞা বলল, “ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে !”

সন্তু বলল, “পরে আবার গরম করে দেবেন !”

কামাল একটা হাই তুলে বললেন, “এই পর্যন্তই আজ থাক বরং। ইউসুফ মিঞার রান্না দ্বিতীয়বার গরম করলে আর আগের মতন স্বাদ পাওয়া যায় না আমাকেও এবার উঠতে হবে।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কামাল, তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে না ?”

কামাল বললেন, “না দাদা, আমার ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে থাকবে। আমি ওদের সঙ্গে রোজ রাত্তিরে খেতে বসি। দিনের বেলা সময় পাই না, ওরাও স্কুলে যায়। সেইজন্যই আমি রাত্তিরে বাইরে কোথাও খেতে যাই না।”

জোজো বলল, “আর একটু বসুন। আর একটুখানি শুনি গল্পটা।”

এই সময় বাইরে হঠাৎ পুলিশের হুইশ্‌ল বেজে উঠল। দু'জন পুলিশ ছুটে এল। গেটের কাছে দেখা গেল একজন সাদা পোশাকপরা মানুষ।

কামাল আর সন্তুও দৌড়ে গেল গেটের দিকে। তার আগেই পুলিশ সেই লোকটাকে ধরে ফেলেছে।

লোকটি কাঁচুমাচুভাবে বলল, "আমি একটা চিঠি দিতে এসেছি। একজন আমাকে একশো টাকা দিয়ে বলল, এই বাংলোর সাহেবকে একটা চিঠি পৌঁছে দিতে।"

লোকটি একটা খাকি লম্বা খাম বার করে দিল। তার মধ্যে ইংরিজিতে টাইপ করা একটা চিঠি। চিঠিখানা কাকাবাবুকে উদ্দেশ করে লেখা :

রাজা রায়চৌধুরী,

আপনি আমাকে একবার হাতেনাতে ধরে ফেলেও ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাকে আপনি ইচ্ছে করলে মেরে ফেলতে পারতেন, কিংবা পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন। তার কোনওটাই আপনি করেননি। সে-কথা আমি কখনও ভুলব না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। সেইজন্যই আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি খবর পেয়েছি, এখানে আপনার আরও কিছু শত্রু আছে। আপনার যে-কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। আমি সাধ্যমতন তাদের আটকাবার চেষ্টা করব। তবুও আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত

সূরযপ্রসাদ

কাকাবাবু চিঠিখানি পড়ে বললেন, "এ কী, এ তো আমাকে ভয়-দেখানো চিঠি নয়। আমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছে। এরকম চিঠি তো আমায় কেউ লেখে না!"

কামাল বললেন, "সূরযপ্রসাদ নিজের নাম দিয়ে আপনাকে এরকম চিঠি লিখেছে? অতি আশ্চর্য ব্যাপার! তাকে আপনি নাকখত দিইয়েছিলেন, সে-অপমান সে ভুলে যাবে?"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওই সূরযপ্রসাদকে আপনি কোথায় ধরেছিলেন? কেন নাকখত দিইয়ে ছিলেন?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আরে, সে তো আর-একটা গল্প। একসঙ্গে কত গল্প শোনাব?"

॥ ৮ ॥

খাজুরাহো মন্দির দেখতে যাওয়ার পথে কাকাবাবু অংশুর পরীক্ষা নিলেন। ভোর থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের অবস্থা দেখলে মনে হয়, সহজে এ-বৃষ্টি থামবে না। আজকের দিনটা ঠিক মন্দির দেখতে যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ খাজুরাহো মন্দিরের এলাকাটা অনেকটা বড়। বেশ কয়েকটা মন্দির আছে, সেইসব মন্দিরের দেওয়ালের কারুকাজ দেখতেই দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসে। ভেতরে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না, পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়। বৃষ্টিতে একদম ভিজে যেতে হবে।

কিন্তু সকালবেলা আর কিছুই করার নেই। কামাল সকালে আসতে পারবেন না, তাই আফগানিস্তানের গল্পও জমবে না। সেইজন্য কাকাবাবু সদলবলে স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। চলন্ত গাড়ি থেকে দু'পাশের সবুজ গাছপালার বৃষ্টিতে স্নান করার দৃশ্য দেখতেও ভাল লাগে।

খানিকটা যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অংশু সেই কবিতাটা মুখস্থ হয়েছে?"

অংশু বলল, "হ্যাঁ সার। তবে আমার মনে হয়, কবিতাটায় ভুল আছে। একটু বাদ পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, "তাই নাকি? বাদ পড়ে গেছে? কী বাদ পড়েছে?"

অংশু বলল, "আপনি ফার্স্ট লাইনটা বলেছিলেন, 'শুনেছো কী বলে গেল সীতারাম বন্দ্যো, তাই না? ওটা সার বন্দ্যোপাধ্যায় হবে না?'"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারে, ব্যানার্জি হতে পারে। এমনও হতে পারত, শুনেছ কী বলে গেল সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ পাওয়া যায়! কিন্তু কবি তো তা লেখেননি! কবি যেরকম লিখেছেন, সেরকমই মনে রাখতে হবে।"

অংশু বলল, "তা হলে বলছি, শুনুন।

শুনেছ কী বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশে খুব টক টক গন্ধ
সেরকম টক টক থাকে না যদি হয় বৃষ্টি
তখন চেটে দেখো, ইয়ে, তখন চেটে দেখেছি
চিনির মতন মিষ্টি

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, অনেকটা হয়েছে। কিন্তু পুরোটা ঠিক হয়নি।"

জোজো প্রবল প্রতিবাদ করে বলে উঠল, "অনেকটা মানে কী? কিচ্ছু হয়নি। কবিতাটা মার্ডার করে দিয়েছে। কবিতার একটা শব্দও বদলানো যায় না। একটা শব্দ ভুল হলেই পুরো কবিতাটা নষ্ট হয়ে যায়। চিনির মতন মিষ্টি,

না গুড়ের মতন মিষ্টি, না জিলিপির মতন মিষ্টি, তা কি আছে কবিতার মধ্যে ?”

জোজোর রাগ দেখে কাকাবাবু হেসে ফেললেন।

সন্তু অংশুর ফ্যাকাসে মুখ দেখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, “আহা, অনেকটা তো চেষ্টা করেছে। আর একটু চেষ্টা করলেই ঠিক-ঠিক মুখস্থ হয়ে যাবে।”

জোজো বলল, “কবিতায় শব্দ ভুল করলেই সেটা খুব বাজে হয়ে যায়। সেরকম কবিতা শুনলে আমার গা কিরকির করে।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে জোজো, তুমি আমাদের একটা ভাল কবিতা শোনাও বরং।”

জোজো অমনই শুরু করল !

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা সাতটা গাড়ি !
ছিল কুকুর, ছিল বিড়াল, নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ'সাত জোড়া ;
দেউড়ি ভরা দোবে-চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস বেহারা চাপরাশি
—আর ছিল এক মাসি ...

সন্তু বলল, “এটা যে খুব লম্বা কবিতা রে !”

কাকাবাবু বললেন, “তা হোক, শুনি। মন দিয়ে শোনো অংশু, এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ...”

প্রায় ছ'পাতার কবিতা নির্ভুল মুখস্থ বলে গেল জোজো। কাকাবাবু তার পিঠ চাপড়ে বললেন, “চমৎকার। সত্যি, জোজো খুব ভাল আবৃত্তি করে। ওর অনেক গুণ আছে।”

জোজো বলল, “বাবার সঙ্গে একবার সুইডেনে গিয়েছিলাম, রাজা-রানির সামনে এই কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাতে হল। রানি তো শুনে কেঁদেই ফেললেন।”

সন্তু নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, “সুইডেনের রানি বুঝি বাংলা জানেন ?”

জোজো সগর্বে বলল, “তুই জানিস না ? রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর সুইডেনের সব শিক্ষিত লোকই বাংলা পড়ে।”

সন্তু বলল, “ইস, তোকে একটা নোবেল প্রাইজ দিল না ?”

জোজো বলল, “আমি যখন লিখতে শুরু করব, তখন দেবে, দেখে নিস !”

কাকাবাবু বললেন, “জোজো লিখতে শুরু করলে গল্পের কোনও অভাব হবে না !”

অংশু সাধারণত অন্যদের কথার সময় চুপ করে থাকে। এখন সে বলল, “সার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?”

কাকাবাবু বললেন, "তুমি সবসময় আমাকে সার-সার করো কেন ? সন্তু-জোজোর মতন তুমিও কাকাবাবু বলতে পারো। আমার সমান বয়েসীও অনেকে এখন আমাকে কাকাবাবু বলে !"

অংশু উৎসাহিত হয়ে বলল, "আপনি আমাকে পারমিশান দিচ্ছেন ? আমিও আপনাকে কাকাবাবু বলতে পারি সার ? আচ্ছা কাকাবাবু, এখানে এসে শুনছি, আপনার অনেক শত্রু। কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন ? আচ্ছা, তোমার কথাই ধরা যাক। তুমি ট্রেনে ডাকাতি করতে এসেছিলে, তোমাকে ধরে যদি আমি পুলিশের হাতে তুলে দিতাম, তা হলে তোমার অন্তত তিন-চার বছর জেল হত। জেলে বসে-বসে তুমি ভাবতে, ওই খোঁড়া লোকটার জন্যই আমি ধরা পড়লাম। ঠিক আছে, ব্যাটাকে দেখে নেব ! জেল থেকে বেরিয়ে তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে। সেরকম অনেক ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর লোককে আমি ধরে ফেলেছি, শাস্তি দিয়েছি, আবার ক্ষমাও করেছি। তারা অনেকেই আমার শত্রু হয়ে আছে। আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। এ পর্যন্ত কেউ কিন্তু আমাকে মারতে পারেনি।"

জোজো বলল, "আমার বাবা আপনার নামে একটা যজ্ঞ করেছেন। তার ফল কী হয়েছে জানেন কাকাবাবু ? আপনার এখন ইচ্ছা-মৃত্যু। আপনাকে অন্য কেউ মারতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যদিও যজ্ঞ-টজ্ঞতে বিশ্বাস করি না, তবু যাই হোক, তোমার বাবাকে ধন্যবাদ !"

অংশু বলল, "যদি আপনাকে কেউ গুলি করে দেয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কাছেও তো পাইপগান ছিল, তুমি তো গুলি করতে পারলে না ?"

অংশু সন্তুর দিকে তাকাল। তারপর বলল, "সন্তুকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। ও যে হঠাৎ অতটা লাফিয়ে উঠতে পারে—"

জোজো মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। এবার বলল, "কাকাবাবু, কালকের সেই নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা আজও পেছন-পেছন আসছে—"

কাকাবাবুও মুখ ঘোরালেন, কিন্তু গাড়িটা দেখতে পেলেন না।

জোজো বলল, "এইমাত্র আড়ালে চলে গেল।"

দিনের বেলা পুলিশের গাড়িটাকে সঙ্গে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির জন্য রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া খুব কম। বৃষ্টি ক্রমশই বাড়ছে। একটু পরে বৃষ্টির এমন তোড় হল যে, সামনের কিছু দেখাই যায় না।

কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, "গাড়ি থামাও, এখন চালাবার দরকার নেই। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।"

গাড়িটা থামানো হল রাস্তার একপাশে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ফ্লাস্কে করে চা আনা হয়েছে না ? বার কর, এখন একটু চা খাওয়া যাক।"

জোজো বলল, "অনেক স্যান্ডউইচও দিয়ে দিয়েছে। আমার একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে।"

বাইরে ঝম্‌ঝম করছে বৃষ্টি। গাড়ির সব কাচ তোলা। সবাই স্যান্ডউইচ আর চা খেতে লাগল, ড্রাইভারকেও দেওয়া হল।

একটা জিপগাড়ি এই গাড়িটা ছাড়িয়ে চলে গিয়ে থেমে গেল। তারপর আবার পিছিয়ে এল। মনে হল, এই গাড়িটাও যেন এখানে একটা বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।

জিপ থেকে নেমে দৌড়ে এল দু'জন লোক। এ-গাড়িটার দু'পাশে দাঁড়াল। জোজো একটা জানলার পাশে বসে আছে, তার কাছে দাঁড়িয়ে একজন লোক কী যেন বলতে লাগল। কাচ বন্ধ বলে কিছু শোনাই যাচ্ছে না।

কাকাবাবু বলল, "জোজো, কাচটা খোলো। দেখো তো, ওরা কী চাইছে।"

জোজো কাচ খুলতেই সেই লোকটি জোজোর বুকের দিকে একটা রিভলভার তুলল। অন্য লোকটির হাতেও রিভলভার।

এদিকের লোকটি হিন্দিতে বলল, "নামো, নেমে এসো গাড়ি থেকে।"

কাকাবাবুর এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাত কোমরের কাছে। লোকটি কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলল, "হাত তুলবে না, ওই অবস্থায় নেমে এসো।"

কাকাবাবু সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বৃষ্টির মধ্যে নামব কেন ?"

লোকটি বিশ্রী একটা গালাগালি দিয়ে বলল, "শিগ্‌গির নাম, নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব !"

কাকাবাবু বললেন, "এ কী কাণ্ড, এ যে দেখছি দিনে ডাকাতি !"

হঠাৎ কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগল সেই লোকটির কাঁধে। সে পড়ে গেল মাটিতে। অন্য লোকটি ছুটে চলে গেল একটা গাছের আড়ালে। সেও গুলি চালাল, এই গাড়ির দিকে নয়, পেছন দিকে।

কাকাবাবুরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, খানিক দূরে থেমে আছে একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি। তার জানলা দিয়ে বেরিয়ে আছে একটা রাইফেলের নল।

এ-গাড়ির ড্রাইভার আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে হুস করে স্টার্ট দিয়ে দিল। পেছন দিকে শোনা গেল দু' পক্ষের গুলি বিনিময়ের শব্দ।

কাকাবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন, "ব্যাপারটা কী হল বল তো, সন্তু। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারাই বা আমাদের ধরতে এল, কারাই বা তাদের মারতে গেল ?"

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো বলল, "আমার মনে হয়, আপনার কোনও

পুরনো শত্রুর দল আমাদের ধরে নিতে এসেছিল। এই সময়ে এসে পড়ল সূরযপ্রসাদের দল। তারা আমাদের বাঁচিয়ে দিল। আমি ওই নীল ফিয়াট গাড়িটার কথা আগে বলিনি ? ওতে সূরযপ্রসাদ নিজে কিংবা ওর কোনও সহকারী সবসময় আমাদের পাহারা দিচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সূরযপ্রসাদের এত কী দায় পড়েছে আমাদের বাঁচাবার ? ক্রিমিনালরা কারও জন্য তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করে না।"

সন্তু বলল, "ফিয়াট গাড়ির লোকটার হাতের টিপ খুব ভাল।"

গাড়িটা বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে। কাকাবাবু আবার ড্রাইভারকে বললেন, "এবার থামাও। গাড়ি ঘোরাতে হবে। আজ আর খাজুরাহো মন্দিরে গিয়ে কাজ নেই। কামালকে এই ঘটনাটা জানানো দরকার।"

অংশু জিজ্ঞেস করল, "আমরা এই রাস্তা দিয়েই আবার ফিরব ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, ভয় করছে নাকি ? দিনের বেলা বড় রাস্তার ওপর মারামারি পাঁচ মিনিটের বেশি চলে না। এখন গিয়ে দেখবে কিচ্ছু নেই।"

ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে ভয়ে-ভয়ে আস্তে চালাতে লাগল।

একটু পরেই দেখা গেল, নীল রঙের ফিয়াটটা এদিকেই আসছে। কাকাবাবুদের গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই সে-গাড়িটা ঝট করে থেমে গিয়ে সাঁ করে ঘুরিয়ে নিয়ে পালাতে লাগল।

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "জোরে চালাও তো, গাড়িটা ধরো। ওতে কে আছে, আমি দেখতে চাই।"

শুরু হল দুটো গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। কিন্তু ফিয়াট গাড়িটা ছোট, স্পিডও বেশি। তাকে ধরা গেল না, মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

আগে যেখানে চা খাওয়ার জন্য থামা হয়েছিল, সেখানে গোলাগুলি চালাবার চিহ্নমাত্র নেই। একটা লোকের কাঁধে তো গুলি লেগেছিলই, নিশ্চিত অনেক রক্ত পড়েছিল, বৃষ্টিতে তা ধুয়ে গেছে।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "নীল গাড়িটা যদি আমাদের পাহারাই দিতে চায়, তা হলে আমাদের দেখে পালিয়ে গেল কেন ?"

সন্তু বলল, "দূর থেকে উপকার করতে চায়। পরিচয় জানাতে চায় না।"

অংশু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, নীল গাড়িটা যদি না আসত, তা হলে তো এই লোকদুটোর কথায় গাড়ি থেকে নামতেই হত। তখন আপনি কী করতেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো জানি না। আমি আগে থেকে কিছু ভেবে রাখি না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

অংশু বলল, "লোকদুটোকে যেমন হিংস্র মনে হল, আমাদের মেরে ফেলতেও পারত।"

কাকাবাবু বললেন, "যারা মারতে চায়, তারা প্রথমেই গুলি চালায়। ওরা

আমাদের কোথাও ধরেটরে নিয়ে যেত বোধ হয়।”

কাকাবাবু আর কথাবার্তায় উৎসাহ দেখালেন না। আপনমনে দু'বার বললেন, 'উপকারী বন্ধু, উপকারী বন্ধু', তারপর গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন।

গাড়ি ফিরে এল শহরে। কামালকে তাঁর বাড়ির একতলাতেই একটা দোকানঘরে পাওয়া গেল। সেখানে আরও লোক রয়েছে। কথা বলা যায় না। সবাই চলে এলেন ভেতরের বৈঠকখানায়।

সব শুনে কামাল খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, “এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। দিনের বেলায় এরকম কাণ্ড তো এখানে কখনও শুনিনি! বাইরে থেকে এসেছে? লোক দুটোকে চিনতে পারলেন? আপনার পুরনো শত্রু?'

কাকাবাবু বললেন, “দু'জনেরই মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত ভাড়াটে গুণ্ডা। অন্য কেউ পাঠিয়েছে। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটাতে কে ছিল? তোমার কি মনে হয়, সূরযপ্রসাদ আমাদের পাহারা দিচ্ছে?”

প্রবল বেগে দু'দিকে মাথা নেড়ে কামাল বললেন, “আমার তা বিশ্বাস হয় না। সূরযপ্রসাদ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। মায়া-দয়া, কৃতজ্ঞতাবোধ, এসব কিছু তার নেই। আপনি তাকে নাকেখত দিইয়েছিলেন, সে-কথা এখানে অনেকেই জানে। সে অপমানের সে শোধ নেবে না?”

কাকাবাবু বললেন, “আমি তার উপকারও করেছিলাম। খাজুরাহো মন্দিরের মূর্তিগুলো সব সে ফেরত দিয়েছিল, তাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিইনি। তোমার সঙ্গে তার কবে দেখা হয়েছে?”

কামাল বললেন, “সূরযপ্রসাদকে তিন-চার বছর দেখা যায় না। পুলিশও তার খোঁজ রাখে না। শরীর তেমন ভাল নয় বলে সে এখন কোথাও লুকিয়ে থাকে। সেখান থেকেই দল চালায়।”

কাকাবাবু বললেন, “হয়তো তার পরিবর্তন হয়েছে। অপমানের কথা ভুলে গিয়ে উপকারটাই মনে রেখেছে। নইলে ওরকম চিঠি পাঠাবে কেন?”

কামাল বললেন, “কী জানি!”

কাকাবাবু বললেন, “কী ঝামেলা, কোথাও কি একটু শান্তিতে থাকা যাবে না?”

কামাল বললেন, “আপনারা কি এখন গেস্ট হাউসে ফিরে যাবেন? দুপুরে খাওয়ার কথা তো বলে আসেননি।”

জোজো বলল, “খাজুরাহোর কোনও হোটেলে খেয়ে নেওয়ার কথা ছিল, সেখানে তো যাওয়াই হল না।”

কামাল বললেন, “বৃষ্টির দিন, আমাদের বাড়িতে আজ খিচুড়ি রান্না হচ্ছে।

আপনারা এখানেই খেয়ে নিন না। খিচুড়ি আর চিংড়িমাছ ভাজা। এইসব জায়গায় ইলিশমাছ পাওয়া যায় না।"

জোজো প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "খিচুড়ি আমি খুব ভালবাসি!"

কাকাবাবু বললেন, "রোজ মোগলাই খানা খাচ্ছি, আজ খিচুড়ি খেলে মুখবদল হবে। আজ তোমার বউয়ের হাতের রান্নাও খেয়ে দেখা যাবে!"

কামাল ভেতরে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন। বৃষ্টি এখনও পড়েই চলেছে। ঠিক যেন বাংলাদেশের বর্ষা।

আধঘণ্টার মধ্যেই খাওয়ার টেবিলে বসা হল। শুধু খিচুড়ি আর চিংড়িমাছ নয়, তার সঙ্গে বেগুনভাজা, আলুভাজা, আলুবোখরার চাটনি, দই, তিনরকম মিষ্টি। খিচুড়িটা সত্যিই অতি উপাদেয় হয়েছে।

খেতে-খেতে কামাল বললেন, "দাদা, দিনের বেলা এইরকম কাণ্ড হল, এবার থেকে আপনাদের সব সময় পুলিশের গাড়ি নিয়ে ঘুরতে হবে। আজ আপনাদের একটা বিপদ ঘটে গেলে আমি নরেন্দ্র ভার্মার কাছে কী কৈফিয়ত দিতাম? উনি আমাকে বারবার বলে দিয়েছেন, এখানে আপনাদের বিপদের আশঙ্কা আছে।"

কাকাবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "সবসময় পুলিশ নিয়ে ঘোরা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। এখানে আমার শরীরটা বেশ ভাল আছে, অসুখ-টসুখ সেরে গেছে। ভেবেছিলাম, এখানে সবাই মিলে গল্প করব আর বেড়াব। এর মধ্যে নরেন্দ্র আর খোঁজখবর নিয়েছিল?"

কামাল বললেন, "না। সেটাই একটু আশ্চর্যের ব্যাপার। উনি আপনার জন্য এত চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে আর ফোন করলেন না। কোনও সাড়াশব্দই নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! হয়তো আন্দামান চলে গেছে, কিংবা লাদাখ। ওকে বহু জায়গায় যেতে হয়।"

কামাল বললেন, "এরকম বুদ্ধিমান আর সুদক্ষ অফিসার আর দেখা যায় না! দারুণ লোক। আপনাকে খুব ভালবাসেন।"

কাকাবাবু বললেন, "নরেন্দ্র আমার খুব ভাল বন্ধু। দু'জনে একসঙ্গে অনেক কাজ করেছি। অনেক বিপদেও পড়েছি। আফগানিস্তানেও তো শেষপর্যন্ত নরেন্দ্রই এসে—"

জোজো বাধা দিয়ে বলল, "না, না, শেষটা আগে বলে দেবেন না! আমরা পুরো গল্পটা এখনও শুনিনি! কাকাবাবু, আমার আর রাত্তির পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকছে না। খেয়ে ওঠার পর বাকি গল্পটা আপনাদের বলতে হবে।"

কামাল বললেন, "এই দুপুরবেলা কি গল্প জমবে?"

সন্তু বলল, "কেন জমবে না? এটা কি ভূতের গল্প নাকি? ভূতের গল্প

রাত্তিরে শুনতে হয় !"

কামাল হেসে বললেন, "নাঃ, এর মধ্যে ভূতটুত কিছু নেই।"

॥ ৯ ॥

খেয়ে ওঠার পর আবার বসা হল বৈঠকখানায়। কামাল একটা পান মুখে পুরলেন, কাকাবাবু পান খান না, খেলেন খানিকটা মৌরি-মশলা। মুখোমুখি দুটো সোফায় বেশ হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসা যায়।

কামাল বললেন, "হ্যাঁ। আমরা যে পাহাড়টায় পৌঁছলাম, তার নীচে একটা গ্রাম আছে, সেটার নাম তৈমুরডেরা। গ্রামটা ছোট, মাত্র তিরিশ-পঁয়তিরিশটি পরিবার। আমাদের দেখে সেখানকার লোকেরা খুব অবাক হল না, আরও কিছু-কিছু বিদেশি নাকি সেই পাহাড়ে কীসব খোঁজাখুঁজি করে গেছে। তারা অবশ্য সবাই সাহেব। শুনে আমরা একটু দমে গিয়েছিলাম। আমরা যা খুঁজতে এসেছি, তা কি আগেই কেউ নিয়ে গেছে ?"

জোজো বলল, "অশোকের শিলালিপি ? অন্য কেউ নিয়ে যাবে কী করে ?"

সন্তু বলল, "অশোকের শিলালিপি নয়। অন্য কিছু ! চুপ করে শোন না।"

কামাল বললেন, "সেই গ্রাম থেকে আমরা কিছু চাল-আটা, আলু-পেঁয়াজ আর নুন কিনে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলাম। পাহাড়টা বেশ দুর্গম, ওপরদিকে কোনও জনবসতি নেই। গাছপালাও খুব কম। ভয়ঙ্কর খাদ আর দু-একটা গুহা আছে। ওদেশে তো আর সাধু-সন্ন্যাসী নেই, তাই গুহাগুলো ফাঁকা। আমরা আশ্রয় নিলাম সেইরকম একটা গুহায়। দিন তিনেক আমরা প্রায় চুপচাপ বসে রইলাম। আমাদের কেউ অনুসরণ করছে কি না সেটা বোঝা দরকার ছিল। আমি দু'বেলা রুটি পাকাতাম কিংবা খিচুড়ি বানাতাম।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি রোজ রাঁধোনি। আমিও রাঁধতে জানি। একদিন কীরকম তেল ছাড়া শুধু নুন আর পেঁয়াজ দিয়ে আলুসেদ্ধ মেখেছিলাম !"

জোজা বলল, "আলুসেদ্ধ আবার রান্না নাকি ? সবাই পারে !"

কাকাবাবু বললেন, "ওইরকম জায়গায় খিদের চোটে শুধু আলুসেদ্ধই অমৃত মনে হয়।"

কামাল বললেন, "তিনদিন পর শুরু হল খোঁজাখুঁজি।"

জোজো বলল, "এবার বলতেই হবে কী খুঁজছিলেন !"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা যা খুঁজছিলাম, তা খুবই দামি জিনিস। সম্রাট কনিষ্ক একবার এক তুর্কি সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে হেরে যান। জোজো বেশি ইতিহাস শুনতে ভালবাসে না, তাই সংক্ষেপে বলছি। অনেক বড় রাজার পক্ষেও হঠাৎ কোনও ছোট রাজার কাছে হেরে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরকম অনেকবার হয়েছে। কনিষ্ক হেরে গেলেন বটে,

কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি, পালিয়ে যান। পরে আবার সৈন্যবাহিনী গড়ে সেই সুলতানের সঙ্গে লড়াই করেন এবং জিতেও যান। প্রথম যুদ্ধটা হয়েছিল এই কাছাকাছি অঞ্চলে, দ্বিতীয় যুদ্ধটা হয়েছিল কাবুলের কাছে। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় কনিষ্ক ছদ্মবেশ ধরেছিলেন, সেইজন্য তিনি নিজের রাজমুকুট ও আরও কিছু-কিছু সম্পদ লুকিয়ে রেখে যান মাটিতে গর্ত পুঁতে। সেই জিনিসগুলো রাখার ভার দিয়েছিলেন তাঁর এক অতি বিশ্বাসী সেনাপতিকে। সে ছাড়া জায়গাটার সন্ধান অন্য কেউ জানত না। কাবুলে পৌঁছবার আগেই সেই সেনাপতিটি একটি দুর্ঘটনায় মারা যায়। সেইজন্য রাজা কনিষ্কর সেই গুপ্ত সম্পদ আর কোনওদিন উদ্ধার করা যায়নি।"

জোজো বলল, "তার মানে, গুপ্তধন ?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকটা তাই। তবে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট কনিষ্কের মুকুটটা খুঁজে বার করা। বুঝতেই পারছ, যে-সম্রাটের মুখখানা কেমন দেখতে ছিল তাই-ই আমরা জানি না, তাঁর একটা মূর্তিরও মুণ্ডু নেই, সেই সম্রাটের মুকুটখানারও ঐতিহাসিক মূল্য সাঙ্ঘাতিক।"

জোজো বলল, "এতকাল কেউ জানতে পারেনি, আপনারা কী করে জানবেন সেগুলো কোথায় লুকনো আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক ঐতিহাসিক নানারকম অনুমান করেছেন। এ-ব্যাপারে আমার নিজের বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সেই সময় প্রভাকরন নামে একজন খুব বড় ইতিহাসের পণ্ডিত ছিলেন দিল্লিতে। সেই প্রভাকরন কিছু পুঁথিপত্তর আর মুদ্রা থেকে একটা থিয়োরি খাড়া করেছিলেন। সেটা মিলতেও পারে, না মেলার সম্ভাবনাই বেশি। প্রভাকরন অবশ্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি ঠিক জায়গাটা আবিষ্কার করেছেন। প্রভাকরন তখন বৃদ্ধ, তার ওপর তাঁর হাঁপানি রোগ। তিনি নিজে তো আর আফগানিস্তানে এসে পাহাড়-পর্বতে খোঁজাখুঁজি করতে পারবেন না, তাই একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'রাজা রায়চৌধুরী, তোমার বয়েস কম, শরীরে শক্তি আছে, মনের জোরও আছে, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি ? যদি ব্যর্থ হও, সেটা তোমার দুর্ভাগ্য, আর যদি সার্থক হও, ইতিহাসে তোমার নাম থেকে যাবে !'"

কামাল বললেন, "তোমরা কি জানো, কাবুলের মিউজিয়ামে রাজা রায়চৌধুরীর ছবি আছে ?"

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "আঃ, ওসব কথা বাদ দাও। গল্পটা বলো !"

কামাল বললেন, "সত্যি ঘটনাটা তো ঠিক গল্পের মতন বলা যায় না। পরের কথা আগে এসে পড়ে। অন্য কথা মনে পড়ে যায় !"

সন্তু বলল, "তার মানে আপনারা সেই মুকুট খুঁজে পেয়েছিলেন !"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ। প্রভাকরনের তত্ত্ব কেউ বিশ্বাস করেনি, শুধু আমরা দু'জনে বিশ্বাস করে অত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। প্রভাকরন

একটা ম্যাপ এঁকে দিয়েছিলেন, সেই ম্যাপ ধরে-ধরে আমরা ইঞ্চি-ইঞ্চি করে খুঁজেছি। চারদিন না পাঁচদিন লেগেছিল।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পাওয়া গেল ? কোনও গুহার মধ্যে ?"

কাকাবাবু বললেন, "গুহাগুলো তো অন্যরা খুঁজতে বাকি রাখেনি। না, কোনও গুহার মধ্যে নয়। জলের নীচে। একটা গভীর খাদের নীচে বহুকাল ধরে জল জমে আছে। দড়ি বেঁধে আমরা সেই খাদে নেমেছিলাম। ম্যাপে যেখানে পিন পয়েন্ট করা সেখানে দেখি যে জল। তখন সেই জলেই ডুব দিলাম অনেকবার। সেখানে অনেক কিছু ছিল, সব আমরা নিতেও পারিনি। একটা হাতির দাঁতের তৈরি বাক্স পেয়েছিলাম, হাতির দাঁতের তৈরি বলেই এতযুগ পরেও সেটা পচেনি। সেই বাক্সের মধ্যে ছিল রাজমুকুট। তোরা শুনে অবাক হয়ে যাবি, মুকুটটা কিন্তু সোনার তৈরি নয়। ভারত জয় করার আগে তো কনিষ্ক সম্রাট ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ রাজা। মুকুটটা তামার তৈরি। তার ওপরে লাল ও সবুজ পাথর বসানো, সেগুলো চুনি আর পান্না। সব মিলিয়ে মুকুটটার দাম খুব বেশি নয়, কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়ে দাম অনেক।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কী করে প্রমাণ হবে যে ওটা কনিষ্করই মুকুট ?"

কাকাবাবু বললেন, "যে-কোনও জিনিসই কতদিন আগে তৈরি, তা এখন প্রমাণ করা যায়। তা ছাড়া কিংবদন্তির সঙ্গে মিলে গেছে। ওই বাক্সটা পেয়ে আমাদের কী যে আনন্দ হয়েছিল ! জল-কাদা-মাখা ভূতের মতন চেহারা নিয়ে আমি আর কামাল সেই খাদের মধ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছি। এতদিনের পরিশ্রম সার্থক।"

কামাল বললেন, "ওই বাক্সটা ছাড়াও আমরা কিছু সোনা রুপোর গয়নাও পেয়েছিলাম। সেগুলো বোধ হয় রানিদের। কোনও অভিজ্ঞ ডুবুরিকে এনে খোজাখুঁজি করলে আরও অনেক কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু আমাদের কাছে ওই মুকুটটাই ছিল যথেষ্ট।"

কাকাবাবু বললেন, "আইন অনুযায়ী ওইসব জিনিসই আফগানিস্তান সরকারের প্রাপ্য। যদিও আবিষ্কার করেছি আমরা, ওরা কিছুই করেনি, তবু এক দেশের সম্পদ অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া যায় না। কাবুলে গিয়ে গভর্নমেন্টকে সব জমা করে দিতে হবে, আমরা শুধু ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারব।"

কামাল বললেন, "আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, মুকুটটা অন্তত লুকিয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসব। কিছুদিন রেখে, বড়-বড় পণ্ডিতদের দেখিয়ে তারপর এ-দেশকে ফেরত দেব। দাদা রাজি হননি। যাই হোক, এত কষ্টের পর ওই জিনিসগুলো পেয়ে আমরা এমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম যে, অন্য কোনও কথা মনেই পড়েনি। দাদা বারবার বলছিলেন, সম্রাট কনিষ্কের মুকুট ! সত্যি-সত্যি আমাদের হাতে। প্রভাকরন কত খুশি হবেন ! কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি ! একটা গাছতলায় বসে আমরা এই সব বলাবলি করছি, তখন বিকেল

প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের গুহা সেখান থেকে অনেকটা দূরে। একটু চা খাওয়া দরকার, তবু আমরা উঠি-উঠি করেও উঠছি না। অতখানি খাদে নামা আর ওঠা, জলে বারবার ডুব দেওয়া, পরিশ্রম তো কম হয়নি, আনন্দের চোটে সেসব ভুলে গেছি, এই সময় এল বিপদ ! সেই নির্জন পাহাড়ে হঠাৎ কোথা থেকে দু'জন লোক আমাদের পেছন দিক থেকে হঠাৎ হাজির হল। একজনের হাতে রাইফেল, অন্যজনের হাতে রিভলভার ! আমরা সাবধান হওয়ারও সময় পেলাম না। একজন আমার বুকে রাইফেলের নল ঠেকাল, আর একজন রাজাদাদার মাথার দিকে উঁচিয়ে রইল রিভলভার !"

কাকাবাবু বললেন, "সেই দু'জনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলাম। সে কে হতে পারে বল তো ?"

জোজো বলে উঠল, "জাভেদ দুরানি ! সেই ডাকাতের সর্দার !"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওই পাহাড়ি লোকরা খুব হিংস্র হলেও একবার কথা দিলে কথা রাখে। সে আমাদের পাঞ্জা দিয়েছে, আর সে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না। সে হচ্ছে ওই অবোধরাম পেহলবান। সে গোপনে আমাদের অনুসরণ করেছিল। সে ঠিক সন্দেহ করেছিল যে, আমরা কোনও দামি জিনিসের সন্ধানে এসেছি। তার সঙ্গে মাত্র একজন লোক, আমরাও দু'জন, যদি একটু আগে টের পেতাম, তা হলে ওদের খপ্পরে অমনভাবে পড়তে হত না।"

কামাল বললেন, "দাদার মাথার দিকে রিভলভার উঁচিয়ে অবোধরাম দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'রাজা রায়চৌধুরী, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ওই বাক্সটা আমার হাতে তুলে দাও !' দাদার কোলের ওপর সেই বাক্স। ওই লোকটা যেমন নিষ্ঠুর, আমরা কোনওরকম চালাকি করতে গেলেই ও নির্ঘাত গুলি চালাবে ! আমি তো ভাবলাম, যাঃ, সব গেল ! এখন প্রাণে বাঁচবার জন্য বাক্সটা দিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু দাদা অন্য ধাতুতে গড়া !"

কাকাবাবু বললেন, "ভুল, কামাল, ভুল। ওই অবস্থায় সবকিছু দিয়ে দিলেও প্রাণে বাঁচা যায় না। অবোধরাম আমাদের কাছ থেকে বাক্সটা নিয়ে নেওয়ার পরও ঠিক গুলি চালাত। প্রমাণ রাখবে কেন, আমাদের মেরে রেখে চলে যেত।"

অংশু কৌতূহল দমন না করতে পেরে বলে উঠল, "আপনারা কী করে বাঁচলেন ? দু'জনের দিকেই রাইফেল আর রিভলভার ?"

কামাল বললেন, "আমি ঘাবড়ে গেলেও ওই অবস্থায় দাদার মাথার ঠিক ছিল। উনি করলেন কী, বললেন, 'বাক্সটা চাও, এই নাও' বলেই বাক্সটা ছুড়ে দিলেন ডান দিকে। সেদিকে পাহাড়টা ঢালু হয়ে গেছে। বাক্সটা গড়াতে লাগল, আর একটু হলেই পড়ে যেত অনেক নীচে। অবোধরাম দৌড়ে গিয়ে কোনওরকমে ধরে ফেলল বাক্সটা। দাদা করলেন কী, সেই সুযোগে লাফিয়ে উঠে অন্য লোকটার ঘাড়ে এসে পড়লেন। আমার দিকে যে রাইফেল উঁচিয়ে

ছিল, সে দাদার দিকে পেছন ফিরে ছিল তো। দাদা তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে কেড়ে নিলেন রাইফেলটা।"

জোজো বলল, "দারুণ ! আমি হলেও ঠিক এইরকমই করতাম !"

কামাল বললেন, "তাতেও কিন্তু শেষরক্ষা হল না !"

জোজো বলল, "কেন ? ওই লোকটার কাছে রিভলভার, আপনাদের কাছে রাইফেল। রিভলভারের চেয়ে রাইফেলের শক্তি বেশি !"

কামাল বললেন, "তা ঠিক। কিন্তু বিপদ এল অন্যদিক থেকে। ওইরকম ব্যাপার দেখে অবোধরাম লুকিয়ে পড়ল একটা বড় পাথরের আড়ালে। আমাদের এদিকে সেরকম কিছু ছিল না। আমরা দাঁড়ালাম গাছটার পেছনে। ও গুলি চালালে আমাদেরও গুলি চালাতে হল। দু'বার এরকম গুলি বিনিময়ের পরেই অবোধরাম হাসতে-হাসতে সামনে চলে এল। তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী, ওটা ফেলে দাও, ওটাতে আর কোনও কাজ হবে না !' রাইফেলটায় মাত্র দুটোই গুলি ছিল, আর গুলি নেই। অবোধরামের কাছে অনেক গুলি রয়েছে। অন্য লোকটা এবার উঠেই দাদার মুখে এক ঘুসি চালাল। আমাদের আর কিছুই করার নেই। অবোধরাম বলল, 'তোমাদের মারতে আমার দুটোর বেশি গুলি খরচ হবে না। আর ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই কোরো না। রায়চৌধুরী, তুমি খুব চালাক, তাই না ? পাথরের ওপর কীসব লেখাটেখার ছবি তোলার জন্য এতদূর এসেছ, এ-কথা আমি বিশ্বাস করব ? এইসব পুরনো জিনিস বিলেত-আমেরিকায় বহু দামে বিক্রি হয়, তোমরা সেই লোভে এসেছ। এবার মরো !" '

অংশু বলল, "অ্যাঁ ? তক্ষুনি গুলি করল ?"

কাকাবাবু বললেন, "একটু সময় নেওয়ার জন্য আমি বললাম, 'ও জিনিস তুমি দেশের বাইরে নিতেও পারবে না, বিক্রিও করতে পারবে না !' তা শুনে অবোধরাম আরও জোরে হেসে উঠল।"

কামাল বললেন, "অন্য লোকটা হাতের সুখ করার জন্য আমার মুখেও একটা ঘুসি মারল। অবোধরাম তাকে বলল, 'রহমত, দাঁড়া, ঘুসি মেরে কেন হাতব্যথা করছিস, ওদের আরও কঠিন শাস্তি দেব ! দড়ি দিয়ে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেল !' অবোধরাম রিভলবার উঁচিয়ে আছে, আমাদের বাধা দেওয়ার উপায় নেই, রহমত নামে অন্য লোকটা আমাদের দু'জনকেই বেঁধে ফেলল। অবোধরাম দাদার চুলের মুঠি ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল একটু দূরে। তারপর বলল, 'রায়চৌধুরী, তোমাদের জন্য গুলি খরচ করে কী হবে ! তোমাদের এমনভাবে রেখে যাব, যাতে একদিন ভূত হয়ে এই পাহাড়ে ঘুরবে।' একটা গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ও দাদাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল।"

অংশু আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ ? তারপরও উনি বেঁচে রইলেন কী করে ?"

কাকাবাবু মুচকি হাসলেন।

কামাল বললেন, "দেখছই তো আমরা ভূত হইনি, দিব্যি বেঁচে আছি। তারপর যা হল, সেটা শুধু রাজা রায়চৌধুরীর পক্ষেই সম্ভব। রহমত একটা ভুল করেছিল, সে আমাদের হাত পা বেঁধেছিল বটে, কিন্তু নিয়ম হচ্ছে, হাত দুটোকে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে বাঁধা। সে বেঁধেছিল সামনের দিকে। সেই অবস্থায় হাত দুটো ওপরে তোলা যায়। দাদাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতেই আমি চোখ বুজে কেঁদে উঠলাম। ভাবলাম যে উনি শেষ হয়ে গেলেন, এবার আমার পালা ! কিন্তু দাদা হাত দুটো তুলে মাথার ওপরের দড়িটা ধরে ফেললেন, তাতে গলায় টান লাগে না। সেই অবস্থায় দুলতে লাগলেন। তাতে মজা পেয়ে অবোধরাম বলল, 'কতক্ষণ দুলতে পারো দেখি !' এ কথা ঠিক, ওই অবস্থায় বেশিক্ষণ দোলা যায় না, হাত কাঁপতে থাকে, তারপর হাত একটু আলগা হলেই গলায় ফাঁস লেগে জিভ বেরিয়ে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে শেষ। কিন্তু রাজা রায়চৌধুরীর অসীম সাহস। ওই অবস্থায় দুলতে-দুলতে উনি একবার জোরে দুলে এসে অবোধরামের মুখে জোড়া পায়ে একটা লাথি কষালেন। অবোধরাম ছিটকে পড়ে গেল। দাদা ধমকে বললেন, 'ইডিয়েট, গুলি কর। আমাকে মারতে চাস তো গুলি কর, নইলে আমি কিছুতেই মরব না !'"

কাকাবাবু বললেন, "সাহসের ব্যাপার নয়। এটাও একটা কৌশল। ক্রিমিনালদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। আমি কিছু না বললে ও গুলি করত ঠিকই। আমি হুকুম দিলাম বলেই ও গুলি করবে না। তাতে আরও কিছুটা সময় পাওয়া যাবে !"

কামাল বললেন, "ঠিক তাই। লাথি খাওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে অবোধরাম প্রথমে রাইফেলটা নিয়ে তার কুঁদো দিয়ে দাদার পায়ে দু'বার খুব জোরে মারল। তারপর বলল, 'গুলি করব ? মোটেই না ? এইরকমভাবে থাক, আর তিলতিল করে মর। এই পাহাড়ে কেউ আসবে না, আর ওই দড়িও ছিঁড়বে না।' তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, রহমতকে নিয়ে অবোধরাম আমাদের ওই অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল !"

কথা থামিয়ে কামাল বললেন, "এখন এই পর্যন্ত থাক। বাকিটা আবার পরে হবে। আমার একটু কাজে বেরনো দরকার।"

সন্তু-জোজো-অংশু তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠল, "না, এখানে থামলে চলবে না ? আজ সবটা বলতেই হবে।"

জোজো উঠে এসে কামালের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনাদের যেতেই দেব না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আর তো বেশি নেই। কামাল, শেষ করেই দাও।"

কামাল বললেন, "হ্যাঁ, আর বেশি নেই অবশ্য।"

জোজো বলল, "সংক্ষেপ করলে হবে না। সব বলতে হবে। কাকাবাবু কী করে ফাঁসির দড়ি থেকে উদ্ধার পেলেন ?"

কামাল বললেন, "মানুষের মনের জোর যে কতখানি হতে পারে, সেদিনই আমি বুঝলাম। তোমরা ভেবে দ্যাখো অবস্থাটা। দাদা গাছের ডাল থেকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলছেন, আমার হাত-পা বাঁধা, আমি নড়তেচড়তে পারছি না। দাদা কোনওরকমে মাথার ওপরে দড়িটা ধরে আছেন, যে-কোনও মুহূর্তে হাত আলগা হয়ে যাবে। সেই অবস্থাতেও দুলতে-দুলতে উনি কথা বলছেন আমার সঙ্গে। আমাকে বললেন, 'কামাল, ঘাবড়াবার কিছু নেই।' কিন্তু আমি ঘাবড়াব না? চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না, কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসবে না। অত উঁচু পাহাড়ে কোনও লোকই আসে না। দাদা দুলতে-দুলতে গাছের ডালটা ভাঙবার চেষ্টা করলেন প্রথমে। কিন্তু সেটা খুব মজবুত ডাল, ভাঙবার কোনও লক্ষণই নেই। তখন দাদা আরও জোরে দুলে দুলে কোনওরকমে সেই ডালটায় চড়ে বসলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "তারপর তো সবকিছুই সোজা হয়ে গেল। প্রথমে দাঁত দিয়ে কামড়ে-কামড়ে আমি হাতের বাঁধন খুলে ফেললাম। তারপর গলার ফাঁস আর পায়ের বাঁধন। এর পর লাফ দিয়ে নীচে নেমে এসে কামালকে মুক্ত করে দিলাম।"

অংশু বলল, "ততক্ষণে ওরা অনেক দূরে চলে গেছে নিশ্চয়ই?"

কামাল বললেন, "তা জানি না। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। দৌড়ে ওদের তাড়া করারও বিপদ আছে। আমাদের কাছে অস্ত্র নেই। ওদের আছে। আমাদের তখন প্রথম কাজ নিজেদের গুহায় ফিরে যাওয়া। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে সেখানে পৌঁছে গেলাম। এত ক্লান্ত লাগছিল যে, ইচ্ছে করছিল শুয়ে থাকতে। খিদেও পেয়েছিল খুব। দাদা কিন্তু বিশ্রাম নিতে দিলেন না। আমাদের সঙ্গে কিছু শুকনো খেজুর আর পেস্তাবাদাম ছিল, শুধু তাই খেয়েই আমরা নেমে গেলাম নীচের গুহায়। আমাদের ঘোড়া দুটো সেখানেই রাখা ছিল। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা অবোধরাম আর রহমতের মতন দু'জন লোককে দেখেছে কিনা। কেউ কিছু বলতে পারল না। অন্ধকারের মধ্যে ওরা কতটা এগিয়ে গেছে কিংবা কোথায় লুকিয়ে আছে, সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। এদিককার রাস্তাঘাট ওরা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল চেনে। রাত্তিরটা আমাদের সেই গ্রামেই থেকে যেতে হল।

কাকাবাবু বললেন, "ইন্ডিয়ার লোক হয়ে অবোধরামের পক্ষে আফগানিস্তানের পাহাড়ে ডাকাতি করা অস্বাভাবিক ব্যাপার। অন্য ডাকাতরা তা মানবে কেন? ডাকাতির জিনিস বিক্রি করা নিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক। এটা অবোধরাম গোপনে একটা ঝুঁকি নিয়েছে। ভেবেছিল যে আর কেউ জানতে পারবে না। সেইজন্য সঙ্গে মাত্র একজন লোক এসেছিল। ওই রহমত নামের লোকটা খুব সম্ভবত বোবা কিংবা তার জিভ কাটা। সে একটা কথাও বলেনি, কোনও শব্দও করেনি। আমরা ঠিক করলাম, অবোধরামদের তাড়া করে আমরা

আর ধরতে পারব না। কিন্তু বড় ডাকাতদলের সর্দার জাভেদ দুরানির সঙ্গে দেখা করে ওর নামে নালিশ জানাব। অবোধরাম ডাকাতদলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জাভেদ দুরানি ইচ্ছে করলেই অবোধরামকে ধরতে পারবে। সম্রাট কনিষ্কের মুকুটটা সে হয়তো আমাদের ফেরত দেবে না। তবু যদি অন্তত ছবি তুলতে দেয়, তা হলেও একটা প্রমাণ থাকবে। সেই ভেবে আমরা যাত্রা শুরু করলাম, পরদিন সকালে।"

কামাল বললেন, "এবার কিন্তু ভাগ্য আমাদের দিকে। জাভেদ দুরানির কাছে পৌঁছবার আগেই আমরা ওদের দেখা পেয়ে গেলাম। দ্বিতীয়দিন সন্ধেবেলা। বোধ হয় ওদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কিংবা কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল পথে, নইলে অতটা পেছিয়ে পড়ার কথা নয়। আমরা তখন যাচ্ছি পাহাড়ের একটা উঁচু রাস্তা দিয়ে, অনেক নীচে দেখতে পেলাম ওরা বসে আছে। আগুন জ্বেলে কিছু রান্না করছে। কীরকম জায়গাটা বুঝলে? আমরা তো অনেক উঁচুতে রয়েছি, এদিকটা খাড়া পাহাড়, নামবার উপায় নেই। সরু রাস্তা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে নেমে ওদের কাছে পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে যাবে। ততক্ষণ ওরা থাকবে কিনা ঠিক নেই। কিংবা কাছাকাছি গেলে ওরা আমাদের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে ফেলতে পারে। ওদের দেখে সেই বাক্সটা উদ্ধার করার আশায় তোমাদের কাকাবাবু একেবারে ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু আমরা নামব কী করে? অতদূর থেকে গুলি করলেও সুবিধে হবে না। দাদা তবু বললেন, 'কামাল, তুমি ঘোড়া দুটো নিয়ে রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে এসো, আমি এখান দিয়েই নামছি।' আমি বললাম, 'আপনার মাথাখারাপ নাকি? এই খাড়া পাহাড় দিয়ে নামতে গেলেই তো ব্যালান্স রাখা যাবে না। আপনি গড়িয়ে পড়ে যাবেন।' উনি বললেন, 'আর্মির লোকেরা এইরকম জায়গা দিয়েও নামতে পারে। শুয়ে পড়ে বুকে ভর দিয়ে-দিয়ে নামতে হয়। আমি সেরকমভাবে ঠিক নেমে যাব।' জানি তো, দাদা কীরকম গোঁয়ার। আমার আপত্তি শুনবেন না। দাদাকে একা ছেড়ে দিই কী করে? ঘোড়াদুটোকে সেখানে রেখে আমরা সেই ঢালু পাহাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। এবার অবশ্য আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। ওদের সমান-সমান। তবু আমাদের দিক দিয়ে সুবিধে এই যে, ওরা এদিকে পেছন ফিরে বসে রাস্তার দিকে নজর রাখছে। এই পাহাড় দিয়ে যে কেউ নেমে আসতে পারে, তা ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি। এই পাহাড়টায় ঝোপঝাড় ছিল, অন্ধকার হয়ে এসেছে, আমাদের দেখাও যাবে না। দাদা বললেন, 'কামাল, তুমি রহমতকে তাক করবে, আমি অবোধরামকে।' অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পর আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না, গুলি চালিয়ে দিলাম। দাদাও তা অনায়াসে করতে পারতেন, তবু অবোধরামকে মারলেন না।"

সন্তু বলল, "আমি জানি, কাকাবাবু কাউকে গুলি করে মারেন না। যত বড়

শত্রুই হোক, তাকেও মারবেন না।"

জোজো বলল, "তা হলে কাকাবাবু কী করলেন ?"

কামাল বললেন, "আমার গুলি রহমতের ডান কাঁধে লেগেছিল, সে পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগল। তোমাদের কাকাবাবু বাঘের মতন অনেক উঁচু থেকে এক লাফে অবোধরামের ওপর গিয়ে পড়লেন। তারপর শুরু হল গড়াগড়ি আর ঘুসোঘুসি। আমি রাইফেল তৈরি রেখেছিলাম, অবোধরাম জিতলে সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাতাম। তার দরকার হল না, একটু পরেই দাদা অবোধরামকে চিত করে ফেলে তার গলায় জুতোশুদ্ধু এক পা দিয়ে দাঁড়ালেন। তার আর নড়বার উপায় রইল না। হাতির দাঁতের সেই বাক্সটা কাছেই পড়ে আছে। আমি বললাম, 'দাদা, আর ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই। এ-দুটোকে গুলি করে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া যাক। তা হলে আমরা নিশ্চিন্তে যেতে পারব।' দাদা কিন্তু রাজি হলেন না। বললেন, 'আমরা ওদের শাস্তি দেব কেন ? ওদের এখানেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আমরা গিয়ে জাভেদ দুরানিকে খবর দেব। বিশ্বাসঘাতকদের যা শাস্তি হয় ওরা দেবে।' দাদার সঙ্গে তর্ক করেও লাভ হল না। ওদের দু'জনকে দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধলাম। কিন্তু শাস্তি না দিয়ে চলে আসতে ইচ্ছে করছিল না। তাই আমি আচ্ছা করে কান মুলে দিলাম দু'জনের। ইচ্ছে করছিল একটা করে কান ছিঁড়ে নিতে।'

কাকাবাবু বললেন, "তুমি রাগের চোটে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলে।"

কামাল বললেন, "হব না ? অবোধরামের মতন অমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর মানুষ আমি আর দেখিনি। তখন বলে কি জানো ? আমরা চলে আসছি, সে বলল, 'রায়চৌধুরী, আমাকে এরকমভাবে বেঁধে রেখে যেয়ো না। জাভেদ দুরানির কাছে গেলে সে ওই মুকুটটা কেড়ে রেখে দেবে, তোমাদের কোনও লাভ হবে না। আমার কাছে তোমরা কী চাও বলো !' তা শুনে আমি আরও রেগে গিয়ে বললাম, 'শয়তান, তুই আমার দাদাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলি। ভেবেছিলি, সে এতক্ষণে মরেই গেছে ? আমারও বাঁচার আশা ছিল না। এখন তুই নির্লজ্জের মতন ক্ষমা চাইছিস ?' তাতে সে বলল, 'ক্ষমা চাইব কেন ? আমাদের ছেড়ে দিলে, আমি তোমাদের দু'জনকেই এক লক্ষ টাকা দেব। তোমাদের আমিই পৌঁছে দেব কাবুলে !' আমি আবার ওর কান মুলে দিয়ে বললাম, 'তোমার মতন সাপকে আর কেউ বিশ্বাস করে ?' দাদা, আপনিও তখন খুব রেগে উঠেছিলেন, মনে আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে কেউ ঘুষ দিতে চাইলে আমি তাকে কিছু না কিছু শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। ওই এক লক্ষ টাকার কথা শুনে আমিও ওর দু'গালে দুটো থাপ্পড় কষালাম।"

কামাল বললেন, "তখনও অবোধরাম চ্যাঁচাতে লাগল, 'এইভাবে আমাকে মারতে পারবে না। আমি তোমাদের দেখে নেব ! পৃথিবীর যেখানেই লুকিয়ে

থাকো, আমি ঠিক খুঁজে বার করে প্রতিশোধ নেব !' আমরা অনেক দূরে চলে এসেও ওর চিৎকার শুনতে পেলাম !"

কাকাবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ব্যস, এই তো হয়ে গেল গল্প। তারপর আমরা সেই মুকুটের বাক্সটা নিয়ে ফিরে এলাম কাবুলে। এবার চলো, যাওয়া যাক। গেস্ট হাউসে ফিরে আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে।"

জোজো হইহই করে বলে উঠল, "সে কী ? সব শেষ হয়ে গেল মানে ? আসল ব্যাপারটা তো জানা হল না। কাকাবাবুর পা ভাঙল কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। একটা এমনি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।"

অংশু বলল, "বুঝেছি। ওই লোকটা, মানে অবোধরাম যখন কাকাবাবুকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে তারপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে পায়ে খুব জোর মেরেছিল, তাতেই ওঁর একটা পা ভেঙে গিয়েছিল।"

কামাল আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, "না, তাতে পায়ের মাংস কেটে অনেক রক্ত পড়েছিল, কিন্তু হাড় ভাঙেনি। সেটা হয়েছে পরে।"

জোজো দাবি জানাল, "আমরা সব ঘটনাটা শুনতে চাই !"

কামাল বললেন, "সে-ঘটনাটা কেউ জানে না। দাদা নিজের মুখে কখনও বলবেন না জানি ! দাদার একটা পা নষ্ট হয়ে গেছে আমার জন্য। উনি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য চিরকালের মতন নিজের একটা পা নষ্ট করেছেন। পৃথিবীতে আর কোনও মানুষ বোধ হয় এ-কাজ করত না।"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, কী যে বলো ! ওইরকম অবস্থায় পড়লে সবাই করত। আমার কোনও বিপদ হলে তুমি ঝুঁকি নিতে না ?"

কামাল বললেন, "না দাদা, সবাই করে না। নিজেদের প্রাণের মায়া ক'জন তুচ্ছ করতে পারে ?"

বলতে-বলতে কামাল ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন !

ওরকম একজন বয়স্ক মানুষকে কাঁদতে দেখে জোজো-সন্তুরা আড়ষ্ট হয়ে গেল, আর কোনও কথা বলতে পারল না।

কাকাবাবু কামালের কাছে এসে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, "কী হল, কামাল ! সে তো অনেকদিন আগেকার কথা ! শান্ত হও, শান্ত হও।"

কামাল চোখ মুছে বললেন, "সেই কথাটা যখনই মনে পড়ে, আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। আমার বাঁচার কোনও কথাই ছিল না। আপনি রক্ষা না করলে আজ আমার এই বাড়ি, ব্যবসা, বউ-ছেলেমেয়ে এসব কিছুই হত না।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কথা আর ভাবতে হবে না। বলছি তো, আমারও হতে পারত। যথেষ্ট হয়েছে, এবার গল্প বন্ধ করো।"

কামাল নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "না, বাকিটা আমি ওদের শোনাব। বুঝলে সন্তু, এর পর যা ঘটল, তা আমারই দোষে। অতি বোকার মতন,

বোকার মতন একটা অ্যাকসিডেন্ট। ওদের দু'জনকে বেঁধে রেখে আমরা বড়জোর আর আধঘণ্টা গেছি। অত কষ্টে আবিষ্কার করা কনিষ্কের মুকুট আবার ফিরে পেয়েছি বলে মনটা খুব উৎফুল্ল। পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা। সেখানকার দৃশ্য খুব সুন্দর। মাঝে-মাঝে গাছপালা, দু-একটা গাছে অচেনা ফুল ফুটে আছে। অনেক নীচে আমুদরিয়া নদী। রোদ্দুর পড়ে রুপোর মতন চকচকে দেখাচ্ছে। আমাদের ঘোড়াদুটো যাচ্ছে পাহাড়ের খাড়া পাড়ের ধার দিয়ে। এক জায়গায় আমার ঘোড়াটা পাহাড়ের একেবারে কিনারে ঘাস খাওয়ার জন্য মুখ বাড়াল। পাশেই একটা ফুলের গাছ। আমি অন্যমনস্কভাবে সেই গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়তে যেতেই, ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গেলাম ঘোড়া থেকে, সঙ্গে-সঙ্গে গড়াতে লাগলাম পাহাড়ের গা দিয়ে। সেখানে একটা গাছও নেই যে, ধরে ফেলব। গড়াতে-গড়াতে পড়তে লাগলাম নদীর দিকে। নদীর বুকে বড়-বড় পাথরের চাঁই আর অসম্ভব স্রোত। একটু পরেই নদীটা জলপ্রপাত হয়ে নেমে গেছে!"

একটু থেমে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামাল বললেন, "নদীতে পড়ার আগেই একটা পাথরে মাথা ঠুকে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম! তারপর আর কেউ বাঁচে? ওইরকম অবস্থায় কাছে যদি নিজের মায়ের পেটের ভাইও থাকত, সে কী করত? চিৎকার করত, কাঁদত, দৌড়োদৌড়ি করত, আর তো কিছু করার ছিল না। আমাকে বাঁচাবার জন্য ওই পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিলে একেবারে নির্ঘাত মৃত্যু!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ! মায়ের পেটের ভাই থাকলে কী করত, তুমি কী করে জানলে? সব মায়ের পেটের ভাই একরকম হয় না। কেউ ভিতু, কাপুরুষ হয়, কেউ আবার ভাইয়ের জন্য প্রাণও দেয়।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি লাফালেন? কী করে বেঁচে গেলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো চিন্তা করার বিশেষ সময় পাইনি। নদীর জলে পড়ার পর কামাল যেভাবে ওলটপালট খাচ্ছিল, তা দেখেই বুঝেছিলাম ওর জ্ঞান নেই। যদি জলপ্রপাতে গিয়ে পড়ে, তা হলে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে, আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। আমি 'জয় মা' বলে ঝাঁপ দিলাম। ওপর থেকে জলে ডাইভ দেওয়ার সময় লোকে সাধারণত হাত দুটো সামনে রেখে, মাথা নিচু করে লাফায়। সেই অবস্থাতেও আমার মনে হল, মাথা যদি নীচের দিকে থাকে, আর নদীতে গিয়ে কোনও পাথরে আঘাত লাগে, তা হলে মাথাটা একেবারে ছাতু হয়ে যাবে। তাই আমি দাঁড়ানো অবস্থায় লাফ দিলাম সোজাসুজি। ঠিক পাথরের ওপরে গিয়েই পড়লাম, আর আমার একটা পায়ের গোড়ালির হাড়টা মট করে ভেঙে গেল।"

কামাল বললেন, "সেই অবস্থাতেও দাদা আমাকে জাপটে ধরে পাড়ে টেনে তুললেন।"

সন্তু চোখ বুজে ফেলে বলল, "ইস, সাঙ্ঘাতিক লেগেছিল নিশ্চয়ই। সেই ব্যথা নিয়েও..."

কামাল বললেন, "ব্যথা তো লাগবেই। দাদার পায়ের তলায় পাথরটা ভেঙে গেঁথে আছে। হুহু করে রক্ত বেরোচ্ছে। তবু দাদা মুখে একটাও শব্দ করেননি। দাঁতে দাঁত চেপে ছিলেন।"

জোজো বলল, "আর সেই মুকুটটা কোথায় গেল?"

কামাল বললেন, "সেটা তো রয়ে গেছে ওপরে। আমাদের ঘোড়া দুটো, সব জিনিসপত্তরই তো পাহাড়ের ওপরে। দাদার হাঁটার কোনও ক্ষমতাই নেই। আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে বটে, মাথা দিয়ে তখনও রক্ত বেরুচ্ছে, শরীর ঝিমঝিম করছে। দাদাকে কাঁধে নিয়ে পাহাড়ে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দু'জনে তখনও প্রাণে বাঁচব কি না তার ঠিক নেই। জিনিসপত্র উদ্ধারের আশাও রইল না।"

জোজো বলল, "যাঃ, মুকুটটা আবার চলে গেল?"

কামাল বলল, "না, যায়নি। ভাগ্য শেষপর্যন্ত সুপ্রসন্ন হল। একটু পরেই আমরা পাহাড়ের ওপরে কিছু লোকজন আর ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। একবার ভাবলাম, তারা যদি অন্য ডাকাতদল হয়, তা হলে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যাবে। প্রাণে বাঁচার জন্য আমাদের চুপচাপ লুকিয়ে থাকাই ভাল। আবার ভাবলাম, এখানে পড়ে থাকলে শেষপর্যন্ত কে আমাদের উদ্ধার করবে? ওপরের ওরা কোনও বণিকের দলও তো হতে পারে? নদীর স্রোতের এমন আওয়াজ যে, আমরা চিৎকার করলেও ওরা শুনতে পাবে না। দাদার কোমরে রিভলভারটা ঠিক ছিল, ওটা নিয়ে শূন্যে দু'বার গুলি করলেন। তাই শুনে সেই দলটা ঘোরা পথে নেমে এল নদীর কাছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই দলের প্রথমেই কাকে দেখতে পাওয়া গেল বল তো সন্তু?"

সন্তু বলল, "নরেন্দ্র ভার্মা!"

কামাল বললেন, "ঠিক বলেছ, নরেন্দ্র ভার্মা আবার কাবুলে এসে জাভেদ দুরানির ডাকাতের দলের কথা শুনেই ভেবেছিলেন, আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। আফগান সরকারের সাহায্য নিয়ে দশজন সৈনিক ও একজন কর্নেলের সঙ্গে এসেছিলেন আমাদের উদ্ধার করতে। ওঁরা অবশ্য অবোধরামের কথা জানতেন না। অবোধরাম আর তার সঙ্গীকেও ধরে নিয়ে এলেন কাবুলে। অবোধরাম এর আগে দিল্লিতে দুটো খুন করে পালিয়ে আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল। দিল্লিতে এনে তাকে জেলে ভরে দেওয়া হল চোদ্দ বছরের জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা সম্রাট কনিষ্কের সেই মুকুট কাবুলের জাদুঘরে জমা দিলাম। এখনও যে-কেউ গিয়ে দেখতে পারে। অনেক কাগজে-টাগজে

ছবি ছাপা হল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটা হইচই পড়ে গেল।"

অংশু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবুর পায়ের চিকিৎসা হল কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেসব আর শোনার দরকার নেই। আমার পা তো ঠিকই আছে। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে কোনও অসুবিধা হয় না। শুধু দৌড়তে পারি না, এই যা। ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ওঠো !"

॥ ১০ ॥

সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, "আজকের দিনটা একটু অন্যরকমভাবে কাটাব ভাবছি। সন্তু, জোজো, অংশু, তোমরা বরং আজ এখানে বসেই গল্পটল্প করো। আমি একবেলার জন্য ঘুরে আসি।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথা থেকে ঘুরে আসবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন মাছ ধরিনি। এক সময় আমার ছিপ দিয়ে মাছধরার খুব শখ ছিল।"

জোজো বলল, "এখানে কোথায় মাছ ধরবেন ? পুকুরটুকুর দেখিনি একটাও।"

কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকে খানিকটা দূরে গেলে ছোট-ছোট পাহাড়ের শ্রেণী আছে। সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চমৎকার একটা নদী। আগেরবার এসে সেখানে আমি মাছ ধরেছিলাম মনে আছে।"

সন্তু জোর দিয়ে বলল, "আমরা মোটেই বাড়িতে বসে থাকব না। আমরাও যাব।"

জোজো বলল, "আমি দারুণ মাছ ধরতে পারি। একবার কাস্পিয়ান হ্রদে একটা স্টার্জন মাছ ধরেছিলাম, সেটার ওজন ছিল বাইশ কিলো !"

কাকাবাবু বললেন, "বাপরে, তা হলে তো তোমার সঙ্গে আমি পারব না ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "অতবড় মাছ নিয়ে কী করলি ?"

জোজো বলল, "পেট কেটে শুধু ডিম বার করে মাছটা ফেলে দিলাম !"

অংশু বলল, "সে কী ! অতবড় মাছ ফেলে দিলে ?"

জোজো অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল, "কিছুই জানো না। স্টার্জন মাছের ডিমেরই আসল দাম।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "তা ঠিক। জোজো, তুমি অতবড় মাছ ধরেছ, এখানে ছোটখাটো মাছধরা দেখতে তোমার ভাল লাগবে কেন ? এখানে বড়জোর এক কিলো-দেড় কিলো মাছ।"

জোজো বলল, "জলের ধারে গেলেই আমার ভাল লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "অংশু তুমি কী করবে ? তোমার তো পড়া মুখস্থ করতে হবে ?"

সবাইকে অবাক করে দিয়ে অংশু সেই চার লাইন কবিতা ঠিকঠাক গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেল!

জোজো বলল, "কাল অনেক রাত জেগে ওকে দুলে-দুলে মুখস্থ করতে দেখেছি।"

অংশু বলল, "খুব ছেলেবেলায় পড়া আর-একটা কবিতা আমার মনে পড়ে গেছে। বলব?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, শোনাও।"

অংশু বলল :

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদমতলায় কে
হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বে।

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বাঃ, তা হলে তো তোমার চাকরি পাকা। তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক।"

জোজো বলল, "মাছ ধরবেন, ছিপ পাবেন কোথায়? ভাল চার লাগবে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাজারে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।"

জলখাবার খেয়ে, সঙ্গে বেশ কিছু স্যান্ডউইচ আর জলের বোতল নিয়ে বেরিয়ে পড়া হল। কামালের পাঠানো স্টেশন ওয়াগন গাড়িটা এসেছে। পুলিশের গাড়িটাও অপেক্ষা করছে বাইরে। কাকাবাবু পুলিশ পাহারায় মাছ ধরতে যেতে রাজি নন।

তিনি পুলিশের অফিসারকে ডেকে বললেন, "এখন আমরা শহরে যাচ্ছি। সেখানে তো আপনাদের ফলো করার দরকার নেই। দুপুরবেলা আমরা আজ আবার খাজুরাহো যাব, তখন আপনাদের লাগবে। আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। শহর থেকে কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করে আমরা এখানেই ফিরে আসছি।"

বাজারে তিনটি দোকানে মাছধরার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। কাকাবাবুর কোনও ছিপই পছন্দ হয় না। তিনি এক দোকান থেকে আর-এক দোকানে ঘুরতে লাগলেন। দোকানদারদের মাছ ধরার বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন নানারকম।

শেষপর্যন্ত তিনি দু'খানা বেশ মজবুত, হুইল দেওয়া ছিপ কিনলেন। আর অনেকখানি নাইলনের দড়ি। দোকানের সামনের রাস্তাটা যেন নদী, এইভাবে তিনি ছিপ দুটো পরীক্ষা করলেন কয়েকবার। তাঁকে দেখার জন্য ভিড় জমে গেল।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু গেস্ট হাউসের উলটো দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি এতক্ষণ ধরে ছিপ কিনলেন যে, সারা

শহর জেনে গেল আপনি মাছ ধরতে যাচ্ছেন। কালকের কাগজে খবর ছাপা হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এর পর যদি মাছ ধরতে না পারি, খুব লজ্জার ব্যাপার হবে, তাই না ? আগেকার দিনে বাবুরা কী করত জানিস ? সকালবেলা সেজেগুজে মাছ ধরতে যেত, একটা মাছও ধরতে না পারলে বাজার থেকে মাছ কিনে এনে বাড়িতে বলত, এগুলো আমি ধরেছি !"

অংশু বলল, "কেউ-কেউ ইলিশমাছও কিনে এনে বলতে, পুকুরে ধরেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "এখানকার শহরের অনেক ছেলেমেয়ে জানেই না যে, ইলিশমাছ কখনও পুকুরে পাওয়া যায় না।"

অংশু বলল, "এইসব দিকে ইলিশ পাওয়া যায় না ! ইলিশ শুধু পাওয়া যায় আমাদের পশ্চিমবাংলায় আর বাংলাদেশে।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা বাঙালিদের ভুল ধারণা। আরও অনেক দেশে ইলিশ পাওয়া যায়। ইলিশ হচ্ছে সমুদ্রের মাছ, বিভিন্ন দেশের নদী দিয়ে ভেতরে ঢুকে আসে ডিম পাড়ার জন্য। অবশ্য সব জায়গায় ইলিশের স্বাদ সমান নয়। আমেরিকায় কিন্তু বেশ ভাল আর বড়-বড় ইলিশ ধরা পড়ে।"

জোজোকে বারবার পেছনদিকে তাকাতে দেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "জোজো, নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা আজও দেখা যাচ্ছে ?"

জোজো বলল, "না, এখনও দেখতে পাচ্ছি না।"

সন্তু বলল, "আমরা কোথাও গেলে কামালকাকুকে ডেকে নেওয়ার কথা ছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, ওর অনেক কাজ আছে। কাল দুপুরে আমরা ওকে কাজে যেতে দিইনি। পুলিশের গাড়িটাকেও ফাঁকি দেওয়া গেছে। আজ বেশ নিরিবিলিতে মাছধরা যাবে।"

খানিকটা বাদেই পাহাড়ি রাস্তা শুরু হয়ে গেল। এখানকার রাস্তা ভাল নয়, গাড়িটা ওপরে উঠতে পারছে না। মাঝে-মাঝে ঘ-র-র ঘ-র-র শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবু জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন, এক জায়গায় এসে বললেন, "ব্যস, এখানে থামাও। এখানেই নামব।"

সবাই নেমে পড়ার পর তিনি গাড়ির ড্রাইভারকে বললেন, "তোমার অপেক্ষা করার দরকার নেই। আমরা এখানে দুপুর অবধি থাকব। তুমি ঠিক চারটের সময় এখানে ফিরে এসো।"

গাড়িটা চলে যাওয়ার পরই সব জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এ-রাস্তায় গাড়িটাড়ি চলে না বিশেষ। ছোট-ছোট পাহাড়, সবুজ গাছপালায় ভর্তি, মাঝে-মাঝে সরু পায়েচলা পথ।

একটা পথ নেমে গেছে নীচের দিকে। সেই রাস্তা ধরে কাকাবাবু তাঁর দলটি নিয়ে এগোলেন। কয়েক মিনিট বাদেই জল চোখে পড়ল।

জায়গাটা ভারী সুন্দর। আসার পথে নদীটা একবার চোখে পড়েছিল, তেমন কিছু বড় নয়, কিন্তু এখানে সেটা হঠাৎ এত চওড়া হয়ে গেছে যে, একটা লেকের মতন মনে হয়। পরিষ্কার টলটলে জল। এপাশে-ওপাশে কয়েকটা নৌকো বাঁধা আছে। কয়েক জায়গায় বেঞ্চ বানিয়েও দেওয়া হয়েছে। পিকনিক করার পক্ষে আদর্শ। আজ ছুটির দিন নয় বলে লোকজন নেই।

কাকাবাবু প্রথমে চার তৈরি করে জলে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে জলে ফেলে নিজে একটা পাথরের ওপর বসলেন। সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফাতনার দিকে।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই জোজো বলল, "কই, মাছ উঠছে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "এর মধ্যেই ? ধৈর্য না থাকলে তো মাছ ধরা যায় না।"

অংশু বলল, "এখানে বড় মাছ আছে কিনা, তাই-ই বা কে জানে ? এই ছিপে ছোট মাছ ধরা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাই এরকম কথা বললে তো পুঁটিমাছও উঠবে না। আওয়াজ শুনলেই মাছরা ভয়ে পালিয়ে যায়।"

একটুক্ষণ তিনি কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "আজ তোমাদের একটা পরীক্ষা নিতে চাই। ধরো, এখন থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত একেবারে চুপ করে থাকতে পারবে ? একটা কথাও বলা চলবে না। কী, রাজি ?"

তিনজনেই মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "জোজোরই বেশি কষ্ট হবে। একদিন সংযম দেখাও ! তোমরা তিনজন এক জায়গায় বসতেও পারবে না। আলাদা-আলাদা আমি জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি না ডাকলে কেউ আমার কাছে আসবে না।"

কাকাবাবু পাহাড়ের ওপরদিকে তিনটে জায়গা বেছে দিলেন ওদের জন্য।

তারপর নিজের কোমর থেকে রিভলভারটা বার করে সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তুই এটা রাখ সন্তু। যদি কিছু ঘটনা ঘটে, তবু তুই হুট করে গুলি চালাবি না। যদি গুলি করতেই হয়, আমি ইঙ্গিত দেব। আমার ডান হাতটা কানের কাছে তুলব।"

সন্তু বলল, "যদি কেউ এসে পড়ে আগেই তোমাকে গুলি করে ? যদি হাত তুলতে না পারো ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেরকম যদি হয়, নিজের বুদ্ধিমতন কাজ করবি। তার আগে পর্যন্ত কিছুতেই না, আমার ইঙ্গিত ছাড়া কিছুতেই না ! আর অন্যদের আবার বলছি, আমি না ডাকলে কিছুতেই আমার কাছে আসবে না ! এখন যাও, যে-যার পজিশান নিয়ে বোসো। ধরে নাও, এটা একটা খেলা। মাছ ধরার মতন এ-খেলাতেও কিন্তু খুব ধৈর্য লাগবে ! কোনও শব্দ করবে না।"

ওরা তিনজন ওপরের দিকে উঠে গেল, কাকাবাবু আবার মাছধরতে বসলেন। অন্যদের কথা বলতে বারণ করেছিলেন, নিজেই গুনগুন করে শুরু

করলেন গান, 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি—' ।

সময় যেন কাটতেই চায় না, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা....

এক ঘণ্টার একটু পরে কাকাবাবু হ্যাঁচকা টান দিয়ে একটা মাছ ধরে ফেললেন । প্রায় এক কিলো ওজনের একটা কাতলামাছ ।

ওপরের লুকনো জায়গা থেকে জোজো প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কাকাবাবুর নিষেধ মনে পড়ায় নিজেই নিজের ঠোঁট চেপে ধরল । অংশু একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেল, খচমচ শব্দ হল গাছের পাতায় । সন্তু মাছধরা দেখছে না, সে রিভলভারটা নিয়ে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে ।

কাকাবাবু মাছটাকে বঁড়শি থেকে ছাড়িয়ে সেটাকে আবার ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলেন । যেন মাছধরাতেই তাঁর আনন্দ, জ্যান্ত মাছ ধরে খাওয়ার লোভ নেই ।

আবার অপেক্ষা ।

জোজো শুয়ে পড়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে । মেঘলা দিন, রোদ্দুরের তাপ নেই । অন্যদিকে অংশু ঘুমিয়ে পড়েছে একটা গাছে হেলান দিয়ে । সন্তু একটা পাথরের আড়ালে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে ।

দু' ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর খুব জোরে একটা গাড়ি এসে ওপরের রাস্তায় থামল । তার থেকে দু'জন লোক লাফিয়ে নেমে পড়ে খানিকটা ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল । তাদের চেহারা ডাকাতের মতন, দু'জনের হাতেই রাইফেল । গাড়ি চালাচ্ছিল একজন প্রায়-বুড়ো লোক, মাথার চুল ধপধপে সাদা, লম্বা-চওড়া চেহারা, সে গাড়ি থেকে নামল একটা ছড়ি হাতে নিয়ে । ছড়িতে ভর দিয়ে ঝুঁকে-ঝুঁকে হেঁটে সে এগিয়ে এল খানিকটা ।

সন্তুর বুকটা ধক করে উঠল । দু'জন লোকের হাতে রাইফেল, এখন সে কী করবে ? কাকাবাবুর যেন ভ্রূক্ষেপই নেই, পেছনে ফিরে তাকালেনও না ।

চুলপাকা লোকটি হেঁকে বলল, "রায়চৌধুরী সাব, নমস্তে । কটা মছলি পাকড়ালেন ?"

কাকাবাবু এবার মুখ ফিরিয়ে যেন খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, "আরে সূরযপ্রসাদ যে ! নমস্তে-নমস্তে । কেমন আছ ?"

সূরযপ্রসাদ বলল, "হনুমানজির কৃপায় ভাল আছি । আপনার চারদিকে এত শত্রু, তবু আপনি একা-একা মাছ ধরতে এসেছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার ভরসাতেই তো এসেছি । তোমার চিঠি পেয়েছি আমি । অন্য কেউ মারতে এলে তুমি বাঁচাবে ।"

সূরযপ্রসাদ বলল, "হাঁ, তা তো জরুর বাঁচাব । অন্য কেউ তোমাকে মারতে পারবে না । তা হলে আমি তোমার ওপর প্রতিশোধ নেব কী করে ?"

সে একজন রাইফেলধারীকে বলল, "ওর কাছে কী অস্তরটস্তর আছে, সার্চ করে দ্যাখ । সাবধান, এ-লোকটা মহা ফন্দিবাজ !"

সে দৌড়ে এসে কাকাবাবুর প্যান্টের পকেট ও কোমরটোমর সব টিপে দেখল। কিছুই নেই। তখন সে রাইফেলের নলটা কাকাবাবুর বুকে ঠেকিয়ে রাখল।

কাকাবাবু বললেন, "মাছ ধরতে এলে কি কেউ সঙ্গে বন্দুক-পিস্তল রাখে নাকি? তুমি আমাকে মেরে ফেলতে এসেছ? তুমি তো আগে শুধু মূর্তি-চুরি আর পাচার করতে, খুনটুন তো করতে না। এখন লাইন পালটেছ?"

সূরযপ্রসাদ বলল, "এত কম্পিটিশান, টিকে থাকতে হলে লাইন পালটাতেই হয়। তবে তোমাকে আমি জানে মারব না। তুমি আমাকে অপমান করেছিলেন, আজ তার শোধ নেব। তোমাকেও আজ নাকে খত দিতে হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কেন নাকে খত দেব? আমি তো কোনও খারাপ কাজ করিনি। তুমি মূর্তি চুরি করেছিলে, তোমাকে জেলে দেওয়ার বদলে আমি ওইটুকু শাস্তি দিয়েছি!"

সূরযপ্রসাদ রাগে দাঁত কড়মড় করে বলল, "আমার জেলে যাওয়া অনেক ভাল ছিল। আমাদের লাইনে জেল কেউ পরোয়া করে না। কিন্তু নাকে খত দিয়েছি বলে আমার শত্রুরা এখনও হাসে। নাও, আরম্ভ করো।"

কাকাবাবু বললেন, "এই পাথরের রাস্তায় নাকখত দিতে হবে? এটা ঠিক হচ্ছে না। তোমাকে আমি খত দিইয়েছিলাম খাজুরাহো মন্দিরে, সেটা প্লেন জায়গা ছিল। এই পাথরে নাক ঘষলে আমার নাক ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তারক্তি হয়ে যাবে যে!"

সূরযপ্রসাদ বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি আমার সঙ্গে মজাক করছ? তোমার ঘাড় ধরে মাটিতে চেপে ধরব, তাই-ই চাও?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, সেটা আরও খারাপ হবে। ঠিক আছে, কোথা থেকে শুরু করব বলো!"

সূরযপ্রসাদ বলল, "এখানে এসে আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাবে, তারপর নাকেখত দিয়ে ওই ওপরের রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে আবার নেমে আসবে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাবাঃ, এ যে অনেকটা। ঠিক আছে, অন্য কেউ আর দেখছে না।"

সূরযপ্রসাদ বলল, "ক্যামেরা এনেছি, ছবি তুলে রাখব।"

কাকাবাবু ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এলেন সূরযপ্রসাদের দিকে।

হঠাৎ ওপর থেকে হুড়মুড় করে অংশু লাফিয়ে পড়ল একজন রাইফেলধারীর কাঁধে। দু'জনে মাটিতে গড়াগড়ি করে অংশু কোনওক্রমে ছিনিয়ে নিল রাইফেলটা। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াবার আগেই অন্য লোকটি তাক করে ফেলেছে তার দিকে।

কাকাবাবু হাত দুটো মুঠো করে আছেন, অর্থাৎ সন্তুকে কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছেন না। নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আরে, এ লোকটা কে?"

সূরযপ্রসাদ চিৎকার করে বলে উঠল, "এ তোমার দলের লোক। তোমার দলে আরও ছেলে ছিল, তারা কোথায় গেল!"

কাকাবাবু বললেন, "তাদের তো আমি নিয়ে আসিনি। এ কী করে চলে এল?"

সূরযপ্রসাদ বলল, "কুছ পরোয়া নেই। রায়চৌধুরী, আমার পায়ে মাথা দাও!"

হাতের ছড়িটা দিয়ে সে সপাং করে এক ঘা কষাল অংশুর পিঠে।

কাকাবাবু এবার কঠোরভাবে বললেন, "সূরযপ্রসাদ, ওকে মেরো না। শোনো আমার কথা। তুমি আমাকে নাকে খত দিতে বাধ্য করালে তারপর আমি তোমাকে ছাড়ব? এবার ঠিক জেলে ভরে দেব!"

সূরযপ্রসাদ বলল, "আরে বাঙালি, তোমার কত মুরোদ, এবার দেখব! তোমাকে আগে নাকে খত দিইয়ে সেটা ফোটো তুলে সবাইকে দেখাব। এখান থেকে যাওয়ার আগে তোমাকে খুন করে সেই লাশ জলে ভাসিয়ে দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে খুন করা এত সোজা? দেব না নাকে খত, তুমি কী করতে পারো?"

সূরযপ্রসাদ কাকাবাবুকে মারার জন্য ছড়িটা তুলতেই তিনি সেটা ধরে ফেলে হ্যাঁচকা টান দিলেন। তারপর কানে হাত দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওপর থেকে ছুটে এল একটা নয়, দুটো গুলি। একজন রাইফেলধারী মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। একটা গুলি লাগল সূরযপ্রসাদের কাঁধে। অন্য রাইফেলধারীটা ওপরের দিকে তাক করতে-করতে আবার দুটো গুলি ছুটে এল। সেও ঘায়েল হয়ে গেল! দু'দিক থেকে দুটো গুলি আসায় কাকাবাবুও অবাক! তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন কামাল।

কাকাবাবু বললেন, "আরে, তুমি কোথা থেকে এলে?"

কামাল বললেন, "আপনি মাছ ধরতে গেছেন শুনেই বুঝলাম, ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে এনেছেন। তাই সঙ্গে রাইফেল নিয়ে ছুটে এসেছি। এসেই দেখি, দলবল নিয়ে উপস্থিত সূরযপ্রসাদ।"

কাকাবাবু বললেন, "দলবল তো নয়, মাত্র দুটো লোক। এদের আমরাই ব্যবস্থা করতে পারতাম। সন্তুকে তুমি টিপ দেখাবার চান্সই দিলে না। সূরযপ্রসাদকে নিয়ে এখন কী করা যায়? আবার নাকখত দিইয়ে ছেড়ে দেব?"

কামাল বললেন, "কিছুতেই না। ওকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। বুড়ো বয়েসেও ওর লোভ যায়নি। জেলই ওর ঠিক জায়গা।"

কাকাবাবু বললেন, "দড়ি এনেছি, ওদের বেঁধে রাখো।"

জোজো আর সন্তুও নেমে এসেছে। সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি ইঙ্গিত দিতে এত দেরি করছিলে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখছিলাম গুলি না চালিয়েও ওদের জব্দ করা যায় কি না। আচ্ছা অংশু, তুমি কোন সাহসে একজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে ? আমি বারণ করেছিলাম না ?"

অংশু বলল, "আপনাকে নাকে খত দিতে বলল শুনেই রাগে আমার গা জ্বলে উঠল। আর থাকতে পারলাম না। আমি ভাবলাম, আমি একজনকে ধরতে পারলেই সন্তু আর একজনকে গুলি করবে।"

কাকাবাবু বললেন, "রেলের ডাকাতরা তো এত সাহসী হয় না। তোমার সাহস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি।"

অংশু বলল, "ও-কথা আর বলবেন না সার। আমি চিরকালের মতন ওই লাইন ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তা হলে তোমাকে পুলিশই একটা চাকরি দেওয়া যেতে পারে। তোমার মতন লোকরাই চোর-ডাকাতদের ভাল সামলাতে পারবে।"

কামাল আর সন্তু মিলে তিনজনকেই বেঁধে ফেলেছে। এই সময় ভটভট শব্দ করতে-করতে এঞ্জিন লাগানো একটা নৌকো এদিকে এগিয়ে এল। তাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বামতন মানুষ, চোখে কালো চশমা। হাতে তার বড় একটা অস্ত্র। স্টেনগান কিংবা এ. কে. ফরটি সেভেন।

চোখের নিমেষে এই অস্ত্র থেকে একসঙ্গে অনেক গুলি ছুটে আসে।

লোকটি কর্কশ গলায় বলল, "সবাই হাত তুলে দাঁড়াও ! যে নড়াচড়া করবে, তার আগে প্রাণ যাবে।"

ওর হাতের অস্ত্রটি দেখলেই ভয় করে। সবাই হাত তুলতে বাধ্য হল। কাকাবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, "এ আবার কে ?"

কামাল বললেন, "গলার আওয়াজটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।"

নৌকোটা পারের কাছে আসতেই লোকটি একলাফে নেমে পড়ল। একহাতে অস্ত্রটা উঁচিয়ে রেখে নৌকোর দড়িটা বাঁধল একটা গাছের সঙ্গে। তারপর খুলে ফেলল চোখের কালো চশমাটা।

কামাল প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, "এ কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "অবোধরাম !"

অবোধরাম বলল, "রায়চৌধুরী, মনে আছে আমাকে ?"

কাকাবাবু বললেন, "মনে থাকবে না ? কী আশ্চর্য যোগাযোগ ! ক'দিন ধরে আমরা তোমার কথাই বলছিলাম। এই ছেলেদের সেই গল্প শোনাচ্ছিলাম। আর তুমি এসে হাজির ! গল্পের মধ্যে গল্পের ভিলেনের সশরীরে আবির্ভাব !"

অবোধরাম বলল, "মনে নেই, আমি বলেছিলাম, আবার দেখা হবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তাও মনে আছে। কিন্তু সেটা তো কথার কথা ! তোমার তো যাবজ্জীবন জেলে থাকার কথা ছিল। তুমি এখানে কী করে ?

সত্যি তুমি এসেছ, না ভুল দেখছি !"

অবোধরাম বলল, "সত্যি কি ভুল তা একটু পরেই মালুম হবে ! তোমার স্যাঙাতটাও এখানে রয়েছে দেখছি ! এর কথা আমার মনেই ছিল না।"

কাকাবাবু বললেন, "জেল থেকে বেরোলে কী করে ? আগেই ছেড়ে দিল ?"

অবোধরাম বলল, "আমাকে আটকে রাখতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোনও জেল নেই। প্রতিশোধ নেব বলেছিলাম। আমরা কখনও অপমান ভুলি না !"

কাকাবাবু হতাশ হওয়ার ভাব দেখিয়ে বললেন, "কত লোকই যে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু কেউ পারে না শেষ পর্যন্ত। তুমি একা এসেছ ? তোমার সাহস তো কম নয় ! আমরা এখানে এতজন আছি।"

অবোধরাম বলল, "আমি একাই একশো। আমার হাতে কী আছে দেখেছ ? এক মিনিটেই তোমাদের সবাইকে শেষ করে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "এসব অস্ত্র তোমরা জোগাড় করো কী করে ?"

অবোধরাম হঠাৎ ধমক দিয়ে বলল, "চোপ ! বড় বেশি কথা বলছ।"

কয়েক পা এগিয়ে এল। সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। তারপর বলল, "এই ছেলেগুলোকে আমার দরকার নেই। রায়চৌধুরী, তুমি আর তোমার স্যাঙাত নৌকোয় ওঠো। তোমাদের দু'জনকে আমি নিয়ে যাব।"

কাকাবাবু কিছুই না বোঝার ভান করে বললেন, "নৌকোয় উঠব কেন ? বেড়াতে নিয়ে যাবে নাকি আমাদের ?"

অবোধরাম চিৎকার করে বলল, "ওঠো বলছি ! তোমাদের দু'জনকে আমি এমন জায়গায় পাঠাব যে, কেউ আর কোনওদিন খুঁজেও পাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "অবোধরাম পালোয়ান, চেঁচিয়ো না। তুমি ফাঁদে পড়ে গেছ। এবার আর তোমার পালাবার আশা নেই।"

অবোধরাম অট্টহাসি দিয়ে বলল, "ফাঁদ ! কীসের ফাঁদ ? চালাকি করতে যেয়ো না রায়চৌধুরী, তা হলে এই ছেলেগুলোও মরবে ! নৌকোয় ওঠো !"

কাকাবাবু বললেন, "যদি না উঠি ?"

অবোধরাম বলল, "তা হলে তোমার চোখের সামনে একজন একজন করে মারব। সবশেষে তোমাকে !"

কাকাবাবু বললেন, "ওহে পালোয়ান, একটা ওইরকম অস্ত্র জোগাড় করলেই হয় না, ঠিকমতন চালানো শিখতে হয়। তুমি চলে এসেছ আমাদের মাঝখানে। আমাদের সবাইকে আগে একসার দিয়ে দাঁড় করানো উচিত ছিল।"

অবোধরাম অমনই কাকাবাবুর বুকের দিকে তাক করে উঠল, "দাঁড়াও, সবাই এক লাইন করে দাঁড়াও !"

কাকাবাবু বললেন, "আহা, হা, এখন আর কেউ নড়বে না। এখন তুমি

আমাদের মধ্যে শুধু একজনকেই মারতে পারবে। একজনকে যে-ই মারবে, অমনই পেছনদিক থেকে একজন তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের মধ্যে একজন কে প্রাণ দেবে? আমি, আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমি মরলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তারপর তুমি বাঁচবে না, অবোধরাম।"

একটু হেসে কাকাবাবু বললেন, "নাও, আমাকে মারো, তোমার ঠিক পেছনে চলে এসেছে কামাল, তার হাতে রয়েছে ছুরি। ডান দিকে আমার ভাইপো সন্তু, তার হাতের টিপও দারুণ। এবার এসো অবোধরাম, প্রতিশোধ নাও!"

অবোধরাম চকিতে পেছন ফিরে কামালকে দেখার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বিদ্যুতের মতন একটা ক্রাচ তুলে প্রচণ্ড জোরে মারলেন তার হাতে। অস্ত্রটা পড়ে যেতেই সন্তু চোখের নিমেষে সেটা তুলে নিল!

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ অবোধরাম, তোমার যে আর প্রতিশোধ নেওয়া হল না!"

অবোধরামের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

কামাল হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "দাদা, দাদা, আপনি যে অসাধ্যসাধন করলেন! এবার যে বাঁচব, ভাবতেই পারিনি। এ লোকটা যদি আগে আমার দিকে গুলি চালিয়ে দিত!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আগে অনেকবার দেখেছি, কারও চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আমি যদি ধমকে বলি, মারো, আমায় মারো, তাতে অন্যরা তক্ষুনি গুলি করতে পারে না।"

জোজো বলল, "হিপনোটাইজ্‌ড হয়ে যায়। আমার বাবা একবার স্পেনে গুণ্ডার দলের মধ্যে পড়ে..."

জোজোকে গল্প বলতে না দিয়ে কামাল বললেন, "সন্তু, এসো, একে আগে বেঁধে ফেলা যাক।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ওই অস্ত্রটা সম্বন্ধে সাবধান। ভারী ডেঞ্জারাস। ওটা নামিয়ে রাখো বরং।"

সন্তু সেটা নামাবার আগেই অবোধরাম লাফিয়ে গিয়ে জোজোকে চেপে ধরল। তার হাতে একটা লম্বা ছুরি। ছুরির ডগাটা সে জোজোর গলায় চেপে ধরেছে। বিকৃত গলায় বলে উঠল, "রায়চৌধুরী, এবার? আমার অস্ত্রটা ফেরত দাও, না হলে এ-ছেলেটা মরবে!"

কাকাবাবু বললেন, "আঃ, বারবার এই ভুল হয়। একজন যে দুটো অস্ত্র রাখতে পারে, সেটা মনে থাকে না। আগেই ওকে সার্চ করা উচিত ছিল।"

অবোধরাম বলল, "দাও, অস্ত্রটা ফেরত দাও!"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ, ওই অস্ত্র তুমি ফেরত পাবে না।"

কামাল বললেন, "এবারেও তোমার সুবিধে হবে না অবোধরাম। ওই

ছেলেটাকে মারার চেষ্টা করলেই আমরা তোমাকে গুলি করব। আমাদের দলের বড়জোর একজন মরবে।”

অবোধরাম জোজোকে টানতে-টানতে নৌকোর কাছে নিয়ে গেল। এখন তার পেছনদিকে আর কেউ নেই। এখন অস্ত্রটা হাতে পেলে সে একসঙ্গে সকলের দিকে গুলি চালাতে পারবে।

অবোধরাম বলে উঠল, “আমি ঠিক পাঁচ গুনব, তার মধ্যে অস্ত্রটা ফেরত না দিলে আমি এই ছেলেটাকে নিয়ে নৌকোয় উঠে চলে যাব। এক—দুই—তিন—চার।”

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, “দাঁড়াও! জোজো পরের বাড়ির ছেলে। আমরা ওর জীবনের ঝুঁকি নিতে পারি না। সন্তু, অস্ত্রটা আমাকে দে। তোরা সব আড়ালে চলে যা। আমি ওকে অস্ত্রটা ফেরত দেব।”

অবোধরাম বলল, “ছুড়ে দিলে চলবে না। এই ছেলেটাকে আমার সামনে দাঁড় করাব, তারপর ওটা আমার হাতে তুলে দেবে।”

কাকাবাবু অস্ত্রটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুখের একটা রেখাও কাঁপছে না। অস্ত্রটা হাতে পেলে অবোধরাম যে প্রথমে তাঁকে ধরবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

একেবারে কাছে এসে তিনি বললেন, “জোজো, কোনও ভয় নেই। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।”

তিনি অস্ত্রটা অবোধরামকে দেওয়ার জন্য উঁচু করলেন, অবোধরাম একহাত বাড়াল।

ঠিক তখনই কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগল অবোধরামের সেই হাতে। সে আঃ করে এক দৌড় লাগাতেই জোজো এক দৌড় লাগাল।

ঠিক পাশের বড় পাথরটার ওপর এসে দাঁড়াল একজন মানুষ, তার হাতে রিভলভার। সে বলল, “খেল খতম! আর কেউ আছে নাকি?”

সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেই মানুষটি নরেন্দ্র ভার্মা!

নরেন্দ্র ভার্মা আবার বললেন, “অবোধরাম, আমি ইচ্ছে করে তোমার মাথায় গুলি চালাইনি। তুমি নৌকোয় ওঠার চেষ্টা করলে কিন্তু প্রাণে বাঁচবে না! কামালসাহেব, ওকে বেঁধে ফেলুন!”

পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে নেমে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। হাসতে-হাসতে কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “রাজা, তা হলে তোমার অপারেশান সাকসেসফুল!”

কাকাবাবু বললেন, “আঃ নরেন্দ্র, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! তুমি খুব নাটক করতে ভালবাসো, তাই না? এমন ভাবে হঠাৎ এসে উদয় হলে, যেন সিনেমার নায়ক। ওই পাথরের আড়ালে কতক্ষণ ধরে ঘাপটি মেরে বসে আছ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা প্রায় ঘণ্টাদেড়েক হবে !"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে, এতক্ষণ ধরে এখানে যা-যা ঘটেছে, সব তুমি দেখেছ ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সব, সব। তোমাদের এখানেই তো যতরকম নাটক হল। তবে আগে আমি দেখা দিইনি, কিংবা গুলি চালাইনি, তার কারণ, দেখছিলাম, তোমরা নিজেরা কতটা ম্যানেজ করতে পারো। তোমাদের কৃতিত্বে বাধা দিতে চাইনি।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এখনই বা গুলি চালালে কেন ? অবোধরামকেও আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নিতাম।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সে কী ! তুমি স্টেনগানটা ওকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলে। আর একবার হাতে পেলে ও কাউকে ছাড়ত না। ওর বিবেক বলে কোনও বস্তু নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে ফিরিয়ে দিতে যাওয়া, আর সত্যি সত্যি হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে অনেক তফাত ! মাঝখানের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অন্য কিছু ঘটে যেতে পারে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না রাজা, আর আমি ঝুঁকি নিতে চাইনি। তুমি যেই এই ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য ওকে স্টেনগানটা ফেরত দিতে এলে, তখনই ভাবলাম, এই রে, আর তো উপায় নেই, এবার খেলা শেষ করা যাক !"

অন্যদের বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। চোখ বড়-বড় করে সব শুনছে। জোজোই প্রথম বলল, "কাকাবাবু, আপনি জানতেন যে, নরেন্দ্র ভার্মা আমাদের বাঁচাবার জন্য এখানে লুকিয়ে আছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তা জানতাম না। ও তো আগে থেকে কিছু বলে না। তবে আমার একটু-একটু সন্দেহ হয়েছিল। নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি করে কে আমাদের অনুসরণ করবে ? কে আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে ? আমার তো এই সাতনায় সেরকম বন্ধু কেউ নেই। কামালের কথা বাদ দিচ্ছি, সে গোপনে অনুসরণ করবে কেন ? তা হলে কে হতে পারে ?"

তারপর নরেন্দ্র ভার্মার দিকে ফিরে বললেন, "তুমি এবারেও আমাকে টোপ ফেলেছিলে, তাই না ? আমি যে এখানে এসেছি, সে-খবর তুমিই ছড়িয়েছ। খবরের কাগজে আমার কথা ছাপাবার ব্যবস্থা করেছ।"

নরেন্দ্র ভার্মা সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, "মাছধরার জন্য যেমন টোপ লাগে, সেইরকম বড়-বড় অপরাধীদের ধরার জন্য তুমি বেশ ভাল টোপ। এই ব্যাটা অবোধরাম জেল ভেঙে পালিয়েছে কয়েক মাস আগে, কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না, তখন ভাবলাম, ও নিশ্চয়ই তোমার ওপর প্রতিশোধ নিতে আসবে। কলকাতায় তোমার বাড়িতে বোমা ছোড়ার ঘটনা শুনে মনে হল, সেটা অবোধরামেরই কীর্তি। রাজা, তুমি যখন সাতনায় বেড়াতে আসতে চাইলে,

তখনই ঠিক করলাম, তা হলে অবোধরামকেও এখানে টেনে আনা যাক। তাই তোমার এখানে আসার খবর ছড়িয়ে দিলাম। অবোধরাম তোমাকে মারতে আসবে, আমি পেছন থেকে ওকে এসে ধরব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমিও ভাবলাম, কেউ যখন আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে, তখন বাড়িতে লুকিয়ে বসে থেকে কিংবা পুলিশের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকা যাবে না। হঠাৎ বোমা ছুড়বে কিংবা চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি চালাবে। তার চেয়ে ওদের প্রকাশ্য জায়গায় মুখোমুখি টেনে আনাই ভাল। বাজারে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলাম যে, মাছ ধরতে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি। সে-খবর পেয়ে ওরা আসবেই। তবে একবার সূরযপ্রসাদ, একবার অবোধরাম, এরকম যে পরপর আসবে, সেটা চিন্তা করিনি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ওই সূরযপ্রসাদ তো চুনোপুঁটি। ওর কথা আমিও ভাবিনি। ওকে ফাউ হিসেবে পাওয়া গেছে। অবোধরামই রাঘব বোয়াল।"

অংশু বলল, "সার, একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনি পুলিশ-টুলিশ না নিয়ে এখানে চলে এলেন। নির্জন জায়গা, ওরা যদি প্রথমেই রাইফেল দিয়ে কিংবা স্টেনগান দিয়ে ট্যা-রা-রা-রা করে গুলি চালিয়ে দিত, আপনি কী করে বাঁচতেন?"

কাকাবাবু বললেন, "অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। প্রথমেই গুলি এরা চালায় না। ভাড়াটে খুনিরা দূর থেকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যারা দলের সর্দার ধরনের, তাদের প্রত্যেকেরই খুব অহঙ্কার থাকে। তারা সামনে এসে মারার আগে অনেক কথা বলে। নিজের যে কত বুদ্ধি আর শক্তি, সেটা প্রমাণ করতে চায়। এরা যত কথা বলবে, ততই সময় পাওয়া যাবে। যত সময় পাওয়া যায়, ততই ওদের সঙ্গে আরও কথা বলে রাগিয়ে দিতে হয়। রেগে গেলে ওরা অসাবধানী হয়ে পড়ে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী খুব লাকি। আগেও অনেকবার দেখেছি, ও কী করে যেন ঠিক বেঁচে যায়।"

কাকাবাবু তার পিঠে একটা কিল মেরে বললেন, "আমি লাকি, তাই না? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। এর পরের বার তোমাকে টোপ হিসেবে দাঁড় করাব!"

অবোধরাম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। গুলি লেগেছে তার কনুইতে, রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে। আহত অবস্থাতেও সে চেয়ে আছে কটমটিয়ে।

সন্তু একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। এবার বলল, "কিন্তু কাকাবাবুর অসুখের সময় আমাদের বাড়িতে কালো চশমা পরে কে এসেছিল? সে তো এই লোকটা হতে পারে না! অবোধরাম বাঙালি নয়, কিন্তু সে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেছিল। তা ছাড়া, খুব সম্ভবত তার একটা চোখ

পাথরের।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “না, সে এ নয়। তার নাম কানা হাবলু। পোশাকি নাম হাবুল সিং। সে বাঙালি হলেও অমৃতসর শহরের লোক। কখনও বাঙালি সাজে, কখনও পাঞ্জাবি। মাথায় বুদ্ধি বিশেষ নেই, কিন্তু গায়ে খুব জোর। একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে ধরা পড়ে দিল্লির এক জেলে অবোধরামের সঙ্গে ছিল। অবোধরামের বুদ্ধিতেই সেও জেল থেকে একসঙ্গে পালায়। অবোধরাম তাকেই কলকাতায় পাঠিয়েছিল তোমার গতিবিধি জানবার জন্য। গ্যাস বোমা বোধ হয় নিজের বুদ্ধিতেই সে ছুড়েছিল। ঠিক বলেছ সন্তু, কানা হাবলুর একটা চোখ পাথরের।”

কামাল বললেন, “আমাকেও বোধ হয় সেই লোকটাই একবার আক্রমণ করতে এসেছিল।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “হতেই পারে। তবে সে কয়েকদিন আগে ধরা পড়ে গেছে, তাকে জেরা করে সব জানা যাবে!”

কাকাবাবু বললেন, “একটা মজা কী জানো, সন্তু আর জোজো আমাদের আফগানিস্তানের সেই প্রথম অভিযানের কাহিনীটা খুব শুনতে চেয়েছিল, ক'দিন ধরে কামাল আর আমি সেটা ওদের বলছিলাম। ওই সময়ই অবোধরাম এসে হানা দিল!”

নরেন্দ্র ভার্মা অবোধরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, “পেহলবান, এই স্টেনগানটা জোগাড় করলে কোথা থেকে? তোমার টাকার অভাব নেই, চুপচাপ কোনও গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থাকলে তোমাকে খুঁজে বার করা যেত না। রাজা রায়চৌধুরীকে খোঁচাতে এসেই তুমি ধরা পড়লে।”

অবোধরাম গম্ভীর গলায় বলল, “কোনও জেল আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আমি আবার বেরোব। তোমাদের ওপর ঠিক প্রতিশোধ নেব!”

কাকাবাবু বললেন, “তাই নাকি? যদি সত্যিই আবার বেরিয়ে আসতে পারো, তা হলে সেবারে নরেন্দ্রকে টোপ রাখব!”

কামাল বললেন, “ওর ডান হাতের পাঞ্জাটা একেবারে ভেঙে দিলে কেমন হয়? তা হলে আর কোনওদিন ও আর বন্দুক পিস্তল ধরতে পারবে না।”

কাকাবাবু বললেন, “না, না, ওসব করতে যেয়ো না! আমরা তো বিচারক নই, আদালত ওকে যা শাস্তি দেবে, সেটাই ও ভোগ করবে।”

কামাল বললেন, “ও দু-দু'বার আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল, আমার ইচ্ছে করছে—”

নরেন্দ্র ভার্মা তাঁর কাধে হাত দিয়ে বললেন, “মাথা ঠাণ্ডা করুন কামালসাহেব! দেখছেন না, রাজা কেমন ফুর্তিতে আছে। চলো রাজা, এবার যাওয়া যাক। আর এখানে থেকে কী হবে?”

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা এই লোকগুলোকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি এখন যাচ্ছি না। মাছ ধরতে এসেছি, এইবার মন দিয়ে মাছ ধরতে হবে।"

কাকাবাবু জলের ধারে এগিয়ে গিয়ে ছিপ নিয়ে বসলেন। গুনগুন করে গান ধরলেন, "আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি/ সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা/আমায় চেন কি ?"

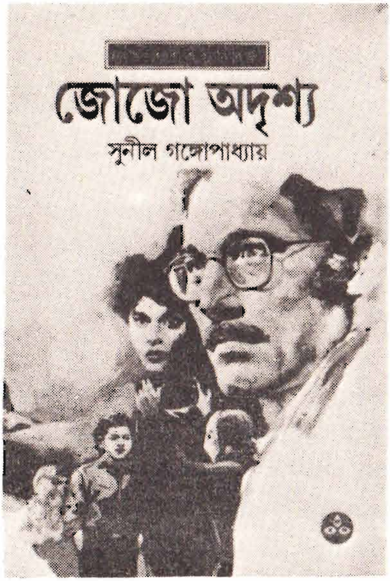

জোজো অদৃশ্য

বাড়ির পাশের গলিটায় এখন একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে সবসময়। গাঢ় চকোলেট রঙের গাড়ি, প্রায় নতুনের মতন ঝকঝকে। সন্তু মাঝে-মাঝেই ছাদ থেকে উঁকি মেরে গাড়িটাকে দেখে। কখনও পায়রা কিংবা কাক গাড়িটার ওপর নোংরা ফেললে সন্তু দৌড়ে নীচে নেমে গিয়ে পরিষ্কার করে দেয়। আদর করে হাত বুলোয় গাড়িটার গায়। এর মধ্যেই সন্তু গাড়িটার একটা নাম দিয়ে ফেলেছে, গিংগো। সে ছাড়া এ নাম আর কেউ জানে না।

গাড়িটা দেখাশুনোর দায়িত্ব সন্তুর ওপর। কিন্তু এটা তাদের গাড়ি নয়। বিমানদা প্রায় জোর করেই গাড়িটা এখানে রেখে গেছে এক সপ্তাহ আগে। বিমানদা দেড় মাসের ছুটি নিয়ে গেছে জার্মানিতে। তার বাড়িতে গ্যারাজ নেই, গাড়িটা আগে রাত্তিরবেলা রাখা হত একটা পেট্রোল পাম্পে। কিন্তু এই দেড় মাস গাড়িটা সেখানে থাকলে তারা যদি ভাড়া খাটায়? যদি যে-সে গাড়িটা চালায়। সেইজন্য বিমানদা যাওয়ার আগে কাকাবাবুকে এসে বলেছিল, "গাড়িটা আপনারা রাখুন। আপনারা ব্যবহার করবেন।"

কাকাবাবু হেসে বলেছিলেন, "আমরা কী করে ব্যবহার করব? আমি কি গাড়ি চালাই? দাদাও গাড়ি চালাতে জানেন না। সন্তু এখনও শেখেনি। তা হলে?"

বিমানদা বলেছিল, "একটা ঠিকে-ড্রাইভার রেখে দেবেন। যখন দরকার হবে, তখন গাড়িটা নিয়ে বেরোবেন। গাড়িটা শুধু-শুধু পড়ে থাকার চেয়ে মাঝে-মাঝে চালালেই ভাল হয়।"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "কিন্তু গাড়িটা গলির মধ্যে রেখে দেবে, যদি চুরি হয়ে যায়?"

বিমানদা বলেছিল, "আপনার বাড়ির পাশ থেকে গাড়ি চুরি করবে, কার এমন বুকের পাটা?"

কাকাবাবু আবার হেসে ফেলে বলেছিলেন, "তুমি বলছ কী বিমান, গাড়ি-চোররাও আমাকে চেনে? আমার নাম-ডাক অতটা ছড়ায়নি বোধ হয়!"

বিমানদা গাড়ি-চুরির ব্যাপারটা তবু গুরুত্ব দেয়নি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "চুরি হয় তো হবে ! ইনশিওর করা আছে। আমি পেট্রোল পাম্পে রাখতে চাই না।"

তারপর সন্তুর কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, "যদি ড্রাইভার না আসে তা হলে তুই রোজ একবার গাড়িটা স্টার্ট দিবি ! না হলে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে তুই এর মধ্যে গাড়ি চালানো শিখেও নিতে পারিস !"

বিমানদা তো গাড়িটা রেখে দিয়ে চলে গেল। গাড়ি চালানো শেখার এরকম আচমকা সুযোগ পেয়ে সন্তুর দারুণ উৎসাহ হয়েছিল, কিন্তু বাবা জানতে পেরে বলেছিলেন, "ওসব চলবে না। পরের গাড়ি নিয়ে শিখতে যাবে, যদি ধাক্কা লেগে ভেঙেচুরে যায় ? যদি কখনও নিজে উপার্জন করে গাড়ি কিনতে পারো, তখনই গাড়ি চালাবে। তার আগে নয়।"

এর মধ্যে কাকাবাবু আবার দিল্লি চলে গেলেন, তাই ড্রাইভার রাখারও প্রশ্ন ওঠেনি। বাবা বাড়ি থেকে বেরোতেই চান না। মা মাঝে-মাঝে আপনমনে বলেন, "কতদিন থেকে একবার কালীঘাট মন্দিরে যাব ভাবছি, বরানগরের সেজোমাসি অনেকবার যেতে বলেছেন, একটা গাড়ি থাকলে কত সুবিধে, একদিনে সব সেরে আসা যায়, ওখান থেকে দক্ষিণেশ্বরেও ...।" বাবা এসব কথা শুনেও না-শোনার ভান করে থাকেন। মুখ ঢেকে রাখেন খবরের কাগজে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সন্তু তড়িঘড়ি গাড়িটা স্টার্ট দিতে যায়। বিমানদা শিখিয়ে দিয়ে গেছে। ক'দিন ধরে শীত পড়েছে বেশ। সন্তু ফুলপ্যান্ট ও কোট পরে নিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে। গিয়ার নিউট্রাল করা থাকলে গাড়ি এগোবে না। সন্তু চাবি ঘুরিয়ে ক্লাচে পা রেখে চাপ দেয়। প্রথম কয়েকবার খ্যা-র-র খ্যা-র-র আওয়াজ হয়, তারপর গম্ভীরভাবে গাড়ির এঞ্জিনের স্বাভাবিক শব্দ বেরোয়।

তখন সন্তু মনে-মনে গাড়ি ছোটায়। নতুন বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে গঙ্গার ওপার। তারপর ফাঁকা রাস্তা। বম্বে রোড ধরে ঝড়ের বেগে ছুটছে গাড়ি, স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে, সামনে একটু ঝুঁকে সন্তু ফিসফিস করে বলে, "কাম অন গিংগো, আরও জোরে, আরও জোরে ...।" গাড়ি নয়, সন্তু যেন ঘোড়া ছোটাচ্ছে !

হঠাৎ গলি দিয়ে জোজোকে আসতে দেখে সে লজ্জা পেয়ে গেল।

জোজো ভোরবেলা কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কোনওদিন গঙ্গার ধার, কোনওদিন বালিগঞ্জ লেক, কোনওদিন সল্টলেকের নলবন পর্যন্ত যায়। মাঝে-মাঝে সন্তুকেও ডাকতে আসে।

গাড়িটার বনেটে একটা চাঁটি মেরে জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু গাড়ি কিনলেন বুঝি ? কবে কেনা হল ? দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড !"

সন্তু বলল, "আমরা কিনিনি, এটা বিমানদার গাড়ি। মোটেই সেকেন্ড হ্যান্ড নয়, নতুন।"

জোজো ভুরু তুলে বলল, "আমায় গাড়ি চেনাবি ? কোন গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে ভেঙে তুবড়ে গিয়েছিল, আবার সারিয়ে-সুরিয়ে রং করা হয়েছে, তা আমি এক নজরে বলে দিতে পারি। এই গাড়িটা একদিন রেড রোডে অ্যাকসিডেন্ট করেছিল, ধাক্কা মেরেছিল ট্রাকের সঙ্গে, ঠিক বেলা এগারোটায়।"

সন্তু বলল, "তুই বুঝি উপস্থিত ছিলি সেখানে ?"

জোজো দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না।"

সন্তু বলল, "অ্যাকসিডেন্ট করতে পারে, কিন্তু রেড রোডে, বেলা এগারোটায়, তা তুই কী করে বুঝলি ?"

জোজো সন্তুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, "কী করে আমি বুঝি, তা যদি তুই বুঝতি, তা হলে তোর নামই তো জোজো হত ! চ, এ গাড়িতে ডায়মন্ড হারবার ঘুরে আসি।"

সন্তু স্টার্ট বন্ধ করে বলল, "কে চালাবে ? স্টিয়ারিং ধরে বসে আছি বলে বুঝি ভাবছিস আমি চালাতে শিখে গেছি !"

জোজো বলল, "তুই শিখিসনি ? তা হলে সরে বোস, আমি চালাব !"

"তুই আবার শিখলি কবে ?"

"আমি তো বাচ্চা বয়েস থেকে চালাচ্ছি। সাহারা মরুভূমিতে জিপ গাড়ি চালিয়েছি। আর একবার উগান্ডার পাহাড়ি রাস্তায় ..."

"ভাই জোজো, এটা পরের গাড়ি, এটা নিয়ে ঘোরাঘুরি করা ঠিক হবে না।"

"ডায়মন্ড হারবার যেতে আর কতক্ষণ লাগবে ? দুপুরের আগেই ফিরে আসব।"

"না ভাই থাক। যদি খারাপ-টারাপ হয়ে যায়।"

সন্তু গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। জোজো হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "আমি জানতুম, তুই কিছুতেই আমাকে চালাতে দিবি না !"

সন্তু বলল, "সেইজন্যই বুঝি তুই বললি যে, তুই গাড়ি চালাতে জানিস ? আমাদের তো লাইসেন্স পাওয়ার বয়েসই হয়নি।"

জোজো বলল, "লাইসেন্স না পেলে বুঝি শেখা যায় না ? আমাকে একবার চাবিটা দিয়ে দ্যাখ না, বোঁ করে তোকে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে আসব !"

সন্তু সরু চোখে জোজোর দিকে তাকিয়ে রইল।

জোজোকে বোঝা খুব মুশকিল, ওর কোন কথাটা যে সত্যি আর কোন কথাটা ডাহা গুল, তা ধরা যায় না। জোজোর এক মামার গাড়ি আছে, কিছুদিন জোজো সেই মামার গাড়িতে ঘুরে বেড়িয়েছে, এ-বাড়িতেও সে গাড়িতে দু'বার এসেছিল, তখন হয়তো গাড়ি চালানো শিখে নিতেও পারে। সাহারা মরুভূমিতে জিপ চালিয়েছিল কি না, তার তো প্রমাণ পাওয়ার কোনও উপায় নেই।

সন্তু বলল, "চল ভেতরে যাই।"

জোজো বলল, "আজ কী বার ? শনিবার। তোরা শনিবার সকালে লুচি-বেগুনভাজা আর মোহনভোগ খাস, তাই না ?"

সন্তু বলল, "সেটা রবিবার। আজ শুধু টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ। ওমলেটও হতে পারে।"

"ওমলেট ? একটা ডিমের, না দুটো ডিমের ?"

"একটা।"

"দুর-দুর ! ওমলেট যখন খাবি, ডাবল ডিমের না হলে ঠিক স্বাদ হয় না।"

"ঠিক আছে। মা-কে বলব তোকে ডাবল ডিমের ওমলেট করে দিতে।"

"টোস্ট খাস কেন, স্যান্ডুইচ খেতে পারিস না ? এই শীতকালে ভাল হ্যাম পাওয়া যায়। কিংবা সার্ডিন মাছ।"

"তুই বাড়িতে সকালবেলা কী খাস রে, জোজো ?"

"ওঃ ক'দিন ধরে কী দারুণ জিনিস খাচ্ছি। বাবার এক ভক্ত অনেকখানি ক্যাভিয়ার পাঠিয়েছিল। ক্যাভিয়ার কাকে বলে জানিস ? পৃথিবীর সবচেয়ে দামি খাবার। স্টার্জন মাছের ডিম। ক্যাস্পিয়ান সাগরের নাম শুনেছিস তো ? সেই সাগরে এই মাছ পাওয়া যায়। মাছটা এলেবেলে, ডিমটুকুই আসল। সহজে পাওয়া যায় না, তাই তো এত দাম !"

"এত চমৎকার জিনিস, আমাকে একটু খাওয়াবি না জোজো ?"

"কেন খাওয়াব না ? কাল সকালে আমাদের বাড়িতে চলে আয়। এক ধরনের বিশেষ বিস্কুটের ওপর মাখন মাখিয়ে তার ওপরে ক্যাভিয়ার রেখে খেতে হয়। খেলে তোর মনে হবে অমৃত ! অবশ্য আজ বিকেলবেলা ইজিপ্টের অ্যাম্বাসাডর আসবেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি পিরামিড দেখাবার জন্য আমাদের অনেকবার ওদেশে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। ওঁর মেয়ের খুব অসুখ, বাবার কাছ থেকে যজ্ঞিডুমুর নিতে আসছেন এবার। ওঁকে খাতির করার জন্য বাবা যদি সবটা ক্যাভিয়ার খাইয়ে দেন, তা হলে আর কাল সকালে কিছু পাবি না।"

সন্তু মনে-মনে ভাবল, কাল সকালে কেন, আজ সকালে, এক্ষুনি গেলেই তো হয়। জোজো কেন সে-কথা বলছে না ? সন্তু নিজেও মুখ ফুটে জোজোকে আজই যাওয়ার কথা বলতে পারল না।

যজ্ঞিডুমুরটাই বা কী জিনিস কে জানে ! তাতে কঠিন রোগ সেরে যায় ?

ওপরের ঘরে গিয়ে ওমলেট আর টোস্ট খেতে-খেতে কিছুক্ষণ গল্প করল দু'জনে। এবার পড়াশুনোর সময়। ক্লাসের পড়ার চাপ না থাকলে সন্তু প্রত্যেক সকালবেলা একটি করে বাংলা বা ইংরেজি কবিতা মুখস্থ করে। তাদের বাড়িতে বাবা, কাকাবাবু, দিদি, এমনকী মায়েরও অনেক কবিতা মুখস্থ। মাঝে-মাঝে কম্পিটিশন হয়। কবিতা মুখস্থ করলে নাকি স্মৃতিশক্তি বাড়ে।

একবার রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি কে নির্ভুল বলতে পারে, তা নিয়ে কম্পিটিশন হয়েছিল। সন্তু ভুলে গিয়েছিল দুটো লাইন, ফার্স্ট হয়েছিল দিদি। দিদি অবশ্য এখন আর এ-বাড়িতে থাকে না।

সন্তু বলল, "আয় জোজো, আমরা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা মুখস্থ করি। এইটা করবি, 'দুই পাখি'।

'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে
একদা কী করিয়া মিলন হলো দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে ..."

জোজো সন্তুর হাতের বইটার দিকে উঁকি দিয়ে বলল, "ওরে বাবা, এ তো মস্ত বড় কবিতা, এটা একদিনে মুখস্থ হয় নাকি ?"

সন্তু বলল, "সবটা নয়, প্রথম দুটো স্ট্যাঞ্জা। এই যে 'আমি কেমনে বন-গান গাই!' এই পর্যন্ত। এক ঘণ্টা টাইম। তারপর মিলিয়ে দেখা হবে।"

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "কম্পিটিশন ? আমার এক ঘণ্টাও লাগবে না। বড়জোর চল্লিশ মিনিট। আমি ফার্স্ট হলে তুই কী খাওয়াবি বল ?"

সন্তু বলল, "চিকেন রোল। তুই হেরে গেলেও খাওয়াবি তো ?"

দু'জনে জোরে-জোরে পড়া শুরু করল কবিতাটা। দু'মিনিট বাদে থেমে গিয়ে জোজো বলল, "অ্যাই সন্তু, তুই আমার সঙ্গে জোচ্চুরি করছিস ?"

সন্তু অবাক হয়ে বলল, "তার মানে ?"

জোজো বলল, "তুই প্রথমেই এই কবিতাটার কথা বললি কেন ? এটা তোর আগে থেকেই মুখস্থ আছে, তাই না ?"

সন্তু বলল, "না, না, আমার মুখস্থ নেই। সত্যি বলছি।"

জোজো বলল, "ওসব চালাকি চলবে না। কবিতা আমি বাছব।"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে। তুই তা হলে বল কোনটা ?"

জোজো রবীন্দ্র রচনাবলীর পাতা ওলটাতে-ওলটাতে এক জায়গায় থেমে গিয়ে বলল, "এই যে এইটা। 'সোনার তরী'। 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা'

সন্তু বলল, "জোজো মাস্টার, এটা যে তোমার আগে থেকে মুখস্থ নয়, তা কী করে বুঝব ? এবার তুমি আমায় ঠকাচ্ছ ?"

জোজো বলল, "এই বিদ্যা ছুঁয়ে বলছি, এটা আমার মুখস্থ নেই। দু'-একবার পড়েছি অবশ্য। প্রথম একুশ লাইন আজ মুখস্থ করি আয়—।"

এবারে পাঁচ মিনিট পড়ার পর সন্তু হেসে ফেলল।

জোজো থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হাসছিস কেন ? এটা কি হাসির কবিতা নাকি ?"

সন্তু তবু হাসতে-হাসতে বলল, "আগের কবিতাটা আমার সত্যি মুখস্থ ছিল না। তুই বিশ্বাস করলি না। তুই যেটা বার করলি, এই সোনার তরী আমার

পুরো মুখস্থ। ধরে দ্যাখ! আমি ভাই সত্যি কথা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারি না।"

জোজো বইটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "ধ্যাত! আজ আর কবিতা-টবিতার দরকার নেই। এমন চমৎকার সকাল, চল না, কোথাও বেড়াতে যাই! শীতকালেই বেড়াতে ভাল লাগে।"

"কোথায় যাবি?"

"ট্রেনে উঠে কোথাও চলে গেলেই হয়। কাকাবাবু কোথায় রে, সন্তু?"

"কাকাবাবু দিল্লিতে। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।"

"কোনও রহস্যসন্ধানে গেছেন বুঝি? তোকে এবার সঙ্গে নিলেন না?"

"সেরকম কিছু ব্যাপার নয়। নরেন্দ্র ভার্মা ডেকে নিয়ে গেছেন। নরেন্দ্র ভার্মার সিমলায় একটা বাড়ি আছে। ওঁর এখন ছুটি। কাকাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সিমলায় ছুটি কাটাবেন শুনেছি।"

"এই শীতকালে সিমলায়? সেখানে তো বরফ পড়ছে!"

"কাকাবাবু অনেকবার বলেছেন, শীতকালেই শীতের দেশে বেড়াতে যেতে হয়। লোকজন কম থাকে।"

"কাকাবাবু না থাকলে ভাল লাগে না। কোথাও না গেলেও অনেক গল্প তো শোনা যায়! তুই নরেন্দ্র ভার্মার ঠিকানা জানিস?"

"তা জানব না কেন? ওঁর বাড়িতে আমি গেছি দু'বার।"

"একটা কাজ করবি সন্তু? বেশ মজা হবে। তুই কাকাবাবুর নামে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দে। তাতে লিখবি, জোজো মিসিং! জোজোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তা হলেই কাকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসবেন।"

"মিথ্যে টেলিগ্রাম পাঠাব? যাঃ, তা হয় নাকি? ফিরে এসে কাকাবাবু কী বলবেন আমাকে?"

"মিথ্যে কেন হবে? আমি ক'টা দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকব। কিছুদিন ধরে সেরকম কিছুই ঘটছে না। কেউ এসে কাকাবাবুর সাহায্য চাইছে না। তা হলে আমাদেরই রহস্য তৈরি করতে হবে। আমি কোথাও লুকিয়ে থাকব। কাকাবাবু এলে তুই বলবি, কয়েকজন তাতার দস্যু এসে আমাকে গুম করেছে। তারপর দেখা যাক, কাকাবাবু কী করে আমাকে খুঁজে বার করেন।"

"মানুষ খোঁজা কাকাবাবুর কাজ নয়। উনি পুলিশে খবর দিয়ে দেবেন। তুই যেখানেই ঘাপটি মেরে থাকিস না কেন, পুলিশ ঠিক ক্যাঁক করে তোকে টেনে আনবে!"

"একবার জানিস তো সত্যিই আমাকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এখানে না, কম্বোডিয়ায়। একটা পাহাড়ের গুহায় আমাকে হাত-পা বেঁধে লুকিয়ে রেখে তারা কম্বোডিয়ার রাজা সিহানুককে চিঠি পাঠাল যে কুড়ি লক্ষ টাকা র‍্যানসম, মানে মুক্তিপণ না পেলে তারা আমার মুণ্ডু কেটে ফেলবে। রাজা তো সেই চিঠি

পেয়েই ভয় পেয়ে গিয়ে টাকাটা পাঠাবার হুকুম দিয়ে দিলেন। আর একটু হলেই—"

সন্তু বাধা দিয়ে বলল, "কম্বোডিয়ার রাজা তোকে চিনলেন কী করে ? তিনি তোর জন্য টাকা দেবেন কেন ?"

জোজো এমনভাবে তাকাল, যেন সন্তু নেহাত ছেলেমানুষ। কিছুই বোঝে না। তারপর বলল, "বাঃ, আমার বাবা তো তখন কম্বোডিয়ায়। রাজার ঠিকুজি-কুষ্ঠি তৈরি করছিলেন। বাবা সেই চিঠিটা হাতে নিয়ে রাজাকে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, টাকা পাঠাতে হবে না। আমার ছেলেকে আটকে রাখার সাধ্য কারও নেই। বাবা সেই চিঠির দিকে সাত মিনিট তাকিয়ে রইলেন, রাগে তাঁর চোখ জ্বলতে লাগল। তারপর পকেট থেকে পাঁচটা যজ্ঞিডুমুর বার করে তাতে মন্ত্র পড়ে মাটিতে ছুড়ে দিয়ে বললেন, যাঃ ! অমনই সেই ডুমুরগুলো গড়াতে লাগল। গড়াতে-গড়াতে রাজসভা ছেড়ে চলে গেল রাস্তায়। রাজার বাছাই-করা কুড়িজন সৈন্য ছুটতে লাগল সেই ডুমুরগুলোর সঙ্গে-সঙ্গে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে একটা পাহাড়ের কাছে আসতেই দেখা গেল, পাঁচজন লোক সেই পাহাড় থেকে রক্তবমি করতে-করতে নেমে আসছে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে তাদের মুখ দিয়ে। তারা সৈন্যদের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউমাউ করে বলতে লাগল, ক্ষমা চাইছি, মাপ চাইছি, ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমাদের বাঁচান। শেষপর্যন্ত ওই ডাকাতদের রক্তবমি থামল কী করে জানিস ? প্রত্যেককে এই মন্ত্র-পড়া যজ্ঞিডুমুর একটা করে খাইয়ে দেওয়া হল !"

আবার যজ্ঞিডুমুর ? তার এত শক্তি !

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "যজ্ঞিডুমুর কী রে, জোজো ?"

জোজো বলল, "এক ধরনের ডুমুর, তুই দেখিসনি ? এমনিতে সাধারণ, কিন্তু মন্ত্র পড়ে দিলে এক-একরকম রেজাল্ট পাওয়া যায়। ওই ডুমুরগুলো খুব মন্ত্র ধরে রাখতে পারে।"

সন্তু বলল, "তোকে এখানে যদি কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে, তা হলে মন্ত্রও লাগবে না। ডুমুরও লাগবে না। কলকাতার পুলিশ খুব কাজের, তারা ঠিক খুঁজে বার করবে !"

জোজো বলল, "তবু পুলিশের বড়-বড় কর্তাদের প্রায়ই আমার বাবার কাছে আসতে হয়, তা জানিস ?"

সন্তু সে-কথা শুনল না। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "গলিতে কীসের শব্দ হচ্ছে।"

তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে ছাদের রেলিং ধরে উঁকি মারল নীচে। ঠিকই শুনেছে সন্তু। দুটো বাচ্চা ছেলে গাড়িটা নিয়ে খেলা শুরু করেছে। একজন চেষ্টা করছে দরজা খোলার জন্য, অন্যজন চড়তে চাইছে গাড়িটার ওপরে।

সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই, কী হচ্ছে কী ? গাড়িতে হাত দিবি না !"

জোজো বলল, "মাথায় ইট মারব। শিগগির পালা!"
ছেলে দুটি সঙ্গে-সঙ্গে চোঁ-চাঁ দৌড় মারল।
প্রায় তক্ষুনি একটা ট্যাক্সি এসে থামল বাড়ির সামনে। তার থেকে নামলেন কাকাবাবু!
সন্তু আর জোজো দু'জনেরই মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল। কাকাবাবু মুখ উঁচু করে ওদের দেখতে পেয়ে হাত তুললেন। তারপর ক্রাচ দুটো গাড়িতে হেলান দিয়ে রেখে পকেটের ব্যাগ থেকে ভাড়ার টাকা বার করতে লাগলেন।
জোজো হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "দ্যাখ, দ্যাখ, সন্তু, কাকাবাবু ক্রাচ ছাড়াই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পা ঠিক হয়ে গেছে! পা ঠিক হয়ে গেছে!"

॥ ২ ॥

সিমলা শহরে একটা নতুন হাসপাতাল হয়েছে। হরি সিং নামে একজন সেনাবাহিনীর বড় অফিসার একবার এভারেস্ট পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। শিরদাঁড়া জখম হওয়ার ফলে দুটো পা-ই নষ্ট হয়ে যায়। মাউন্ট এভারেস্টে উঠতে গিয়ে এরকম কত দুর্ঘটনা হয়, কত মানুষ মরে যায়, কত মানুষ আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে থাকে সারাজীবন। সেই জন্যই হরি সিং অনেক চেষ্টা করে, অনেকের সাহায্য নিয়ে খুলেছেন এই হাসপাতাল। নতুন-নতুন যন্ত্রপাতি, ভাল-ভাল ডাক্তার রাখা হয়েছে, এখানে শরীরের হাড়গোড় ভাঙারই চিকিৎসা হয়। এখন অনেক পর্বত-অভিযাত্রী আহত হলেও এই হাসপাতালে চিকিৎসা করে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে।
কাকাবাবুর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মা ছুটি কাটাবার নাম করে কাকাবাবুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সিমলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আসল উদ্দেশ্য, ওই নতুন হাসপাতালে কাকাবাবুর চিকিৎসা করানো। আজকাল কত নতুন-নতুন চিকিৎসা-ব্যবস্থা হয়েছে, অপারেশন করে প্রায় সবকিছু সারিয়ে দেওয়া যায়। কাকাবাবু সারাজীবন খোঁড়া থাকবেন কেন?
কাকাবাবুকে প্রায় জোর করেই ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল সেই হাসপাতালে। মনোহর যোশি নামে একজন তরুণ ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে বলেছিল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনার পা আমি এরকম মেরামত করে দেব যে, ক'দিন পরে আপনি আবার দৌড়তে পারবেন, লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন। ক্রাচ দুটো ছুড়ে ফেলে দেবেন!"
শেষপর্যন্ত অবশ্য কাকাবাবুর পা ভাল হয়নি!
আফগানিস্তানে সেই দুর্ঘটনার সময় কাবুলে ঠিক ভাল চিকিৎসা করা যায়নি। দিল্লিতে নিয়ে আসতে-আসতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তখন

এতরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। কাকাবাবুর একটা পায়ের গোড়ালির হাড় একেবারে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে, ও আর এখন মেরামত করা যাবে না। একমাত্র উপায়, পায়ের খানিকটা একেবারে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে নকল পা লাগিয়ে দেওয়া। নকল পা নিয়েও মোটামুটি হাঁটতে পারা যায়।

কাকাবাবু নকল পা লাগাতে রাজি নন। তিনি বলেছিলেন, "এত বছর ধরে ক্রাচ নিয়ে হাঁটা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আর ওসব ঝঞ্ঝাট করার দরকার কী ? এই বেশ আছি।"

মনোহর যোশি খোঁজখবর নিয়ে বলেছিল, "আর একটা উপায় আছে। সেজন্য ইংল্যান্ডে যেতে হবে। ইয়র্কশায়ারে একটা হাসপাতালে হাড়-ভাঙার আরও আধুনিক চিকিৎসা হয়। সেখানে পা কেটে বাদ দিতে হয় না, অপারেশন করেও সবরকম পা-ভাঙা সারিয়ে দিতে পারে।"

কিন্তু বিলেতে গিয়ে থাকা, সেখানে চিকিৎসা করবার অনেক খরচ। অত টাকা কে দেবে ? কাকাবাবু বলেছেন, "আমার অত টাকা নেই, আমি এই ভাঙা-পা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেব।"

তবে সিমলার হাসপাতালে গিয়ে কাকাবাবুর একটা উপকার হয়েছে। ওরা একজোড়া বিশেষ ধরনের জুতো বানিয়ে দিয়েছে, যা পরে থাকলে কাকাবাবু এক জায়গায় কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। হাঁটতে গেলে ক্রাচ লাগবে, শুধু দাঁড়িয়ে থাকার সময় লাগবে না।

ক্রাচ ছাড়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কাকাবাবুকে দেখলে মনে হবে, তাঁর পা ভাঙা নয়।

কাকাবাবু ফিরে আসার পর বাড়ির সবাই তাঁকে ঘিরে রইল। কাকাবাবু মজা করে বলতে লাগলেন সেই হাসপাতালের কথা। সন্তুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন অপারেশন করালাম না জানো বউদি ? তোমার কথা ভেবে। আমার খোঁড়া পা ঠিক হয়ে গেলে তুমি যদি জোর করে আমার বিয়ে দিয়ে দাও !"

মা বললেন, "পায়ে একটু খুঁত থাকলে বুঝি মানুষের বিয়ে হয় না ! তোমার ওপর জোর খাটাবার সাধ্য আছে আমার ?"

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "নতুন জুতো পরে আমার একটা খুব উপকার হয়েছে। এখন আমি গাড়ি চালাতে পারি। দিল্লিতে ফিরে চালালাম একদিন। অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই, তবু ভুলিনি। ড্রাইভার রাখতে হবে না, বিমানের গাড়িটা আমিই চালাতে পারব !"

পরদিন ড্রাইভার হয়ে কাকাবাবু মাকে নিয়ে গেলেন কালীঘাটের মন্দিরে, তারপর বরানগরে মাসির বাড়ি। তারপর নিউ মার্কেটে মা অনেকক্ষণ ধরে কেনাকাটি করলেন মনের সুখে। আজ তো আর ট্যাক্সি খুঁজতে হবে না।

অনেকদিন পর গাড়ি চালাতে শুরু করে কাকাবাবু খুব উৎসাহ পেয়ে

গেছেন। ভোরবেলা উঠেই বললেন, "চল সন্তু, কলকাতার বাইরে কোনও জায়গা থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি। দিনটা সুন্দর, আমারও খানিকটা প্র্যাকটিস হবে।"

সন্তু বলল, "জোজো ডায়মন্ড হারবার যেতে চেয়েছিল। ওকে তুলে নিয়ে যাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ! জোজো না থাকলে জমেই না। তা হলে ডায়মন্ড হারবারই যাওয়া যাক।"

জোজোর তৈরি হতে বেশি সময় লাগে না। তার বাড়িতে গিয়ে হর্ন দিয়ে ডাকতেই জোজো পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামা-প্যান্ট পরে বেরিয়ে এল।

গাড়িতে উঠেই জোজো বলল, "কাকাবাবু, আপনি সিকিম লটারির টিকিট কাটবেন ?"

কাকাবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "কেন বলো তো ? আমি তো কখনও লটারির টিকিট কাটি না। হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ?"

জোজো বলল, "ওই লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পঁচিশ লাখ টাকা। ওই টাকাটা আপনি পেয়ে গেলে বিলেতে গিয়ে পায়ের অপারেশন করিয়ে আসতে পারবেন। আমি সব শুনেছি, আপনি টাকার জন্য বিলেতে যেতে পারছেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "লটারির টিকিট কাটলেই আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাব ? এমন আশ্চর্য কথা তো কখনও শুনিনি।"

জোজো বলল, "টিকিটটা আপনি কেটে আমাকে দেবেন। আমার বাবা সেই টিকিটে এমন মন্ত্র পড়ে হাত বুলিয়ে দেবেন যে ওই টিকিট নির্ঘাত ফার্স্ট প্রাইজ পাবে !"

কাকাবাবু ভুরু দুটো তুলে জোজোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এরকম মন্ত্র আছে নাকি ? মন্ত্রের এত জোর ! তা হলে জোজো, তুমি নিজেই আগে কেন লটারির টিকিট কিনে ফার্স্ট প্রাইজ জিতে নাওনি !"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "না, না, সেরকম নিয়ম নেই। সেটা চলবে না ! এই মন্ত্র যে জানে, সে কখনও নিজের জন্য কিংবা নিজের ছেলেমেয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারে না। তাতে মন্ত্রের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। বাবা অন্যদের জন্যও এটা করতে চান না। আপনার জন্য স্পেশ্যাল কেস। এর আগে একবার শুধু একজন শিল্পীর সাত বছরের ছেলের হুপিং কাশি হয়েছিল, কিছুতেই সারছিল না, রাশিয়াতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার, তাই বাবা তাঁকে একটা লটারির সেকেন্ড প্রাইজ পাইয়ে দিয়েছিলেন।"

সন্তু ফস করে জিজ্ঞেস করল, "ওর বেলা সেকেন্ড প্রাইজ কেন ?"

জোজো বলল, "ছোট ছেলে তো, তার বেশি দরকার নেই !"

কাকাবাবু হেসে উঠে জোজোর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, "শোনো

জোজো। আমাদের দেশে কত ছোট ছেলে-মেয়ে হুপিং কাশি কিংবা আরও কতরকম অসুখে ভোগে। টাকার অভাবে তাদের চিকিৎসা হয় না। তোমার বাবাকে বলো, তাদের সাহায্য করতে। একসঙ্গে অনেককে ফার্স্ট প্রাইজ, সেকেন্ড প্রাইজ, সব প্রাইজ পাইয়ে দাও। আমি এই ভাঙা পা নিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি। আমার সাহায্যের দরকার নেই !”

জোজো বলল, “আর একটা ব্যবস্থাও করা যায়। তাতে বিশেষ টাকা খরচ হবে না। অবশ্য আপনি যদি রাজি থাকেন !”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “বিনা পয়সায় চিকিৎসা ? সেটা কী বলো তো ?”

জোজো বলল, “আমার একজন ছোটকাকার একবার ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মালাইচাকি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছিলেন, কোনওদিন আর হাঁটতে পারবেন না—”

সন্তু বাধা দিয়ে বলল, “জোজো, তোর ক’জন ছোটকাকা রে ?”

জোজো বলল, “ছোটকাকা আবার ক’জন হয় ?”

সন্তু বলল, “তুই যে বললি, একজন ছোটকাকা ?”

জোজো বলল, “একজন বলেই তো একজন বললুম !”

কাকাবাবু বললেন, “জোজো আজ বেশ মুডে আছে। তারপর কী হল ? তোমার ছোটকাকার পা সেরে গেছে ?”

জোজো বলল, “আমার বাবা তাকে বললেন, তুই মধ্যপ্রদেশের মৃদঙ্গপুর পাহাড়ে চলে যা। সেখানে বিছাবজ্র নামে এক সাধু থাকেন। দুশো সাতান্নটা সিঁড়ি ভেঙে উঠলে সেই পাহাড়ের মাথায় সাধুজির মন্দির। উনি কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলেবিছে এরকম অনেক রকম বিছে পোষেন। চোদ্দো-পনেরোটা সাপও আছে। ওই সাধু সবরকম ভাঙা হাড় জোড়া দিয়ে দিতে পারেন। ইঞ্জেকশনের বদলে কাঁকড়াবিছে। ভাঙা জায়গাটায় গোটা দশেক কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেবেন, তারা হুল ফুটিয়ে-ফুটিয়ে ... সেটা সহ্য করতে হবে, সেইসঙ্গে সাধুজি মন্ত্র পড়া জল ছেটাবেন, ঠিক সতেরো দিন ! কাকাবাবু যদি ধৈর্য ধরে ওখানে সতেরোটা দিন থাকতে পারেন ... আমি আর সন্তুও যাব আপনার সঙ্গে। বিছাবজ্র সাধু একটাও পয়সা নেন না, বরং হালুয়া আর ক্ষীর খেতে দেন !”

কাকাবাবু বললেন, “সতেরো দিনটা সমস্যা নয়। কিন্তু দুশো সাতান্নটা সিঁড়ি ভেঙে তো আমি পাহাড়চূড়ায় উঠতে পারব না ! সিঁড়িতেই আমাকে কাবু করে দেয় !”

সন্তু মুচকি-মুচকি হাসতে-হাসতে বলল, “জোজো, আর একটা বল !”

জোজো জিজ্ঞেস করল, “আর একটা কী বলব ?”

সন্তু বলল, “এইরকম আর একটা কিছু চিকিৎসার উপায় জানিস না ?”

কাকাবাবু এমন মুখের ভাব করে বসে আছেন, যেন তিনি জোজোর সব কথা

বিশ্বাস করেছেন।

গাড়িটা চলেছে ডায়মণ্ড হারবার রোড দিয়ে। দু'পাশে ফাঁকা মাঠ, মাঝে-মাঝে এক-একটা গ্রাম আসছে। আবার কয়েকটা বড় বড় কারখানাও চোখে পড়ে। শীতকালের নরম রোদ ঝকমক করছে চারদিকে।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি এতদিন পর গাড়ি চালাচ্ছ, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "না রে। কিছুই ভুলিনি দেখছি। গাড়ি চালাতে পেরে বেশ একটা মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি। ব্রেক চাপার সময় পায়ে একটু-একটু ব্যথা লাগছে, সেটাও এমন কিছু না।"

সন্তু বলল, "ভাগ্যিস বিমানদা গাড়িটা রেখে গিয়েছিলেন !"

কাকাবাবু জোজোকে জিজ্ঞেস করলেন, "জোজো, তুমিই তো ডায়মন্ড হারবার বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছিলে। সেখানে কী-কী দেখার আছে বলো তো ?"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল, "ইলিশ মাছ !"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "অ্যাঁ ? ইলিশ মাছ ?"

জোজো বলল, "ওখানে খুব টাটকা ইলিশ পাওয়া যায়। যারা বেড়াতে যায়, তারা দু-তিনটে করে কিনে নিয়ে আসে। একবার আমার এক মেসোমশাই বত্রিশটা ইলিশ কিনেছিলেন।"

সন্তু বলল, "বত্রিশটা ? তোর মেসোমশাইয়ের বুঝি মাছের দোকান আছে ?"

জোজো বলল, "মোটেই না। উনি মাছ খাওয়ার থেকেও মাছ কিনতে বেশি ভালবাসেন। মাছ কিনে এনে চেনা লোকদের বাড়িতে-বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। আমাদেরও দুটো দিয়েছিলেন সেবার। অপূর্ব স্বাদ !"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু এই শীতকালে তো ইলিশের স্বাদ থাকে না। ভাল ওঠেও না।"

জোজো বলল, "সরস্বতী পুজো তো পার হয়ে গেছে। ঠিক সরস্বতী পুজোর পর থেকেই আবার ওঠে।"

কাকাবাবু বললেন, "ইলিশ মাছেরা বুঝি জানে কবে আমাদের সরস্বতী পুজো হয় ?"

সন্তু বলল, "প্রত্যেক বছর তো একই দিনে সরস্বতী পুজো হয়ও না। বদলে-বদলে যায়।"

জোজো বলল, "সরস্বতী পুজোর পর নদীর জলটাও বদলে যায়। তার থেকেই ইলিশ মাছরা টের পেয়ে যায় ! সরস্বতীর একটা মানে নদী, তা জানিস ?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন আগে একবার ডায়মন্ড হারবার ছাড়িয়ে কাকদ্বীপ গিয়েছিলাম। একটা ছোট হোটেলে খেয়েছিলাম, এমন চমৎকার রান্না

যে, এখনও যেন মুখে স্বাদ লেগে আছে। টাটকা মাছ ভাজা আর পাঁঠার মাংসের ঝোল দিয়ে গরম-গরম ভাত। এইসব ছোটখাটো হোটেলে খেতে আমার খুব ভাল লাগে। আজও ওইরকম একটা হোটেলে খাব।"

সন্তু বলল, "আমরা বিকেলের আগে ফিরব না।"

জোজো বলল, "আমাদের ফেরার তাড়া কী আছে? কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছি, হারিয়ে তো যাব না?"

ডায়মন্ড হারবারের গঙ্গার ধারে এসে দেখা গেল, প্রচুর গাড়ি আর মানুষজনের ভিড়। শীতকালে এখানে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ বেড়াতে আসে। অনেক পিকনিক পার্টি এসেছে, তারা মাইকে গান বাজাচ্ছে, সেই শব্দে কানে তালা লেগে যায়!

সন্তুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত ভিড় তার ভাল লাগে না। বাস ভর্তি-ভর্তি আরও লোক আসছে।

কাকাবাবু বললেন, "একসঙ্গে তিন-চারটে মাইক বাজছে কাছাকাছি, এতে কোনও গানই তো ভাল করে শোনা যায় না! মাইক না বাজিয়ে এরা নিজেরা গান গায় না কেন?"

জোজো বলল, "চলুন, আমরা কাকদ্বীপে চলে যাই! আপনার সেই হোটেলে গিয়ে খাব!"

গাড়ি, ট্রাক, বাস আর রিকশায় রাস্তা জ্যাম হয়ে গেছে। কাকাবাবু কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে এগিয়ে চললেন। তারপর রাস্তা ফাঁকা পেতেই স্পিড দিলেন খুব।

কাকদ্বীপ পৌঁছতে দেরি হল না। কাকাবাবু অনেকদিন আগে যখন এসেছিলেন, তখন একটাই মোটে ভাত খাওয়ার হোটেল ছিল। এখন আরও কয়েকটা হোটেল হয়ে গেছে। তবু কাকাবাবু মনে করে-করে আগের হোটেলটাই খুঁজে বার করলেন। সেটার নাম 'নীলকণ্ঠ কেবিন'। প্রায় একই রকম রয়েছে। এর তুলনায় অন্য নতুন হোটেলগুলো আরও বড়।

জোজো বলল, "বেশ নাম দিয়েছে তো! নীলকণ্ঠ! তার মানে, এখানে বিষ খেলেও হজম হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "খেলে বুঝবে, এরা বিষ দেয় না, অমৃত দেয়।"

বেলা বেশি হয়নি, মাত্র পৌনে এগারোটা। এর মধ্যে ভাত খাওয়া যায় না, কিছু লোক অবশ্য হোটেলের মধ্যে ভাত খাচ্ছে।

জোজো বলল, "আমার কিন্তু খিদে পেয়ে গেছে। আমি ব্রেকফাস্টে বিশেষ কিছু খাইনি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী খেয়েছিস? ক্যাভিয়ার দিয়ে টোস্ট খেয়েছিস?"

জোজো বলল, "আহা, সেটা তো ফুরিয়ে গেছে, তোকে খাওয়াতে পারলুম না। আজ খেয়েছি এক বাটি ঘুগনি, দুটো পরোটা, আর দুটো পরোটা খেলুম

ঝোলাগুড় দিয়ে, আর নারকোলের নাড়ু কয়েকটা।"

সন্তু বলল, "এত খেলে আর দুপুরে আমি কিছু খেতামই না।"

জোজো বলল, "গাড়িতে চাপলেই আগেকার খাবার সব আমার হজম হয়ে যায়। সেইজন্যই খিদে পায় !"

কাকাবাবু বললেন, "বেলা একটার আগে লাঞ্চ খাওয়া যায় না, চলো খানিকক্ষণ ঘুরে আসি। এর মধ্যে আমরা একবার চা-বিস্কুট খাব। কিন্তু কোথায় খাওয়া যায় ? কাকদ্বীপে তো দেখার কিছু নেই।"

সন্তু বলল, "এইদিকে নামখানা বলে একটা জায়গা আছে না ? সেখানে নদী পার হতে হয়। নদীটার নাম বেশ চমৎকার। হাতানিয়া-দোয়ানিয়া !"

কাকাবাবু বললেন, "চলো তা হলে নামখানা থেকেই ঘুরে আসি। ইচ্ছে হলে নদী পেরিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ-বকখালিতেও যাওয়া যেতে পারে।"

উলটো দিক থেকে একটা ভ্যান আসছে, তাতে লাউড স্পিকারে কী যেন ঘোষণা করা হচ্ছে। গ্রামের দিকে বড় ধরনের কোনও সভা-সমিতি হলে এইভাবে ঘোষণা করে। এই লাউড স্পিকারের আওয়াজ এত খারাপ যে, কথাগুলো বোঝাই যাচ্ছে না, শুধু মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে কাটা মুণ্ডু...পাঁচটা বাঘ... শূন্য থেকে ঝাঁপ... মুখের মধ্যে আগুন..."

একটা লোক সেই ভ্যান থেকে হ্যাণ্ডবিল ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে, সেগুলো কাটা-ঘুড়ির মতন উড়ছে বাতাসে, জোজো জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা খপ করে ধরে নিল।

সার্কাসের বিজ্ঞাপন ! এখানে জুয়েল সার্কাস চলছে। দিনে দু'বার, দুপুর তিনটে আর সন্ধে সাড়ে ছ'টায়।

জোজো পড়তে-পড়তে বলে উঠল, "কাকাবাবু, আমরা সার্কাস দেখব ! অনেকদিন দেখিনি !"

কাকাবাবু বললেন, "তা দেখা যেতে পারে। মফস্বলের সার্কাস দেখতে বেশ মজা লাগে।"

একটুখানি যাওয়ার পর মাঠের মধ্যে সেই সার্কাসের তাঁবুও দেখা গেল। বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। সামনে একটা হাতি বাঁধা আছে। এখানেও একজন লোক চ্যাঁচাচ্ছে।

সন্তু বলল, "পাঁচটা বাঘ, তার ওপর হাতিও আছে, দারুণ জমবে মনে হচ্ছে।"

নামখানায় নদীর ধারে কয়েকটা চায়ের দোকান রয়েছে। কাকাবাবু একটা দোকানের সামনে গাড়ি থামালেন। গাড়ি থেকে না নেমেই তিনি তিনটে চা ও বিস্কুট দিতে বললেন দোকানদারকে।

নদীটা বেশি চওড়া নয়, কিন্তু অনেক বড়-বড় নৌকো যায়। একটা ফেরি চলছে, ইচ্ছে করলে গাড়িসুদ্ধুও ওপারে যাওয়া যেতে পারে। একটা খড়

বোঝাই নৌকোর ওপরে বসে একটি লোক চেঁচিয়ে গান গাইছে। একটা মাছধরা নৌকো থেকে জেলেরা দু' ঝুড়ি মাছ নীচে নামিয়ে আনল।

রাস্তার উলটোদিকে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে, তার ভেতরে বসা একজন লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে। একটু পরে লোকটি নেমে এদিকে এল।

কাছে এসে সে বলল, "তা হলে চোখে ভুল দেখিনি। রাজা রায়চৌধুরী ? ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না !"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "অসীম দত্ত ! অনেকদিন পর দেখা। তোমার কী বিশ্বাস হচ্ছিল না ?"

অসীম দত্ত বললেন, "পা ঠিক হয়ে গেছে ? কী করে হল ? কবে হল ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই ভাঙা পা কি আর জোড়া লাগে ? এই দ্যাখো না, ক্রাচ দুটো পাশে রাখা আছে।"

অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিই তো গাড়ি চালাচ্ছিলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "এইটুকু প্রোমোশন পেয়েছি। নতুন ধরনের জুতো পেয়েছি দিল্লিতে, গাড়ি চালাতে পারি, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারি না। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতেও পারি না। তুমি এ দিকে কোথায় এসেছিলে ?"

অসীম দত্ত বললেন, "এখানে একটা সুন্দর বাংলো আছে। ছুটি নিয়ে দিন তিনেক কাটাতে এসেছিলাম। আজ ফিরে যাচ্ছি। তুমি কোনও রহস্যের সন্ধানে এসেছ নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, রহস্য-টহস্য কিছু নেই। অনেকদিন পর গাড়ি চালানো প্র্যাকটিস করছি।"

সন্তু আর জোজোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "অসীম আমার ছেলেবেলার বন্ধু, এখন পুলিশের একজন বড়কর্তা।"

অসীম দত্ত পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বললেন, "রাজা, এটা রাখো। কখনও দরকার হলে ফোন কোরো। তোমার বাড়িতে আমি একদিন যাব। আমার মেয়ে তোমার খুব ভক্ত। সে অবশ্য আমাদের সঙ্গে আসেনি এবার।"

আর একটুক্ষণ কথা বলে অসীম দত্ত চলে গেলেন। সন্তু আর জোজো গাড়ি থেকে নেমে নদীর ধারে এসে দাঁড়াল।

সন্তু বলল, "জোজো, চল ফেরিতে চেপে ওপারটা ঘুরে আসি।"

জোজো উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, "ওপারে দেখবার কী আছে ? আমার ভাই খিদে পেয়ে গেছে। তা ছাড়া সার্কাস যদি আরম্ভ হয়ে যায় ?"

আবার ফিরে আসা হল কাকদ্বীপের সেই হোটেলে। এখন ভেতরে বেশ ভিড়। ফাঁকা টেবিল পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হল খানিকক্ষণ। জোজোর মুখ দেখে মনে হয়, সে আর খিদে সহ্য করতে পারছে না। টেবিলে বসার পর

বেয়ারা প্রথমেই একটা প্লেটে লেবু, লঙ্কা আর পেঁয়াজ দিয়ে গেল, জোজো শুধু-শুধু সেই পেঁয়াজই খাওয়া শুরু করে দিল।

এ-হোটেলের খাবার এখনও বেশ ভাল আছে। সবকিছুই গরম-গরম। ভাত, ডাল, বেগুনভাজা, পার্শে মাছ ভাজা, এর পর কাকাবাবু নিলেন বড়-বড় ট্যাংরা মাছের ঝোল। সন্তু সেই মাছের বদলে নিল মুর্গির মাংস, জোজো মুর্গির মাংসও নিল, সেইসঙ্গে দু'পিস ইলিশ মাছ। সেই ইলিশের ঝোল এমনই ঝাল যে, ঠোঁট দিয়ে হুস-হুস শব্দ করতে লাগল জোজো।

কাকাবাবু বললেন, "এর পর দই খাও, ঝাল কমে যাবে।"

এ-হোটেলে দই পাওয়া যায় না। তারা আনিয়ে দিল অন্য দোকান থেকে।

দই শেষ করার পর কাকাবাবু বললেন, "আঃ, বড় তৃপ্তি হল।"

সন্তু বলল, "বেশি খেয়ে ফেলেছি। সার্কাস দেখতে গিয়ে ঘুম না পেয়ে যায়!"

জোজো বলল, "আমি চিমটি কেটে তোকে জাগিয়ে দেব!"

সার্কাস শুরু হতে এখনও কিছুটা দেরি আছে, কিছু-কিছু লোক আসছে এর মধ্যে। এখন মাইকে একটা গান বাজছে, আর হঠাৎ হঠাৎ সেই গান থামিয়ে একজন লোক ঘোষণা করছে, "আসুন, আসুন, খেলা শুরু হবে, ক্ষণে-ক্ষণে শিহরন, আগুনে ঝাঁপ দেবে মেয়ে, মাথার একটি চুলও পুড়বে না। কাটা মুণ্ডু কথা বলবে, চোখের পলকে জীবন্ত মানুষ অদৃশ্য, বাঘের মুখে বাঙালি, তবলার তালে-তালে হাতির নাচ..."

কাকাবাবু বেশি দামের তিনখানা টিকিট কিনে ফেললেন। ভেতরে অনেকটা বড় জায়গা, থাক-থাক গ্যালারি করা, সামনের দিকে কিছু গদি-মোড়া চেয়ার। দুটি ক্লাউন ডিগবাজি খাচ্ছে মাঝে মাঝে। তাদের কালো রঙের পোশাক, মুখ এমনই সাদা যে, মনে হয় চুন মেখেছে। পরদার আড়াল থেকে ভ্যাঁপ্পোর পোঁ, ভ্যাঁপ্পোর পোঁ করে একটা বাজনা বাজছে।

ঠিক তিনটের সময় পরদা খুলে গেল। নানারকম সাজপোশাক পরা খেলোয়াড়রা বেরিয়ে এসে দৌড়তে লাগল গোল হয়ে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি মেয়েও রয়েছে।

প্রথমে আরম্ভ হল ট্রাপিজের খেলা। অনেক ওপরে রয়েছে দুটো দোলনা। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এক দোলনা থেকে লাফিয়ে যাচ্ছে অন্য দোলনায়। সেই খেলাই চলল বেশ কিছুক্ষণ। লোকে উসখুস করছে, অনেকেরই এ-খেলা ভাল লাগছে না। একজন চেঁচিয়ে উঠল, "কই দাদা, বাঘ কখন আসবে?"

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "এই ট্রাপিজের খেলা খুব শক্ত। দ্যাখ, নীচে জাল পেতে রাখেনি। পড়ে গেলে হাড়গোড় চুরমার হয়ে যাবে।"

তাঁবুর পেছন দিক থেকে দু'বার বাঘের ডাক শোনা গেল।

জোজো বলল, "আসল বাঘের ডাক নয়। হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে কোনও মানুষ এরকম আওয়াজ করছে।"

সন্তু বলল, "বাঘের খেলার সময় মানুষই কি বাঘ সেজে আসবে?"

সোনালি রঙের কোট পরা একজন লোক এসে মাঝখানে দাঁড়াল, বুকের কাছে অনেক মেডেল ঝোলানো। সে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বলল, "ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ, আমরা পরপর কী খেলা দেখাব, তা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। জন্তু-জানোয়ারের খেলা একেবারে শেষকালে দেখানো হয়। তার আগে আপনারা দেখবেন অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ সব খেলা, জীবন্ত মানুষ অদৃশ্য, মোটর সাইকেলের মরণঝাঁপ, কাটা মুণ্ডুর কথা বলা..."

সেই লোকটির কথা শেষ হতে-না-হতেই একটা মোটর সাইকেলের দারুণ আওয়াজ শোনা গেল। তারপর আর সব আলো নিভিয়ে একদিকে ফোকাস ফেলতে দেখা গেল, খানিকটা উঁচুতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো কাপড়ে মোড়া একজন লোক বসে আছে মোটর সাইকেলে। পেছন থেকে খুব জোরে-জোরে দু'বার ড্রাম বাজতেই সে মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিল। প্রথমে মনে হল, সে শূন্যের ওপর দিয়ে মোটর সাইকেলটা চালাচ্ছে। আসলে তা নয়। সেখানে একটা মোটা তার টাঙানো আছে। মোটর সাইকেল যাচ্ছে সেই তারের ওপর দিয়ে।

দু'বার সেই তারের ওপর দিয়ে যাতায়াত করার পর সেই লোকটি আরও সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করল। মোটর সাইকেল সমেত সে সেই তার থেকে ঝাঁপ দিল নীচের দিকে। ততক্ষণে নীচের জায়গাটায় দু'জন লোক একটা গোরুর গাড়ির চাকার সমান রিং নিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই রিংটার মাঝখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। মোটর সাইকেল-আরোহী ওপর থেকে পড়ে সেই আগুনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দারুণ খেলা। সবাই চটাপট হাততালি দিল।

কাকাবাবু বললেন, "কী করে পারে? কতদিন প্র্যাকটিস করতে হয় বলো তো!"

এর পর কয়েকটা খেলা এমন কিছু নয়। অতি সাধারণ। কাটা মুণ্ডুর কথা বলা দেখলে হাসি পায়। প্রথমে সত্যি মনে হয়, একটি মেয়ের শুধু মুণ্ডুটা শূন্যে ঝুলছে। সেটা আবার একপাশ থেকে আরেক পাশে যাচ্ছে। আসলে আর সব আলো নিভিয়ে ফোকাস ফেলা হয়েছে শুধু মেয়েটির মুখে, তার শরীরটা কালো কাপড়ে ঢাকা। সেইজন্য দেখা যাচ্ছে শুধু মুখটা। সেই মুখ আবার নাকিসুরে কথা বলছে।

সেই খেলার পর আবার সব আলো জ্বলে উঠল। এবারে স্টেজের ওপরে এসে দাঁড়াল আর-একজন লোক। এরও কালো পোশাক, মুখে একটা মুখোশ,

হাতে একটা মস্ত বড় চাদর। প্রথমে লোকটি সেই চাদরটা নিয়ে খানিকটা নাচ দেখাল। তারপর সে থামতেই আগের সোনালি কোট পরা লোকটি এসে বলল, "এবার জাদুকর এক্স আপনাদের মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখাবেন। ইনি সবকিছু অদৃশ্য করে দিতে পারেন। আলো জ্বলবে, আপনাদের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাবে! প্রথমে দেখুন একটা কুমড়ো!"

একটা বিরাট কুমড়ো এনে রাখা হল একটা টুলের ওপর। জাদুকর এক্স সেই কুমড়োটার গায়ে হাত বুলিয়ে টুলটার চারপাশে ঘুরলেন একবার। তারপর সেই কালো চাদরটা দিয়ে কুমড়োটাকে একবার ঢেকেই তুলে নিলেন। কুমড়োটা আর নেই!

এর পর জাদুকর এক্স সেই টুলটাকে ওইভাবে অদৃশ্য করে দিলেন।

দড়ি বেঁধে একটা ছাগলকে টানতে-টানতে আনা হল মঞ্চে, সেটা ব্যা-ব্যা করে ডাকছে। কালো কাপড়ে ঢাকার পর ছাগলটাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

কালো কাপড়টা রাখা হচ্ছে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। জাদুকর এক্স নিজে কোনও কথা বলছেন না, শুধু একবার নাচের ভঙ্গিতে ঘুরছেন।

সোনালি কোট পরা লোকটি বলল, "এবার মানুষ! যে-কোনও মানুষ, ছোট-বড়, নারী-শিশু, মোটা-রোগা, যে-কোনও মানুষকে দেখবেন, এই আছে, এই নেই!"

একজন মাঝবয়েসী লোক এসে দাঁড়াল মঞ্চে। জাদুকর এক্স সঙ্গে-সঙ্গে তাকে অদৃশ্য না করে কালো কাপড়টা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নাচতে লাগলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, মানুষ কি সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হতে পারে?"

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না!"

জোজো বলল, "আমি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা 'অদৃশ্য মানুষ' নামে একটা বই পড়েছি। 'স্টার ট্রেক' সিরিয়ালে দেখায় একটা যন্ত্রের নীচে দাঁড়ালে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার আগের চেহারায় ফিরে আসছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো কল্পনা। সত্যি-সত্যি ওরকম হতে পারে না। এ-পর্যন্ত বিজ্ঞান যতখানি এগিয়েছে, তাতে সম্ভব নয়!"

জোজো তবু অবিশ্বাসের সুরে বলল, "তা হলে এই লোকটা কী করে করছে?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই কোনও একটা কায়দায় আমাদের চোখে ধুলো দিচ্ছে। কায়দাটা জানলে তো আমি নিজেই এরকম দেখাতে পারতাম। ম্যাজিশিয়ান কতরকম খেলা দেখায়, আমরা ধরতেই পারি না।"

মঞ্চের লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর সোনালি কোট পরা লোকটি দর্শকদের দিকে চেয়ে বলল, "দেখলেন? দেখলেন? বিশ্বাস হল তো? যদি কেউ অবিশ্বাস করে থাকেন, তিনি উঠে আসুন। তাঁকেও অদৃশ্য করে দেওয়া হবে। আসুন, আসুন, কে আসবেন, আসুন।"

জোজো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "আমি যাব। আমি কায়দাটা দেখতে চাই।"

জোজোর সঙ্গে-সঙ্গে আরও চারজন গিয়ে দাঁড়াল মঞ্চে।

সোনালি কোট বলল, "সবাইকে তো অদৃশ্য করা যাবে না। আমাদের এর পরে অন্য খেলা আছে। মাত্র একজন। একজনকে বেছে নেওয়া হবে।"

পাঁচজন নানা বয়েসের। ম্যাজিশিয়ান এক্স সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে জোজোর দিকে একটুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। কেন যে তিনি জোজোকে বেশি পছন্দ করলেন, তা বোঝা গেল না। এগিয়ে এসে জোজোর কাঁধে হাত রাখলেন।

অন্য চারজন ফিরে এল। জোজোকে দাঁড় করানো হল স্টেজের মাঝখানে। জোজো মুখখানা হাসি-হাসি করে রেখেছে, তবু মনে হচ্ছে যেন সে একটু নার্ভাস হয়ে গেছে। সোনালি কোট আরও খানিকক্ষণ বকবক করল। তারপর ম্যাজিশিয়ান কালো চাদরটা উড়িয়ে জোজোর পাশ দিয়ে নাচলেন একবার। দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে কালো চাদরটা দিয়ে ঢেকে দিলেন, আবার সরিয়েও নিলেন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

জোজো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সবাই খুব জোরে-জোরে হাততালি দিল একবার।

॥ ৩ ॥

পরের খেলাগুলো তেমন কিছু জমজমাট নয়। পাঁচটা বাঘ একসঙ্গে দেখা যায়নি, দুটো বাঘকেই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আনা হয়েছে, অন্য নাম দিয়ে। সে বাঘ দুটোও রোগা আর বুড়ো, মনে হয় আফিং খাইয়ে রাখা হয়েছে, আস্তে-আস্তে হাঁটে। হাতির নাচটা মোটেই নাচ নয়। হাতিটাকে নিয়ে আসার পর পেছন থেকে এত জোরে-জোরে ঢাক-ঢোল-জগঝম্প বাজানো হতে লাগল যে, মনে হল যেন হাতিটা ভয় পেয়ে দৌড়চ্ছে। একজন লোক তাকে গোল করে ঘোরাতে লাগল।

সন্তু মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে দেখছে যে জোজো ফিরে আসছে কি না। কিন্তু একটার পর একটা খেলা হয়ে যাচ্ছে, জোজোর দেখা নেই।

ক্লাউন দু'জনের কাণ্ডকারখানাই বেশ মজার। একবার একজন ক্লাউন একটা জ্বলন্ত সিগারেট পুরোটাই মুখের মধ্যে ভরে দিল, তারপর তার মুখ থেকে আগুন বেরোতে লাগল ভলকে- ভলকে। অন্য ক্লাউনটি এক বালতি জল এনে ঢেলে দিল তার মাথায়, তখন তার চুল থেকেও বেরোতে লাগল ধোঁয়া। বালতিতে আর জল নেই। অন্য ক্লাউনটি তখন মুখ থেকে পিচকিরির মতন জল বার করতে লাগল।

এই খেলাটা দেখে কাকাবাবু পর্যন্ত হাততালি দিয়ে উঠলেন।

সব খেলা শেষ হওয়ার পর দর্শকরা উঠে চলে যেতে লাগল, কাকাবাবু আর সন্তু দাঁড়িয়ে রইল জোজোর জন্য। জোজো আসছে না। সব লোক বেরিয়ে গেল তবু পাত্তা নেই জোজোর।

কাকাবাবু হাসিমুখে সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, আমাদের জোজোবাবু কি সত্যি অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি ?

সন্তু বলল, "ও বোধ হয় এখনও ম্যাজিশিয়ানের কাছ থেকে কায়দাটা শিখছে।"

কাকাবাবু বললেন, "চল দেখে আসি, কতটা শিখল।"

যেখানে একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, সেখানে এসে কাকাবাবু পেছনের পরদাটা সরিয়ে ফেললেন। যারা খেলা দেখাল, তাদের মধ্যে কয়েকজন সেখানে বসে শিঙাড়া আর চা খাচ্ছে। সোনালি কোট পরা লোকটি মনে হয় এই সার্কাসের ম্যানেজার। তার হাতেই শিঙাড়ার ঝুড়ি। জাদুকর এক্স একটা টিনের চেয়ারে বসে আছেন, সামনের দিকে পা দুটো ছড়ানো। মুখোশটা এখনও খোলেননি, একটা চুরুট টানছেন আপনমনে। তাঁর পাশে একজন লোক একটা লম্বা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকটা আলো ঠিক করছে।

কাকাবাবু সেই সোনালি কোট পরা ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, "ও মশাই, আপনাদের খেলা তো শেষ হয়ে গেল, এবার আমাদের ছেলেটিকে ফেরত দেবেন না ?"

ম্যানেজার বললেন, "আপনাদের ছেলে মানে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওই যাকে অদৃশ্য করে দিলেন ? আর কতক্ষণ অদৃশ্য করে রাখবেন ?"

ম্যানেজার একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সে তো চলে গেছে !"

কাকাবাবু বললেন, "চলে গেছে ? কখন গেল ?"

ম্যানেজার বললেন, "কখন ? তাকে চারটে শিঙাড়া আর দুটো রসগোল্লা দেওয়া হয়েছিল, সব খেয়ে নিল, তারপর নিজেই চলে গেছে।"

সন্তু বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই বাইরে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও কাকাবাবু আবার মুখ ফিরিয়ে ম্যাজিশিয়ান এক্স-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার এই অদৃশ্য করার কায়দাটা কী বলুন তো !"

উত্তর না দিয়ে ম্যাজিশিয়ান কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখোশের আড়ালে তাঁর মুখখানা কেমন তা বোঝার উপায় নেই। শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আপনার খেলাটা আমাদের খুব তাক লাগিয়ে

দিয়েছে। আপনার শো-ম্যানশিপ চমৎকার।"

ম্যাজিশিয়ান এবার শুধু বললেন, "থ্যাঙ্কস !"

ম্যানেজার হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন, "আমাদের কায়দাগুলো ফাঁস করে দিলে কি চলে ? তা হলে আর লোকে টিকিট কেটে দেখতে আসবে কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা বটে, তা বটে ! আমি এমনই কৌতূহলে জিজ্ঞেস করছিলাম। চল সন্তু—"

এই সময় টুলের ওপর দাঁড়ানো লোকটি হঠাৎ হুড়মুড় করে টুল উলটে পড়ে গেল। একেবারে সন্তুর গায়ের ওপর। দু'জনেই মাটিতে গড়াগড়ি।

ম্যানেজার হা-হা করে ছুটে এসে সন্তুকে ধরে তুলতে-তুলতে বললেন, "লাগেনি তো ভাই ? লাগেনি তো ?"

সন্তুর কিছুই হয়নি, কিন্তু অন্য লোকটির মাথা ঠুকে গেছে। সন্তুই তাকে তুলতে গেল। লোকটির বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, মাথায় একটাও চুল নেই, মুখে গোঁফ-দাড়ির কোনও চিহ্ন নেই, এমনকী ভুরু দুটোও প্রায় নেই-ই বলতে গেলে।

ম্যাজিশিয়ান চেয়ার থেকে ঝুঁকে সেই লোকটির গালে জোরে একটা চড় কষিয়ে বললেন, "ইউ ফুল !"

ম্যানেজার বললেন, "আহা-হা, ওকে মারছেন কেন ? বেচারা পা পিছলে পড়ে গেছে। ক্ষতি তো কিছু হয়নি।"

পড়ে যাওয়ার সময়, কিংবা চড় খেয়েও সেই লোকটা মুখ দিয়ে একটা শব্দও করেনি।

কাকাবাবু আর সন্তু বেরিয়ে এল তাঁবুর পেছন দিক থেকে। একপাশে বাঘের খাঁচা। একটু দূরে সেই ছাগলটাও বাঁধা রয়েছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ম্যাজিশিয়ান এক্স-এর মুখে মুখোশ কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ম্যাজিশিয়ানদের নানারকম সাজপোশাক করতে হয়। ইনি মুখোশ লাগিয়েছেন। মুখোশ লাগালে অন্য গ্রহের প্রাণী মনে হয় না ?"

সন্তু বলল, "খেলা দেখাবার পরেও মুখোশ খোলে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "সাড়ে ছ'টার সময় তো আবার শো শুরু হবে, তাই খোলেনি বোধ হয়।"

বাইরে কোথাও জোজোকে দেখা গেল না। গাড়ির কাছেও সে নেই।

কাকাবাবু বললেন, "জোজোটা কোথায় গেল ?"

সন্তু বলল, "নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে। আমাদের কাছে প্রমাণ করবে যে ও সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এর পর এসে যে কত গল্প বানাবে ! ও অদৃশ্য হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে, এর মধ্যে হিমালয় ঘুরে এসেছে, কিংবা সমুদ্রের তলায়..."

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর গল্প শুনতে আমার ভালই লাগে। কিন্তু

কতক্ষণে সে দেখা দেবে ? সন্ধে হয়ে গেল যে, ফিরতে হবে না ?”

শীতকালের বিকেল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গিয়ে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। গাড়ির কাছে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও জোজোর পাত্তা পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু বললেন, “অনেকদিন পরে গাড়ি চালাচ্ছি, রাত্তিরবেলা অসুবিধে হতে পারে। তুই দেখে আয় তো, ওই তাঁবুর আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে কি না। এখানে মাঠের মধ্যে কোথায় লুকোবে ?”

সন্তু দৌড়ে দেখে এল। সেখানে কোথাও জোজো নেই। সার্কাসের লোকেরাও কেউ কিছু বলতে পারে না।

ফিরে এসে সন্তু বলল, “ও সহজে দেখা দেবে না। এক কাজ করা যাক। তুমি গাড়িতে স্টার্ট দাও। আমাদের চলে যেতে দেখলেই দৌড়ে আসবে।”

সন্তু উঠে বসল, কাকাবাবু গাড়ি চালাতে শুরু করলেন, বড় রাস্তা ধরে গেলেন খানিকটা। জোজো তবু দৌড়ে এল না।

সন্তু বলল, “বেশি গল্প বানাবার জন্য জোজো বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকবে। হয়তো ডায়মন্ড হারবার চলে গেছে বাসে চেপে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে। আমাদের দেখলে বলবে, অদৃশ্য হয়ে উড়ে ডায়মন্ড হারবার পৌঁছে গেছে।”

তবু কাকদ্বীপের কয়েকটা দোকানে উঁকি দিয়ে জোজোকে খুঁজে দেখা হল। তার কোনও চিহ্ন নেই। অগত্যা গাড়ি ছুটল ডায়মন্ড হারবারের দিকে।

কাকাবাবু বললেন, “জোজোর প্র্যাকটিক্যাল জোক একটু বেশি-বেশি হয়ে যাচ্ছে। ডায়মন্ড হারবারে অত ভিড়ের মধ্যে কোথায় তাকে খুঁজব ?”

সন্তু বলল, “ও নিশ্চয়ই রাস্তার ধারে বসে থাকবে। আমাদের গাড়ি দেখলেই চিনবে।”

ডায়মন্ড হারবারের কাছাকাছি এসে কাকাবাবু গাড়ির গতি কমিয়ে দিলেন। এখন অবশ্য তেমন ভিড় নেই। যারা পিকনিক করতে এসেছিল, প্রায় সবাই ফিরে গেছে। তা ছাড়া বেশ শীত পড়েছে, গঙ্গার ধারে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না।

আস্তে-আস্তে গাড়ি চালিয়ে কাকাবাবু পুরো শহরটা অতিক্রম করে গেলেন। আবার ফিরে এলেন ‘সাগরিকা’ হোটেলের কাছে। আবার উলটো দিকে গাড়ি ঘোরালেন। কোথায় জোজো ?

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে কি জোজো কাকদ্বীপেই থেকে গেল ?”

সন্তু বলল, “বরং আমার মনে হয়, জোজো কলকাতায় ফিরে গেছে। এখান থেকে ট্রেন আছে, বাস আছে।”

কাকাবাবু সাধারণত রাগ করেন না। কিন্তু এখন বিরক্তিতে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি আপনমনে বললেন, “এটা জোজো ঠিক করেনি। এতক্ষণ

লুকিয়ে থাকার কী মানে হয় ? শুধু-শুধু আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলা।"

সন্তু বলল, "জোজো ঠিক কলকাতায় চলে যেতে পারবে। বাস আছে, ট্রেন আছে। ওর কাছে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট আছে, আমি দেখেছি।"

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কলকাতায় ফিরতেই হল। আগে সন্তুদের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকে ফোন করল সন্তু।

জোজোর মা ধরেছেন, সন্তু বলল, "মাসিমা, একটু জোজোকে দিন তো।"

জোজোর মা বললেন, "জোজো তো নেই। ও তো সকালবেলা তোমাদের সঙ্গেই বেরিয়েছিল। এখনও ফেরেনি। তোমাদের সঙ্গে ফেরেনি ?"

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, "না, মানে, আমাদের সঙ্গেই গিয়েছিল, কিন্তু ওখানে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ও তার সঙ্গে ফিরবে বলল...নিশ্চয়ই এসে যাবে খানিকক্ষণ পরে—"

রাত্তির দশটা, এগারোটা, বারোটা, তিনবার ফোন করল সন্তু, তারপর সারারাত কেটে গেল। পরদিন সকাল দশটার মধ্যেও জোজো ফিরল না, নিজের বাড়িতে সে কোনও খবরও দেয়নি।

কাকাবাবু বললেন, "ছি ছি ছি ছি। আমাদের সঙ্গে বেড়াতে গেল, অথচ আমরা ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। ওর মা-বাবা কী ভাবছেন আমাদের !"

সন্তু বলল, "জোজোর বাবা কলকাতায় নেই, কাশী গেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ওর মা একলা রয়েছেন ? ছেলের জন্য উনি ব্যাকুল হয়ে পড়বেন।"

সন্তু বলল, "না, একলা নন মাসিমা। জোজোদের বাড়িতে অনেক লোক।"

সন্তু এখনও ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে পারছে না। তার দৃঢ় ধারণা, জোজো নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে। তার মনে পড়ল, কাকাবাবু দিল্লিতে আছেন শুনে জোজো বলেছিল, "কাকাবাবুকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দে, জোজো মিসিং ! তা হলেই কাকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসবেন। আমি লুকিয়ে থাকব, কাকাবাবু আমাকে খুঁজে বার করবেন। বেশ মজা হবে !" জোজো নিশ্চয়ই এই খেলাটাই খেলছে।

কিন্তু নিজের মাকেও যে দারুণ চিন্তায় ফেলে দিল জোজো ? তিনি বারবার ফোন করছেন উতলা হয়ে। আর একবার ফোন করতেই সন্তুকে বাধ্য হয়ে একটা ছোট্ট মিথ্যে কথা বলতে হল।

সন্তু বলল, "মাসিমা, কাল তো জোজোর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে নিশ্চয়ই জোজোকে জোর করে ধরে রেখেছে। এখন আমাদের কলেজ ছুটি, তাই জোজো থেকে গেছে। দু'-একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরবে।"

এ-কথা বলে তো দিল, কিন্তু জোজো যদি দু'-একদিনের মধ্যেও না ফেরে ?

যদি তার সত্যিই কোনও বিপদ হয়ে থাকে ? তখন সবাই বলবে, আগেই কেন পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি ।

এখন পুলিশে খবর দিলে তারা প্রথমেই ভাল করে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য জোজোদের বাড়িতে যাবে । তাতে জোজোর মা আরও ব্যাকুল হয়ে পড়বেন না ? নিশ্চয়ই কান্নাকাটি শুরু করে দেবেন !

কী মুশকিলেই ফেলে দিল জোজো !

অসীম দত্ত কাকাবাবুকে একটা কার্ড দিয়েছিলেন । কাকাবাবু সেই কার্ড দেখে অফিসে ফোন করলেন । সেখান থেকে জানানো হল, তিনি অফিসে আসেননি, বাড়িতেই আছেন । বাড়িতে ফোন করার পর একটি মেয়ে বলল, অসীম দত্ত বাড়িতেও নেই, মাংস কিনে আনতে গেছেন, খানিক বাদেই ফিরবেন ।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি অসীমের মেয়ে ? তোমার নাম কী ?"

মেয়েটি বলল, "আমার নাম রূপকথা, ডাকনাম অলি ।"

কাকাবাবু বললেন, "শোনো অলি, আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী, তোমার বাবাকে বাড়িতে থাকতে বলো, আমি এক্ষুনি আসছি ।"

কাকাবাবুর নাম শুনে অলি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু ফোন রেখে দিলেন । সন্তুকে বললেন, "তৈরি হয়ে নে । মাকে বলে যা, রাত্রে আমরা নাও ফিরতে পারি ।"

আজ আর কাকাবাবু গাড়ি নিলেন না । একটা ট্যাক্সি ধরে চলে এলেন আলিপুরে অসীম দত্তর বাড়িতে ।

দরজা খুলে অসীম দত্ত সারামুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, "আমি তোমার বাড়িতে যাব বলেছিলাম, তার আগে তুমিই চলে এলে ? দ্যাখো, আমার মেয়ে কী কাণ্ড করেছে !"

বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল, একগাদা নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে । টেবিলের ওপর দু'খানা ফুলদানি ভর্তি ফুল, এক জন লোক ক্যামেরা তুলে খচাত-খচাত করে ছবি তুলতে লাগল ।

কাকাবাবু বললেন, "এ কী !"

অসীম দত্ত বললেন, "আমার মেয়ে তোমার কী দারুণ ভক্ত, তুমি জানো না ! কতবার বলেছে, তোমাকে দেখতে যাবে । আজ তুমি নিজেই আসছ শুনে পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে ডেকে এনেছে ।"

অলির বয়েস তো তেরো-চোদ্দো বছর, একটা গোলাপি রঙের ফ্রক পরে আছে । সে একটা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে দিল কাকাবাবুর গলায় । তারপর কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল ।

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "থাক, থাক !"

একজন মহিলা বললেন, "সন্তু কোথায় গেল ? সে এসেছে ?"

অসীম দত্ত সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "আরে, তুমি পেছনে লুকিয়ে আছ কেন ? সামনে এসো—"

সেই মহিলাটি বললেন, "ও মা, সত্যি-সত্যি সন্তু নামে কেউ আছে ? এ তো দারুণ ছেলে, কাকাবাবুর চেয়ে কম যায় না।"

অলি একটা ফুলের তোড়া তুলে দিল সন্তুর হাতে। সন্তু লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে।

ওদের দু'জনকে বসানো হল দুটি চেয়ারে। অনেকে বলতে লাগল, আমরা সন্তু আর কাকাবাবুর সঙ্গে ছবি তুলব !

এক-একজন পাশে এসে দাঁড়ায়, ক্যামেরাম্যানটি ছবি তোলে। এরই মধ্যে অনেকে মিলে কাকাবাবুকে নানান প্রশ্ন করতে লাগল, রাজা কনিষ্কর মুণ্ডু আবার খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, তার কি ছবি তোলা আছে ? মাউন্ট এভারেস্টে যাওয়ার পথে কি সত্যিই ইয়েতি দেখা গিয়েছিল ? আন্দামানের জারোয়ারা এখনও বিষাক্ত তীর ছোড়ে ?

কাকাবাবু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপর হাত তুলে বললেন, "আজ এই পর্যন্ত থাক। অসীমের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।"

অসীম দত্ত সবাইকে বললেন, "ছবি তোলা তো হয়েছে, এবার আপনারা একটু পাশের ঘরে যান।"

ঘর খালি হয়ে যাওয়ার পর কাকাবাবু গলা থেকে মালা খুলে ফেলতে লাগলেন। অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি কিছু জরুরি কথা আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এসেছি। কাল আমার সঙ্গে দু'জনকে দেখেছিলে তো ? আমার ভাইপো সন্তুর সঙ্গে ওর বন্ধু জোজোও ছিল। সেই জোজোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, "খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে ? কোথায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে আমাদের সঙ্গে কাল ফেরেনি। আমরা কাকদ্বীপে একটা সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম। একটা লোক মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখাচ্ছিল, জোজো নিজেই এগিয়ে গেল, ম্যাজিশিয়ানটা কীসব কায়দা-টায়দা করল, তারপর, মানে, তারপর জোজো আর নেই !"

অসীম দত্ত ঠাট্টার সুরে বললেন, "বলো কী ! জলজ্যান্ত ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেল ? একেবারে মিলিয়ে গেল হাওয়ায় ?"

কাকাবাবু বিব্রতভাবে বললেন, "শুনলে সবাই মনে করবে গাঁজাখুরি ব্যাপার। কিন্তু ওই খেলার পর জোজোকে আর আমরা দেখিনি, এটাও ঠিক।"

সন্তু এবার বলল, "ওই খেলার পর জোজো শিঙাড়া আর রসগোল্লা

খেয়েছিল, ম্যানেজার বলেছেন। অদৃশ্য হয়ে থাকলে কি কিছু খাওয়া যায় ?”

অসীম দত্ত আরও মজা করে বললেন, “সেও তো একটা প্রশ্ন বটে। অদৃশ্য হলে কি খেতে পারে ? ভূতেরা কি কিছু খায় !”

কাকাবাবু এবার গলায় জোর এনে বললেন, “ইয়ার্কি রাখো তো ! ছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার কোনও বিপদ হতে পারে তো ! যদি তাকে কেউ জোর করে আটকে রেখে থাকে ?”

অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, “জোজোর বয়েস কত ?”

কাকাবাবু বললেন, “ষোলো-সতেরো হবে !”

সন্তু বলল, “সতেরো। আমার সমান।”

অসীম দত্ত বললেন, “ওই বয়েসের ছেলেদের ধরে রাখা খুব শক্ত। কী সন্তু, তোমায় কেউ কোথাও আটকে রাখতে পারবে ?”

সন্তু মাথা নিচু করে হাসল। অনেকবারই কাকাবাবুর শত্রুরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারেনি।

অসীম দত্ত বললেন, “ঠিক আছে। কাকদ্বীপ থানায় খবর পাঠাচ্ছি, ওরা খোঁজখবর নেবে।”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার ওই কাকদ্বীপ থানার ওপর ভরসা করে কতদিন বসে থাকব ? আমার নিজেরই খুব লজ্জা লাগছে। ছেলেটা আমার সঙ্গে গেল, অথচ আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম না ! আজই একটা কিছু করা দরকার। অসীম, তোমার কার্ডে দেখলাম, তুমি এখন আই জি ক্রাইম, তার মানে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে তোমার কাজ। তুমি আমার সঙ্গে চলো কাকদ্বীপ। ওই সার্কাসে গিয়ে আবার খোঁজ নিতে হবে !”

অসীম দত্ত প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, “কালই ওদিক থেকে ফিরেছি, আবার আজ যাব ? অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, দেখবে হয়তো বিকেলের মধ্যেই ছেলেটা বাড়ি ফিরে আসবে ! শোনো, রাজা, আজ পার্ক সার্কাস থেকে ভাল খাসির মাংস কিনে এনেছি। আমার রান্নার শখ আছে জানো তো ? নিজে আজ বিরিয়ানি রান্না করব। দুপুরে এখানে খাওয়াদাওয়া করো, বিশ্রাম নাও, তারপর বিকেলবেলা ফোন-টোন করে—”

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “চল, সন্তু !”

অসীম দত্ত বললেন, “এ কী, তুমি রাগ করলে নাকি ?”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার বিরিয়ানি তুমি খাও। যত ইচ্ছে খাও ! আমি আর সন্তু এক্ষুনি কাকদ্বীপের দিকে রওনা হব।”

অসীম দত্ত বললেন, “দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? ঠিক আছে, যদি যেতেই চাও, আমি ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা অফিসারকে ফোন করে দিচ্ছি। ওর নাম অর্ক মজুমদার, খুব ভাল ছেলে। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই স্মার্ট। সে তোমাদের সাহায্য করবে।”

অসীম দত্ত টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। এই সময় একজন কাজের লোক একটা ট্রে-তে করে একগাদা কচুরি-আলুর দম আর মিষ্টি নিয়ে এল, তার পেছনে-পেছনে এল অলি। তার মুখে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব।

অলি জিজ্ঞেস করল, "জোজো হারিয়ে গেছে ?"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে মাথা নাড়লেন।

অলি বলল, "জোজোকে হাত-পা বেঁধে রেখেছে। মুখও বেঁধেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? কে বেঁধে রেখেছে ?"

অলি বলল, "তা জানি না। যেই শুনলাম যে জোজোকে পাওয়া যাচ্ছে না, অমনই আমি দেখতে পেলাম, একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে জোজো শুয়ে আছে। হাত-পা-মুখ সব বাঁধা !"

অসীম দত্ত অলির মাথায় হাত রেখে বললেন, "জানো তো রাজা, আমার মেয়ের এই একটা রোগ আছে। দিনের বেলা জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখে। কত কী-ই যে বলে, তার দু'-একটা মিলেও যায়। মেয়েটা একটু-একটু পাগলি !"

কাকাবাবু কৌতূহলী হয়ে অলির দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওর কথা কীরকম মিলে গেছে শুনি ? একটা উদাহরণ দাও !"

অসীম দত্ত বললেন, "ও বানিয়ে-বানিয়ে অনেক কথা বলে, বেশিরভাগই মেলে না। তবে, কয়েকদিন আগে হঠাৎ বলল, আজ পিসিমণি আসবে, খুব মজা হবে ! ওর পিসিমণি মানে আমার বোন মণিকা। সে দিল্লিতে থাকে, কলকাতায় আসার কোনও কথাই নেই, আমাদের কিছু জানায়নি। সেইজন্য আমরা অলির কথা বিশ্বাস করিনি। ও মা, সন্ধের সময় হঠাৎ মণিকা তার দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে হাজির। ওরা প্লেনে কাঠমণ্ডু যাচ্ছিল, সেখানে এমন কুয়াশা আর বৃষ্টি যে, প্লেন নামতেই পারল না, চলে এল কলকাতায়। আবার পরদিন ছাড়বে। সেইজন্য মণিকাও রাতটা কাটাতে চলে এল এখানে। আমার পাগল মেয়েটা কী করে আগে থেকে টের পেয়ে গেল বলো তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "এটা রোগও নয়, পাগলামিও নয়। কোনও-কোনও মানুষের এই ক্ষমতা থাকে। তারা দূরের জিনিস দেখতে পায়। দশ লক্ষ-কুড়ি লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের থাকে এই ক্ষমতা। সাধারণ মানুষের চেয়ে এদের অনুভূতি অনেক তীব্র হয়। একে বলে ই এস পি।"

তারপর তিনি অলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই অন্ধকার ঘরটা কোথায় বলতে পারো ?"

দু'দিকে মাথা নেড়ে অলি বলল, "তা জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, আর দেরি করতে পারছি না। এইসব কিছু আমরা খাব না !"

অসীম দত্ত বললেন, "একটা করে মিষ্টি অন্তত খাও। সন্তু, তুমি খাও। ততক্ষণে আমি অর্ককে টেলিফোন করে জানিয়ে দিই।"

অলি কাকাবাবুকে বলল, "আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।"

অসীম দত্ত সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "তুই কোথায় যাবি ? সামনের সপ্তাহে তোর গানের পরীক্ষা। আমরা যখন গেলাম, তখন তুই গেলি না !"

অলি বলল, "আমি জোজোকে খুঁজতে যাব !"

অসীম দত্ত বললেন, "তুই এই কাকাবাবুটাকে ঠিক চিনিস না। জোজো যদি সত্যিই হারিয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা কেউ জোর করে ধরে রাখে, তা হলে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যেখানেই হোক, কাকাবাবু ঠিক খুঁজে বার করবে। তাই না রাজা ?"

অলি ঘাড় নিচু করে বলল, "আমি কাকাবাবুর সঙ্গে থাকব !"

অসীম দত্ত দু' হাত ছড়িয়ে বললেন, "এই রে ! এ মেয়ে যদি একবার জেদ ধরে, তা হলে কিছুতেই তো একে বোঝানো যাবে না ! যদি জোর করে যেতে না দিই, তা হলে কাঁদবে, অনবরত কাঁদবে, ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, কিছু খাবে না, কোনও কথা শুনবে না। কী মুশকিলে ফেললে বলো তো রাজা !"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে অলি চলুক আমাদের সঙ্গে।"

সঙ্গে-সঙ্গে অলির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অসীম দত্ত একটা বড় নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "তার মানে, আজ আর কপালে বিরিয়ানি নেই। মাংসটা ফ্রিজে তুলে রাখতে হবে। আমাকেও যেতে হবে, না হলে ওর মা কিছুতেই ছাড়বে না। একটু অপেক্ষা করো, আমি ভেতর থেকে তৈরি হয়ে আসছি।"

॥ ৪ ॥

আজ আর জিপ নয়, অসীম দত্ত নিলেন একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডার গাড়ি। এইরকম বড়-বড় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে সবসময় একজন বডিগার্ড থাকে। সেই বডিগার্ড আর অসীম দত্ত বসলেন সামনে, পেছনে কাকাবাবু, সন্তু আর অলি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গাড়ি যখন বেহালা পার হয়ে গিয়ে অনেকটা ফাঁকা রাস্তায় পড়ল, তখন অসীম দত্ত বললেন, "সবাই এত গোমড়ামুখে রয়েছ কেন ? কাকদ্বীপ পৌঁছবার পরে কাজ শুরু হবে, তার আগে তো কিছু করার নেই। অলি, তুই বরং একটা গান ধর।"

অলি করুণভাবে বলল, "আমার এখন গান গাইতে ইচ্ছে করছে না।"

অসীম দত্ত বললেন, "পরীক্ষার আগে তোর প্র্যাকটিস হয়ে যেত।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী গান শিখছ অলি ?"

অলির বদলে তার বাবা উত্তর দিলেন, "ক্ল্যাসিকাল আর রবীন্দ্রসঙ্গীত।

আমার মেয়ে বলে প্রশংসা করছি না। সত্যিই ওর গানের গলা বেশ ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "অলি, তুমি 'খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে', এই গানটা জানো?"

অলি মাথা হেলিয়ে বলল, "জানি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি যদি এ গানটা গাইতে গিয়ে সুর ভুল করি, তুমি ঠিক করে দেবে?"

সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবু ওই গানটা 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'-এর সুরে গাওয়া শুরু করলেন, সবাই হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "এবার তুমি সুরটা ঠিক করে দাও!"

অলি আস্তে-আস্তে 'খরবায়ু বয় বেগে' গাইতে গেল, কিন্তু তারও সুর 'ধনধান্য পুষ্প ভরা'র মতো হয়ে গেল অনেকটা!

কাকাবাবু হেসে বললেন, "দেখেছ, নকল গান কীরকম আসল গান ভুলিয়ে দেয়! আমি আর একটা গান গাইছি। দ্যাখো, এটা আগে শুনেছ কি না!

"শুনেছো কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ!
টক টক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।"

অসীম দত্ত বললেন, "এটা তো সুকুমার রায়ের লেখা। সুর দিয়েছে কে?"

সন্তু বলল, "এটা কাকাবাবুর খুব প্রিয় গান। কাকাবাবুই সুর দিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "নিজে সুর দেওয়ার কী সুবিধে বলো তো? এক-একবার এক-এক সুরে গাওয়া যায়, কেউ বলতে পারবে না যে সুর ভুল হয়েছে!"

গান আর গল্প করতে-করতে ডায়মন্ড হারবার এসে গেল।

অসীম দত্ত বললেন, "অর্ক মজুমদারকে ডেকে নেওয়া যাক, কী বলো?"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে খানিকটা দেরি হয়ে যাবে। আগে চলো কাকদ্বীপ ঘুরে আসি।"

গাড়ি থামল না, এগিয়ে চলল।

কাকাবাবু অলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ভাল নাম রূপকথা, এমন সুন্দর নাম আগে শুনিনি। এ নাম কে রেখেছে?"

অলি বলল, "ঠাকুমা।"

অসীম দত্ত বললেন, "আমার মা অনেক ছেলেমেয়েদের নাম দেন। আমাদের আত্মীয়স্বজন কিংবা পাড়ার মধ্যে কারও ছেলে বা মেয়ে জন্মালেই সে মাকে নাম ঠিক করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। মা সব নতুন ধরনের নাম ভেবে বার করেন। ক'দিন আগে একটা ছেলের নাম রেখেছেন নির্ভয়।"

সন্তু বলল, "এই রে, যদি ছেলেটা পরে ভিতু হয়?"

কাকাবাবু বললেন, "ওইরকম নামের জন্যই সে ভিতু হতে পারবে না।"

অসীম দত্ত বললেন, "নামের সঙ্গে কি সকলের মিল থাকে ? যার নাম পদ্মলোচন, তার কি কখনও চোখ কানা হতে পারে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "রূপকথা নামটা কিন্তু অলিকে খুব মানিয়েছে। আচ্ছা অলি, তুমি আর কী-কী দূরের জিনিস দেখেছ ? যেমন তুমি জোজোকে একটা অন্ধকার ঘরে দেখতে পেলে ?"

অলি বলল, "আমি মাঝে-মাঝে এরকম দেখি। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই ভাবে, বানিয়ে-বানিয়ে বলছি।"

কাকাবাবু বললেন, "দু-একটা তো মিলেও যায় !"

অসীম দত্ত বললেন, "তুমি যদি কারও হাত দেখে দশটা কথা বলো, তা হলে একটা-দুটো মিলে যেতেই পারে !"

কাকাবাবু বললেন, "অলি, তোমার পিসিমণি আসবার মতন, তুমি আর কী বলেছ, যা মিলে গেছে ?"

অলি বলল, "একদিন আমি ছাদের ঘরে বসে বই পড়ছি, হঠাৎ খুব জোর একটা শব্দ শুনলাম। মনে হল, একটা মোটরসাইকেল খুব জোর ছুটে যাচ্ছে। খুব কাছে। রাস্তায় উঁকি দিয়ে দেখলাম, সেখানে কোনও মোটরসাইকেল নেই। কেমন যেন ভয়-ভয় করল। তারপরই দেখতে পেলাম ছোটকাকাকে। তার মুখ দিয়ে ভলকে-ভলকে রক্ত বেরোচ্ছে।"

থেমে গিয়ে, বাবার দিকে তাকিয়ে অলি আড়ষ্টভাবে বলল, "এ-কথাটা তোমাদের বলিনি। আমার এমন ভয় করছিল !"

অসীম দত্ত দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "তুই সত্যি এরকম দেখেছিলি ? জানো রাজা, আমার ছোটভাই থাকে পটনায়। সে মোটরসাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করেছিল। খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছে। কয়েকটা পাঁজরা ভেঙে গিয়েছিল, আর চারখানা দাঁত ! আমরা খবর পেয়েছিলাম দু'দিন পরে। অলি তা আগে থেকে কী করে জানবে ? অলি, তুই আগে বলিসনি, এখন বানাচ্ছিস না তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, ও বানাচ্ছে না। ওর মুখ দেখেই বোঝা যায় !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি তো জোজোকে কখনও দ্যাখোনি। তাকে চেনো না। তুমি কী করে বুঝলে, অন্ধকার ঘরে জোজোকে বেঁধে রাখা হয়েছে ?"

অলি আমতা-আমতা করে বলল, "জোজোকে চিনি না...তোমরা যখন জোজোর কথা বলছিলে, তখন হঠাৎ দেখলাম...তোমারই বয়েসী একটা ছেলে, হাত বাঁধা, মুখ বাঁধা..."

অসীম দত্ত মাথা নেড়ে বললেন, "এটা মিলবে না। আমার ধারণা, আজ বিকেলের মধ্যেই ছেলেটার খোঁজ পাওয়া যাবে।"

গাড়িটা কাকদ্বীপ বাজার পেরিয়ে যেতেই সন্তু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আরে ! তাঁবুটা কোথায় ?"

সত্যিই মাঠের মধ্যে কাল বিরাট সার্কাসের তাঁবু ছিল, মাইকে অনবরত ঘোষণা হচ্ছিল, গান বাজছিল, এখন সব চুপচাপ, তাঁবুটাও নেই।

তবে, কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে। ভারী-ভারী বাক্স বয়ে আনছে কিছু লোক। একটা খাঁচায় দুটো বাঘ, আর একটা খাঁচায় একটা বাঘ। হাতিটা দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। অত বড় হাতিকে কি ট্রাকে তোলা যাবে ?

সবাই গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগিয়ে গেল। কাকাবাবু একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, সার্কাস বন্ধ হয়ে গেল ?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, এর পর বজবজে হবে।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কাল আমরা দেখে গেলাম, তখন তো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কিছু শুনিনি। আজ আবার দেখব বলে বন্ধুদের নিয়ে এসেছি।"

লোকটি বলল, "কাল আদ্ধেকও টিকিট বিক্রি হয়নি। এরকম লোকসান দিয়ে চালানো যায় না।"

অসীম দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ম্যানেজার ?"

লোকটি আঙুল দিয়ে একদিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ম্যানেজারবাবু ওইখানে বসে আছেন।"

সেখানে একটা একতলা বাড়ি। তার বারান্দায় টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আছে একজন, আর কয়েকজন ভিড় করে আছে তার সামনে।

কাছে গিয়ে দেখা গেল, কালকের সেই সোনালি কোট পরা লোকটিই ম্যানেজার। কিন্তু এখন তাকে চেনা খুব শক্ত। কাল তার মাথায় ছিল কুচকুচে কালো বাবরি চুল, গায়ে সোনালি কোট, আর সাদা প্যান্ট পরা। আজ তার মাথায় আধখানা টাক, বাকি চুল কাঁচা-পাকা, অর্থাৎ কাল পরচুলা পরে ছিল। পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি, বেশ ভুঁড়িওয়ালা চেহারা। ম্যানেজার কিছু লোককে হিসেব করে টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছে।

কাকাবাবু সামনে এসে বললেন, "নমস্কার ম্যানেজারবাবু। সার্কাস বন্ধ করে দিলেন ?"

ম্যানেজার বলল, "হ্যাঁ ! এবার বজবজ যাব।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কালই যে শেষ খেলা, তা তো একবারও ঘোষণা করলেন না ? আমরা ভেবেছিলাম, আজকে আর একবার দেখব। বিশেষ করে ওই মানুষ অদৃশ্য করার খেলাটা..."

ম্যানেজার বলল, "আহা, ওইজন্যই তো বন্ধ করে দিতে হল এখানে। ও খেলাটা আর দেখানো যাবে না। ম্যাজিশিয়ান মিস্টার এক্স কাল রাত্তিরেই কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কত করে বোঝালাম, একশো টাকা বেশি দেব বললাম, তাও থাকতে চাইল না।"

এবার কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি ম্যানেজারের চোখে চোখ রেখে বললেন, "মিস্টার এক্স কাজ ছেড়ে দিয়েছেন ? কেন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ?"

ম্যানেজার বলল, "না, না, ঝগড়া হবে কেন ? হঠাৎ বলল, আর খেলা দেখাবে না।"

"উনি আপনার সার্কাসে কতদিন আছেন ?"

"ও তো আমার স্টাফ নয়। এখানে তাঁবু ফেলার পর নিজে থেকেই এসে বলেছিল, ওই খেলাটা দেখাবে। আমার মনে হল, ওটা একটা অ্যাট্রাকশান হবে। তা ও খেলাটা লোকে নিচ্ছিল খুব। এরকম তো হয়, যত লোক খেলা দেখায়, সবাই সার্কাসের স্টাফ নয়। কিছু-কিছু লোকাল আর্টিস্টও নিতে হয়। যে লোকটা দু' হাতে দুটো লাঠি নিয়ে খেলা দেখাল, সেও তো লোকাল।"

"মিস্টার এক্স-এর আসল নাম কী ?"

"তাও তো আমি জানি না। সে একটা ন্যাড়া-মাথা অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে এসেছিল, তাকেও আমরা ন্যাড়া-ন্যাড়া বলেই ডেকেছি।"

"মিস্টার এক্স কতদিন ওই খেলা দেখিয়েছেন ?"

"দশদিন।"

"এই দশদিনে যত লোককে অদৃশ্য করা হয়েছিল, তাদের ফেরত পাওয়া গেছে ?"

ম্যানেজার এবার কাকাবাবুর বগলের ক্রাচদুটোর দিকে তাকিয়ে চিনতে পারল। দু' হাত ছড়িয়ে বলল, আপনি কাল একটা ছেলের খোঁজ নিতে এসেছিলেন না ? আপনি তো বড় তাজ্জব কথা বললেন মশাই। মানুষ কি সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হতে পারে নাকি ? ও তো ভেলকিবাজি। আলোর কারসাজি। অডিয়েন্সের ভেতর থেকে যদি কেউ আসে, সে খেলা শেষ হওয়ার একটু বাদে নিজের সিটে ফিরে যায়।

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল, সে ফিরে আসেনি।"

অসীম দত্ত তাঁর বডিগার্ডকে বললেন, "সুলেমান, এখানকার থানায় চলে যাও। বড়বাবুকে আমার নাম করে ডেকে আনো। এক্ষুনি আসতে বলবে।"

তারপর তিনি ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই কি এই সার্কাসের মালিক ? আপনার নাম কী ?"

ম্যানেজার বলল, "না, সার, আমি ম্যানেজার। তবে মালিকের সঙ্গে কিছুটা শেয়ার আছে। মালিক থাকেন কানপুরে। আমার নাম জহুরুল আলম। সার্কাসের লাইনের লোকেরা আমাকে জহরভাই বলে চেনে।"

অসীম দত্ত বললেন, "আপনার আজ বজবজ যাওয়া হবে না। জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিন, আপনাকে এখানে থাকতে হবে।"

জহুরুল আলম একগাল হেসে বলল, "তাই নাকি ? আমি বজবজ যেতে পারব না ? কে আমায় আটকাবে ?"

অসীম দত্ত বললেন, "থানা থেকে বড়বাবু আসছেন। তিনি আপনাকে থানায় নিয়ে যাবেন !"

জহুরুল আলম এবার হাসি থামিয়ে অবজ্ঞার সুরে বলল, "বললেই হল ? ওরকম পুলিশ আমার ঢের দেখা আছে ! কেন আমায় আটকাবে, আমি কী দোষ করেছি ?"

অসীম দত্ত বললেন, "কাল থেকে আপনারা একটা ছেলেকে গাপ করে রেখেছেন। তাকে ফেরত না পেলে আপনাকে ছাড়া হবে না !"

জহুরুল আলম বলল, "গাপ করে রেখেছি ? খামোকা একটা ছেলেকে ধরে রাখতে যাব কেন ? সে ছোঁড়া নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে, তার জন্য আমার দোষ হল ? তা ছাড়া মিস্টার এক্স খেলা দেখিয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।"

অসীম দত্ত বললেন, "আপনিই তো বললেন, মিস্টার এক্স কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আপনি সত্যি কথা বলছেন কিনা, তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।"

এই সময় হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল। যেখানে ট্রাকগুলোতে জিনিসপত্র তোলা হচ্ছিল, সেখানকার লোকগুলো প্রাণ ভয়ে দৌড়চ্ছে। দু-একজন চেঁচিয়ে বলল, "বাঘ ! বাঘ !"

জহুরুল আলমের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বলল, "সর্বনাশ ! নিশ্চয়ই একটা বাঘের খাঁচার দরজা খুলে গেছে !"

এই কথা বলেই সে টেবিলটা উলটে দিয়ে দৌড় মারল।

অসীম দত্ত পকেট থেকে রিভলভার বার করলেন। কাকাবাবু বললেন, "এ কী করছ, তুমি কি রিভলভার দিয়ে বাঘ মারবে নাকি ? সে-চেষ্টাও কোরো না। তুমি গুলি চালালে বাঘ নির্ঘাত তোমার দিকেই তেড়ে আসবে, ওই গুলিতে ওর কিছু ক্ষতি হবে না।"

লোকেরা দৌড়চ্ছে, বাঘটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একবার ডাক শোনা গেল।

এই ছোট বাড়িটার দুটো ঘরের দরজাই তালাবন্ধ। ভেতরে আশ্রয় নেওয়া যাবে না, খোলা বারান্দা। কাকাবাবু বললেন, "সবাই দৌড়ে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ো। গাড়ির মধ্যে থাকলে বাঘ কিছু ক্ষতি করতে পারবে না।"

অন্যরা দৌড়তে পারে। একমাত্র কাকাবাবুরই দৌড়বার ক্ষমতা নেই। সন্তুও অন্যদের সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত দৌড়ে গেল, তারপর কাকাবাবুর কথা মনে পড়ায় আবার ফিরে এল।

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুই ফিরে এলি কেন ? শিগগির যা,

গাড়িতে ঢুকে পড় । আমার কিছু হবে না ।”

অসীম দত্তকে বারণ করলেও কাকাবাবু নিজের রিভলভারটা হাতে নিলেন । তারপর ক্রাচে ভর দিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলেন গাড়ির দিকে ।

অন্য লোকেরা এর মধ্যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে । মাঠে আর কেউ নেই । এবার দেখা গেল বাঘটাকে । বেরিয়ে এল একটা ট্রাকের আড়াল থেকে । কাকাবাবুর দিকেই সে ছুটে আসছে ।

কাকাবাবু গাড়ির কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছেন । অলি হিস্টিরিয়া রোগীর মতন চিৎকার করছে, “কাকাবাবু, কাকাবাবু, বাঘ ! এসে পড়ল, এসে পড়ল ।”

কাকাবাবু বাঘটার দিকে চোখ রেখে পেছোতে লাগলেন । গাড়ির দরজা খুলে অসীম দত্ত ঝট করে কাকাবাবুকে টেনে নিলেন ভেতরে । সব কাচ তুলে দেওয়া হল । ড্রাইভারকে বলা হল, “স্টার্ট দাও, স্টার্ট দাও !”

ড্রাইভার পরিতোষ এমনই ভয় পেয়ে গেছে যে, থরথর করে কাঁপছে । গাড়ির চাবিটা খসে পড়ে গেছে নীচে, সে খুঁজেই পাচ্ছে না ।

বাঘটা চলে এল গাড়ির একেবারে কাছে । বেশ বড় বাঘ । কাল সার্কাসের খেলার সময় সবক'টা বাঘকেই মনে হচ্ছিল বুড়ো আর ক্লান্ত, এখন তা মনে হচ্ছে না । চোখ দুটো দারুণ হিংস্র, গরগর আওয়াজ করছে ।

বাঘটা দুই থাবা তুলে গাড়ির জানলার কাছে মুখটা ঠেকাল ।

অলি কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, “কাচ ভেঙে ফেলতে পারে না ?”

অসীম দত্ত বললেন, “চুপ, কথা বলিস না ।”

সন্তু ভাবছে, কোন খাঁচার দরজাটা খুলে গেছে ? যেটাতে দুটো বাঘ ছিল, না একটা ?

বাঘটা ওদের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে, কে জানে !

একটা-একটা মুহূর্ত কাটছে, যেন এক-এক ঘণ্টা । বাঘটা কটমট করে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে ।

অসীম দত্ত নিচু হয়ে চাবিটা খুঁজে পেয়ে ড্রাইভারকে বললেন, “শিগগির চালাও !”

এঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার শব্দ হতেই বাঘটা এক লাফে গাড়ির ছাদের ওপর উঠে গেল ! ধড়াম করে একটা শব্দ হল !

এবার কী হবে ? বাঘটাকে নিয়েই গাড়িটা চলবে ? ড্রাইভার হতভম্ব মুখে অসীম দত্তর দিকে তাকাল ।

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে খুব জোরে হর্ন বাজিয়ে দিলেন ।

তাতে কাজ হল । হঠাৎ অত জোর শব্দ শুনে বাঘটা গাড়ির ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে গেল মাঠে ।

গাড়িটা চলতে শুরু করতেই বাঘটা তেড়ে এল সেদিকে ।

অলি তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে। যেন এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

এরই মধ্যে কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, "আহা রে, বাঘটার বোধ হয় খুব খিদে পেয়েছে। এত মুখের গেরাস ফসকে গেল!"

অসীম দত্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "জোরে চালাও, খুব জোরে!"

মাঠটা এবড়োখেবড়ো, মাঝে-মাঝে বড়-বড় গর্ত, গাড়ি জোরে চালানো যায় না, সেটা অনবরত লাফাচ্ছে।

বাঘটা কিন্তু বেশিদূর এল না। কোথা থেকে একটা বন্দুকের গুলির শব্দ হল!

গাড়িটা পাকা রাস্তায় উঠে আসতেই অসীম দত্ত অস্থিরভাবে বললেন, "ডান দিকে যাও, ডান দিকে, থানায়, থানায়!"

এর মধ্যেই বাঘ বেরোবার খবর রটে গেছে। সব দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ, রাস্তায় একটাও লোক নেই। কিছু বাড়ির ছাদে লোকেরা ভিড় করে আছে। সেইরকমই একটা বাড়ির ছাদ থেকে বন্দুক চালাচ্ছে একজন। কিন্তু সেখান থেকে অতদূরে বাঘটার গায়ে গুলি লাগানো অসম্ভব।

থানার সামনেও অন্য কোনও লোক নেই, শুধু তিনজন কনস্টেবল রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। তাদের চোখ-মুখে ভয়ের ছাপ। অসীম দত্তর বডিগার্ডও দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের পেছনে। থানার ওসি একটা জিপগাড়িতে বসে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেটা কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না।

এই গাড়িটা পৌঁছতেই ও সি নেমে এসে অসীম দত্তকে স্যালুট দিয়ে বললেন, "সার, আমি এক্ষুনি যাচ্ছিলাম, জিপটা গোলমাল করছে। আপনাদের কোনও বিপদ হয়নি তো?"

অসীম দত্ত গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন, বাঘ বেরিয়েছে, এখন কী করবেন? পুলিশ কি বাঘ ধরতে পারে? বাঘ মারাও তো নিষেধ!

ও সি বললেন, "এমন আইন হয়েছে, বাঘ ইচ্ছে করলেই মানুষ মারতে পারবে। কিন্তু আমরা বাঘ মারতে পারব না।"

কাকাবাবু হালকা গলায় বললেন, "বাঘটা যদি নিজেই এই থানায় উপস্থিত হয়, তখন আপনারা কী করবেন? আপনাদের কী বাঘ বন্দি করে রাখার ব্যবস্থা আছে?"

অসীম দত্ত বললেন, "তুমি এখন রসিকতা করছ, রাজা? উফ, যা গেল না! বাঘটা যখন গাড়ির জানলার কাছে থাবা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, এই শীতকালেও আমার গা থেকে ঘাম বেরিয়ে গেছে! সবাই নেমে এসো, থানার ভেতরে গিয়ে বসা যাক!"

ওসি বললেন, "বাঘ ধরার দায়িত্ব টাইগার প্রজেক্ট আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের।"

অসীম দত্ত বললেন, "ডায়মন্ড হারবারে ওদের অফিসে ফোন করুন !"

ওসি বললেন, "খবর পাওয়ামাত্র আমি ফোন করেছিলাম। লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় ওদের টেলিফোন খারাপ !"

অসীম দত্ত বিরক্তির ভঙ্গি করে বললেন, "ঠিক দরকারের সময় ফোন খারাপ হয় ! সব সার্কাসের দলের সঙ্গেই বাঘের একজন ট্রেনার থাকে। সে চাবুক নিয়ে শপাং-শপাং করে, বাঘেরা তাকে ভয় পায়। সে-লোকটা গেল কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "এখন কে তাকে খুঁজতে যাবে ?"

সবাই মিলে থানার ভেতরে এসে বসা হল। তারপর মাঝে মাঝেই খবর আসতে লাগল নানা রকম। কেউ বলল, বাঘটা নদীর ধারে গেছে, কেউ বলল, বাঘটা একটা বাড়ির গোয়াল ঘরে ঢুকে পড়েছে, কেউ বলল, এর মধ্যেই তিনটে মানুষ মেরেছে, কেউ বলল, একই সময় দু'জায়গায় দুটো বাঘ দেখা গেছে, কেউ বলল, হাতিটাও ছাড়া পেয়ে গিয়ে বাড়িঘর ভাঙছে।

কোনটা যে সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, তা বোঝার উপায় নেই।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। দুপুরে সেরকম কিছু খাওয়া জোটেনি, সব হোটেল বন্ধ। থানার কাছে একটা ছোট চায়ের দোকান, সেটা খোলানো হল প্রায় জোর করে। বন্দুক নিয়ে পাহারায় রইল তিনজন সেপাই। সে দোকানে কয়েকটা ডিম আর বিস্কুট ছাড়া কিছুই নেই। সেই ডিমসিদ্ধ আর বিস্কুট দিয়ে চা খেয়ে খিদে মেটানো হল কিছুটা।

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা অসীম, আজ তোমার বিরিয়ানি খাওয়ার কথা ছিল, তার বদলে এ তো কিছুই না !"

অসীম দত্ত বললেন, "বাঘের পেটে গিয়ে যে কিমা হইনি, এই যথেষ্ট !"

এর পর সন্ধে হয়ে গেলে বিপদের আশঙ্কা আরও বাড়বে। অন্ধকারে অতর্কিতে বাঘ যে কখন কোথায় হানা দেবে, তা টেরও পাওয়া যাবে না।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লঞ্চ এসে পৌঁছল বিকেল সাড়ে চারটের সময়। তাদের সঙ্গে ঘুমপাড়ানি গুলি আছে। ওই গুলি খেয়ে বাঘ ঘুমিয়ে পড়লে তারপর তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন বাঘটা কোথায় আছে, তা খুঁজে বার করা দরকার।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা লঞ্চ থেকে নেমে প্রথমে থানায় এল। তারপর তারা অসীম দত্তর গাড়িটা ধার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এরা এসে পড়ায় সাধারণ মানুষের সাহস হঠাৎ বেড়ে গেছে। সেই গাড়ির পেছনে শত-শত লোক শাবল, লাঠি নিয়ে ছুটছে। এত লোকের চ্যাঁচামেচিতে ভয় পেয়ে বাঘটা কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকলে, তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে।

কাকাবাবু একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আছেন। বাঘ ধরা না পড়া পর্যন্ত

বেরোনোই যাবে না। এখন কিছুই করার নেই।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকরা বেরিয়ে যাওয়ার পর কাকাবাবু নিজের পিঠের এক জায়গায় হাত দিয়ে বললেন, "ঘুমপাড়ানো গুলি! একবার একজন আমার ওপর ওই গুলি চালিয়ে ছিল। এখনও দাগ আছে। তোর মনে আছে সন্তু?"

সন্তু বলল, "বাঃ, মনে থাকবে না! তারপর আমরা ত্রিপুরায় গেলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "কী ঘুম ঘুমিয়েছি সেবার! বেঁচে গেছি খুব জোর! আচ্ছা সন্তু, বল তো, এই বাঘের খাঁচার দরজাটা হঠাৎ খুলে গেছে, না কেউ ইচ্ছে করে খুলে দিয়েছে?"

ঘরের অন্য কোণে একটা চেয়ারে বসে আছেন অসীম দত্ত। তিনি বললেন, "সে কী! কেউ ইচ্ছে করে খুলে দেবে কেন? এরকম একটা সাঙ্ঘাতিক কাজ করে তার কী লাভ?"

কাকাবাবু বললেন, "একটা লাভ তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। আমরা জোজোর খোঁজখবর নিতে এসেছিলাম, সেটা বন্ধ করে দিল। যদি সত্যি-সত্যি কেউ জোর করে জোজোকে ধরে রেখে থাকে, সেও এই তালে সরে পড়ার সুযোগ পেল! এখন সবাই বাঘ নিয়ে ব্যস্ত। জোজোর কথা কেউ ভাবছে না।"

॥ ৫ ॥

সারারাত ধরে খোঁজাখুঁজি করেও সেই বাঘকে গুলি খাওয়ানো গেল না। বন্দুকধারী পুলিশদের পাহারায় কাকাবাবুদের পৌঁছে দেওয়া হল কাকদ্বীপ ডাকবাংলোতে। সেখানে সুন্দর ব্যবস্থা। মুর্গির মাংসের ঝোল আর ভাতও পাওয়া গেল। শুধু বারান্দায় বসার উপায় নেই, দরজা-জানলা বন্ধ করে থাকতে হল ঘরের মধ্যে।

শুতে যাওয়ার আগে কাকাবাবু অলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে একটা অন্ধকার ঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জোজোকে দেখেছিলে, তারপর আর কিছু দেখেছ?"

অলি জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না!"

কাকাবাবু বললেন, "ভাল করে ঘুমোও। বাঘের কথা আর ভেবো না। বাঘ এখানে আসবে না। হয়তো স্বপ্নের মধ্যে জোজোকে আবার দেখতে পাবে।"

অন্য ঘরে পাশাপাশি দুটো খাট, সন্তু আর কাকাবাবুর। প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল দু'জনে। সন্তুর ঘুম আসছে না। খালি মনে হচ্ছে, বাংলোর পাশ দিয়ে একটা বড় জন্তু দৌড়ে যাচ্ছে। দূরে অনেক কুকুর ডাকছে একসঙ্গে, এখানে কি বাঘটা আছে?

তারপর সে বাঘের চিন্তা জোর করে মন থেকে মুছে ফেলে বলল,

"কাকাবাবু, তুমি ঘুমিয়েছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, কিছু বলবি ?"

সন্তু বলল, "আজ সকাল পর্যন্ত আমার অনেকটাই মনে হচ্ছিল, জোজো ইচ্ছে করেই কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, জোজো এতটা করবে না। এতক্ষণ থাকবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর যা স্বভাব, যদি নিজে লুকোতে চাইত, তা হলে বড়জোর দু'-তিন ঘণ্টা আমাদের ধোঁকায় ফেলে রাখত, তারপরই বেরিয়ে আসত হাসতে হাসতে।"

সন্তু বলল, "বাড়িতে খবর না দিয়ে ও অন্য জায়গায় রাত্তিরে থাকে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু কথা হচ্ছে, কে বা কারা জোজোকে ধরে রাখবে ? সেইটাই আমি বুঝতে পারছি না। সার্কাসের লোকেরা কেন একটা ছেলেকে ধরে রাখবে ? মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখিয়ে যদি কোনও ছেলেকে ধরে রাখে, তা হলে তো প্রথমেই ওদের ওপর সন্দেহ পড়বে।"

সন্তু বলল, "জাদুকর মিস্টার এক্স কাল রাত্তিরেই সার্কাস ছেড়ে চলে গেছে। এটা সন্দেহজনক নয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ, ম্যানেজার বলল, মিস্টার এক্স নাকি স্থানীয় লোক। আমি থানার ওসি কৃষ্ণরূপবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জাপানি জাদুকর মিস্টার এক্স কোথায় থাকেন, বলতে পারেন! উনি বললেন, ওই নামে কোনও জাদুকরের কথা উনি শোনেননি। তবে রায় রায়হান নামে এখানে একজন ছোটখাটো ম্যাজিশিয়ান আছে, তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। বাঘের ঝামেলা আগে চুকে যাক !"

সন্তু বলল, "বাঘটা যতক্ষণ ধরা না পড়ে, ততক্ষণ আমরা বাইরেই বেরোতে পারব না !"

কাকাবাবু বললেন, "আগেকার দিন হলে শিকারিরা এসে বাঘটাকে গুলি করে মেরে ফেলত। এখন পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে, বাঘ শিকার নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। বাঘেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য হয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্প। তাতে অনেক টাকা খরচ হয়। মানুষ যে বাঘদের বাঁচাবার জন্য এত কিছু করছে, বাঘেরা কিন্তু তা জানে না। তারা সুযোগ পেলেই মানুষ মারে। সুন্দরবনে প্রতি বছর বেশ কিছু মানুষ বাঘের পেটে যায়।"

সন্তু বলল, "সন্ধেবেলা থানা থেকে কলকাতায় ফোন করা হল, জোজো তখনও ফেরেনি। রাত্তিরে আর একবার ফোন করলে হত !"

কাকাবাবু বললেন, "অসীম একটা ব্যবস্থা করেছে। জোজোদের বাড়ির কাছে যে থানা, সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে, জোজোদের বাড়ির ওপর নজর রাখতে। জোজো ফিরে আসার খবর পেলেই আমাদের জানিয়ে দেবে! শুধু চিন্তা করে কী হবে, এখন ঘুমো !"

বাঘটার সন্ধান পাওয়া গেল পরদিন সকাল নটায়। এর মধ্যে সে একজন চাষিকে আক্রমণ করেছিল, মারতে পারেনি, শুধু কাঁধে একটা থাবা দিয়েছে। তারপর সে একটা গোরুকে মেরে একটা ঝোপের মধ্যে বসে খাচ্ছিল। কয়েকজন লোক দেখতে পেয়ে ফরেস্ট অফিসারদের খবর দিয়েছে। তাঁরা যখন গিয়ে পৌঁছলেন, তখনও সে কড়মড় করে হাড় চিবিয়ে খাচ্ছিল। সার্কাসে ভাল করে খেতে দেয় না, আফিম-গোলা জল খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তাই অনেকদিন পর বাঘটা মনের সুখে খাচ্ছিল সেই মাংস। বন্দুকধারীদের দেখেও সে পালায়নি, গরগর আওয়াজ করে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল। তারপর দুটো গুলি বেঁধার পর সে ঘুমিয়ে পড়েছে, হাত-পা বেঁধে তাকে তোলা হয়েছে লঞ্চে।

হাজার-হাজার লোক দেখতে গেছে সেই ঘুমন্ত বাঘকে।

কলকাতা থেকে জোজোর কোনও খবর আসেনি, কিন্তু অসীম দত্তর জরুরি ফোন এসেছে। আজ দুপুরেই তাঁকে পুলিশমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সার্কাসের জিনিসপত্র নিয়ে ট্রাকগুলো সরে পড়েছে এর মধ্যে। ম্যানেজার জহুরুল আলমের কোনও পাত্তা নেই।

অসীম দত্ত বললেন, "পালাবে কোথায়? বজবজে ওকে ধরা হবে। ওখানকার পুলিশকে জানিয়ে দিচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "অসীম তুমি তা হলে কলকাতায় ফিরে যাও। আমি এখানেই থেকে দেখি জাদুকর মিস্টার এক্স-এর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কি না। তুমি এই সার্কাসের ম্যানেজার আর যে-লোকটি বাঘের খেলা দেখায়, এই দু'জনকে গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করো। আমি এখানে যদি কিছু না পাই, ফিরে গিয়ে ওদের জেরা করব।"

অসীম দত্ত মেয়েকে বললেন, "অলি, তা হলে জুতো পরে নে। আমরা এক্ষুনি বেরোব!"

অলি মুখ গোঁজ করে বলল, "আমি যাব না। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে থাকব।"

অসীম দত্ত বললেন, "আর থেকে কী করবি? তোর গানের পরীক্ষা আছে।"

অলি বলল, "এবারে পরীক্ষা দেব না। আবার তিন মাস পরে হবে!"

এর পর অসীম দত্ত মেয়েকে অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, অলি কিছুতেই ফিরতে রাজি নয়। তার দু' চোখে টলটল করছে জল।

কাকাবাবু বললেন, "অসীম, মেয়েটার যখন এতই ইচ্ছে, তখন থাক না আমার কাছে। তোমার কোনও ভয় নেই, আমি বেঁচে থাকতে অলির কোনও ক্ষতি হবে না।"

হাল ছেড়ে দিয়ে অসীম দত্ত বললেন, "তোমার কাছে থাকবে, তাতে আবার

ভয় কী ! ওর মা চিন্তা করবে ! ঠিক আছে, তাকে বুঝিয়ে বলব !”

অসীম দত্ত চলে যেতেই কাকাবাবু থানার ওসি কৃষ্ণরূপ রায়কে বললেন, “আপনি এখানকার একজন ম্যাজিশিয়ানের কথা বলেছিলেন না, রায় রায়হান না কী নাম, চলুন, তার সঙ্গে দেখা করব।”

থানার জিপটা এখন ঠিক হয়ে গেছে। সেই জিপে উঠে পড়ল সবাই। যেতে-যেতে কাকাবাবু ওসি-কে জিজ্ঞেস করলেন, এই সার্কাসে দশদিন ধরে মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখানো হয়েছে। সবাই নিশ্চয়ই পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়নি। আপনার কাছে এখানকার লোক হারিয়ে যাওয়ার কোনও রিপোর্ট এসেছে ?”

ওসি বললেন, “ না সার। ওই ম্যাজিকের খেলা আমিও দেখেছি। ও তো ম্যাজিকই। মানুষ তো সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হয় না। আমি যেদিন সার্কাসে যাই, সেদিন সতীশ নামে একজন লোককে অদৃশ্য করা হয়েছিল। সেই সতীশ তো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ! পরশুও দেখেছি।”

কাকাবাবু বললেন, “ওই সতীশকেও আমার দরকার। জাদুকর তাকে অদৃশ্য করার পর তার কী হয়েছিল, নিশ্চয়ই বলতে পারবে।”

ওসি বললেন, “আমি সতীশকে সে-কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার কৌতূহল হয়েছিল, সতীশ ঠিক বলতে পারে না। সে শুধু বলল, তার মাথা ঝিমঝিম করেছিল, চক্ষে অন্ধকার দেখেছিল, তারপর কী হল তার মনে নেই। খানিক বাদে সে দেখল যে পরদার পেছনে বসে আছে। তাকে শিঙাড়া আর রসগোল্লা খেতে দেওয়া হয়েছে।”

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, “এখানে মানুষজন হারিয়ে যাওয়ার কোনও রিপোর্ট নেই ?”

ওসি বললেন, “উঁহুঃ ! তবে দিন দশেক আগে একটা ষোলো সতেরো বছরের ছেলে ভোরবেলা নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার ডেডবডিটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ-কেউ বলছে, ছেলেটা ইচ্ছে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ছেলেটা এখানকার স্কুলের ফার্স্ট বয় ছিল, এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।”

জিপটা থামল একটা দর্জির দোকানের সামনে। কিছু লোক এখনও সেখানে জটলা করে বাঘের গল্প বলছে। অনেকের ধারণা আর একটা বাঘ এখনও রয়ে গেছে এখানে। পুলিশের জিপ দেখে সবাই চুপ করে গেল।

দর্জির দোকানের মালিকের নাম পরেশ জানা। সে বই পড়ে নিজে-নিজেই কিছু ম্যাজিক শিখেছে। রথের মেলায়, দুর্গাপুজোর সময় ম্যাজিক দেখায়।

দোকানের পেছনদিকের একটা ঘর আছে। সেই ঘরে বসে কাকাবাবু পরেশ জানাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি ম্যাজিশিয়ান মিস্টার এক্স-কে চেনেন ?”

পরেশ দু'দিকে জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বলল, “নাঃ ! কক্ষনও নামও

শুনিনি !”

কাকাবাবু বললেন, “কিন্তু সে এখানকারই লোক শুনলাম যে !”

পরেশ বলল, “এখানকার কেউ ম্যাজিক শিখলে আমি জানতাম না ? এ কোনও বাইরের উটকো লোক ! মুখে সবসময় মুখোশ পরে থাকে, ওর আসল মুখও তো কেউ দেখেনি !”

কাকাবাবু বললেন, “সবসময় মুখোশ পরে থাকে ?”

পরেশ বলল, “তাই তো শুনেছি। সার্কাসের বাইরে রাস্তাঘাটে তাকে দেখা যায়নি। তবে, কিছুদিন আগে গঙ্গাসাগরের মেলা হয়ে গেল, সেখানেও নাকি ওই মিস্টার এক্স জাদুর খেলা দেখিয়েছে। দুটি ছেলেকে অদৃশ্য করে দিয়েছে, তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।”

কাকাবাবু ও সি-র দিকে ফিরে বললেন, “গঙ্গাসাগর মেলায় দুটি ছেলে হারিয়ে গেছে, সে-রিপোর্ট আপনারা পাননি ?”

ওসি বললেন, “দেখুন, গঙ্গাসাগর মেলায় দূর-দূর থেকে কত মানুষ আসে, প্রতি বছরই কয়েকজন হারিয়ে যায়, আবার বোধ হয় তাদের পাওয়াও যায়। মোট কথা, আমাদের থানায় ডায়েরি করেনি কেউ !”

পরেশ বলল, “সার, আমাদের দেশে কত মানুষ, চতুর্দিকে মানুষ গিসগিস করছে, তার মধ্যে দু-চারটে কখন কোথায় হারিয়ে গেল, তা নিয়ে কি পুলিশের মাথা ঘামাবার সময় আছে ?”

ওসি পরেশকে জিজ্ঞেস করলেন, “গঙ্গাসাগর মেলায় ম্যাজিক দেখাবার সময়ই যে দুটি ছেলে হারিয়ে গেছে, তা তুমি জানলে কী করে ?”

পরেশ বলল, “আমার ভাইপো ওই মেলায় গিয়েছিল। তার কাছে শুনেছি। সে ওই ম্যাজিক দেখেছে। তারপর বিহারের এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে খুব চ্যাঁচামেচি করেছিল। আর একটা ছেলের সঙ্গে ছিল তার মা আর মাসি। সেই মহিলা দু'জন খুব কান্নাকাটি করছিল, কিন্তু ছেলেটাকে পাওয়া যায়নি !”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “সেই ম্যাজিশিয়ানের কাছে লোকে জবাবদিহি চায়নি কেন ?”

পরেশ বলল, “মুখোশ-পরা ম্যাজিশিয়ান। মুখোশটা খুলে সে যদি ভিড়ে মিশে যায়, তা হলে তাকে কে চিনবে ? আমি সার অনেক ম্যাজিক দেখেছি, কলকাতাতেও দেখেছি, কিন্তু কোনও মুখোশপরা ম্যাজিশিয়ানের কথা বাপের জন্মে শুনিনি !”

কাকাবাবু বললেন, “আচ্ছা পরেশবাবু, আপনি তো অনেক ম্যাজিক জানেন। বেশ ভাল ম্যাজিক দেখান শুনেছি। আপনি মানুষ অদৃশ্য করার খেলা দেখাতে পারেন ?”

পরেশ অবজ্ঞার সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, “আমি ওসব আজেবাজে খেলা

দেখাই না। ও তো ভেলকিবাজি। যন্ত্রপাতি আর আলোর খেলা। আমি দেখাই শুধু হাতের খেলা। দেখবেন, দেখুন!"

পরেশ পকেট থেকে একটা এক টাকার মুদ্রা দেখাল। সেটা ডান হাতে নিয়ে বলল, "দেখতে পাচ্ছেন তো, ভাল করে দেখুন, এটা একটা টাকা। এই যে ওপরে ছুড়ে দিচ্ছি। এই যে লুফে নিলুম। দেখলেন তো? আবার ছুড়ে দিচ্ছি! কই গেল?"

টাকাটা নেই। পরেশ দুটো হাত উলটেপালটে দেখাল। কোনও হাতেই টাকাটা নেই।

পরেশ হাসতে-হাসতে বলল, "দেখতে পেলেন না? ভাল করে দেখেননি। এই তো!"

পরেশ আবার ডান হাতটা ওলটাতেই দেখা গেল সেখানে রয়েছে টাকাটা।

পরেশ বলল, "এই হচ্ছে হাতের খেলা। এ শিখতে এলেম লাগে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, চমৎকার!"

সন্তু আর অলি এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার অলি বলল, "আর-একটা, আর-একটা দেখান!"

পরেশ অলির দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখবে? তোমার হাত দুটো বাড়িয়ে দাও!"

পরেশ অলির হাত দুটো ধরে একটুক্ষণ মুঠো করে রাখল। তারপর আবার খুলে আবার মুঠো করে দিল।

অন্যদের দিকে ফিরে বলল, "এই মেয়েটির একটা হাতে আমি সেই টাকাটা রেখে দিয়েছি। বলুন তো, কোন হাতে সেই টাকাটা আছে?"

সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "তুমিই বলো, কোন হাতে?"

সন্তু অলির ডান হাতটা ছুঁয়ে দিল।

মুঠো খুলতে দেখা গেল, টাকাটা রয়েছে সেই হাতে।

পরেশ বলল, "বাঃ, তুমি ঠিক ধরেছ তো। এক চান্সেই বলে দিলে? আচ্ছা, এবার বাঁ হাতটা খুলে দেখাও তো খুকুমণি!"

বাঁ হাতের মুঠো খুলতে দেখা গেল, সে-হাতেও রয়েছে এক টাকা। একটা মুদ্রা দুটো হয়ে গেছে!

কাকাবাবু বললেন, "দারুণ তো!"

পরেশ সগর্বে বলল, "আমার যন্ত্রপাতি লাগে না। শুধু হাতে খেলা দেখাই!"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ। আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আমাদের উঠতে হয়। তা হলে, মিস্টার এক্স এই অঞ্চলে কোথায় থাকে, আপনি বলতে পারবেন না?"

পরেশ বলল, "আমার ধারণা, সে এখানকার লোক নয়। বিদেশি।

গঙ্গাসাগর মেলার সময় সে একটা লঞ্চে করে এসেছিল। আমার ভাইপো তাকে একবার একটা লঞ্চ থেকে নেমে আসতে দেখেছে। আপনারা তাকে খুঁজছেন তো। একবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে দেখুন, সেখানে পাওয়া যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "মেলা শেষ হয়ে গেলে তো সেখানে আর কেউ থাকে না।"

ওসি বললেন, "এখন সারা বছরই কিছু লোক যায়। কয়েকটা হোটেল আর গেস্ট হাউস হয়েছে। কপিল মুনির আশ্রমের কাছে কয়েকজন সাধুও থাকে।"

পরেশ বলল, "কেউ লুকিয়ে থাকতে চাইলে ওটা খুব ভাল জায়গা। মেলার সময় ছাড়া সারা বছর ওখানে পুলিশ যায় না।"

কাকাবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতেই ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল একজন বেশ সুদর্শন যুবক। সাদা প্যান্ট ও নীল হাওয়াই শার্ট পরা। সে হাতজোড় করে বলল, "নমস্কার। আপনি রাজা রায়চৌধুরী, দেখেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু আপনাকে আমি মিস্টার রায়চৌধুরী বলতে পারব না, আপনাকে আমি কাকাবাবু বলে ডাকব, আমি আপনার ভক্ত। আমি এই মহকুমার পুলিশ অফিসার। আমার নাম অর্ক মজুমদার।"

কাকাবাবু বললেন, "অসীমের কাছে আপনার কথা শুনেছি।"

অর্ক বলল, "আপনি নয়, আপনি নয়, আমাকে তুমি বলবেন। আমি একটা খবর দিতে এসেছি। জুয়েল সার্কাস পার্টির নামে অনেক অভিযোগ এসেছে। বাঘের খাঁচার দরজা খুলে যাওয়ায় চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তাই আমি চতুর্দিকে ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে ওই সার্কাসের যে-কোনও লোককে দেখলেই অ্যারেস্ট করার অর্ডার দিয়েছি। ওরা বলেছে, বজবজের দিকে যাবে, এই ঘটনার পর অন্যদিকে পালাবার চেষ্টা করাই তো ওদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের সঙ্গে বাঘ আছে, হাতি আছে, আরও কত জিনিসপত্র, এতসব নিয়ে ওরা পালাবে কী করে?"

অর্ক বলল, "বনে-জঙ্গলে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে। ধরা পড়বে ঠিকই, কিন্তু দেরি হতে পারে। এর মধ্যেই একজন ধরা পড়েছে। আমি তাকে জেরা করার জন্য নিয়ে আসতে যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই যাব! যে ধরা পড়েছে, সে সার্কাসে কী করত?"

অর্ক বলল, "তা বলতে পারছি না। একজন কনস্টেবল তাকে এই সার্কাসে দেখেছে। সে লোকটি হারউড পয়েন্ট থেকে লঞ্চে উঠতে যাচ্ছিল।"

কাকাবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "হারউড পয়েন্ট? সেখানে কি সারা বছর লঞ্চ চলে?"

অর্ক বলল, "হ্যাঁ, এখন চলে। দেখলেন, এটা বজবজের একেবারে উলটো

দিকে।”

পরেশ দর্জি বলল, “ওখান দিয়েই তো গঙ্গাসাগর যায়। দেখলেন, আমি ঠিক বলেছিলাম কি না।”

কাকাবাবু বললেন, “তাই তো দেখছি।”

অর্ক এনেছে একটা স্টেশন ওয়াগন। কাকদ্বীপ থানার ওসি-কে ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবু সদলবলে অর্কর গাড়িতে উঠলেন।

গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার পর অর্ক বলল, “কাকাবাবু, কাল রাত্রে ওই ব্যাঘ্রকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর খবর পেয়ে কলকাতা থেকে অনেক সাংবাদিক চলে এসেছে। এমন রোমাঞ্চকর ব্যাপার তো বিশেষ হয় না। সাংবাদিকরা আপনাকে চিনতে পারলে কিন্তু বিরক্ত করে মারবে। আপনার চোখের সামনেই তো বাঘটা বেরিয়েছিল!”

কাকাবাবু বললেন, “চোখের সামনে মানে? আমাদের গাড়ির মাথায় বাঘটা চেপে বসে ছিল।”

অর্ক বলল, “এই গল্প শুনলে কি আর সাংবাদিকরা আপনাকে ছাড়বে? আপনি মাথাটা নিচু করে থাকুন, যাতে কেউ দেখতে না পায়! কলকাতাতেও খবর নিয়েছি, আপনাদের সেই জোজো এখনও ফেরেনি।”

কাকাবাবু বললেন, “বাঃ, তুমি তো বেশ কাজের ছেলে! তোমাকে দেখলে পুলিশ অফিসার মনে হয় না। মনে হয় যেন কলেজের ছাত্র!”

অর্ক বলল, “পরীক্ষা দিয়ে দু’বছর আগে চাকরি পেয়েছি। তার আগে তো ছাত্রই ছিলাম। কী হে সন্তু, তুমি কিছু কথা বলছ না যে!”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “যে-লোকটা ধরা পড়েছে, তাকে কেন কাকদ্বীপে নিয়ে আসা হল না? আপনাকে যেতে হচ্ছে কেন!”

অর্ক বলল, “ওখানে কোনও গাড়ি নেই। ধরা পড়ার পরেও লোকটা পালাবার চেষ্টা করেছিল। আমাদের কনস্টেবল, আরও দু-তিনজন মিলে তাকে জাপটে ধরে বেঁধে রেখেছে। ওর কাছে কয়েকটা বড়-বড় আলোর বাল্ব পাওয়া গেছে। চুরি করেছে কি না কে জানে, নইলে পালাবার চেষ্টা করবে কেন?”

কাকদ্বীপ থেকে হারউড পয়েন্ট বেশি দূর নয়। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, ফেরিঘাটের পাশে এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিছু মানুষ। কাকাবাবু ক্রাচ নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। সন্তু আগে-আগে দৌড়ে গেল।

সেই ভিড় ঠেলে মাঝখানের হাত-পা-বাঁধা মানুষটাকে দেখে সন্তু খুশিতে শিস দিয়ে উঠল।

মাথায় একটাও চুল নেই, চকচকে টাক, ভুরুও দেখা যায় না, এ তো সেই ম্যাজিশিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট। সন্তুর গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল।

কাকাবাবু আসতেই সন্তু উত্তেজিতভাবে বলল, “কাকাবাবু, এর সঙ্গে নিশ্চয়ই

ম্যাজিশিয়ান এক্স-ও ছিল। মুখোশ খোলা থাকলে তো তাকে কেউ চিনতে পারবে না। এ ধরা পড়ার পর ম্যাজিশিয়ান পালিয়েছে।"

কাকাবাবু চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "এই ভিড়ের মধ্যে মিশে সে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে!"

লোকটি শুয়ে ছিল মাটিতে। তার জামা-প্যান্ট ভেজা। পালাবার জন্য সে ঝাঁপ দিয়েছিল নদীতে। সেখান থেকে তাকে টেনে তোলা হয়েছে।

অর্ক কাছে গিয়ে লোকটিকে দাঁড় করাল। তারপর তার জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী রে, পালাতে চাইছিলি কেন? কী দোষ করেছিস?"

লোকটি কোনও উত্তর দিল না।

অর্ক আবার জিজ্ঞেস করল, "তোর নাম কী? সার্কাসে তুই কী কাজ করিস?"

লোকটি এবারেও চুপ।

অর্ক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "কথা বলছিস না কেন? যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দে!"

লোকটি মুখ না খুলে সোজা চেয়ে রইল অর্কর দিকে।

কনস্টেবলটি এবার লাঠি তুলে মারার ভঙ্গি করে বলল, "এই, সাহেব যা জানতে চাইছেন, জবাব দে, নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব!"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও, মারবার দরকার নেই। একে আমরা চিনি। ম্যাজিশিয়ান মিস্টার এক্স-এর সহকারী। সেই ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলা আমার খুব দরকার। ম্যাজিশিয়ান কোথায় গেছে, এ নিশ্চয়ই বলতে পারবে। কিন্তু এখানে এত লোকের মধ্যে জেরা করে লাভ নেই। কোথাও গিয়ে বসতে হবে।"

অর্ক বলল, "তা হলে কাকদ্বীপের থানায় যাওয়া যাক।"

কাকাবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, "কাকদ্বীপে না। এই লোকটা এখান থেকে লঞ্চ ধরে গঙ্গাসাগরের দিকে যেতে চাইছিল, কেন? চলো, আমরাও সেখানেই যাই। গাড়িটা এখানে থাকবে?"

অর্ক বলল, "গাড়িসুদ্ধই যাওয়া যেতে পারে। সে-ব্যবস্থা আছে। শুধু এখন জোয়ার না ভাটা তা দেখতে হবে।"

ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন চেঁচিয়ে বলল, "জোয়ার, জোয়ার। ওই তো ফেরির লঞ্চ আসছে।"

এখানে দু'রকম লঞ্চ চলে। একরকম লঞ্চে শুধু যাত্রী পারাপার করে। আর-একরকম লঞ্চে গাড়ি, বাস, ট্রাক সব উঠে যায়। তাতেও যাত্রীরা যায় কিছু-কিছু।

গাড়ির সামনের সিটে কনস্টেবলটি ন্যাড়ামাথা লোকটিকে ধরে বসে রইল।

পেছনের সিটে আর সবাই।

গঙ্গা এখানে বিশাল চওড়া। বড়-বড় ঢেউ। হুহু করছে হাওয়া। অনেক মাছধরার নৌকো ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলছে।

অলি জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি সমুদ্রে যাচ্ছি?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সমুদ্রের দিকেই যাচ্ছি। তবে এখনই নয়। দেখছ তো, এই লঞ্চটা কোনাকুনি গঙ্গা পার হচ্ছে। ওদিকে একটা দ্বীপ আছে। খুব বড় দ্বীপ, সেখানে মানুষজন থাকে। সেই দ্বীপের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে অনেকটা গেলে, একেবারে শেষে গঙ্গার মোহনা। মোহনা কাকে বলে জানো?"

অলি বলল, "হ্যাঁ, নদী যেখানে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই মোহনার নাম গঙ্গাসাগর। অনেকের ধারণা, সেখানে স্নান করলে খুব পুণ্য হয়, তাই বছরে একবার বহু দূর দূর থেকে মানুষ এসে গঙ্গাসাগরে ডুব দেয়।"

অলি বলল, "আমিও ডুব দেব। কিন্তু আমি সাঁতার জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "সাঁতার না জানলেও ডুব দিতে পারবে। ভয় নেই। সন্তু তোমার পাশে থাকবে।"

অলি জিজ্ঞেস করল, "সন্তুদা বুঝি ভাল সাঁতার জানে?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সন্তুকে যদি এই গঙ্গায় ঠেলে ফেলে দাও, ও ঠিক সাঁতরে ওপারে চলে যাবে।"

অর্ক বলল, "তাই নাকি! সন্তু তোমার সঙ্গে একদিন সাঁতারের কম্পিটিশন দিতে হবে। আমি সাঁতার প্রতিযোগিতায় দু-তিনটে প্রাইজ পেয়েছি।"

সন্তু লাজুক-লাজুক মুখ করে বলল, "আমি তেমন কিছু ভাল পারি না।"

কাকাবাবু অর্ককে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি জুয়েল সার্কাসের শো দেখেছ?"

অর্ক বলল, "হ্যাঁ, দেখে গেছি একবার। বেশির ভাগ খেলাই অতি সাধারণ। গ্রামের মানুষদের ভাল লাগবে, আমরা ধরে ফেলি।"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ অদৃশ্য করার খেলাটা?"

অর্ক বলল, "ওটা তো খুব সোজা! ওই যে উঁচু করে স্টেজটা বানিয়েছিল, ওর মাঝখানে কিছুটা জায়গা কাটা। তার ওপর একটা আলগা তক্তা পাতা থাকে। একজন লোককে সেখানে দাঁড় করায়, তারপর অনেক আলো জ্বলতে নিভতে থাকে, ম্যাজিশিয়ান লোকটাকে একটা কালো কাপড়ে ঢেকে দেয়, পা দিয়ে একটা শব্দ করে তক্ষুনি স্টেজের নীচ থেকে ওর সহকারী তক্তাটা সরিয়ে লোকটাকে নীচে টেনে নেয়।"

অর্ক সামনে ঝুঁকে ন্যাড়ামাথা লোকটার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, "কী রে, তাই নয়?"

সে ফিরে তাকাল না, কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু বললেন, "তা ছাড়া আর কী হবে ! কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় চোখের নিমেষে ঘটে যায় ।"

অর্ক বলল, "সেটাই তো প্র্যাকটিস । তা ছাড়া আলোর খেলায় চোখ ধাঁধিয়ে যায় ।"

সন্তু বলল, "যাদের অদৃশ্য করা হচ্ছে, তারা তো ফিরে এসে কায়দাটা বলে দিতে পারে ।"

অর্ক বলল, "তা তো পারেই । বললেই বা ক্ষতি কী ? আগে থেকে কায়দাটা জানলেও যে-সময় ওরা খেলাটা দেখায়, সে-সময় একটুও ধরা যায় না । মনে হয়, সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ।"

কাকাবাবু বললেন, "অদৃশ্য হওয়ার খেলার পর আমাদের জোজোকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি । এই একই ম্যাজিশিয়ান গঙ্গাসাগর মেলাতেও ওই খেলা দেখিয়েছে । দর্জি' ভদ্রলোক বললেন, তখনও নাকি দুটি ছেলে হারিয়ে গেছে ।"

অর্ক বলল, "মেলাতে অত ভিড়ের মধ্যে প্রতি বছরই..."

কাকাবাবু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "সেটা জানি । কিন্তু আমি একটা অন্য কথা ভাবছি । আমাদের জোজোর বয়েস সতেরো । মেলায় যে দুটি ছেলে হারিয়ে গেছে, তাদের বয়েসও ষোলো-সতেরো । কাকদ্বীপের ওসি বললেন, কয়েকদিন আগে একটি ছেলে ভোরবেলা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল, তার বয়েসও সতেরো, তাকে আর কেউ দেখেনি, তার ডেডবডিও পাওয়া যায়নি । হঠাৎ ঠিক ওই এক বয়েসের ছেলেরা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এটা খুব পিকিউলিয়ার না ?"

অর্ক বলল, "এটা কাকতালীয় হতে পারে । তা ছাড়া এই বয়সের ছেলেরাই বাড়ি থেকে পালায় ।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের জোজো বাড়ি থেকে পালাবার ছেলে নয় । তাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে রেখেছে ।"

অর্ক অবাক হয়ে বলল, "সে কী ! এর মধ্যেই সেটা ধরে নিচ্ছেন কী করে ?"

কাকাবাবু অলির মাথায় হাত রেখে হেসে বললেন, "ধরে নিইনি, সেটা আমাদের এই অলি দিদিমণি জানে ।"

অর্ক বলল, "ও কী করে জানবে ? ও কি দেখেছে নাকি !"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলব, এই যে আমরা এসে গেছি !"

ফেরি লঞ্চটা ভ্যাঁ- ভ্যাঁ করে করে ভেঁপু বাজিয়ে জেটিতে এসে ভিড়ল । গাড়িটা উঠে এল উঁচু রাস্তায় ।

অর্ক বলল, "আমরা পি ডব্লু ডি'র বাংলোয় থাকব, সেখানে রান্নাবান্না করে

দেবে। খুব ভাল ব্যবস্থা আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “এইসব জায়গায় বেড়াতে এসে ভালই লাগে। কিন্তু মাথার মধ্যে জোজোর চিন্তা ঘুরছে। জোজোকে যতক্ষণ না খুঁজে পাচ্ছি, ততক্ষণ কিছুই ভাল লাগছে না।”

অর্ক বলল, “যারা ছেলেধরা, তারা সাধারণত বাচ্চা ছেলেমেয়েদের চুরি করে। পাঁচ বছর, সাত বছর, বড়জোর আট-ন'বছর। কিন্তু একটা ষোলো-সতেরো বছরের জোয়ান ছেলেকে চুরি করাটা খুবই অস্বাভাবিক। এরকম শোনা যায় না।”

কাকাবাবু বললেন, “অস্বাভাবিক তো বটেই ? ম্যাজিক দেখাবার ছল করে একটা ছেলেকে সত্যি-সত্যি অদৃশ্য করে দেওয়াটা অস্বাভাবিক নয় ?”

অর্ক বলল, “ওই ম্যাজিশিয়ানই যে জোজোকে চুরি করেছে, তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। হয়তো এটা সার্কাসের ম্যানেজারের কারসাজি।”

কাকাবাবু বললেন, “কে সত্যি দায়ী, তা এই লোকটাকে জেরা করে জানা যেতে পারে।”

দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি, সকলেরই খিদে পেয়ে গেছে বেশ। বাংলোতে পৌঁছতে অনেক বেলা হয়ে গেল। এখন রান্না করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

কাকাবাবু অনেক বছর আগে এসেছিলেন গঙ্গাসাগরে, তখন এখানে বাড়িঘর প্রায় কিছুই ছিল না। এখন অনেক বাংলো, গেস্ট হাউস, ইয়ুথ হস্টেল হয়ে গেছে। কয়েকটা ছোটখাটো হোটেল আর চায়ের দোকানও আছে। একটা হোটেল থেকে রুটি আর আলুর দম কিনে আনা হল।

খেতে-খেতে অর্ক বলল, “কাকাবাবু, আপনি প্রথমে এই টাকলু লোকটাকে জেরা করে কিছু কথা বার করতে পারেন কি না দেখুন। মনে হচ্ছে, এ-ব্যাটা গভীর জলের মাছ। সহজে মুখ খুলবে না। যদি আপনি না পারেন তা হলে আমি চেষ্টা করব। থার্ড ডিগ্রি দিলেই ওর পেটের কথা হুড়হুড় করে বেরিয়ে যাবে।”

অলি জিজ্ঞেস করল, “থার্ড ডিগ্রি কী ?”

অর্ক বলল, “সেটা ছোটদের জানতে নেই। যখন আমি থার্ড ডিগ্রি দেব, তখন তুমি আর সন্তু সেখানে থাকতে পারবে না।”

সন্তু বলল, “পা বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া ?”

কাকাবাবু বললেন, “অত সব লাগবে না।”

অর্ক বলল, “আমি ঘুরেফিরে চারদিকটা দেখে আসি। মুখোশ-পরা ম্যাজিশিয়ান সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে কিনা খোঁজ নিই। আপনারা কিন্তু সাবধানে থাকবেন। দেখবেন, ও ব্যাটা না পালায়।”

কাকাবাবু বললেন, “না, পালাবে কী করে ? হাত-পা বাঁধা আছে। ওকে

এখন কিছু খেতেও দেওয়া হবে না। খাবার সামনে রেখে লোভ দেখাতে হবে। আপাতত ওকে একটা ঘরে আটকে রাখা হোক। এর মধ্যে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল রাত্তিরে একে তো বাঘের উপদ্রব, তার ওপর জোজোর চিন্তায় আমার ভাল করে ঘুম হয়নি।"

॥ ৬ ॥

একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে কাকাবাবু ঠিক চল্লিশ মিনিট ঘুমোলেন। তারপর উঠে পড়ে সন্তুকে বললেন, "এবার লোকটিকে এ-ঘরে নিয়ে আয়।"

অলিকে বললেন, "তুমি একটা প্লেটে ওর জন্য রুটি আর আলুর দম এনে টেবিলের ওপর রাখো।"

এখানে শনশন করে হাওয়া দিচ্ছে অনবরত। বেশ শীত-শীত ভাব। কাকাবাবু কোট পরে আছেন। কিন্তু টাক-মাথা লোকটার গায়ে শুধু পাতলা একটা সুতির জামা। সেটা এখন শুকিয়ে গেছে। তার হাত ও পা শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা, সে এল লাফাতে-লাফাতে, সন্তু তাকে পেছন থেকে ঠেলছে।

কাকাবাবু বললেন, "ওহে, তোমার নামটা আগে বলো, না হলে তোমাকে ডাকব কী করে ? কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া যেমন বলতে নেই, তেমনই ন্যাড়া-মাথা লোককে নেড়ু কিংবা টাক-মাথা লোককে টাকলু বলতে আমার খারাপ লাগে। কী নাম তোমার ?"

লোকটি উত্তর তো দিলই না, এমন ভাব দেখাল যেন শুনতেই পায়নি।

কাকাবাবু আবার বললেন, "খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই ? আমরা পেটপুরে খেলাম, আর তোমাকে খেতে দিইনি, এটা খুব খারাপ ব্যাপার। এক্ষুনি খাবার পাবে। তার আগে কয়েকটা কথার উত্তর দাও তো চটপট। সন্তু, ওর পা আর হাতের বাঁধন খুলে দে। দেখতে খারাপ লাগছে। হাত-বাঁধা থাকলে খাবে কী করে ?"

সন্তু ওর দড়ির বাঁধন খুলে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "এবারে লক্ষ্মী ছেলের মতন টেবিলের উলটো দিকের ওই চেয়ারটায় বোসো।"

কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে বললেন, "এটা দেখেছ তো ? পালাবার চেষ্টা করলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। সারাজীবন খোঁড়া থাকার যে কী কষ্ট, তা তো আমি জানি, তুমিও হাড়ে-হাড়ে টের পাবে। এবারে বলো তো, ম্যাজিশিয়ান মিস্টার এক্স কোথায় ?"

লোকটি চেয়ারে বসল, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

কাকাবাবু বললেন, "কেন সময় নষ্ট করছ ? তোমা:. কোনও ভয় নেই, কেউ

মারধর করবে না। সত্যি কথা বলো, একটু বাদেই ছাড়া পাবে। আমাদের সঙ্গে জোজো বলে যে ছেলেটি ছিল, তার কী হয়েছে? কে তাকে আটকে রেখেছে?”

লোকটি মুখ বুজে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর চোখের দিকে।

সন্তু বলল, “কাকাবাবু, লোকটি বোধ হয় বোবা। সেই যে টুল থেকে পড়ে গেল, আঃ উঃ কোনও শব্দ করেনি। ম্যাজিশিয়ানটা ওকে চড় মারল, তাও কিছু বলেনি।”

কাকাবাবু বললেন, “সত্যিকারের বোবা না হয়েও বোবা সেজে থাকতে পারে। বোবারা সাধারণত কানেও শোনে না। এর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আমার সব কথা শুনতে পাচ্ছে, বুঝতেও পারছে। মুখটা ফাঁক করে দ্যাখ তো, জিভটা কাটা কি না।”

সন্তু ওর মুখখানা ধরে ঠোঁট ফাঁক করে দিল, তাতে ও আপত্তি জানাল না। কটমট করে চেয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে।

জিভ কাটা নয়, ঠিকই আছে।

অলি খাবারের প্লেটটা রাখল টেবিলের ওপর। সে সেদিকে চেয়েও দেখল না।

কাকাবাবু বললেন, “কথা বলতে জানো না? লেখাপড়া জানো?”

তিনি কোটের পকেট থেকে নোটবই আর কলম বার করে লিখলেন, “ম্যাজিশিয়ান কোথায়?”

লেখাটা লোকটিকে দেখিয়ে নোটবই আর কলম এগিয়ে দিলেন। সে ওসব ছুঁল না।

সন্তু বলল, “এমন হতে পারে, বাংলা জানে না। ম্যাজিশিয়ানটা ইংরিজি বলছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “ম্যাজিশিয়ানের মুখ আমরা দেখিনি। কিন্তু এর মুখ দেখে বোঝা যায় না যে, পুরো বাঙালি? এ লোকটি আলবাত বাঙালি। ইচ্ছে করে কথা বলছে না।”

হঠাৎ লোকটি মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। অদ্ভুত শব্দ। ক্রমে শব্দটা জোর হতে লাগল আর সে দোলাতে লাগল মাথাটা।

কাকাবাবু বললেন, “এ আবার কী ব্যাপার?”

অলি দেওয়ালের এক কোণে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, “ভয় করছে, আমার ভয় করছে।”

লোকটি এবার সামনের দিকে ঝুঁকে চট করে একটা আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দিল কাকাবাবুর কপাল।

সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবুর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। তাঁর মাথাটা ঢলে পড়ল টেবিলের ওপর।

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এক ঝটকায় সন্তুকে ঠেলে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর দৌড়ে বেড়িয়ে গেল দরজা দিয়ে।

কিন্তু সে পালাতে পারল না। তার দুর্ভাগ্য, ঠিক তখনই অর্ক ফিরে এল গাড়ি নিয়ে। লোকটিকে পালাতে দেখে অর্ক লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তাড়া করল তাকে। ধরেও ফেলল। জড়াজড়ি করে দু'জনে পড়ে গেল মাটিতে। টাক-মাথা লোকটির গায়ের জোর বেশি, তবু নিজেকে ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করেও পারল না, অর্ক নানারকম কায়দা জানে, সে লোকটির একটা হাত পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে মোচড়াতে লাগল। গাড়ি থেকে কনস্টেবলটিও লাঠি নিয়ে পৌঁছে গেল সেখানে।

এর মধ্যে কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। তিনি হাহা করে হেসে উঠলেন। অর্ক যখন পলাতকটিকে ঠেলতে-ঠেলতে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল তখনও কাকাবাবু হাসছেন আর আপন মনে বলছেন, ব্যাটা হিপনোটাইজ করল আমাকে! অ্যাঁ? এটা হাসির কথা নয়। রাজা রায়চৌধুরীকেও কেউ হিপনোটাইজ করার সাহস পায়?

অর্ক বলল, "এ কী কাকাবাবু, আপনি ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলেন? আর একটু হলে পালাচ্ছিল!"

কাকাবাবু সে-কথা গ্রাহ্য না করে হাসিমুখে বললেন, "আমাকে হিপনোটাইজ করল? ঘুমিয়ে ছিলাম তো, ঘুম ভাঙার পরেও কিছুক্ষণ মাথার জড়তা কাটে না, তাই ও পেরেছে! এবার তো ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ওকে আবার চেয়ারে এনে বসাও!"

অর্ক সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "ও কিছু স্বীকার করেছে?"

সন্তু বলল, "একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।"

অর্ক লোকটির গালে সপাটে এক চড় কষিয়ে বলল, "ফের পালাবার চেষ্টা করবি?"

কাকাবাবু বললেন, "মেরো না, মেরো না। মারধর আমার পছন্দ হয় না। তবে ও যদি খোঁড়া হতে চায়, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আবার পালাবার চেষ্টা করলেই খোঁড়া হবে। আমার সামনে ওকে বসাও।"

অর্ক ওকে বসাল, হাত দুটো পেছনে মুড়ে বেঁধে দিল। কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "ওর নামও বলেনি? ব্যাটার মাথায় একটাও চুল নেই, দাড়ি গোঁফ নেই। ওর নাম দেওয়া হোক মাকুন্দ।"

কাকাবাবু বললেন, "মাকুন্দ শব্দটা শুনতে ভাল নয়। বরং বলা যাক তুবরক। ভীমের দাড়ি-গোঁফ ছিল না, তাই তার এক নাম ছিল তুবরক। ওহে তুবরক, তুমি তো আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিলে। আর-একবার করো দেখি! আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী, আমাকে তুমি চেনো না।"

অর্ককে বললেন, "তুমি পেছন থেকে সরে যাও। আমার ধারণা, ও-বিদ্যেটা

সারা দেশে আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। শিখেছিলাম লাদাখের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে। ও-বিদ্যে যখন-তখন ব্যবহার করতে গুরুর নিষেধ আছে। কিন্তু কেউ আমার ওপর ওটা চালাতে গেলে তাকে আমি ছাড়ি না।"

লোকটি এখনও কটমট করে তাকিয়ে আছে। কাকাবাবু তার মুখের সামনে একটা হাত ঘোরাতে লাগলেন, আর আস্তে-আস্তে বলতে লাগলেন, "তাকিয়ে থাকো, তাকিয়ে থাকো, আমি যা বলব তা শুনবে, আমি যা জিজ্ঞেস করব, তার উত্তর দেবে, তাকিয়ে থাকো, তাকাও আমার দিকে।"

লোকটির চোখ এবার একটু-একটু করে বুজে আসতে লাগল, তারপর পুরোটা বুজে গেল।

কাকাবাবু হুকুম দিলেন, "চোখ খোলো!"

লোকটি চোখ খুলল, কিন্তু চোখের তারা দুটি একেবারে স্থির। পলক পড়ছে না।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

লোকটি ধীরে-ধীরে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কেউ না? সে আবার কী? ম্যাজিশিয়ান এখন কোথায়?"

আবার সে মাথা নাড়ল দু'দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না। ম্যাজিশিয়ানটি কোথায় লুকিয়েছে, নিশ্চয়ই তুমি জানো, বলো সে কোথায়?"

লোকটি আবার দু'দিকে মাথা নাড়ল, তার মুখে ফুটে উঠল যন্ত্রণার রেখা।

কাকাবাবু এবার অন্যদের দিকে ফিরে বললেন, "এ-লোকটা বোবা নয়। কিন্তু কোনও কারণে ওর কথা বলার ক্ষমতাটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ওর মনের মধ্যে ঢুকতে পারছি না। খানিক বাদে ঠিক পারব, আচ্ছা দেখা যাক, মুখে বলতে না পারলেও ও লিখতে পারে কি না!"

কাগজ-কলম এগিয়ে দিয়ে কাকাবাবু লোকটিকে বললেন, "ওহে তুবরক, জোজো কোথায় আছে, এখানে লিখে দাও!"

অর্ক ওর হাতের বাঁধন খুলে দিল।

লোকটি কলমটি তুলে নিয়েও থেমে রইল।

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "লেখো!"

লোকটি এবার লিখতে শুরু করল। আঁকাবাঁকা অক্ষর। সবাই হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগল সে কী লেখে।

লোকটি একটু লিখেই কলম তুলে নিল। সে লিখেছে, মহিষ কালী।

কাকাবাবু বললেন, "এ আবার কী? এর কী মানে হয়? মহিষ কালী? ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? ঠিক করে লেখো, জোজো কোথায় আছে?"

লোকটি আবার গোটা-গোটা করে লিখল, "কক শেস বা জাড়।"

কাকাবাবু আবার বিরক্তভাবে বললেন, "এ কী অদ্ভুত কথা ? কোনও মানেই হয় না। বাংলা অক্ষরেই তো লিখেছ, এটা কী ভাষা ?"

লোকটির হাত থেকে কলমটা খসে গেল, মাথাটা নিচু হতে হতে ঢুকে গেল টেবিলে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে বা অজ্ঞান হয়ে গেছে !

কাকাবাবু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "এখন আর কিছু করা যাবে না। ওকে পাশের ঘরে শুইয়ে দাও !"

অর্ক দারুণ অবাক হয়ে বলল, "ওরকম একটা তেজি লোককে আপনি ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ? এরকমভাবে হিপনোটাইজ করা যায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখলেই তো যে যায় ! একটা হাতিকেও আমি ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি। বাঘকে পারব না। বাঘ আগেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে !"

অর্ক জিজ্ঞেস করল, "আমাকে পারবেন ? করুন তো !"

কাকাবাবু বললেন, "ওই ক্ষমতাটা নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই। একটু ভুল হলে আমি নিজেই মারা পড়ব !"

অর্ক মনের ভুলে পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বার করে ধরাতে গিয়ে কাকাবাবুকে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আবার পকেটে ভরে ফেলল।

কাকাবাবু বললেন, "তোমার সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস থাকলে খেতে পারো। আমার সামনে লজ্জার কিছু নেই। তবে, একটু দূরে বসে খেয়ো, ধোঁয়ার গন্ধটা আমার এখন খারাপ লাগে। এককালে নিজে খুব চুরুট খেতাম।"

অর্ক বলল, "না, এখন খাব না। জানেন কাকাবাবু, আমি এখানে খোঁজখবর নিয়ে বেশ কিছু অদ্ভুত খবর পেলাম। সেই মুখোশধারী ম্যাজিশিয়ানকে মেলার সময় কয়েকজন দেখেছিল, তারপর আর কেউ দেখেনি। আপনি ঠিকই শুনেছেন, সে একটা লঞ্চে থাকত। এখানে নাকি বাংলাদেশ, বার্মা থেকে কিছু-কিছু লঞ্চ সমুদ্রের ধার দিয়ে-দিয়ে প্রায়ই আসে। এখান থেকেও কিছু লঞ্চ ওইসব দেশে যায়। ভিসা, পাসপোর্টের কোনও ব্যাপার নেই। নানারকম জিনিসের চোরাচালান হয়। এদিকটায় পুলিশের তেমন নজর নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "এইদিক দিয়েই তো বড়-বড় বিদেশি জাহাজ কলকাতা আর হলদিয়া বন্দরে যায় ?"

অর্ক বলল, "হ্যাঁ, সেইসব জাহাজ থেকেও অনেক চোরাই জিনিসপত্র নামিয়ে দেয় এখানে। এই ব্যাপারে একটা রিপোর্ট করতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঘরে বসে থেকে কী হবে, চলো সবাই মিলে সমুদ্রের ধারটা একবার ঘুরে আসি।"

টাক-মাথা লোকটাকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে পাশের ঘরে।

প্রফুল্ল নামে একটা লোক বাংলোটা দেখাশুনো করে, তাকে ডেকে বলা হল, "দরজা বন্ধ করে রাখো। ওই লোকটার ওপর নজর রাখবে।"

টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী হিজিবিজি লিখেছে, মাথামুণ্ডু নেই! মহিষ কালী! মহিষের সঙ্গে কালীর কী সম্পর্ক? তারপর কক শেস বা জাড়, এটা তো মনে হচ্ছে বাংলাই নয়!"

কাগজটা কাকাবাবু পকেটে পুরে নিলেন।

অর্ক সন্তুর কাঁধে চাপড় মেরে বলল, "জোজোর অভাবে সন্তু একেবারে মুষড়ে পড়েছে। কোনও কথাই বলছে না!"

সন্তু ফ্যাকাসে ভাবে একটু হাসল।

কাকাবাবু বললেন, "সামনাসামনি যদি কোনও শত্রু আসে, তা হলে সন্তু জানে কী করে লড়াই করতে হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তো কে যে শত্রু তা বোঝাই যাচ্ছে না। জোজোর বদলে যদি সন্তুকে অদৃশ্য করে দিত, তা হলে আমার এত চিন্তা হত না। সন্তু ঠিক বেরিয়ে আসত!"

সমুদ্র এখান থেকে বেশি দূর নয়। গাড়িতে গিয়ে লাভ নেই, বালিতে চাকা বসে যাবে। সবাই হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল। ভাটার সময় সমুদ্রের জল অনেকটা সরে যায়। তখন কাদা থিকথিক করে। এখন জল বেশ কাছে। বালির ওপর দৌড়োদৌড়ি করছে অসংখ্য লালরঙের কাঁকড়া। সেগুলো এত ছোট যে, খাওয়া যায় না। এদের ধরাও বেশ শক্ত। একটু দূর থেকে মনে হয় যেন হাজার হাজার কাঁকড়া একটা কার্পেটের মতন বিছিয়ে আছে, কাছে গেলেই সব গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়। অলি দৌড়োদৌড়ি করে ধরবার চেষ্টা করল, একটাও পারল না।

তারপর সে এক জায়গায় বসে পড়ে বালি দিয়ে দুর্গ বানাতে লাগল।

কাকাবাবুও ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে, রুমাল পেতে বসে পড়লেন এক জায়গায়। বললেন, "একটু পরেই সূর্যাস্ত হবে। সেটা দেখে যাব।"

সন্তু বলল, "একটা লঞ্চ দেখা যাচ্ছে ওই যে!"

অর্ক বলল, "ওটা মাছ ধরার ট্রলার। সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। দূরের দিকে চেয়ে দ্যাখো, আরও দু-তিনটে লঞ্চ রয়েছে। ওগুলো কাদের কে জানে! এবার এদিকটায় টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

কিছু-কিছু জেলেদের নৌকোও রয়েছে। এক-একজন জেলে জাল কাঁধে নিয়ে ফিরছে। এক জায়গায় বালির ওপর কয়েকজন কাঠকুটো জ্বেলে গোল হয়ে বসে আছে। সন্তু সেইদিকে হেঁটে গেল।

অলি বেশ বড় একটা দুর্গ বানিয়েছে। তারপর আর-একটা কিছু বানাতে গিয়ে থেমে গিয়ে বিভোর হয়ে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। একসময় সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "অর্ককাকু, এই সমুদ্রে দ্বীপ আছে?"

অর্ক বলল, "হ্যাঁ। সুন্দরবনের দিকে অনেক দ্বীপ আছে। তারপর যদি

আন্দামান-নিকোবরের দিকে যাও, সেখানে কয়েক শো দ্বীপ !"

অলি বলল, "আমি একটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি।"

অর্ক বলল, "কই ? আমরা তো পাচ্ছি না !"

অলি বলল, "আমি মাঝে-মাঝে দেখছি, আবার দেখছি না। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে।"

অর্ক কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "এখান থেকে তো কোনও দ্বীপ দেখা যায় না ? ও দেখছে কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ও-মেয়েটা ওরকমই। আমরা যা দেখি, তার চেয়ে ও কিছুটা বেশি দ্যাখে। তাই নিয়ে ও নিজের মনে থাকে।"

পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেছে, সূর্য নেমে গেছে অনেক নীচে। সমুদ্রের জলেও লাল আভা। একটা বড় জাহাজ এগিয়ে আসছে গভীর সমুদ্রের দিক থেকে, সেটাকে মনে হচ্ছে ছবিতে আঁকা জাহাজ। ঝাঁক-ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে।

অর্ক বলল, "কাকাবাবু, একবার ওই কাগজটা আমাকে দিন তো !"

কাগজটা নিয়ে একদৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে সে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু অর্থ উদ্ধার করতে পারলে নাকি ?"

অর্ক বলল, "মহিষ কালী মানে কী তা আমি ধরতে পারছি না। কিন্তু অন্য লেখাটা যতবার উচ্চারণ করছি, একটা জায়গার নাম আমার মনে আসছে।"

কাকাবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, "তাই নাকি ? কী নাম বলো তো ?"

অর্ক বলল, "ধরা যাক লোকটা লেখাপড়া প্রায় কিছুই শেখেনি। যুক্তাক্ষর লিখতে জানে না। আপনি হিপনোটাইজ করেছিলেন, সেই ঘোরের মধ্যে অনেক বানান ভুল করেছে। এই সব ধরে নিলে অক্ষরগুলো নিয়ে একটা নাম তৈরি হয়। কক্সেসবাজার !"

কাকাবাবু বললেন, "কক্সেসবাজার ? সে তো বাংলাদেশের প্রায় শেষ প্রান্তে সমুদ্রের ধারে একটা ছোট শহর।"

অর্ক বলল, "কক্স সাহেবের নামে বাজার, তাই কক্সেসবাজার। কেউ-কেউ শুধু কক্সবাজারও বলে। যেমন আমাদের ফ্রেজারগঞ্জ !"

কাকাবাবু বললেন, "ওই তুবরক কি বলতে চায় যে জোজোকে কক্সেসবাজারে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে ?"

অর্ক বলল, "তাই তো বোঝায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাংলাদেশে কি মানুষ কম পড়েছে ? সেখানে শুধু-শুধু একটা সতেরো বছরের ছেলেকে নিয়ে যাবে কেন ? উদ্দেশ্যটা কী ?"

অর্ক বলল, "ঠিক বলেছেন, উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলে অন্য সব কিছু সহজ হয়ে যায়। উদ্দেশ্যটি বোঝা যাচ্ছে না।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, "দ্বিতীয় লেখাটা যদি কক্সেসবাজার হয়, তা হলে প্রথম লেখাটারও একটা মানে বার করা যায়। মহিষ কালী নয়, মহেশখালি! কক্সেসবাজারের কাছে মহেশখালি নামে একটা বড় দ্বীপ আছে আমি জানি। সেখানে একটা পুরনো মন্দির আছে। অনেকদিন আগে আমি গিয়েছিলাম। ওই অঞ্চলের লোকেরা 'খ'-কে 'ক'-এর মতন উচ্চারণ করে। মহেশ হয়ে গেছে মহিষ। মহেশখালি!"

অর্ক বলল, "তা হলে দুটোরই মানে হয়।"

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শিগগির চলো, ডাকবাংলোতে ফিরতে হবে। ওই লোকটাকে আরও জেরা করে কথা বার করতে হবে। সন্তু কোথায় গেল!"

অর্ক সন্তুর নাম ধরে জোরে-জোরে ডাকতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, "অলি, উঠে এসো, এবার আমাদের ফিরতে হবে।"

অলি বলল, "না, আমি এখন যাব না। আর- একটু থাকব।"

কাকাবাবু বললেন, "না, আর থাকা যাবে না। বাংলোতে যাওয়া খুব দরকার।"

অলি বলল, "তোমরা যাও, আমার এখানে খুব ভাল লাগছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে একলা রেখে যেতে পারি নাকি? লক্ষ্মী সোনা, চলো, আমরা কাল সকালে আবার আসব!"

অলি বলল, "এখনও অন্ধকার হয়নি, কত রং দেখা যাচ্ছে। সকালটা তো অন্যরকম!"

কাকাবাবু বাংলোয় ফেরার জন্য ছটফট করছেন। অলিকে বোঝানো যাচ্ছে না কিছুতেই। সন্তু কাছে এলে কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই অলির কাছে থাক। একটু পরেই চলে আসিস। বেশি দেরি করিস না।"

ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবু জোরে-জোরে হাঁটতে লাগলেন বাংলোর দিকে। গাড়িটা রয়েছে বাংলোর সামনে, ড্রাইভার আর কনস্টেবলটি ঘুমোচ্ছে তার মধ্যে।

বসবার ঘরে ঢুকেই অর্ক বলে উঠল, "এ কী!"

মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে প্রফুল্ল, তার মাথায় থকথকে রক্ত। অর্ক তার পাশে বসে পড়ে আস্তে-আস্তে তার শরীরটা উলটে দিল।

কাকাবাবু পাশের ঘরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "পাখি উড়ে গেছে!"

সে-ঘরের দরজা খোলা। টাক-মাথা লোকটা নেই। পড়ে আছে তার হাত-বাঁধা দড়িটা।

অর্ক প্রফুল্লর বুকে হাত দিয়ে বলল, "বেঁচে আছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে, কেউ ওর মাথায় ভারী কিছু জিনিস দিয়ে মেরেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ছি ছি, আমাদের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।"

অর্ক বলল, "টাকলুটাকে আমি নিজে হাত বেঁধেছি। সে-বাঁধন সে খুলবে কী করে ? নিশ্চয়ই আর একজন কেউ এসেছিল ওকে সাহায্য করতে।"

কাকাবাবু হঠাৎ অস্থিরভাবে বললেন, "অলি ! অলিকে রেখে এসেছি, ওর যদি কোনও বিপদ হয় ? এক্ষুনি যেতে হবে।"

অর্ক ড্রাইভার আর কনস্টেবলটিকে ডেকে তুলল। তাদের ধমকে বলল, "তোমরা এই সন্ধেবেলা পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিলে, ভেতরে কী কাণ্ড হয়ে গেল জানো না !"

তারা কাঁচুমাচু মুখে চুপ করে রইল।

কনস্টেবলটিকে রেখে যাওয়া হল প্রফুল্লকে দেখাশুনো করার জন্য। কাকাবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন।

সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। অলি ঠিক তার আগের জায়গাটাতেই বসে আছে। সেখানে সন্তু নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অলি, অলি, সন্তু কোথায় ?"

অলি আঙুল তুলে একটা দিকে দেখিয়ে বলল, "সন্তুকে ধরে নিয়ে যাবে !"

ডান দিকে, অনেকটা দূরে দুটি ছায়ামূর্তি দৌড়োদৌড়ি করছে। তাদের মধ্যে একজন সন্তু, অন্যজন বেশ লম্বা। ঠিক যেন চোর-চোর খেলছে। লম্বা মূর্তিটা একবার সন্তুকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলছে, সন্তু পেছনে সরে যাচ্ছে।

অলি বলল, "ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

কাকাবাবু অলিকে দেখেই নিশ্চিত হলেন, তার পাশে গিয়ে হাতটা ধরলেন। সন্তুর জন্য তাঁর চিন্তা নেই। ওইরকম ভাবে কেউ সন্তুকে ধরতে পারবে না। অন্য লোকটির গায়ে যতই জোর থাকুক, সন্তু দারুণ ক্ষিপ্র।

ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবু বালির ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতেও পারবেন না, অর্ক ছুটে গেল সেদিকে। কিন্তু বেশি ব্যস্ত হয়ে সে ভুল করে ফেলল। কাছে গিয়ে লোকটিকে ধরে ফেলা উচিত ছিল। একবার সেই লম্বা ছায়ামূর্তিটা সন্তুকে জাপটে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে দেখে অর্ক তার রিভলভার ওপরের দিকে তুলে গুলি ছুড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই মূর্তিটা সন্তুকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল জলের দিকে, সেখানে কয়েকটা মাছ-ধরা নৌকোর আড়ালে আর তাকে দেখা গেল না।

রিভলভার উঁচিয়ে অর্ক সেদিকে গিয়ে লোকটাকে খুঁজল। কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না কিছুতেই। সে কি জলে নেমে গেছে ? ওদের কাছে টর্চ নেই, এর মধ্যে আরও অন্ধকার হয়ে গেল।

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন অলির হাত ধরে। ওই লোকটা যে-ই হোক, সে অলিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। অথচ সেটাই সহজ ছিল। সন্তুকে ধরার চেষ্টা করছিল কেন ?

লোকটিকে খুঁজে না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে অর্ক আর সন্তু ফিরে আসবার পর অলি

খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "সন্তু, তুমি ইচ্ছে করে ধরা দিলে না কেন ? তা হলে বেশ ভাল হত ! জোজো যেখানে আছে, তোমাকেও সেখানে নিয়ে যেত। তোমরা দু'জনে বেশ একসঙ্গে থাকতে !"

॥ ৭ ॥

এর পর পাঁচদিন কেটে গেল, তবু জোজোর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। তার মুক্তিপণ দাবি করে কোনও চিঠিও এল না। জোজো যেন সত্যি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সার্কাসের ম্যানেজার জহুরুল আলম ধরা পড়ে গেছে বজবজের কাছে। তাকে অনেক জেরা করেও লাভ হল না কিছু। লোকটি জেদি ধরনের, চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলে। অনেক বছর ধরে সে সার্কাস চালাচ্ছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত পুলিশের খাতায় তার নাম ওঠেনি। সে বারবার বলতে লাগল, "আমার কাছে কত ছেলে এসে কাজ চায়, চাকরি চায়, আমি শুধু-শুধু একটা ছেলেকে লুকিয়ে রাখব কেন ?"

সার্কাসের অন্য লোকেরাও সাক্ষী দিল যে, ম্যাজিশিয়ান এক্স তাদের দলের কেউ নয়। সে একজন সহকারী নিয়ে কাকদ্বীপেই ম্যাজিক দেখাবার জন্য যোগ দিয়েছিল। সে কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না।

যে-লোকটি বাঘের খেলা দেখায়, তার জ্বর হয়েছিল। বাঘগুলোকে খাঁচায় ভরে লরিতে তোলার সময় তার উপস্থিত থাকার কথা, কিন্তু সে থাকতে পারেনি সেদিন। তার ধারণা, কেউ ইচ্ছে করেই একটা বাঘের খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছিল।

ঘুমপাড়ানি গুলি খাইয়ে কাবু করার পর সেই বাঘটাকে এখন রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িয়াখানায়। তাকে আর সার্কাস দলে ফেরত পাঠানো হবে না।

জোজোর বাবা ফিরে এসেছেন কাশী থেকে। সন্তু আশা করেছিল, তিনি একটা যজ্ঞিডুমুরে মন্ত্র পড়ে ছুড়ে দেবেন, অমনই সেটা গড়াতে- গড়াতে গিয়ে খুঁজে বার করবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। কাকাবাবু আর সন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করায় তিনি বললেন, "তোমাদের কোনও দোষ নেই। আমি জানতাম, এক সময় এরকম একটা কিছু হবেই। অনেকদিন ধরেই ওরা জোজোকে নিজেদের দলে ভেড়াবার চেষ্টা করছে। আমাকে জব্দ করার ফন্দি, বুঝলেন তো !"

কাকাবাবু খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা মানে কারা ? জোজোকে কারা আটকে রেখেছে আপনি জানেন ?"

জোজোর বাবা আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, "জানি। পুলিশের সাধ্য নেই তাকে খুঁজে বার করার। আমার সঙ্গেই ওদের বোঝাপড়া হবে।"

কাকাবাবু বিনীতভাবে বললেন, "ব্যাপারটা ঠিক কী আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন ? কারা এবং কীজন্য জোজোকে ধরে নিয়ে যাবে ?"

জোজোর বাবা বললেন, "নেপালের দিকে হিমালয়ে কালী মহিষানি নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে একদল সাধু থাকে, তাদের বলে হিঙ্গুরানি সম্প্রদায়। ওদের যে হেড, সেই দুসেরিবাবার সঙ্গে আমার একবার খুব তর্ক হয়েছিল। দুসেরিবাবার নামের মানে তিনি প্রত্যেকদিন দু' সের চাল, অর্থাৎ প্রায় দু'কেজি চালের ভাত খান। দু' কেজি চালে এইরকম পাহাড়ের মতন ভাত হয় থালার ওপর, তিনি অনায়াসে খেয়ে নিতেন, যদিও চেহারাটা রোগা পাতলা। সেই দুসেরিবাবার সঙ্গে আমার শাস্ত্র নিয়ে তর্ক হয়, তিনি হেরে যান। সেখানে অনেক পণ্ডিত ছিল, তাদের সামনে হেরে গিয়ে দুসেরিবাবা খুব অপমানিত বোধ করেন। তর্ক কিন্তু আমি শুরু করিনি। আমি তর্ক করতে ভালও বাসি না। সেই থেকে হিঙ্গুরানি সাধুরা আমার ওপর খুব চটে আছে। আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করছে। ওরাই জোজোকে ধরে রেখেছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "সেই হিমালয় থেকে সাধুরা এসে জোজোকে ধরবে কী করে ?"

জোজোর বাবা বললেন, "ওরা তো গঙ্গাসাগর মেলার সময় স্নান করতে আসে। কিছুদিন থেকে যায়। কাকদ্বীপের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে নিশ্চয়ই। তবে ওই সাধুরা খুনি নয়, জোজোকে মেরে ফেলবে না। সে ভয় নেই। আমাকেও ওখানে নিয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই সাধুদের আপনার ওপর রাগ আছে বুঝলাম। কিন্তু অন্য কোনও দলও তো জোজোকে ধরে রাখতে পারে !"

জোজোর বাবা হেসে বললেন, "একটা সতেরো বছরের ছেলেকে শুধু-শুধু কে ধরে রাখতে যাবে বলুন ! আমি বড়লোক নই, আমার কাছ থেকে টাকা-পয়সাও পাবে না। রায়চৌধুরীবাবু, আপনি চিন্তা করবেন না। জোজোকে আমিই ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করব।"

জোজোর মা অবশ্য এসব কথা মানছেন না। তিনি কান্নাকাটি শুরু করেছেন।

সে বাড়ি থেকে বেরোবার পর সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওই সাধুরা যেখানে থাকে, সেই জায়গাটার নাম কালী মহিষানি। টাক মাথা লোকটা লিখেছিল মহিষ কালী। দুটোতে মিল আছে না !"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ ! আর পরের লেখাটা !"

সন্তু বলল, "ওখানে ওই নামে কোনও বাজার থাকতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "সব গুলিয়ে যাচ্ছে। একদিকে হিমালয়, আর একদিকে বাংলাদেশের একটা ছোট শহর। । কক্সেসবাজারে একবার যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সেখানকার পুলিশ আমাকে চেনে না, তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য

পাব না...”

সন্তু বলল, “ম্যাজিশিয়ানের মুখে মুখোশ ছিল, সেটা খুলে ফেললে তাকে চেনবার কোনও উপায় নেই। আর তার অ্যাসিস্ট্যান্টের মাথায় একটাও চুল নেই, ভুরু নেই। সে যদি পরচুলা পরে নেয়, আর নকল ভুরু লাগায়, তা হলে তারও চেহারা একেবারে বদলে যাবে। এরা এখন আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ালেও বুঝতে পারব না।”

কাকাবাবু বললেন, “টাক-মাথা লোকটাকে পালাতে দেওয়াটা চরম ভুল হয়ে গেছে। ওর পেট থেকে আমি সব কথা বার করে আনতাম! চল, একবার অসীম দত্তর বাড়ি যাই। নতুন কোনও খবর পাওয়া যায় কি না!”

দরজা খুলে দিল অলি। কাকাবাবু আর সন্তুকে দেখে তার মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে পরে আছে একটা গোলাপি রঙের স্কার্ট, মাথার চুলে রিবন বাঁধা। চোখ গোল-গোল করে ফিসফিসিয়ে বলল, “কাকাবাবু, আমি জোজোকে আবার দেখেছি!”

কাকাবাবু বললেন, “তাই নাকি? কখন দেখলে? স্বপ্নে?”

অলি বলল, “না, জেগে-জেগে। একটা সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, একটু পরে হঠাৎ দেখতে পেলাম। একেবারে স্পষ্ট। এবারে জোজোকে চিনতেও পেরেছি।”

“কী করে চিনলে?”

“বাবার কাছে এখন জোজোর ছবি আছে। সেই ছবি আমি দেখেছি তো, ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।”

“কোথায় দেখলে? সেই অন্ধকার ঘরে?”

“না, না, এবার অন্য জায়গায়। সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপ, সেই দ্বীপে কোনও মানুষ নেই, একেবারে ফাঁকা, সেই দ্বীপের ঠিক মাঝখানে একটা মস্ত বড় বাড়ি, সাদা রঙের বাড়ি, অনেক ঘর, সেই বাড়ির একটা ঘরে রয়েছে জোজো!”

সন্তু হোহো করে হেসে উঠল।

অলি রাগ-রাগ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, “এই, তুমি হাসলে যে?”

সন্তু বলল, “তোমার নাম রূপকথা, তুমি সত্যিই নতুন-নতুন রূপকথা বানাও!”

অলি বলল, “তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?”

সন্তু বলল, “যে দ্বীপে একটাও মানুষ থাকে না, সেখানে অতবড় একটা বাড়ি কে বানাবে?”

অলি তবু জোর দিয়ে বলল, “কে বানিয়েছে জানি না, কিন্তু ওরকম বাড়ি সত্যিই আছে। আমি দেখেছি।”

সন্তু বলল, “সেখানে আর কেউ থাকে না। শুধু জোজো একা?”

অলি বলল, “জোজো ছাড়া আর কোনও লোক দেখিনি। জোজো ঘুমিয়ে

আছে।”

সন্তু মুচকি হেসে বলল, “ঘুমন্ত রাজপুত্তুর। সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি বদল করে তাকে জাগাতে হবে।”

কাকাবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “অলিদিদি, পৃথিবীতে অনেক সমুদ্র আছে। হাজার-হাজার দ্বীপ আছে। এই দ্বীপটা কোথায় বলতে পারো ?”

অলি আস্তে-আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, “না। তা জানি না। আমি দেখলাম ধু ধু করছে সমুদ্র, মাঝখানে একটা দ্বীপ—”

সন্তু বলল, “সমুদ্র কখনও ধু ধু করা হয় না। ধু ধু করা মাঠ, ধু ধু মরুভূমি হয়। বাংলাও জানো না !”

অলি বলল, “সমুদ্র তা হলে কী হয় ?”

সন্তু বলল, “বলতে পারো অকূল সমুদ্র। কিংবা, ‘জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল’ !”

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, “ওসব কথা এখন থাক। অলি, এক কাপ চা খাওয়াতে পারো ?”

এই সময় অসীম দত্ত ঘরে এসে বললেন, “অলি তোমাদের সেই স্বপ্ন দেখার গল্পটা বলেছে ? এ-মেয়েটাকে নিয়ে যে কী করি ! জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখে !”

কাকাবাবু বললেন, “ভালই তো। কত লোক স্বপ্ন দেখে মনেই রাখতে পারে না ! অসীম, আর কোনও খবর পেলে ?”

অসীম দত্ত বললেন, “সেরকম কিছু না। বীরভূমে ইলামবাজারের কাছে দুটো লোক একটা ছ’ বছরের ছেলেকে চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পাড়ার লোক ওই লোক দুটোকে পিটিয়ে প্রায় মেরেই ফেলত, পুলিশ এসে পড়ায় প্রাণে বেঁচে গেছে। সে-দুটো সাধারণ ছিঁচকে চোর, এর আগেও জেল খেটেছে। এরা কি একই দলের হতে পারে ?”

কাকাবাবু বললেন, “মনে হয় না। এরকম তো প্রায়ই শোনা যায়।”

অসীম দত্ত বললেন, “তুমি যদি চাও, লোকদুটোকে কলকাতায় আনাতে পারি। তুমি জেরা করে দেখতে পারো। কিংবা, তুমি বীরভূমে যাবে ?”

কাকাবাবু বললেন, “ওদেরই বরং কলকাতায় আনাও।”

তারপর চা খেতে-খেতে কিছুক্ষণ গল্প হল। এক সময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

অসীম দত্ত রিসিভার তুলে বললেন, “ইয়েস, অসীম দত্ত স্পিকিং... কে ? সিরাজুল চৌধুরী ? কী খবর সিরাজুল, অনেক দিন পর... কার ছেলে ? কী হয়েছে ? ...কবে হল ? ...ডিটেইল্‌স দাও তো... ভেরি স্ট্রেঞ্জ, আমাদের এখানেও এরকম হয়েছে...”

প্রায় দশ মিনিট কথা বলার পর অসীম দত্ত টেলিফোন ছাড়লেন। কাকাবাবুর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, “অদ্ভুত, অদ্ভুত ! কে

ফোন করেছিল জানো ? সিরাজুল চৌধুরী, আমার অনেকদিনের বন্ধুমানুষ, বাংলাদেশের পুলিশের একজন বড়কর্তা, সে আমাকে একটা অনুরোধ জানাল। ব্যাপার হয়েছে কী, ঠিক জোজোর মতনই বাংলাদেশে একটি ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "তার বয়েস কত ?"

অসীম দত্ত বললেন, "সতেরো বা আঠেরো। একজন বড় ব্যবসায়ীর ছেলে, লেখাপড়াতেও ভাল। ব্যাপারটা নিয়ে ওখানে খুব হইচই পড়ে গেছে। ছেলেটির নাম রশিদ হায়দার, ডাকনাম নিপু।"

"কী করে অদৃশ্য হল ?"

"ওই একই ভাবে। চট্টগ্রাম শহর থেকে খানিকটা দূরে এক জায়গায় ম্যাজিক দেখানো হচ্ছিল। মানুষ অদৃশ্য করার ম্যাজিক। ওই নিপু বিজ্ঞানের ছাত্র, সে বিশ্বাস করেনি। উঠে গিয়ে বলেছিল, আমাকে অদৃশ্য করুন দেখি। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে সে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর ফিরে আসেনি।"

"সেই ম্যাজিশিয়ানের মুখে মুখোশ ছিল ?"

"সেটা জিজ্ঞেস করিনি। পরের দিন যখন ছেলেটির খোঁজ পড়ল, ততক্ষণে ম্যাজিশিয়ান তাঁবু গুটিয়ে সরে পড়েছে। ছেলেটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না, ম্যাজিশিয়ানও ধরা পড়েনি।"

"তোমাকে ফোন করে জানাল কেন ? তোমার কাছে পরামর্শ চাইছে ?"

"না, তা নয়। সিরাজুলের ধারণা, ওই ম্যাজিশিয়ানটি ইন্ডিয়ান। কিংবা তা যদি নাও হয়। ওই ছেলেটাকে স্মাগ্‌ল করে পশ্চিমবাংলায় আনা হয়েছে। একদল ক্রিমিনাল বাংলাদেশ থেকে ছেলেমেয়েদের ধরে-ধরে পশ্চিমবাংলায় নিয়ে আসে। এখানকার কিছু ক্রিমিনালদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে। সেইসব ছেলেমেয়ে এখান থেকে বম্বে নিয়ে গিয়ে আরব দেশে পাচার করে দেয়।"

"হ্যাঁ, এরকম শুনেছি। কিন্তু সে তো ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে যায়। ওখানে গিয়ে ভিক্ষে করায় কিংবা উটের পিঠে চাপিয়ে দৌড় করায়।"

"বড়-বড় ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে গিয়ে ধনী শেখদের বাড়িতে কাজ করায়। একবার কোনও বাড়িতে ঢুকলে আর বেরোতে পারে না। এরকম ক্রিমিনালদের গ্যাং আগে এখানে ধরাও পড়েছে। সিরাজুল আমাকে অনুরোধ করল, যে-কোনও উপায়ে নিপুকে খুঁজে বার করতেই হবে। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, জোজোকেও আরব দেশে পাঠিয়ে দেয়নি তো ?"

অলির দিকে তাকিয়ে সন্তু বলল, "ধু ধু করছে মরভূমি, তার মধ্যে একটা সাদা বাড়ি, এটা হতেও পারে।"

অলি জোর দিয়ে বলল, "না, আমি সমুদ্রই দেখেছি !"

কাকাবাবু বললেন, "কালই আমি চট্টগ্রাম যাব। তুমি সিরাজুল চৌধুরীকে

একটা খবর দিয়ে দাও !"

অসীম দত্ত বললেন, "তুমি চট্টগ্রামে গিয়ে কী করবে ? বরং ওই ক্রিমিনালদের একটা ঘাঁটি আছে দমদমের দিকে, খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে একবার রেড করে দেখলে হয় ।"

কাকাবাবু বললেন, "সেসব কাজ তুমি করো । আমি চিটাগাং একটু বেড়িয়ে আসি । অনেকদিন বাংলাদেশে যাইনি । সন্তুও যাবে আমার সঙ্গে ।"

অলি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আমিও যাব !"

অসীম দত্ত বললেন, "এই রে !"

কাকাবাবু সস্নেহে অলির মাথায় হাত রেখে বললেন, "সেখানে তো তোমায় নিয়ে যাওয়া যাবে না । সেটা অন্য দেশ, সেখানে যেতে পাসপোর্ট, ভিসা লাগে ।"

অলি ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা সরিয়ে নিয়ে বলল, "ওসব জানি না । আমি যাবই । জানি, কাকাবাবু ওখানে জোজোকে খুঁজতে যাচ্ছেন !"

কাকাবাবু বললেন, "শোনো, শোনো অলি, জোজোর বাবা বলেছেন তিনিই জোজোকে খুঁজে বার করবেন । আমাদের আর দায়িত্ব নেই । বাংলাদেশে আমি বেড়াতেই যাচ্ছি ।"

অলি বলল, "ওসব আমি বুঝি । আমাকে ঠকানো হচ্ছে । আমার পাসপোর্ট করে দাও, আমি যাব !"

অসীম দত্ত বললেন, "কী পাগলামি করছিস অলি ? পাসপোর্ট কি সহজে হয় নাকি ? অনেকদিন লাগে । শুধু-শুধু জেদ করে লাভ নেই ।"

এবার অলির চোখে জল এসে গেছে । সে বলল, "ওই সন্তুর পাসপোর্টটা আমাকে দিয়ে দাও । ও যাবে না, ওর বদলে আমি যাব ।"

অসীম দত্ত আর সন্তু হেসে উঠল ।

অসীম দত্ত বললেন, "সব পাসপোর্টে ছবি থাকে । অন্যের পাসপোর্ট নিয়ে গেলে কী হয় জানিস না ? পুলিশ ক্যাঁক করে ধরে জেলে পুরে দেবে ।"

অলি বলল, "স্মাগলাররা যে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসে, তাদের তো পাসপোর্ট থাকে না ? আমিও সেইভাবে যাব !"

অসীম দত্ত বললেন, "আরে স্মাগলাররা বেআইনি কাজ করে, আমরা কি তা করতে পারি ? অবুঝ হোসনি লক্ষ্মীটি !"

অলি এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ।

কাকাবাবুর তা দেখে খুব কষ্ট হল । তিনি বললেন, "অলি, এবারে সত্যিই তোমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । তবে, আমি কথা দিচ্ছি, এর পর আমি যেখানে যাব, তোমাকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব । তোমার বাবাকে বলে দিচ্ছি, এর মধ্যে তোমার পাসপোর্ট করিয়ে রাখবে ।"

অলি এক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলল, "অকূল সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ, তার মাঝখানে একটা সাদা বাড়ি..."

॥ ৮ ॥

দুপুরের মধ্যেই ভিসা আর টিকিট হয়ে গেল, সন্ধেবেলা প্লেন। মোটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে কলকাতা থেকে চিটাগাং যেতে। ছোট্ট এয়ারপোর্ট, সেখানে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছেন সিরাজুল চৌধুরী। বেশ বড়সড় চেহারা, নাকের নীচে মোটা গোঁফ, দেখলেই জবরদস্ত পুলিশ অফিসার বলে মনে হয়।

তিনি কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "আসুন, আসুন রায়চৌধুরী সাহেব। এই প্রথম চিটাগাং এলেন, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম!"

কাকাবাবু বললেন, "আগেও এসেছি, কেউ জানতে পারেনি। এবারেও কাউকে জানাবেন না। এই আমার ভাইপো সন্তু!"

সিরাজুল সাহেব বললেন, "আমি বই-টই বিশেষ পড়ি না। তবে আমার ছেলেমেয়েরা আপনাদের কথা জানে। তারা এই সন্তুর খুব ভক্ত। তারা ঢাকায় আছে, একদিন আমাদের বাড়িতে যেতে হবে।"

গাড়িতে ওঠার পর তিনি আবার বললেন, "নিপুর কোনও খোঁজ পেলেন? আমার দৃঢ় ধারণা, তাকে কলকাতাতেই নিয়ে গেছে। বম্বেতেও চালান করে দিতে পারে। ও, আপনারা তো এখন বম্বেকে মুম্বই বলেন তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "অসীম দত্ত সেসব ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। কক্সেসবাজার যাব, সেখানে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে?"

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, "অনেক জায়গা আছে। সুন্দর ব্যবস্থা। গিয়ে দেখবেন, সে-শহরের কত বদল হয়ে গেছে। এখানেও আপনাদের জন্য গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করেছি। অসীম যদি নিপুকে উদ্ধার করে ফেরত পাঠাতে পারে, তবে বড়ই কৃতজ্ঞ হব। এখানে আপনারা যা সাহায্য চান, পাবেন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "যে ম্যাজিশিয়ানের খেলা দেখতে গিয়ে নিপু নামের ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার মুখে কি মুখোশ ছিল?"

সিরাজুল সাহেব চমকে উঠে বললেন, "আপনি জানলেন কী করে? হ্যাঁ, সে একটা মুখোশ পরে ছিল, অনেকটা কমিকসের ফ্যান্টমের মতন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তার একজন সহকারী ছিল কি, যার মাথায় একটাও চুল নেই, ভুরুও নেই!"

সিরাজুল সাহেব বললেন, "সেরকম কিছু রিপোর্ট পাইনি। সহকারীর কথা কেউ বলেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকে আর কোনও ছেলে হারাবার খবর পাওয়া গেছে কি?"

সিরাজুল সাহেব বললেন, "দেশে এত মানুষ, কিছু-কিছু হারিয়ে যায়, সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেকে পুলিশে খবরও দেয় না।"

কাকাবাবু বললেন, "তবে ম্যাজিক দেখিয়ে সতেরো-আঠারো বছরের ছেলেদের উধাও করার মধ্যে বেশ নতুনত্ব আছে, তাই না ?"

সিরাজুল সাহেব বললেন, "চোরেরা এই কায়দাটা কেন নিয়েছে জানেন ? রাস্তাঘাট থেকে ছেলে-মেয়ে চুরি করতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। আর ধরা পড়লেই লোকের হাতে মার খেতে-খেতে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। ম্যাজিক দেখিয়ে অদৃশ্য করলে সে ভয় নেই। লোকে ভাববে ম্যাজিকের খেলা, একটু পরে ফিরে আসবে। কিংবা ছেলেটা ইচ্ছে করে লুকিয়ে আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছেন। এইজন্যই বাচ্চাদের বদলে বড় বয়েসের ছেলেদের নিচ্ছে, যারা ইচ্ছে করে লুকিয়ে থাকতে পারে। যাদের নিয়ে কেউ প্রথমেই বেশি চিন্তা করে না।"

কথা বলতে-বলতে গাড়িটা পৌঁছে গেল গেস্ট হাউসে। বড়-বড় গাছপালায় ঘেরা সেই বাড়িটিকে বাইরে থেকে দেখাই যায় না। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার পর সামনে চওড়া বারান্দা, পাশাপাশি অনেক ঘর।

সিরাজুল চৌধুরী লোকজনদের ডেকে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। কাকাবাবুকে বললেন, "আপনাদের এখানে কোনও অসুবিধে হবে না, যা দরকার হয় চাইবেন। রায়চৌধুরী সাহেব, আপনার সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে পারলে আমার ভাল লাগত খুব। কিন্তু তার উপায় নেই, আমায় কালই ঢাকায় যেতে হবে বিশেষ কাজে। আমার দু'জন অফিসার আপনাদের দেখাশুনো করবে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আপনি ব্যস্ত মানুষ আমি জানি। আমাদের দেখাশুনো করবার দরকার নেই। শুধু কক্সেসবাজারে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দিলেই হবে। আমি মহেশখালির পুরনো মন্দিরটা একবার দেখতে যাব।"

সিরাজুল চৌধুরী বললেন, "কাল সকালেই আপনাদের জন্য একটা গাড়ি আসবে। সে-গাড়িটা যতদিন খুশি সঙ্গে রাখবেন। সব জায়গায় নিয়ে যাবে।"

সিরাজুল সাহেব চলে যাওয়ার পরই গেস্ট হাউসের ম্যানেজার দু'টি বড়-বড় প্লেটে ভর্তি নানারকম খাবার নিয়ে এলেন। তাতে কচুরি-শিঙাড়া থেকে শুরু করে অনেকরকম কেক-পেস্ট্রি সাজানো রয়েছে।

সন্তু বলল, "এত খাবার কী করে খাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাংলাদেশের মানুষরা খুব খাওয়াতে ভালবাসে। কাল থেকে দেখবি, যার সঙ্গে আলাপ হবে, সে-ই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে চাইবে। কারও বাড়িতে নেমন্তন্ন মানেই পাঁচ-ছ'রকমের মাছ আর তিন-চাররকমের মাংস থাকবেই।"

সন্তু শুধু একটা শিঙাড়া তুলে নিয়ে কামড় দিল। তার মনে হল, জোজো

খেতে ভালবাসে, সে এখানে থাকলে খুশি হত ! জোজোকে এদিকে কোথাও ধরে রেখেছে, না আরব দেশে পাচার করে দেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে ? কিংবা সে আছে হিমালয়ে ?

হঠাৎ সন্তুর চোখদুটো জ্বালা করে উঠল। জোজো কি চিরকালের মতন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ?

রাত্তিরবেলা ডিনারের সময়ও প্রচুর খাবার দেওয়া হল। কাকাবাবু বা সন্তু কেউই বেশি খেতে পারে না। জোজোর কথা বেশি করে মনে পড়ায় সন্তুর আজ কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।

গেস্ট হাউসটাতে অনেক ঘর, কিন্তু আর কোনও ঘরে লোক নেই। কর্মীরা থাকে পেছনের দিকে। রাস্তায় কোনও গাড়িঘোড়ার শব্দও শোনা যায় না। দশটার মধ্যে চতুর্দিক একেবারে সুনসান।

কাকাবাবু বারান্দাটা একবার ঘুরে দেখে নিয়ে ঘরে এসে ভাল করে দরজা বন্ধ করলেন। রিভলভারটা বালিশের নীচে রেখে বললেন, "রাতটা একটু সাবধানে থাকিস সন্তু। রাত্তিরে কিছুতেই ঘরের বাইরে যাবি না।"

আলো নিভিয়ে দেওয়ার পর সন্তুই ঘুমিয়ে পড়ল আগে।

সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল কিছু একটা ঠাণ্ডা জিনিসের ছোঁয়ায়। তার কপালে কেউ যেন এক চাঙড় বরফ রেখেছে। সে সেখানে হাত দিতেই টের পেল, বরফ নয়, কারও হাত। অসম্ভব ঠাণ্ডা, মানুষের হাত এত ঠাণ্ডা হতে পারে না। তারপরই একটা ঘ-র-র ঘ-র-র শব্দ পেল। তার শিয়রের কাছে একজন কেউ দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখদুটো ঠিক টর্চের আলোর মতন জ্বলছে। ঘরের দরজা বন্ধ, তবু এই লোকটা কী করে ঢুকল ? মানুষ নয়, ভূত ? ধুত ! সন্তু ভূত বিশ্বাস করে না। ভূত বলে কিছু নেই। তবে কি অন্য গ্রহের প্রাণী ? তাই-ই হবে নিশ্চয়ই, মানুষের চোখ ওইরকম ভাবে জ্বলে না।

এইবার সেই প্রাণীটা সন্তুর হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। তার হাতে অসম্ভব জোর। সন্তু ছাড়িয়ে নিতে পারল না নিজেকে। কাকাবাবুকে সে ডাকতেও পারছে না, গলা শুকিয়ে গেছে।

সেই প্রাণীটা তাকে দরজার কাছে নিয়ে যেতেই দরজাটা খুলে গেল আপনা থেকে। বাইরে এসে সন্তু দেখল, বারান্দার নীচে বাগানে বনবন করে ঘুরছে একটা আলোর মালা। তার নীচে একটা পালকির মতন জিনিস, ভেতরে বসার জায়গা, তা-ও অনেক রঙের আলো দিয়ে সাজানো। এটা কি একটা ছোট্ট হেলিকপ্টার, না মহাকাশযান ?

এবার সেটার পেছন থেকে বেরিয়ে এল সেই টাক-মাথা লোকটা। সারা গায়ে চকচকে কোনও ধাতুর পোশাক, মুখটা শুধু বেরিয়ে আছে। এরও চোখ জ্বলজ্বল করছে। ও, এ-লোকটাও তা হলে মহাকাশের প্রাণী ?

সে হাতছানি দিয়ে সন্তুকে ডাকল।

সন্তু এবার চেঁচিয়ে উঠল, "না, যাব না ! আমি যাব না !"

অন্য প্রাণীটা সন্তুকে টানতে লাগল, সন্তু নিজেকে ছাড়াতে পারছে না, ছটফট করছে...

এই সময় তার স্বপ্নটা ভেঙে গেল। তবু বুঝতে সময় লাগল কিছুটা। সত্যি স্বপ্ন ? হ্যাঁ, সে বিছানাতেই শুয়ে আছে, ঘরের দরজা বন্ধ। অন্ধকার কিছুটা পাতলা হয়ে গেছে, ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

এরকম একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখার কোনও মানে হয় ? সন্তু বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এখনও তার বুক ধকধক করছে।

ভয় পাওয়ার জন্য এখন তার লজ্জা হল। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেও আর তার ঘুম এল না। টাক-মাথা লোকটাকে সে অন্য গ্রহের প্রাণী বলে দেখল কেন স্বপ্নে ? সেরকম কেউ এলে মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নাকি ? তবে লোকটার হাবভাব বেশ অস্বাভাবিক ঠিকই। বোবা সেজে ছিল। কিন্তু সে বাংলা লিখতে পারে, যতই ভুলভাল বানান হোক !

ক্রমে ভোর হয়ে এল, পাখি ডাকতে লাগল। এখানে অনেক পাখি। জানলা দিয়ে ভোরের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়ায় সন্তু দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। সকালটা কী সুন্দর। এখনও আর কেউ জাগেনি। কাল সন্ধের পর এখানে এসেছে বলে বোঝা যায়নি। এখন দেখা গেল বাগান-ভর্তি নানা জাতের ফুল। অনেক ফুল সন্তু চেনেই না। দুটো হলুদ পাখি এক গাছ থেকে আর-এক গাছে উড়ে গেল।

এইসব সুন্দর দৃশ্য দেখতে-দেখতে রাত্তিরের দুঃস্বপ্নটা আস্তে-আস্তে মুছে গেল সন্তুর মন থেকে। কাকাবাবু জেগে ওঠার পর তাঁকে কিছুই বলল না।

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার টেবিলে বসতেই একটা গাড়ি এসে থামল। তার থেকে নেমে এল দু'জন তরুণ অফিসার। কাছে এসে একজন বলল, "আসসালামু আলাইকুম।" আর-একজন বলল, "নমস্কার।" একজনের নাম মুস্তাফা কামাল, আর-একজনের নাম তথাগত বড়ুয়া।

তথাগত বলল, "সার, আপনারা কোথায় যেতে চান বলুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাব। এখানে আশপাশে অনেক দেখবার জায়গা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আপাতত কক্সেসবাজার যেতে চাই। ফেরার পথে চট্টগ্রাম ঘুরে দেখব।"

তথাগত বলল, "তা হলে কামাল আপনার সঙ্গে যাবে। ওটা ওর এলাকা। কাল রওনা হবেন, আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে দু'টি ডাল-ভাত খেতে হবে।"

কামাল বলল, "দুপুরে আমার বাড়িতে। আমার স্ত্রী বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছেন আপনাদের।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব খাওয়াদাওয়া পরে হবে, আগে বরং কক্সেসবাজার

ঘুরে আসি। এখনই বেরিয়ে পড়তে চাই।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে কাকাবাবু ও সন্তু গাড়িতে চড়ে বসল।

চট্টগ্রাম শহরটি বড় মনোহর। ছোট-ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কর্ণফুলী নদী, কাছেই সমুদ্র। সেসব কিছুই দেখা হল না, গাড়িটা একটু পরেই শহর ছাড়িয়ে পড়ল ফাঁকা রাস্তায়।

সন্তু কাকাবাবুর এত ব্যস্ততার কারণ বুঝতে পারল না। কক্সেসবাজার যাওয়া হচ্ছে তো অনেকটা আন্দাজে। টাক-মাথা লোকটা লিখেছিল, মহিষ কালী, সেটা যদি কালী মহিষানি হয়, তা হলে যাওয়া উচিত ছিল হিমালয়ে। কিংবা ওই লোকটা কাকাবাবুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য হিজিবিজি কিছু একটা লিখে দিয়েছে।

রাস্তা বেশ মসৃণ, গাড়িটাও বিদেশি। যাওয়া হচ্ছে আরামে। কাকাবাবু কামালকে জিজ্ঞেস করছিলেন তার বাড়ি কোথায়, কতদিন হল সে চাকরিতে ঢুকেছে, এইসব। এক সময় বললেন, "আচ্ছা কামাল, আমি শুনেছিলাম চিটাগাং-এর লোক এমন ভাষায় কথা বলে, যা বাইরের লোক প্রায় কিছুই বুঝতে পারে না। এমনকী ঢাকার লোকেরাও বুঝতে পারে না। কিন্তু তোমার কথা তো সব ঠিকঠাক বুঝতে পারছি।"

কামাল হেসে বলল, "আমরা বাইরের লোকের সঙ্গে আজকাল সে-ভাষায় কথা বলি না। নিজেদের মধ্যে বলি। সে-ভাষা শুনলে সত্যিই আপনারা বুঝতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "একটুখানি শোনাও তো।"

কামাল ফরফর করে কী খানিকটা বলল, তার একবর্ণও বোঝা গেল না! কাকাবাবু বললেন, "শুনে তো মনে হল বার্মিজ!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কক্সেসবাজার জায়গাটাকে এখানকার লোক কী বলে?"

কামাল বলল, "কেউ বলে ককস্যাসবাজার, কেউ বলে, কক্‌শোবাজার।"

সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "আর মহেশখালিকে কী বলে?"

কামাল বলল, "আমরা মহেশখালিই বলি। ড্রাইভারসাহেব কী বলেন দেখা যাক। ও ড্রাইভারসাহেব, আপনি মহেশখালি গেছেন?"

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কী কইলেন সার? মইশকালি? হ, গেছি। লঞ্চে যাইতে হয়।"

সন্তু কাকাবাবুর দিকে আড়চোখে তাকাল। কাকাবাবু বললেন, "চট্টগ্রাম শহরটার নামও কত বদলে গেছে। কেউ বলে চাটগাঁ, সেটা তবু বোঝা যায়। কিন্তু চিটাগাং শুনলে মনে হয় অন্য নাম। হয়তো আগে চিটাগাং-ই নাম ছিল, তার থেকে শুদ্ধ করে চট্টগ্রাম বানানো হয়েছিল।"

কামাল বলল, "এই রাস্তাটা ধরে সোজা গেলে বার্মা পৌঁছনো যায়।

টেকনাফ বলে আমাদের একটা জায়গা আছে, তার পরেই বার্মার বর্ডার।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন আর বার্মা বলা যাবে না। নতুন নাম হয়ে গেছে মায়ানমার। কত নামই যে বদলে যাচ্ছে! ভাগ্যিস কলকাতার নামটা বদলায়নি!"

রাস্তার দু'ধারে মাঝে-মাঝে ঘন জঙ্গল। কখনও যেতে হচ্ছে দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। মধ্যে-মধ্যে ছোট-ছোট গ্রাম। রাস্তা দিয়ে যেসব মানুষজন যাচ্ছে, তাদের অনেকের চেহারা বার্মিজদের মতন।

কক্সবাজার পৌঁছবার মুখে এক জায়গায় কামাল বলল, "ওই দেখুন সমুদ্র!"

রাস্তাটা সেখানে বেশ উঁচু, সেখান থেকে নীল সমুদ্র দেখা যায়। তারপর রাস্তাটা নিচু হয়ে শহরে ঢুকে গেছে। কাকাবাবু বললেন, এ-শহরটা যে চেনাই যায় না! আমি দশ-বারো বছর আগে এসেছিলাম, তখন ছিল নিরিবিলি ছিমছাম শহর। এখন কত বড়-বড় বাড়ি।"

কামাল বলল, "হ্যাঁ, লোক অনেক বেড়ে গেছে। অনেক টুরিস্ট আসে তাই প্রচুর হোটেল হয়েছে, আরও বানানো হচ্ছে।"

গাড়ি এসে থামল একটা টুরিস্ট লজে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে তৈরি, দু'পাশে বাগান, কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই। ঘরের জানলা দিয়ে সমুদ্র চোখে পড়ে। বেলাভূমিতে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জিনিসপত্র ঘরে রেখে দেওয়ার পর কামাল বলল, "কাকাবাবু, আপনি মহেশখালির মন্দির দেখতে যাবেন বলেছিলেন। আপনাদের জন্য স্পিড বোট রেডি আছে। কখন যেতে চান বলুন?"

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "এখন সওয়া দশটা। দুপুরটা কী করব? এখনই ঘুরে আসা যাক না!"

কামাল বলল, "অনেকটা সময় লাগবে কিন্তু। দুপুরে খেতে বেশ দেরি হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "একদিন না হয় দেরিতেই খাব। না খেলেই বা ক্ষতি কী! কী বলিস সন্তু?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, এক্ষুনি যাব।"

কাকাবাবু কামালের কাঁধ চাপড়ে বললেন, "তোমাকেও আজ না খাইয়ে রাখব।"

কামাল হেসে বলল, "আমার অভ্যাস আছে।"

আবার বেরিয়ে পড়া হল। যাওয়ার পথে একটা দোকানে বেশ পুরুষ্টু চেহারার সোনালি রঙের মর্তমান কলা দেখে কাকাবাবুর খুব পছন্দ হয়ে গেল, কিনে নিলেন এক ডজন।

পাকা জেটি এখনও তৈরি হয়নি, একটা সরু লম্বা কাঠের পুলের দু'ধারে অনেক নৌকো, স্পিড বোট, ছোটখাটো লঞ্চ বাঁধা রয়েছে। কোনও-কোনওটা

কাদার ওপর। ভাটার সময় বলে জল নেমে গেছে। জায়গাটায় খুব মাছ-মাছ গন্ধ।

পুলটার একেবারে শেষপ্রান্তে একটা স্পিড বোটে চাপল ওরা। চালকটি ঘুমোচ্ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসে সেলাম দিয়ে বলল, "সার, আমার নাম আলি।"

লোকটির চেহারাটি ছোট্টখাট্টো হলেও বেশ একটা চটপটে ভাব আছে। মুখখানা হাসি মাখা। তাকে পছন্দ হয়ে গেল কাকাবাবুর। চালক পছন্দ না হলে কোনও গাড়িতে চেপেই সুখ নেই।

ভট-ভট শব্দ করে স্পিড বোটটা চলতে শুরু করল। প্রথম থেকেই বেশ জোরে। সাঁ-সাঁ করে জল কেটে ছুটছে, মাঝে-মাঝে বড় ঢেউ এলে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে।

কাকাবাবু বললেন, "কী রে সন্তু, আগে কখনও স্পিড বোটে চেপেছিস?"

সন্তু প্রথমে বলল, "না।" তারপর বলল, "ও হ্যাঁ, একবার সুন্দরবনে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো নদীতে। সেখানে এরকম বড়-বড় ঢেউ তো নেই। আমি কখনও সমুদ্রে স্পিড বোটে ঘুরিনি।"

সন্তু বলল, "সিনেমায় দেখেছি।"

কাকাবাবু কামালকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বোট কি কখনও উলটে যেতে পারে?"

কামাল বলল, "সহজে ওলটায় না।"

"কখনও কঠিন অবস্থায় পড়লে উলটে যায়?"

"তা যায়। ঝড়-বাদলের সময় বেশি ভয় থাকে।"

"উলটে গেলে কী হয়? যাত্রীরা প্রাণে বাঁচে?"

"দেখুন, খানিকটা তো রিস্ক থাকেই। তবে, এই বোট উলটে গেলেও ডুবে যায় না। আবার সোজা করে নেওয়া যায়। ততক্ষণ সাঁতার কেটে থাকতে হয়।"

"যদি কেউ সাঁতার না জানে?"

"তা হলে তো খুব বিপদ। আমাদের এদিকে সব লোকই সাঁতার জানে। আপনি জানেন না?"

"সাঁতার তো জানি। কিন্তু সমুদ্রে সাঁতার কাটা কি সহজ কথা? খোঁড়া পায়ে কতক্ষণই বা পারব?"

"তা হলে কি ফিরে যাব? পরে প্যাসেঞ্জার লঞ্চে আসা যেতে পারে। সেগুলো অনেক বড়, খুব ঝড়-বাদল না হলে ভয় থাকে না।"

"না, না, ফিরে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার বেশ ভালই লাগছে। কী রে, সন্তু, ভয় পাচ্ছিস না তো?"

সন্তু জোরে-জোরে দু'দিকে মাথা নাড়ল। জেটি ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে

আসার পর বোটটা এমনিতে ঠিকভাবেই চলছে, হঠাৎ-হঠাৎ কোথা থেকে ঢেউ আসছে, অমনই লাফিয়ে ওঠে, তখন বুকটা কেঁপে ওঠে ঠিকই। সন্তু দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে পাটাতন।

কাকাবাবু বোটের চালককে বললেন, "আলিভাই, সাবধানে চালাবেন। আপনার ওপর আমাদের জীবন নির্ভর করছে।"

আলি কাকাবাবুর ক্রাচদুটো একবার দেখে নিয়ে বলল, "আপনার মতন কোনও প্যাসেঞ্জার এই বোটে ওঠে নাই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি তো অনেকদিন চালাচ্ছেন। এর মধ্যে একবারও বোট উলটেছে ?"

আলি বলল, "তা ধরেন পাঁচ-ছয়বার তো হবেই।"

কাকাবাবু বললেন, "পাঁচ-ছ'বার ? সবাই ঠিকঠাক ছিল, নাকি কেউ-কেউ..."

আলি বলল, "এই তো গত মাসেই, লস্কর সাহেবের পোলাডা, কী যে হইল, আর পাওয়াই গেল না।"

কামাল বলল, "পোলাডা মানে বুঝলেন ? ছেলেটা।"

কাকাবাবু বললেন, "থাক, ওসব কথা থাক। আচ্ছা কামাল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এখানে তো বেশ কয়েকটা দ্বীপ আছে, তাই না ? যদি কেউ বলে, একটা দ্বীপে কেউ একটা মস্ত বড় চারতলা সাদা বাড়ি বানিয়ে রেখেছে, তা হলে সে-কথাটা গাঁজাখুরি মনে হবে, তাই না ?"

কামাল বলল, "মোটেই না। এরকম বাড়ি তো আছে। একটা না, অনেক।"

কাকাবাবুই এবার অবাক হয়ে বললেন, "সে কী ? দ্বীপগুলোতে তো গরিব লোকেরা থাকে। তাদের ছোট-ছোট মাটি-খড়ের বাড়ি, বড়জোর টালির বাড়ি। সেখানে হঠাৎ মস্ত বড় তিন-চারতলা পাকা বাড়ি কে বানাবে ? আমি আগেরবার এসে তো এরকম কিছু শুনিনি !"

কামাল বলল, "গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামেই বহু জায়গায় এরকম বাড়ি ছড়িয়ে আছে। এগুলোকে বলে সাইক্লোন শেলটার। প্রায় প্রত্যেক বছরই এদিকে সাঙ্ঘাতিক সাইক্লোন হয়, বহু লোক মারা যায়—"

সন্তু খুব আগ্রহ নিয়ে এই কথাবার্তা শুনছিল, এবার সে বলে উঠল, "খুব ঝড় হলেই খবরের কাগজে কক্সবাজারের নাম দেখি। এখানেই বেশি ঝড় হয় কেন ?"

কামাল বলল, "এটাকে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা বলতে পারো। বঙ্গোপসাগরের এক জায়গায় ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়, তারপর সেটা এইদিকে ধেয়ে আসে। পশ্চিমবাংলার পাশ দিয়েই আসে, কিন্তু আশ্চর্য, সেখানে এই ঝড়ের ঝাপটা লাগে না। আপনাদের ডায়মন্ড হারবার কিংবা কলকাতা প্রত্যেকবার বেঁচে যায়, ঝড়ের যত তেজ সব এসে আছড়ে পড়ে চিটাগাং-কক্সবাজারে। এখানে কত

বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়, কত বাড়ির চাল, গাছপালা উড়ে যায় আকাশে, হাজার-হাজার গোরু-ছাগল মারা পড়ে। সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়।"

সন্তু বলল, "একবার আমাদের অন্ধ্রপ্রদেশেও এরকম সাইক্লোনের ধাক্কা লেগেছিল।"

কামাল বলল, "ঠিক। সেবারেও খুব জোর ঝড় হয়েছিল, এদিকে না এসে ওদিকে বেঁকে গিয়েছিল। তোমাদের ওড়িশাতেও কোনও-কোনওবার হয়। খালি পশ্চিমবাংলারই ভাগ্য ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশিবার এদিকেই আসে, প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। কয়েক বছর আগেই তো কক্সবাজারের এদিকে লাখখানেক লোক মারা গিয়েছিল না?"

কামাল বলল, "তার বেশি। এদিকের মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই। সেইজন্যই মাঝে-মাঝে ওইরকম পাকা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঝড়ে যখন গরিব মানুষের বাড়িঘর উড়ে যায়, তখন মানুষ ছুটে গিয়ে ওই বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তবু প্রাণে বাঁচে।"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝলাম। বাড়িগুলো কে বানিয়ে দিয়েছে?"

কামাল বলল, "আমাদের সরকার। মানে সবগুলো নয়। বাংলাদেশ সরকারের অত টাকা নেই। অন্য অনেক দেশও বানিয়ে দিয়েছে, জাপান, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আপনাদের ইন্ডিয়াও বানিয়ে দিয়েছে, আরও অনেক দেশ সাহায্য করেছে। চলুন না, আপনাকে সেরকম দু'-একটা বাড়ি দেখিয়ে দেব।"

আলি বলল, "ওই তো, ডাইন দিকে দ্যাখেন। ওই তো একখান ছাইকোন ছেল্টার!"

কাকাবাবু ও সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। স্পিড বোটটার একপাশে তীর দেখা যায়, আর-একপাশে অথৈ জল। তীরের দিকে ফাঁকা জায়গায় একটি চৌকো সাদা রঙের বাড়ি দেখা যায় অনেক দূর থেকে। ওখানে আর কিছু ছোট-ছোট মাটির বাড়ি রয়েছে, সেগুলো গ্রামের লোকদের, ওই বাড়িটা একেবারে অন্যরকম। অনেক উঁচু তো বটেই, একেবারে চৌকো এবং ধপধপে সাদা। দেখলেই বোঝা যায় নতুন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সব বাড়িই সাদা?"

কামাল বলল, "বিদেশিরা যে-সব বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে, সেগুলি একই রকম দেখতে। সামনে গেলে আরও দেখতে পাবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এর পর আর-একটা প্রশ্ন আছে। গ্রামের মানুষদের জন্যই তো এই বাড়িগুলো বানানো হয়েছে। এমনও দ্বীপ আছে, যে-দ্বীপে কোনও মানুষ নেই। সেই দ্বীপেও কি এরকম বাড়ি থাকতে পারে?"

কামাল বলল, "হ্যাঁ পারে।"

আলি বলল, "একখান আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষের জন্যই তো সাইক্লোন শেল্টার। যে-দ্বীপে মানুষ নেই, সে-দ্বীপে শুধু-শুধু অত বড় বাড়ি বানিয়ে রাখবে কেন ?"

কামাল বলল, "জেলেদের জন্য। জেলেরা নৌকো নিয়ে অনেক দূরে-দূরে মাছ ধরতে যায়। হঠাৎ ঝড় উঠলে তারা কী করবে ? আগে কত নৌকো ডুবে গেছে, কত জেলে মারা পড়েছে। এখন তারা ঝড়ের আভাস পেলেই কাছাকাছি দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ফাঁকা থাকলেও বাঁচবে না, তাই তাদের জন্যও বাড়ি রয়েছে।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন।

আলি বলল, "সেই দ্বীপটা আমি দূর থেকে দেখছি একবার ! দ্বীপটা ভাল না। সেখানে ভূত আছে।"

কাকাবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "তাই নাকি, ভূত আছে ?"

আলি বলল, "এইজ্ঞে সার। যে মানুষগুলা আগে মরে গেছে, তারা বাড়িটায় ভূত হয়ে আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তবে তো সেখানে যেতেই হয়। আমি কখনও ভূত দেখিনি।"

আলি বলল, "কিন্তু সে তো উলটা দিকে। দূর আছে।"

কামাল বলল, "আপনি যে মহেশখালি যাবেন বলেছিলেন। ওই যে দেখুন পাহাড়ের ওপর মন্দির দেখা যাচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "মন্দির তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ওখানেই থাকবে। আগে চলো, ভূত দেখে আসি। সেটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। কামাল, তোমার কি ভূতের ভয় আছে নাকি ?"

কামাল হা-হা করে হেসে বলল, "কী যে বলেন ! ভূত-ফুত কিছু আছে নাকি ? যেসব গ্রামে এখনও ইলেকট্রিসিটি পৌঁছয়নি, শুধু সেই-সব জায়গায় মানুষ এখনও ভূতে বিশ্বাস করে।"

কাকাবাবু আলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই দ্বীপে যে ভূত আছে তা তুমি কী করে জানলে ? অন্যরা বলেছে, না নিজের চোখে দেখেছ ?"

আলি বলল, "নিজে দেখিছি।"

কাকাবাবু বললেন, "বটে, বটে ! কী দেখেছ বলো তো ?"

আলি বলল, "সে-দ্বীপে মানুষজন নাই। তবু রাত্তিরবেলা দপ-দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আলেয়া না, চড়া আগুন। আর মাঝে-মাঝে একটা শব্দ হয়, কী বিকট সেই শব্দ, যেন মনে হয়, একখান দৈত্য পেটের ব্যথায় চিখরাচ্ছে !"

এবার সবাই হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "দৈত্যদের পেটব্যথা হলে কীরকম চিৎকার করে তাও কখনও শুনিনি। তা হলে তুমি বলছ, শুধু ভূত নয়, দৈত্যও আছে সেখানে ?

নাও, সবাই কলা খাও, কলা খেয়ে গায়ের জোর করে নাও !”

সেই দ্বীপটার কাছে পৌঁছতে আরও ঘণ্টাদেড়েক লাগবে। এখন গনগনে দুপুর। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে সূর্য। এখন একটুও শীত নেই, কাকাবাবু কোট খুলে ফেলেছেন, সন্তুও খুলে ফেলেছে সোয়েটার। এরকম দিনের আলোয় কি ভূত দেখা যায় ? আলিও বলল যে, আগুন-টাগুন দেখা যায় সন্ধের পর। তা হলে এত তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে কী হবে ?

কামাল বলল, “তা হলে এক কাজ করা যাক। কাছাকাছি চাঁদপাড়া নামে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামে সাগরের নোনা জল ঢুকে যায় বলে এখন বাঁধ বাঁধার কাজ চলছে। সরকারি লোকেরা ক্যাম্প করে আছে সেখানে। একজন এঞ্জিনিয়ার আমার খুব চেনা। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই আমরা। তারপর বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়লেই হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে, চলো সেখানেই যাই। কিন্তু আমরা কোন দ্বীপে যাব, সেসব কিছু তাদের বলবার দরকার নেই। বলবে, আমরা এমনই বেড়াচ্ছি। বাঁধের কাজ দেখতে এসেছি।”

কামাল বলল, “আলি, চলো চাঁদপাড়ায়।”

চাঁদপাড়ায় প্রায় তিনশো লোক মাটি কেটে বাঁধ দিচ্ছে। আগের বছর সাইক্লোনের সময় সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে উঠে পুরো গ্রামটা ভাসিয়ে দিয়েছিল। একটাও ঘরবাড়ি আস্ত নেই। তবে যেখানে-যেখানে সমুদ্রের জল জমে ছিল, এখন সেখানে সেই জল শুকিয়ে নুন বানানো হচ্ছে। গভর্নমেন্ট বাঁধ বানিয়ে দিচ্ছে, মজদুররা কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মাছ ধরছে অল্প জলে। একজনের ঝুড়িতে লাফাচ্ছে বড়-বড় চিংড়ি।

কামালের চেনা লোকটি জোর করে ওদের ভাত-মাছের ঝোল খাইয়ে দিল। গরম-গরম ভাত আর টাটকা চিংড়িমাছের ঝোল, অপূর্ব স্বাদ।

কাকাবাবু বললেন, “দ্যাখো, ভেবেছিলাম শুধু কলা খেয়ে দিনটা কাটাতে হবে। কেমন সুখাদ্য জুটে গেল। কোনও হোটেলে এত টাটকা চিংড়িমাছ পাবে ?”

কামাল বলল, “এতদূর পর্যন্ত তো আসবার কথা ছিল না। আমিও আগে ভাবিনি।”

মাটি-কাটা শ্রমিকরা কাকাবাবুকে ভেবেছে কোনও অফিসার। খোঁড়া পা নিয়ে এত দূরে এসেছেন বাঁধের কাজ দেখার জন্য, তা হলে নিশ্চয়ই খুব বড় অফিসার হবেন। সবাই বেশি-বেশি কাজ করতে লাগল।

বিকেলের একটু আগে বেরিয়ে পড়া হল সেখান থেকে। খানিক বাদেই সন্তু মুখ ঘুরিয়ে দেখল, এখন চারদিকেই সমুদ্র, কোনওদিকেই আর তীর দেখা যায় না। শীতকালের আকাশে মেঘ নেই। আকাশ নীল, জলও নীল। এখানে আবার ঢেউ বেশি, ছলাত-ছলাত শব্দ হচ্ছে আর স্পিড বোটটা লাফিয়ে-লাফিয়ে

উঠছে।

কাকাবাবু কামালকে জিজ্ঞেস করলেন, "এত দূরেও জেলেরা মাছ ধরতে আসে ?"

কামাল বলল, "জি, আসে। এখন তো শীতকাল, এই সময় মাছ ওঠে কম। গরমকালে এলে দেখবেন, নৌকোয়-নৌকোয় জায়গাটা ভরে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "গরমকালেই ঝড় ওঠে। শীতকালে তো তেমন ঝড় হয় না। শীতের সময় এই সাদা বাড়িগুলো খালি পড়ে থাকে ?"

কামাল বলল, "অন্য সময় কাউকে আসতে দেওয়া হয় না। না হলে তো বাড়িগুলো জবরদখল হয়ে যাবে।"

সন্তু বলল, "দূরে-দূরে দু'-একটা নৌকো দেখা যাচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এখনকার নৌকোয় তো বৈঠা বাইতে হয় না। মোটর লাগানো থাকে, তাই অনেকদূর যেতে পারে। নৌকো কথাটাই উঠে যাচ্ছে, এখন বলে ভটভটি।"

কামাল বলল, "আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য এই জেলেরাও পাচ্ছে। এত দূর বৈঠা বেয়ে আসতে হলে কত পরিশ্রম হত ভাবুন ! সময়ও লাগত অনেক।"

কাকাবাবু বললেন, "ছোটবেলায় দেখেছি, পালতোলা নৌকো, বাতাসে টেনে নিয়ে যেত, একজন মাঝি হাল ধরে বসে থাকত, ভারী সুন্দর দেখাত।"

এইরকম কথা বলতে-বলতে অনেকটা সময় চলে গেল। তারপর এক সময় সেই কূলকিনারাহীন সমুদ্রের বুকে জেগে উঠল একটা দ্বীপ। প্রায় গোল আকৃতি, মাঝারি উচ্চতার গাছপালার রেখা দিয়ে ঘেরা, আর-একটাও বাড়িঘর নেই, শুধু সাদা রঙের বিশাল এক চৌকো বাড়ি মাথা উঁচু করে আছে। সমুদ্রের নীল, গাছপালার সবুজ আর বাড়িটির সাদা রং মানিয়েছে চমৎকার !

সন্তু অস্ফুটভাবে বলল, "তা হলে সত্যিই এরকম দ্বীপ আছে। তাতে সাদা বাড়িও রয়েছে। কী করে বলতে পারল মেয়েটা ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোরা তো বিশ্বাস করিসনি। কেউ-কেউ পারে। এখন আলির কথার বাকিটা মিললেই হয়।"

কামাল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের কলকাতার একটি মেয়ে, সে কখনও এদিকে আসেনি, অথচ সে বলে দিয়েছিল, এরকম দ্বীপের মধ্যে একটা সাদা বাড়ি আছে।"

কামাল বলল, "হয়তো কোনও পত্রিকায় পড়েছে। বাংলাদেশের সাইক্লোন নিয়ে অনেক বিদেশি কাগজেই লেখালেখি হয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এমন সুন্দর একটা দ্বীপ, এখানে মানুষ থাকে না কেন ?"

কামাল বলল, "খাবার পানি পাবে কোথায় ? চারদিকে সমুদ্র, তার পানি এত

লোনা যে, মুখে দেওয়া যায় না। সেই যে ইংরেজি কবিতা আছে না, ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার, নট এ ড্রপ টু ড্রিংক !”

আলি বলল, “এই পর্যন্ত ! এইখান থিকা দ্যাখেন।”

কাকাবাবু মুগ্ধভাবে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, “এমন সুন্দর একটা দ্বীপ, ঠিক যেন স্বর্গের বাগান, এটা ভূতেরা দখল করে থাকবে, সেটা তো ঠিক নয় ! জেলেদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাড়িটা তৈরি হয়েছে, সেটা ভূতেরা নিয়ে নেবে ? এ ভারী অন্যায়। এখান থেকে ভূত তাড়াবার কেউ চেষ্টা করেনি ?”

কামাল বলল, “আসল ব্যাপার কী জানেন, সাইক্লোন বা জোর ঝড়বাদল হলেই এইদিকটা সম্পর্কে সরকারের টনক নড়ে। অন্য সময় এদিকে তো কেউ আসে না। এই ভূতের ব্যাপারটা তো আমি প্রথম শুনছি !”

স্পিড বোটটা থেমে যেতে দেখে কাকাবাবু বললেন, “এ কী আলিভাই, এঞ্জিন বন্ধ করলে কেন ?”

আলি বলল, “আমি আর যাব না !”

॥ ৯ ॥

দ্বীপটার দিকে তাকালে যে সেখানে ভয়ের কিছু আছে, তা কল্পনাও করা যায় না। সূর্য সবেমাত্র ডুবে গেলেও এখনও লালচে রঙের আলো ছড়িয়ে আছে, দূরের সাদা বাড়িটাও যেন রাঙা হয়ে উঠেছে। কয়েকটি সিগাল পাখি দুলছে তীরের কাছে। এই অপরূপ ছবিটি শুধু দূর থেকে দেখে আশা মেটে না।

কিন্তু আলি আর কাছে যেতে রাজি নয়। সে এখন ফিরতে চায়। এতক্ষণ সে বেশ হাসিখুশি মানুষ ছিল, এখন কীসের যেন আশঙ্কায় তার মুখ শুকিয়ে গেছে।

কামাল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, “মিঞা, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? এই দ্যাখো, আমার কাছে পিস্তল আছে। ভূত-টুত যে-ই আসুক, একেবারে ফুঁড়ে দেব !”

কাকাবাবু বললেন, “আমরা ভুতুড়ে আগুন দেখলাম না, দৈত্যের চিৎকার শুনলাম না, এর মধ্যেই ফিরে যাব ?”

আলি বলল যে, “সেসব রোজ-রোজ না-ও হতে পারে। এক-একদিন হয়। যদি মাঝরাত্তিরে হয়, ততক্ষণ কী বসে থাকব ?”

কাকাবাবু এবার দৃঢ়ভাবে বললেন, “ঠিক আছে, তুমি ফিরে যেতে চাও, ফিরে যাবে। আমাদের ওই দ্বীপে নামিয়ে দাও। কাল সকালে এসে আমাদের নিয়ে যাবে।”

আলি এবারে হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলল, “আপনেরা ওইখানে সারারাত

থাকবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার আর সন্তুর এরকম অভ্যেস আছে। কামালও ফিরে যাক।"

কামাল জোর দিয়ে বলল, "মোটেই না। আমিও থাকব। ওই বাড়িটা কেউ দখল করেছে কি না সেটা আমারও জানা দরকার। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করব।"

আলি তবু বিড়বিড় করে বলল, "অপয়া জায়গা। সতু শেখের ভটভটি এর ধারেকাছে এসে ডুবে গিয়েছিল, আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি !"

আবার সে স্টার্ট দিল। ক্রমশই দ্বীপটা কাছে আসছে, সেখানে জনপ্রাণীর কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। গাছগুলো বড় হয়ে উঠছে ক্রমশ। এক জায়গায় এসে মোটর বোটটা থামল, সেখানে কাদা নেই, বেশ পরিষ্কার বালি। দুটো কচ্ছপ সেখান থেকে সরসর করে জলে নেমে গেল।

সন্তুই প্রথম নেমে গেল এক লাফ দিয়ে। কামাল নেমে কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ধরব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। অন্যের সাহায্য ছাড়াই তো জীবনটা কাটাতে হবে।"

তাঁর ক্রাচ নরম বালিতে গেঁথে গেলেও আস্তে-আস্তে তিনি ওপরে উঠে গেলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, "ঠিক আছে আলি, তুমি যাও, কাল সকালে এসো !"

কামাল বলল, "তুমি চাঁদপাড়ায় গিয়ে থাকতে পারো।"

আলি তবু ফেরার উদ্যোগ করল না। একটুক্ষণ মুখখানা গোঁজ করে থেকে সে নোঙর ফেলল। তারপর বোট থেকে নেমে এসে বলল, "আপনাদের ফেলে চলে যাব, আমারও তো একটা ধর্ম আছে !"

তারপর সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওইটুকু পোলাডা যদি ভয় না পায়, আমি বুড়া মানুষটা ভয়ে পালাব ?"

কামাল তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, "বাঃ, এই তো চাই। বাংলাদেশের মানুষ অত সহজে ভয় পায় না।"

চারজনে একসঙ্গে এগোল। এর মধ্যে আকাশের রং মিলিয়ে গেছে, নেমে এসেছে অন্ধকার। দূরের সাদা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ, শুধু সমুদ্রের ঢেউ পাড়ে আছড়ে পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

কামাল বলল, "মনে হয়, মাঝে-মাঝে দু-চারজন জেলে রাত্তিরে থেকে যায়। আগুন জ্বেলে রান্নাবান্না করে। সেই আগুন দূর থেকে দেখে লোকে ভয় পায়।"

আলি বলল, "তেমন আগুন না। হা-হা আগুন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এখনও এ-দ্বীপে লোক

আছে। তারা আড়াল থেকে আমাদের দেখছে !”

পকেট থেকে টর্চ বার করে কাকাবাবু চারদিকে আলো ঘুরিয়ে দেখলেন। গাছপালা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

কামাল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “কে আছ ? কেউ আছ এখানে ?”

অমনই খানিক দূরে কয়েকটা গাছের আড়ালে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। যেন মস্ত বড় একটা মশাল মাটিতে পোঁতা, লকলক করল তার শিখা।

এরকম দেখলে বুকটা ধক করে উঠবেই। আলি কাকাবাবুর গায়ের কোট চেপে ধরল।

সেই আগুন থেকে ধোঁয়াও বেরোচ্ছে, তাতে পাওয়া যাচ্ছে ধূপের মতন একটা মৃদু গন্ধ।

কামাল রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরে বলল, “কে ওখানে আগুন জ্বালল ? মনে হচ্ছে একটা মাটির হাঁড়ি থেকে বেরোচ্ছে। কিছু একটা বাজি নাকি ?”

কামাল এগিয়ে গেল সেটা দেখতে। কাকাবাবু বললেন, “বেশি কাছে যেয়ো না, ওটা ফেটে যেতে পারে।”

ফাটল না, আগুনটা কমে গিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল, গন্ধটাও তীব্র হল।

এবার পেছনদিকেও আর এক-জায়গায় জ্বলে উঠল ওইরকম আগুন !

কাকাবাবু এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, “গ্যাস ! কামাল, সাবধান ! কিছু একটা গ্যাস বেরোচ্ছে।”

কামাল ততক্ষণে মাতালের মতন টলতে শুরু করেছে, হাত থেকে খসে গেছে রিভলবার, ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

আলি দারুণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল, “হায় আল্লা !”

তারপর সে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে বলল, “হুজুর বাঁচান আমারে। দমবন্ধ হয়ে আসছে !”

কাকাবাবু অস্থিরভাবে বললেন, “ছাড়ো, ছাড়ো ! এখান থেকে সরে যেতে হবে।”

আলি আরও জোরে আঁকড়ে ধরল কাকাবাবুকে। তিনি এবার জোরে ধাক্কা দিয়ে আলিকে ফেলে দিলেন মাটিতে। তা করতে গিয়ে একটা ক্রাচ খসে পড়ল মাটিতে। সেটা তুলতে গিয়ে আর সময় পেলেন না। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

অজ্ঞান হওয়ার আগে তিনি কোনওক্রমে বললেন, “সন্তু, পালিয়ে যা, এখান থেকে অনেক দূরে সরে যা !”

সন্তুরও চোখ জ্বালা করতে শুরু করেছিল, সেই অবস্থাতেও সে বাঁই বাঁই করে ছুটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আলি, কামাল আর কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন সেখানে।

একটু পরেই দ্বিতীয় আগুনটাও নিভে গেল, বাতাসে মিলিয়ে গেল ধোঁয়া। তারপর গাছপালার আড়াল থেকে চারজন লোক বেরিয়ে এসে ওদের তিনজনকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল সাদা বাড়িটার দিকে। কাকাবাবুর ক্রাচদুটো পড়ে রইল সেখানে।

সাদা বাড়িটার নীচের তলায় কোনও ঘর নেই। বড়-বড় ফ্ল্যাট বাড়ির নীচের তলায় যেমন শুধু পিলার থাকে আর গাড়ি রাখার ব্যবস্থা থাকে, সেইরকম। এবারে সেখানে একটা হ্যাজাক বাতি জ্বালা হল, তাতে দেখা গেল ঠিক মাঝখানে সিংহাসনের মতন লাল মখমলে ঢাকা একটা উঁচু চেয়ার রয়েছে। ওপরের সিঁড়ি দিয়ে চটি ফটফটিয়ে নেমে এল একজন মধ্যবয়স্ক লোক, ফরসা রং, চেহারাটা বেশি বড় নয়, রোগা-পাতলাই বলা যায়, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল পাতলা হয়ে এসেছে। সে আলখাল্লার মতন একটা পোশাক পরে আছে, সেটা দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তাতে নানা রঙের জরির লম্বা-লম্বা স্ট্রাইপ, যখন যেদিকে আলো পড়ে, অমনই ঝকমক করে ওঠে।

লোকটিকে বাঙালি বলে মনে হয় না, তবে ঠিক কোন জাতের, তাও বোঝা যায় না, কোরিয়ান, চিনে বা জাপানি কিছু একটা হতেও পারে। তার হাতে এক-দেড় হাত লম্বা একটা ছোট লাঠির মতন, সেটা মনে হয় সোনার তৈরি। সে এসে সিংহাসনটার কাছে দাঁড়াতেই একসঙ্গে অনেক গলা শোনা গেল, "মাস্টার! মাস্টার!"

তখন বোঝা গেল, পেছনদিকের অন্ধকারে অনেক লোক চুপ করে বসে ছিল এতক্ষণ। এবার তারা উঠে এল। প্রথমে পরপর দুজন মুখোশপরা লোক তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে গেল। তারপর এল লাইন দিয়ে একদল ছেলে, তাদের প্রত্যেকের বয়েস ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে, সকলের উচ্চতা সমান। তারা প্রথমে সেই লোকটিকে ঘিরে সাতবার গোল হয়ে ঘুরল। তারপর একজন-একজন করে তার সামনে বসল হাঁটু গেড়ে। সেই লোকটি তাদের কাঁধে সেই সোনার দণ্ডটা ছুঁইয়ে বলতে লাগল, "আই ব্লেস ইউ! তোমাদের ট্রেনিং প্রায় ফিনিশ্‌ড। তোমরা হবে আমার হিউম্যান রোবট! আমি যা আদেশ করব ইউ উইল ওবে!"

লোকটি কথা বলে ইংরিজি-বাংলা মিশিয়ে। বাংলা শব্দগুলোর উচ্চারণ অন্যরকম। সাহেবের নতুন শেখা বাংলার মতন। লোকটির কথা বলা শেষ হতেই ছেলেগুলি প্রত্যেকে যন্ত্রপুতুলের মতন বলতে লাগল, "ইয়েস মাস্টার! ইয়েস মাস্টার!"

সন্তু বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিল অনেকটা। সাদা বাড়িটার তলায় আলো জ্বলতে দেখে সে গুটি-গুটি এগিয়ে এসেছে সেদিকে। অন্ধকারে একটা গাছের আড়াল থেকে সব দেখছে।

যে-ছেলেগুলো রঙিন আলখাল্লা পরা লোকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসছে,

তাদের মধ্যে জোজোও আছে! জোজোকে দেখেই সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, আর-একটু হলে জোজো বলে ডেকে উঠত। নিজেই মুখচাপা দিয়েছে। কিন্তু 'জোজো' ওরকম অদ্ভুত ব্যবহার করছে কেন? চোখের মণিদুটো একেবারে স্থির, যেন পলকও পড়ছে না। হাঁটছে দম-দেওয়া পুতুলের মতন!

সন্তু গুনে দেখল, জোজোর বয়েসী, অর্থাৎ তারও বয়েসী, মোট একুশটা ছেলে আছে ওখানে। সকলেরই ভাবভঙ্গি একই রকম। হাঁটাচলা আর চোখ অস্বাভাবিক। ওই আলখাল্লা পরা লোকটা বলল, ওদের হিউম্যান রোবট বানাবে। যন্ত্র দিয়ে বানানো রোবট অনেক সময় মানুষের মতন কাজকর্ম করতে পারে। কিন্তু জীবন্ত মানুষ কি রোবট হতে পারে? ওই লোকটা এই ছেলেদের হিপনোটাইজ্ড করে রেখেছে। সেই অবস্থায় নাকি মানুষকে দিয়ে ইচ্ছেমতন কাজ করানো যায়। ওই লোকটা জোজোদের দিয়ে কী কাজ করাবে?

জোজো আর সবক'টা ছেলেই ওই লোকটাকে বলছে, মাস্টার। তার মানে, ওই লোকটা প্রভু, আর সবাই ভৃত্য? ছি ছি ছি ছি। জোজো কী করে বলছে, ওর লজ্জা করে না? এটা জোজোর চরিত্রের সঙ্গে মেলে না মোটেই। কিংবা জোজো ইচ্ছে করে ওরকম সেজে আছে?

সবক'টা ছেলেকে 'আই ব্লেস ইউ' বলে সোনার দণ্ডটা ছোঁয়াবার পর আলখাল্লা পরা লোকটা মাটিতে পড়ে থাকা কাকাবাবুদের দিকে তাকাল। একজন মুখোশধারীকে ডেকে আঙুল দেখিয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করল।

সেই মুখোশধারীটি খুব সম্ভবত বুঝিয়ে দিল ওরা কীভাবে এসেছে, কীভাবে ধরা পড়েছে। লোকটি ঠোঁট বেঁকিয়ে অবহেলার সঙ্গে শুনল। তারপর বলল, "একটা ছেলে ভেগেছে? ফাইন্ড হিম! গেট হিম! ওকে ধরো। এই আইল্যান্ড থেকে সে পালাবে কোথায়? ঠিক আসতে হবে আমার কাছে!"

তারপর কামাল আর আলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "উহাদের বেঁধে রাখো। পরে ব্যবস্থা হবে। অন্য লোকটার জ্ঞান ফেরাও।"

দু'জন লোক কাকাবাবুর মুখে জলের ছিটে দিতে লাগল। একটু পরেই কাকাবাবু চোখ মেলে তাকালেন। লোক দুটো কাকাবাবুর দু' হাত ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

আলখাল্লা-পরা লোকটি কাকাবাবুর দিকে একটা আঙুল নেড়ে বলল, "কাম হিয়ার। আমার নিকটে এসো।"

কাকাবাবু লোকটিকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলেন। এখনও তাঁর মাথা একটু-একটু ঘুরছে। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়নি। তিনি বললেন, "আমার ক্রাচদুটো কোথায়? আমি খোঁড়া লোক, হাঁটতে পারি না।"

এমনই সময় একটা লোক একটা লাঠি দিয়ে সজোরে কাকাবাবুর মাথায় মেরে বলল, "সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারো, হাঁটতে পারো না? মাস্টার ডাকছেন,

যাও !"

বেশ জোরে লেগেছে, ঘাড়ের কাছটায় কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে খুব শান্ত গলায় বললেন, "আমাকে মারলে কেন ? তোমাকে কেউ অমনভাবে মারলে কেমন লাগবে ? আমি সত্যি খোঁড়া, আমার ক্রাচদুটো দাও !"

আলখাল্লা-পরা লোকটি হুকুমের সুরে বলল, "ডোন্ট আর্গু, ইধারে এসো !"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে কী হচ্ছে ? যাত্রাপালা ?"

একজন লোক কাকাবাবুর হাত ধরে টানতেই কাকাবাবু প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য লোকটি লাঠি দিয়ে আবার খুব জোরে মারল কাকাবাবুর মাথায়। কাকাবাবু সেটা সামলাতে পারলেন না, জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

আলখাল্লা-পরা লোকটি ফিক করে মাটিতে থুতু ফেলল। তারপর বলল, "ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম। উহাকে ফেলে দাও ! একটা স্পিড বোটে চাপিয়ে অনেকখানি সমুদ্রে নিয়ে যাও। থ্রো হিম ! শার্ক ওকে খাবে ! ক্রোকোডাইল ওকে খাবে। উহার কোনও চিহ্ন থাকবে না।"

দু'জন লোক মাটি থেকে তুলে নিল কাকাবাবুকে।

সন্তু সব দেখছে, এবার আর সামলাতে পারল না। তীরের মতন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকদুটোর ওপর। লাথি মেরে ফেলে দিল একজনকে। তারপর সে কাকাবাবুকে ধরে ঝাঁকাতে লাগল, যদি তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তার ধারণা, জ্ঞান ফিরে পেলে কাকাবাবু উদ্ধার পাওয়ার ঠিকই উপায় বার করে ফেলবেন।

কিন্তু কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরল না। দু'জন মুখোশধারী সন্তুকে মাটিতে চেপে ধরে একজন তার পিঠের ওপর পা রাখল।

হা-হা করে খুব জোরে হেসে উঠল সেই আলখাল্লা-পরা লোকটি। অমনই বাকি সকলেই একই রকম ভাবে হা-হা করে হাসতে লাগল।

তারপর আলখাল্লাধারী যখন বাঁ হাত তুলে বলল, "চুপ !" অমনই সঙ্গে-সঙ্গে সবাই থেমে গেল।

আলখাল্লাধারী এবার দু'জনকে ইঙ্গিত করল কাকাবাবুকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য।

তারা কাকাবাবুকে ধরাধরি করে নিয়ে এল জলের ধারে। তারপর যে স্পিড বোটে কাকাবাবুরা এসেছিলেন, সেটাতেই তোলা হল তাঁকে। সেটা চালিয়ে অনেকটা দূর এসে থামল। এখানে সমুদ্রের কোনও দিক দেখা যায় না, শুধুই সমুদ্র, লোক দুটো কাকাবাবুকে চ্যাংদোলা করে তুলে কয়েকবার দুলিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল জলে। অন্ধকারে ঝপাং করে শব্দ হল।

স্পিড বোটটা আবার ফিরে গেল ফট-ফট শব্দ করে। একটু বাদেই মিলিয়ে গেল শব্দটা।

কাকাবাবু ডুবতে লাগলেন। ডুবতে-ডুবতে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। যারা সাঁতার জানে, জ্ঞান থাকলে তারা কক্ষনও ডোবে না। কাকাবাবু ভেসে উঠলেন।

প্রথমে তিনি মনে করতে পারলেন না, ঠিক কী হয়েছে। জলের মধ্যে পড়লেন কী করে ? এটা কি স্বপ্ন দেখছেন নাকি ? না, স্বপ্ন কী করে হবে, এই তো ওপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের নোনা জল লেগে জ্বালা করছে মাথার ক্ষতস্থানটা।

আস্তে-আস্তে তাঁর মনে পড়ল, একটা লোক তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে মেরেছে দু'বার। লোকটাকে দেখতে কেমন ছিল ? মুখোশ পরা ছিল, মুখ দেখা যায়নি। মুখোশ পরা থাক আর যাই-ই থাক, লোকটাকে খুঁজে বার করতে হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে না ? তাঁর গায়ে কেউ হাত তুললে তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়েন না। লোকটার মাথায় ঠিক ওইভাবে মারতে হবে দু'বার !

এই অবস্থাতেও কাকাবাবুর হাসি পেয়ে গেল। আগে তো বাঁচতে হবে, তারপর প্রতিশোধের চিন্তা। এই অবস্থায় বাঁচবেন কী করে ? কতক্ষণ সাঁতার কাটতে পারবেন ? একটা পায়ে জোর নেই, অন্য পা-টা কিছুক্ষণ পরেই অসাড় হয়ে যাবে। প্যান্ট-কোট-জুতো-মোজা পরে কি সাঁতার কাটা যায় ? শরীরটা ভারী হয়ে আসছে ক্রমশ।

ক্রাচ দুটো কোথায় গেল ? আঃ, এই এক জ্বালা ! কোথাও একটু মারামারি হলেই ক্রাচ দুটো হারিয়ে যায়। কতবার যে ক্রাচ তৈরি করতে হয়েছে তার ঠিক নেই। এখন তিনি ক্রাচ পাবেন কোথায় ? ক্রাচ ছাড়া যে তিনি অচল।

আবার হাসি পেল। এখানে যদি ডুবেই মারা যান, তা হলে আর ক্রাচ দিয়ে কী হবে ? প্রাণে বাঁচলে অনেক ক্রাচ পাওয়া যাবে !

এত বড় বিপদের সময়ও মানুষের কত তুচ্ছ কথা মনে পড়ে।

কাকাবাবু টের পেলেন যে, জলে স্রোত আছে। তিনি শুধু ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন। স্রোত তাঁকে একদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জোয়ার না ভাটার টান ? যদি ভাটা হয়, তা হলে আরও সর্বনাশ, তিনি গভীর সমুদ্রে চলে যাবেন। জোয়ার হলে এগোতে পারবেন কক্সবাজারের দিকে।

জোয়ার না ভাটা, তা বোঝার উপায় নেই। চাঁদ নেই আকাশে, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

এই সমুদ্রে হাঙর থাকতে পারে। একরকমের ছোট-ছোট হাঙরকে বলে কামঠ। সেগুলো কচাত করে এক কামড়ে পা কেটে নিয়ে যায়। সেই কামঠের পাল্লায় পড়লেই হয়েছে আর কী ! দুটো পা-ই যাবে। দুটো পা গেলে আর বেঁচে লাভ কী ! রাজা রায়চৌধুরী এইভাবে মরবে ? সন্তু ওই দ্বীপে রয়ে গেল। কী হবে সন্তুর ?

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ পেয়ে কাকাবাবু চমকে গেলেন। দূরে দেখতে

পেলেন একটা জ্বলজ্বলে আলো। প্রথমে ভাবলেন, সেই দ্বীপের কাছে ফিরে এসেছেন নাকি ? এ সেই দৈত্যের চিৎকার ? তারপরই বুঝতে পারলেন, এসব একেবারে আজেবাজে ভাবছেন। একটা লঞ্চ কিংবা স্টিমার আসছে, সেটা একবার ভোঁ দিল, সামনে সার্চলাইট জ্বলছে।

কাকাবাবুর বুকের মধ্যে আনন্দ উছলে উঠল। এই তো বাঁচার উপায় পাওয়া গেছে। লঞ্চের সারেং নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পেয়ে তুলে নেবে। কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "হেল্প ! হেল্প ! বাঁচাও, বাঁচাও !"

সমুদ্রের ঢেউ আর লঞ্চের আওয়াজে সে-চিৎকার শোনা গেল না। আরও বিপদ হল। লঞ্চের জন্য বড়-বড় ঢেউ উঠতে লাগল, তাতে কাকাবাবু উঠছেন আর নামছেন, তাঁকে দেখা যাবে না। কাকাবাবুর গায়ে কালো কোট, আলো পড়লেও মনে হবে, কিছু একটা ময়লা।

হলও তাই, লঞ্চটা সার্চলাইট ঘোরাতে-ঘোরাতে খানিকটা দূর দিয়ে চলে গেল। কাকাবাবু যতটা আশার আনন্দ পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি নৈরাশ্যে ভরে গেল তাঁর বুক। আর কি বাঁচার কোনও উপায় আছে ? হাত দুটোয় ব্যথা হয়ে গেছে, পা অবশ। আর ভেসে থাকতে পারছেন না। এত ক্লান্ত লাগছে যে, ইচ্ছে করছে ঘুমিয়ে পড়তে। সমুদ্রের একেবারে তলায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়াই তো ভাল। কাকাবাবুর চোখ বুজে এল।

॥ ১০ ॥

আলখাল্লা পরা লোকটি এবারে বলল, "ব্রিং দ্যাট বয়, ছেলেটিকে আমার নিকটে আনো ?"

কাকাবাবুকে ওইভাবে অজ্ঞান করে নিয়ে যেতে দেখে সন্তু দু'বার ফুঁপিয়ে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। কাকাবাবু একদিন বলেছিলেন, সব মানুষকেই একদিন না একদিন মরতে হয়। মানুষ কতরকম ভাবে মরে। কিন্তু মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আত্মসম্মান বজায় রেখে, মাথা উঁচু করে থাকতে হয়। মৃত্যুর কাছে হার মানতে নেই।

দুটি লোক সন্তকে সেই আলখাল্লাধারীর সামনে দাঁড় করাতেই সন্তু চোখ বুজে ফেলল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "হোয়াটস ইয়োর নেম ? নাম কী আছে ?"

সন্তু বলল, "সুনন্দ রায়চৌধুরী।"

"অত বড় নাম দরকার নেই। নিক নেম বলো। ছোট নাম !"

"সন্তু।"

"গুড। সনটু ? বেশ নাম আছে। তুমি চক্ষু ক্লোজ করে আছ কেন ?"

"আমার ইচ্ছে হয়েছে।"

"ওপ্‌ন ইয়োর আইস। মাই অর্ডার। চক্ষু খোলো!"

"আমি কারুর হুকুমে চোখ খুলি না, চোখ বন্ধ করি না।"

দু'পাশের লোক দুটি দু' দিক থেকে ধাঁই ধাঁই করে সন্তুর দু' গালে চড় কষাল। সন্তু একটা শব্দও করল না। চোখ বোজাই রইল।

আলখাল্লাধারী হাততালি দিয়ে উঠল।

একজন মুখোশধারী জিজ্ঞেস করল, "মাস্টার, একটা লোহা গরম করে আনব? চোখের সামনে ধরলে বাপ-বাপ বলে চোখ খুলবে।"

মাস্টার বলল, "না। ব্রেভ বয়! এরকম ছেলেই আমার চাই। ওর চোখ নষ্ট করা চলবে না। পরে ঠিক চোখ খুলবে, হি উইল ওবে মি, আমার সব কথা শুনবে। টেক হিম আপস্টেয়ার্স।"

লোক দুটো সন্তুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে চলল। দোতলা, তিনতলা পেরিয়ে চারতলার একটা ঘরে ওকে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে।

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঘরটা পরীক্ষা করে দেখল। সম্পূর্ণ ফাঁকা ঘর, কোনও কিছু নেই। দেওয়ালের রং সাদা। দুটো বড়-বড় জানলা, ভেতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া। একটা জানলার ছিটকিনি খুলে কাঠের পাল্লাটা ঠেলতেই সেটা সম্পূর্ণ খুলে গেল, জানলায় কোনও লোহার শিক বা গ্রিল নেই!

ঝড়বৃষ্টির সময় মানুষের আশ্রয় নেওয়ার জন্য এই বাড়ি তৈরি হয়েছে। এখানে কেউ সবসময় থাকে না, চোর-ডাকাতের কথাও চিন্তা করা হয়নি, তাই জানলায় গ্রিল বা শিক লাগায়নি। এরকম ঘরে সন্তুকে আটকে রেখে লাভ কী? সে তো জানলা দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারে।

সন্তু মাথা বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকাল। চারতলা, এখান থেকে লাফালে হাড়গোড় টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। বাইরের দেওয়ালে পা রাখার কোনও জায়গা নেই। কাছাকাছি কোনও জলের পাইপও চোখে পড়ল না।

সন্তু আরও অনেকটা ঝুঁকে ওপরে ছাদের দিকটা দেখে নিল। তারপর জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে বসে রইল লক্ষ্মী ছেলে হয়ে।

ঘণ্টাখানেক বাদে দরজা খুলে একজন একটা প্লেটে তিনখানা পরোটা আর আলুর দম দিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে খেতে শুরু করে দিল সন্তু। হাতের সামনে খাবার পেলে সে অবহেলা করে না। এর পর আবার কখন খাবার জুটবে কি জুটবে না, তার ঠিক নেই।

খাবার দিয়েছে, কিন্তু জল দিল না? পরোটা খেলেই জল তেষ্টা পায়। সন্তু ভাবল, একজন কেউ নিশ্চয়ই প্লেটটা ফেরত নিতে আসবে, তখন তার কাছে জল চাইবে। হয়তো দিতে ভুলে গেছে। কিন্তু কেউ আর এল না।

ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। মাঝে-মাঝে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিছু লোক চলে যাচ্ছে এ-ঘরের পাশ দিয়ে। এ-ঘরে বিছানা নেই, একটা শতরঞ্চি

বা মাদুর পর্যন্ত নেই, ওরা কি ভেবেছে, সন্তু মেঝেতে শুয়ে ঘুমোবে ? দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইল সন্তু ।

একসময় সব শব্দ থেমে গেল । মাঝরাত পেরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই । তবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সন্তু । তারপর উঠে একটা জানলার পাল্লা খুলে দেখল । তারপর সেই জানলার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটা বার করে দিল বাইরে । নীচের দিকে নামবার উপায় নেই । কিন্তু খানিকটা উঁচুতে ছাদের কার্নিস । হাত তুলে ছোঁয়া যায় । সেটা ধরে ঝুলতে-ঝুলতে ওপরে ওঠা যাবে কী করে ? সে-চিন্তা না করে সন্তু দু' হাতে ছাদের কার্নিস ধরে ঝুলে পড়ল । হাত একটু আলগা হলেই সোজা নীচে পড়ে যাবে । শরীরটাকে দোলাতে-দোলাতে একবার উলটো সামার সল্ট দিয়ে সন্তু উঠে পড়ল কার্নিসের ওপর । তার শরীরটা কাঁপছে । একচুল এদিক-ওদিক হলে একেবারে আছড়ে পড়ত নীচে । আবার তার মুক্তির আনন্দও হচ্ছে ।

ছাদটা বিরাট, ফুটবল খেলার মাঠের মতন । আকাশ অন্ধকার বলে সমুদ্রের কিছুই দেখা যায় না । খানিকটা দূরে সমুদ্রের ওপর একটা আলো জ্বলছে । অস্পষ্টভাবে মনে হল, ওখানে একটা লঞ্চ বা স্টিমার দাঁড়িয়ে আছে । ওটা কাদের ? এদেরই নাকি ? কাকাবাবুকে কি সত্যিই সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, না কোথাও আটকে রেখেছে ? অজ্ঞান অবস্থায় সমুদ্রে ফেলে দিলে কাকাবাবু বাঁচবেন কী করে ? কাকাবাবু প্রায়ই বলেন, 'আমার চার্মড লাইফ । মহাভারতের ভীষ্মের মতন আমার ইচ্ছামৃত্যু । অন্য কেউ আমাকে মারতে পারবে না ।'

ছাদ থেকে নামার সিঁড়ির মুখে কোনও দরজা নেই । সন্তু পা টিপে-টিপে নেমে এল । চারতলায় লম্বা টানা বারান্দা, তার দু' দিকে সারি-সারি ঘর । সন্তু যে-ঘরে ছিল, সেটা ছাড়া আর সব ঘরের দরজা খোলা । এখানকার সকলেই ওই মাস্টার নামের লোকটার কথায় ওঠে-বসে । কেউ পালাতে চায় না ?

সন্তু খুব সন্তর্পণে একটা ঘরে উঁকি মারল । মেঝেতে শতরঞ্চি পাতা । সে-ঘরে দুটি ছেলে ঘুমিয়ে আছে । সন্তু নিশ্বাস বন্ধ করে তাদের কাছে গিয়ে মুখ দেখল । তারই বয়েসী দুটি ছেলে, অচেনা ।

বেরিয়ে গিয়ে অন্য একটা ঘরে ঢুকল । চতুর্থ ঘরটায় সে দেখতে পেল জোজোকে । অন্য ছেলেটি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে আছে, জোজো ঘুমোচ্ছে চিত হয়ে । সন্তু একটা বড় নিশ্বাস ফেলল । উঃ কতদিন পর দেখা হল জোজোর সঙ্গে ! কলকাতায় একদিন দেখা না হলেই মনটা ছটফট করত ।

সন্তু আস্তে-আস্তে ঠেলা দিতে লাগল জোজোকে । সে জানে, জোজোর গাঢ় ঘুম, সহজে ভাঙে না । হঠাৎ জেগেই না চেঁচিয়ে ওঠে ! কয়েকবার ঠেলার পর জোজো চোখ মেলে তাকাতেই সন্তু নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "চুপ ! কোনও কথা বলিস না । আমি সন্তু, উঠে আয় ।"

জোজো স্থির চোখে সন্তুর দিকে তাকিয়ে শুয়েই রইল।

সন্তু হ্যাঁচকা টানে তাকে উঠিয়ে বলল, "সময় নষ্ট করা চলবে না। শিগগির চল!"

জোজোর হাত ধরে ঘরের বাইরে এসে সন্তু দৌড়ল সিঁড়ির দিকে। এখনও কোথাও কেউ জাগেনি। কামাল আর আলিকে কোথায় আটকে রেখেছে? ওদের খুঁজতে হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই আমাকে আগে দেখতে পাসনি?"

জোজো কোনও উত্তর দিল না।

সন্তু আবার বলল, "ওই আলখাল্লা পরা লোকটার পায়ে হাত দিচ্ছিলি কেন? লোকটা কে?"

জোজো এবার থমকে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বলল, "আই অ্যাম আর নাম্বার ফোর্টিন, হু আর ইউ?"

সন্তু দারুণ অবাক হয়ে বলল, "সে কী রে জোজো? তুই আমায় চিনতে পারছিস না? আমি আর কাকাবাবু তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি।"

জোজো আবার একই সুরে বলল, "আমার নাম্বার আর ফোর্টিন, তোমার নাম্বার কত?"

সন্তু বলল, "অত জোরে কথা বলিস না। নাম্বার আবার কী?"

জোজো নিজের হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে আরও জোরে চিৎকার করল, "মিস্টার এক্স, মিস্টার এক্স কাম হিয়ার!"

সন্তু এবার জোজোর মুখ চেপে ধরে কাতরভাবে বলল, "জোজো কী করছিস? এত কষ্ট করে তোর জন্য এলাম—"

জোজো আবার মিস্টার এক্স-এর নাম ধরে ডাকল।

এবার চারতলা থেকে নেমে আসতে লাগল একজন মুখোশধারী। নীচের তলা থেকেও দু'জন উঠে আসছে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতন সন্তু একবার নীচে খানিকটা নেমে গিয়ে আবার উঠে এল ওপরে। তিনজন একসঙ্গে চেপে ধরল সন্তুকে, জোজো তার মুখে একটা ঘুসি মেরে বলল, "আই ওবে দ্য মাস্টার!"

আগের ঘরটাতেই আবার নিয়ে আসা হল সন্তুকে, তবে এবার হাত-পা বেঁধে রেখে গেল।

সেই অবস্থাতেই সন্তুর কেটে গেল পরের সারাদিন। কেউ তাকে একফোঁটা জলও দিল না। কিছু খাবারও দিল না। তার খোঁজ নিতেও এল না কেউ। খিদের চেয়েও সন্তুর জলতেষ্টা পাচ্ছে বেশি। তবু সে নিজের মনকে বোঝাচ্ছে যে, আগেকার দিনে বিপ্লবীরা জেলখানায় নির্জলা অনশন করতেন। যতীন দাস বেঁচে ছিলেন তেষট্টিদিন! তার তো কেটেছে মাত্র দেড়দিন। এসব ভেবেও মন মানে না, বারবার সে শুকনো ঠোঁট চাটছে জিভ দিয়ে।

পা বাঁধা থাকলেও সে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে এসেছে জানলার ধারে। জানলাটাও খুলতে পেরেছে। সারাদিন তার কেটে গেল জানলার ধারে। অনেকখানি সমুদ্র দেখা যায়, মাঝে-মাঝে দু-একটা ভটভটি নৌকো আর স্পিড বোট যাচ্ছে। এই দ্বীপের কাছে কেউ আসে না। কালকে দূর থেকে এই দ্বীপটাকে কী সুন্দর আর নির্জন দেখাচ্ছিল অথচ এখানে কতসব কাণ্ড চলছে।

এত ছেলেকে এখানে চুরি করে আনার উদ্দেশ্যটা ঠিক কী, এখন বোঝা যাচ্ছে না। ওই যে আলখাল্লা পরা লোকটাকে সবাই মাস্টার অর্থাৎ প্রভু বলে, সেই লোকটার সব হুকুম এখানে সবাই অন্ধের মতন মেনে চলে। লোকটার একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক ক্ষমতা আছে, চোখ দিয়ে সবাইকে বশ করে ফেলে। ওর চোখের মণিদুটো হিরের মতন জ্বলজ্বল করে। সন্তু দূর থেকে দেখেছে, ওর সামনে গিয়ে সেজন্যই চোখ বুজে থেকেছে।

মুখোশধারী এখানে পাঁচ-ছ'জন আছে, তারা কর্মী, এই জায়গাটা পাহারা দেয়, অন্য কাজকর্ম করে। মুখোশ পরে থাকে কেন কে জানে! বাইরের লোকদের ভয় দেখাবার জন্য? তাদের চেয়ে কিন্তু জোজো আর তার বয়েসী ছেলেদের খাতির বেশি। এদের পোশাকও ভাল, সাদা ফুলপ্যান্ট আর নীল রঙের কোট। সারাদিন ধরে ওই ছেলেদের নানারকম ব্যায়াম করতে দেখেছে সন্তু। আশ্চর্য ব্যাপার, তারা কেউই প্রায় কোনও কথা বলে না। হাঁটা-চলা যন্ত্রের মতন। ওদের মধ্যে জোজোও আছে।

জোজোর দিকে যতবার চোখ পড়ছে, ততবার চোখ ফেটে জল আসছে সন্তুর। জোজো বেশ জোরে একটা ঘুসি মেরেছিল, চোয়ালে ব্যথা হয়ে আছে। জোজো তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সে তাকে ঘুসি মারল? জোজোই কাল রাত্রে তাকে ধরিয়ে দিল! জোজো কি সত্যি জীবন্ত রোবট হয়ে গেছে?

সন্তু কিছুতেই হার স্বীকার করবে না। কিছুতেই ওই লোকটাকে মাস্টার বলে ডাকবে না। ওরা যদি তার চোখ গেলে দেয়, কেটে কুচি-কুচি করেও ফেলে, তবু সন্তু রোবট হবে না। সে মানুষ হয়েই মরবে।

সেই আলখাল্লা পরা মাস্টারকে অবশ্য দিনের বেলা একবারও দেখা যায়নি। কাল ছাদ থেকে যেটাকে লঞ্চ বলে মনে হয়েছিল, সেটা সত্যিই একটা লঞ্চ, এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এই দ্বীপ থেকে একটি স্পিড বোট মাঝে-মাঝে যাতায়াত করছে সেটার কাছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল, সন্তু দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়। নীচে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওপর তলাতেও কোনও লোকজনের শব্দ নেই। সবাই কোথাও চলে গেল নাকি? মাঝে-মাঝে কি ওরা এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়? সন্তুর কথা কি সবাই ভুলে গেছে? এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার তো কোনও উপায়ই নেই। কেউ যদি এখানে না থাকে, তা হলে সন্তু না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে! কাকাবাবু বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আসবেন। আর যদি

বেঁচে না থাকেন... নাঃ, তা হলেও সন্তু না খেয়ে মরতে রাজি নয়। আজ রাতটা সে দেখবে, তারপর জানলায় উঠে ঝাঁপ দেবে নীচে।

আর একটু রাত হওয়ার পর দরজা খুলে গেল। দু'জন মুখোশধারী এসে তার পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে দড়িটা বাঁধল কোমরে। তারপর দড়িটা ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল নীচে। সন্তু যেন একটা গোরু কিংবা ছাগল।

অনেকটা হাঁটিয়ে সন্তুকে তারা একটা স্পিড বোটে তুলল। সেটা যেতে লাগল লঞ্চটার দিকে। সন্তু একবার ভাবল, হাত-বাঁধা অবস্থায় সমুদ্রে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু তার কোমরের দড়িটা একজন শক্ত করে ধরে আছে। দেখা যাক এর পরে কী হয়?

লঞ্চের ভেতরে একটা বড় হলঘরের মতন। সেখানে বসে আছে জোজোর বয়েসী সবক'টি ছেলে। সন্তুকে বসিয়ে দেওয়া হল তাদের একপাশে। মাস্টারের আজ অন্যরকম পোশাক, সাদা প্যান্টের ওপর একটা লম্বা কালো মখমলের কোট, সেটা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা, বুকপকেটে একটা সাদা ফুল গোঁজা। একটা ছোট টেবিলের ওপাশে সেই সিংহাসনের মতন উঁচু চেয়ারটা রাখা হয়েছে। মাস্টার তাতে বসেনি, দাঁড়িয়ে আছে, হাতে সেই সোনালি দণ্ড।

সন্তুকে দেখে মাস্টার বলল, "ওয়েলকাম অন বোর্ড।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে চোখ বুজে ফেলল।

মাস্টার হেসে বলল, "খুলবে, খুলবে, চোখ খুলবে। যখন জানবে তোমার সামনে কী দারুণ ফিউচার আমি তৈরি করে দেব।"

তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বলল, "বয়েজ, তোমাদের পারফরমেন্স দেখে আমি খুশি! তোমাদের ট্রেনিং এখানে অর্ধেক কমপ্লিট হয়েছে। এখানে বাইরের লোক এসে ডিসটার্ব করছে, তাই আমরা অন্য জায়গায় চলে যাব। তোমরা হবে আমার প্রাইভেট আর্মি। তোমাদের কেউ বন্দি করতে পারবে না, কোনও কারাগার তোমাদের আটকে রাখতে পারবে না। অসীম শক্তি হবে তোমাদের।"

সন্তু জোজোর চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করছে, কিন্তু জোজো তার দিকে তাকাচ্ছেই না একেবারে, সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মাস্টারের দিকে।

মাস্টার বলে চলেছে, "তোমরা কেউ কারও নাম করবে না, সবাই এক-একটা নাম্বার, তবু প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করবে। আমি তোমাদের সুপ্রিম কম্যান্ডার। আমি যখন তোমাদের যে-কোনও জায়গায় যেতে বলব, তোমরা যাবে। কোনও প্রশ্ন করবে না। বুঝেছ?"

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, "ইয়েস মাস্টার!"

মাস্টার আবার বলল, "তোমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ থাকবে না। আমিই তোমাদের সব। তার বদলে তোমরা চমৎকার জায়গায় থাকবে। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল খাবার খাবে। বুঝেছ?"

আবার সবাই বলে উঠল, "ইয়েস মাস্টার !"

মাস্টার বলল, "তোমাদের ট্রেনিং যখন কমপ্লিট হবে..."

হঠাৎ এই সময় বাইরে একটা গুলির শব্দ হল। খুব কাছেই। একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, "পুলিশ ! তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। সারেন্ডার করো। সবাই হাত তুলে দাঁড়াও। নইলে গুলি করা হবে !"

সন্তুর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। এ তো কাকাবাবুর গলা !

একটা ছোট লঞ্চ এসে এর পাশে ভিড়েছে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু, তাঁর হাতে একটা রাইফেল। আরও চারজন পুলিশ তাঁর পাশে রাইফেল উঁচিয়ে আছে।

মাস্টার জানলা দিয়ে দেখল বাইরে। সে একটুও চঞ্চল হল না। ছেলেদের বলল, "তোমরা চুপ করে বসে থাকো। তোমরা ভয় পাবে না জানি। পৃথিবীর কোনও কিছুকেই তোমরা ভয় পাবে না।"

তারপর তার মুখে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত হাসি।

কাকাবাবুর বগলে একটামাত্র ক্রাচ, তাও বাঁশের তৈরি। তিনি সেটাকে প্রথমে এই লঞ্চের ওপর ছুড়ে দিলেন, তারপর লাফিয়ে চলে এলেন এদিকে। জানলায় দেখতে পেলেন মাস্টারের মুখ।

কাকাবাবু তাকে বললেন, "হাত তুলে বাইরে এসো। তোমার খেলা শেষ।"

মাস্টার বলল, "আমি পৃথিবী জয় করতে চলেছি, আর আমার খেলা শেষ করবে একটা খোঁড়া লোক ? আর কয়েকটা সেকেলে বন্দুকধারী সেপাই ? হাঃ হাঃ হাঃ, তুই আবার মরতে এসেছিস ! দ্যাখ এবার কী হয় !"

এই লঞ্চ থেকে কেউ দুটো বোমা ছুড়ে দিল পুলিশের লঞ্চে। সাধারণ বোমা নয়, শব্দ হল না, ফাটল না। তার ভেতর থেকে আগুন বেরুল প্রথমে, তারপর গলগলিয়ে ধোঁয়া। পুলিশ চারজন ঘাবড়ে গিয়ে এলোমেলো গুলি চালাল কয়েকবার, তারপর তাদের হাত থেকে বন্দুক খসে গেল, তারা নিজেরাও নেতিয়ে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

কাকাবাবু পেছন ফিরে ব্যাপারটা দেখলেন। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন ঘরটায়। রাইফেল তুলে বললেন, "ওতে কোনও লাভ হবে না। আর একটা বড় জাহাজ-ভর্তি সৈন্য আসছে পঞ্চাশজন। একটু পরেই এসে পড়বে। তাদের ওই ধোঁয়া দিয়ে কাবু করতে পারবে না। ততক্ষণ কেউ নড়বে না। এদিক-ওদিক করলেই আমি গুলি চালাব !"

মাস্টার আবার হেসে উঠে বলল, "বটে ? গুলি চালাবে ? গুলি চালিয়ে ক'জনকে মারবে ? ঠিক আছে, তুমি প্রথমে একে মারো।"

জোজোর দিকে আঙুল তুলে বলল, "আমি জানি, তুমি এই ছেলেটির খোঁজে এসেছ, তাই না ?"

সে জোজোকে হুকুম দিল, "রোবট নাম্বার ফোর্টিন, যাও, এগিয়ে যাও, গো, গেট হিম।"

জোজো স্প্রিং-এর মতন দাঁড়িয়ে পড়ে দু'হাত মেলে এগিয়ে গেল কাকাবাবুর দিকে। একেবারে রাইফেলের নলের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল।

কাকাবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "জোজো, এ কী করছ? সরে যাও। আমার সামনেটা ক্লিয়ার করে দাঁড়াও!"

জোজো যেন সে-কথা শুনতেই পেল না।

মাস্টার আবার হুকুম দিল, "গ্র্যাব হিম! গেট দা রাইফেল!"

জোজো এবার কাকাবাবুর রাইফেলটা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল।

সন্তুর খুব ইচ্ছে হল কাকাবাবুকে সাহায্য করার জন্য ছুটে যেতে। কিন্তু তার হাত পেছন মুড়ে বাঁধা। কোমরের দড়িটা একজন ধরে আছে। তবু সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই সেই লোকটি আবার জোর করে বসিয়ে দিল।

কাকাবাবু চিৎকার করছেন, "জোজো, ছাড়ো, ছাড়ো। হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যাবে! জোজো, প্লিজ, প্লিজ, ওরা তোমার শত্রু, ওদের সাহায্য কোরো না।"

মাস্টার আরও কয়েকটি ছেলেকে বললেন, "যাও, ওকে চেপে ধরো। গ্র্যাব হিম।"

চারটি ছেলে ছুটে গিয়ে কাকাবাবুর কেউ গলা টিপে ধরতে গেল, কেউ কোমরটা জাপটে ধরল। কাকাবাবু খুব অসহায় হয়ে পড়লেন। জোজোর কাছ থেকে তিনি রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিয়েছেন বটে, কিন্তু জোজোকে তিনি মারবেন কী করে? সে প্রশ্নই ওঠে না। সন্তুর বয়েসী অন্য ছেলেগুলোকে মারতেও তাঁর হাত উঠল না।

তিনি রাইফেলটা ফেলে দিয়ে হাত দিয়ে ঠেলে-ঠেলে ছেলেগুলোকে সরাবার চেষ্টা করলেন।

রাইফেলটা পড়ামাত্র কয়েকজন মুখোশধারী ছুটে গিয়ে কাকাবাবুকে দেওয়ালে ঠেসে ধরল।

মাস্টার এবারে তৃপ্তির হাসি দিয়ে বলল, "ফিনিশ্‌ড! ক' মিনিট লাগল? বয়েজ, তোমরা খুব ভাল কাজ করেছ। এক্সেলেন্ট! দেখলে তো, তোমাদের কেউ হারাতে পারবে না। তোমরা সবসময় জিতবে!"

তারপর কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই লোকটা বেঁচে ফিরে এল কী করে? ঠিকমতন ওকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তো? ঠিক আছে, এবারে ওকে এমন শিক্ষা দেব, ওকে আমি একটা কুকুর বানাব। ও আমার সব কথা শুনবে, আমার পায়ের কাছে কাছে থাকবে! ওকে আমার প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে এসো! তোমরা সবাই বসে থাকো!"

পেছনদিকের দরজা খুলে একটা ছোট ঘরে গেল মাস্টার। মুখোশধারীরা কাকাবাবুকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে চলল সেই দিকে।

সেই ছোট ঘরখানা নানারকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। একটা টেবিল আর দুটো চেয়ারও রয়েছে। মুখোশধারীদের চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করে সে কাকাবাবুকে বলল, "বোসো! আর দশ মিনিটের মধ্যে তুমি তোমার নিজের নামটাও ভুলে যাবে। তোমাকেও একটা মুখোশ পরিয়ে দেব, তুমি নিজের মুখটাও আয়নায় দেখতে পাবে না। তুমি হবে আমার স্লেভ। আমি মাস্টার, তুমি স্লেভ।"

কাকাবাবুর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, তিনি বললেন, "তুমি তো দেখছি একটা পাগল!"

লোকটি গর্জন করে উঠে বলল, "কী, পাগল? এখনও তুমি আমার সব ক্ষমতা দ্যাখোনি।"

কাকাবাবু বললেন, "এত ছেলেকে তুমি চুরি করে আনিয়েছ কী মতলবে? সব এক বয়েসী?"

লোকটি বলল, "বাছাই-করা ইন্টেলিজেন্ট ছেলে। ঠিক এই বয়েসটাতে ভাল ট্রেনিং নিতে পারে। এই বয়েসের ছেলেরা বিপ্লব করে। যুদ্ধে যায়। এরা মরতে ভয় পায় না। এরা কোনওদিন লিডারের কথার অবাধ্য হয় না। আমি শুধু লিডার নই, আমি ওদের মাস্টার, ওদের প্রভু। ওরা আরও ওই বয়েসী ছেলে জোগাড় করে আনবে। একটা বিশাল আর্মি হবে। আমি ওদের দেশে-দেশে ছড়িয়ে দেব! ওরা সব ব্যাঙ্ক ভেঙে টাকা লুট করে আনবে। অস্ত্রশস্ত্র লুট করে আনবে। পৃথিবীর সব টাকা আমার হবে। আমি হব পৃথিবীর রাজা! তুমি হবে আমার চাকর! আমার পা চাটবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এ যে বদ্ধ উন্মাদের মতন কথা! পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি? হিটলার হতে চাও!"

লোকটি রাগে নিশপিশ করতে-করতে বলল, "হিটলার যা পারেনি, আমি তাই দেখিয়ে দেব! আমি পৃথিবীর যে-কোনও মানুষকে বশ করতে পারি। আমার চোখের সামনে কেউ পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে পারে না। এইবার দ্যাখো!"

সে কাকাবাবুর চোখের সামনে হাত ঘুরিয়ে সম্মোহনের ভঙ্গি করল।

কাকাবাবু অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর বললেন, "এই মুহূর্তটির জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। একজনের কাছে আমি শপথ করেছিলাম, আমার ওপর কেউ এই বিদ্যে ফলাবার চেষ্টা না করলে আমি নিজে থেকে কক্ষনও কাউকে হিপনোটাইজ করব না। এখন আর বাধা নেই। শোনো, তুমি ওই ছোট-ছোট ছেলেগুলোকে সম্মোহিত করে রেখেছ বলে ভাবছ যে আমাকেও পারবে? ওহে, আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী, আমাকে সম্মোহিত করে এমন সাধ্য দুনিয়ায় কারও নেই!"

লোকটি এবার চমকে উঠে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী? তুমি?"

কাকাবাবু বললেন, "নাম শুনেছ তা হলে?"

লোকটি টেবিলের ওপর একটা বেল বাজাবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু তার

হাত চেপে ধরলেন। কড়া গলায় বললেন, "তোমার পাঁচ মিনিট লাগে, আমার তাও লাগে না।"

লোকটি মুখ নিচু করে ফেলেছিল, কাকাবাবু তার চিবুকটা ধরে উঁচু করে দিলেন। সে তবু দুর্বলভাবে বলল, "পারবে না, তুমি আমাকে পারবে না! তার আগে আমি তোমাকে—"

দু'জনে দু'জনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। মাস্টারই আগে চোখ বুজে ফেলল। কাকাবাবু জলদমন্দ্র স্বরে ধমক দিলেন, "চোখ খোলো!"

সঙ্গে-সঙ্গে সে আবার চোখ খুলল। তার চোখের মণি স্থির হয়ে গেছে। পলক পড়ছে না।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

সে বলল, "আমি তোমার ভৃত্য!"

কাকাবাবু আবার বললেন, "তুমি আমার সব কথা মেনে চলবে?"

সে বলল, "ইয়েস মাস্টার!"

কাকাবাবু বললেন, "প্রমাণ দাও, এই দেওয়ালে তিনবার মাথা ঠোকো!"

সে অমনই পেছন ফিরে দড়াম-দড়াম করে বেশ জোরে মাথা ঠুকল তিনবার।

কাকাবাবু বললেন, "হাত দুটো মাথার ওপরে তোলো! এইবার চলো ওই ঘরটায়!"

লোকটি থপ-থপ করে এগিয়ে চলল। দরজাটা খুলে বড় ঘরটায় এসে কাকাবাবু বললেন, "এদের সবাইকে বলো, যে যেখানে বসে আছে, সেখানেই থাকবে। কেউ যেন আমার গায়ে হাত না দেয়।"

লোকটি বলল, "সবাই বসে থাকো। ইনি তোমাদের মাস্টারের মাস্টার। কেউ এর গায়ে হাত দেবে না!"

কাকাবাবু ক্রাচটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই সন্তুর হাতের বাঁধন খুলে দিলেন। সন্তু নিজেই এর পরে খুলে নিল কোমরের দড়ি।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মাথায় ডাণ্ডা দিয়ে কে মেরেছিল, তুই দেখেছিস?"

কোনও একজন মুখোশধারীকে সন্তু মারতে দেখেছিল। কিন্তু এদের মধ্যে ঠিক কোনজন তা বুঝতে পারল না।

কাকাবাবু আবার মাস্টারের কাছে এসে বললেন, "কে আমাকে মেরেছিল? বলো!"

সে আঙুল তুলে একজন মুখোশধারীকে দেখিয়ে দিল।

কাকাবাবু একটানে তার মুখোশটা টেনে খুলে দিলেন। মাথাজোড়া টাক, ভুরু নেই, এই সেই লোকটি।

কাকাবাবু বললেন, "তুবরক! তুমি এখানে এসে জুটেছ? ম্যাজিশিয়ান

মিস্টার এক্স কোথায় ? ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে। শোনো, আমার গায়ে যে হাত তোলে, তাকে আমি ক্ষমা করি না। এ-ব্যাপারে আমার কোনও দয়ামায়া নেই ! মানুষকে যখন মারো, তখন মনে থাকে না যে তোমাকেও ওইরকমভাবে কেউ মারলে কেমন লাগবে ? এবার দ্যাখো কেমন লাগে।"

ক্রাচটা তুলে কাকাবাবু দড়াম-দড়াম করে তাকে দু'বার মারলেন। তার কানের পাশটায় কেটে গিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল।

কাকাবাবু এবার মাস্টারের দিকে ফিরে বললেন, "তুমি এত ছেলের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে ! মা-বাবার কাছ থেকে ওদের কেড়ে এনেছ ! ওরা মেসমেরাইজ্‌ড হয়ে আছে। ওটা কী করে কাটিয়ে দিতে হয় তাও আমি জানি। তুমি আমাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। অর্থাৎ তুমি একটা খুনি। এবার তোমার কী শাস্তি হবে ?"

সন্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কাকাবাবু সরে যাও, সরে যাও, তোমার পেছনে—"

মেঝেতে পড়ে থাকা রাইফেলটা তুলে সে তক্ষুনি একবার গুলি চালিয়ে দিল !

একজন মুখোশধারী এই ঘরের বাইরে ছিল, সে একটা তলোয়ার নিয়ে চুপিচুপি পেছন দিক থেকে মারতে এসেছিল কাকাবাবুকে। প্রায় কোপ মেরেছিল আর একটু হলে, ঠিক সময় সন্তু গুলি করেছে।

লোকটি মরেনি, গুলি লেগেছে তার কাঁধে, মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। মস্ত বড় তলোয়ারটির দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন, "বাপ রে, লাগলেই হয়েছিল আর কী ! সন্তু, তুই আর একবার আমার প্রাণ বাঁচালি। আর কেউ বাইরে আছে ? মাস্টার, আর কেউ আছে বাইরে ?"

মাস্টার দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই তবু রাইফেলটা রেডি করে রাখ। আর কেউ ঢোকার চেষ্টা করলেই গুলি করবি।"

তারপর মাস্টারের দিকে ফিরে বললেন, "তোমার শাস্তি আমি ঠিক করে রেখেছি। আমার সঙ্গে তুমি যে ব্যবহার করেছ, তুমিও ঠিক সেই ব্যবহার পাবে। রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার ! আমাকে তুমি রাত্তিরবেলা মাঝসমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলে, তোমাকেও ঠিক ওই একই ভাবে এই রাত্তিরেই সমুদ্রে ফেলে দেব। তারপর তুমি বাঁচতে পারো কি না দ্যাখো !"

॥ ১১ ॥

এর পর তিনদিন কেটে গেছে।

কাকাবাবু আর সন্তুর কলকাতায় ফেরা হচ্ছে না। কক্সবাজারে তাদের খাতিরযত্নের অন্ত নেই। যে ছেলেগুলোকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ন'জনই বাংলাদেশের। বিভিন্ন জেলা থেকে এদের চুরি করা হয়েছিল। তাদের আনন্দের শেষ নেই। নিপু নামে ছেলেটির বাবা নিজে ছুটে এসেছেন এখানে, কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, "রায়চৌধুরীদাদা, আপনি শুধু আমার ছেলেকে বাঁচাননি, আমার স্ত্রীকেও বাঁচিয়েছেন, ছেলের শোকে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে খাওয়াদাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামে আমাদের বাসায় আপনাদের কিছুদিন থাকতেই হবে।"

প্রতিদিন দু' বেলাই খুব খাওয়াদাওয়া চলছে। দলে-দলে লোক আসছে কাকাবাবুকে দেখার জন্য। টুরিস্ট লজ ছেড়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে কাকাবাবু চলে এসেছেন আজ, সেখানে সহজে কেউ ঢুকতে পারে না।

মাস্টার নামে সেই লোকটিকে আর শেষপর্যন্ত সমুদ্রে ডোবানো হয়নি। তাকে ভয় দেখাবার জন্য একটা স্পিড বোটে চাপিয়ে মাঝসমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর চ্যাংদোলা করতে যেতেই সে শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়ল। হাউহাউ করে কেঁদে কাকাবাবুর পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "আমাকে বাঁচান, আমাকে দয়া করুন, আমি সাঁতার জানি না!"

এখন তাকে রাখা হয়েছে জেলে। তার বিচার বাংলাদেশে হবে, না ভারতে হবে, তা নিয়ে তর্ক শুরু হয়ে গেছে। তবে জেলের প্রহরীদের যাতে সে সম্মোহিত না করতে পারে, সেই জন্য চোখ বেঁধে রাখা হয়েছে তার।

জোজো প্রায় টানা ঘুমিয়েছে দু'দিন। কিছু খেতেও চায়নি। আজ সকাল থেকে সে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ফিরে এসেছে তার খিদে। সকালে লুচি, কিমার তরকারি ও ডাবল ডিমের ওমলেট খেয়েছে। আবার এগারোটার সময় তার খিদে-খিদে পাওয়ায় সে খেয়েছে চারটে রসগোল্লা, দুপুরে ভাতের সঙ্গে দু'রকম মাংস আর তিনরকম মাছ, আর বিকেলে চায়ের সঙ্গে একটা পদ্মফুল সাইজের কেক।

সন্ধেবেলা বাংলোর দোতলার বারান্দায় বসে গল্প করছে সবাই। এখান থেকেও সমুদ্র দেখা যায়। আস্তে-আস্তে রং পালটাচ্ছে আকাশের। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট জাহাজ, তার সারা গায়ে ঝলমল করছে আলো।

জোজো একটা সিল্কের পাজামা ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরে একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে রয়েছে। ওই পোশাক সে উপহার পেয়েছে নিপুর বাবার কাছ থেকে, সন্তুও পেয়েছে অবশ্য। কাকাবাবু কারও কাছ থেকে কিছু নেন না। জোজো একটা ইংরিজি বই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আলমারি থেকে এনে পড়ছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে জোজো, এই যে এতসব কাণ্ড ঘটে গেল, তোর মনে আছে কিছু ?"

জোজো বলল, "মনে থাকবে না কেন, সব মনে আছে !"

সন্তু বলল, "তোকে কী করে ওই দ্বীপটায় নিয়ে গেল, তুই জানিস ?"

কামাল বলল, "না, না, আর একটু আগে থেকে শুরু করো।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। কাকদ্বীপে সেই তাঁবুতে আমরা সার্কাস দেখতে গেলাম—"

সন্তু বলল, "তার মধ্যে মানুষ অদৃশ্য হওয়ার খেলা, তুই উঠে গেলি, তারপর কী হল ?"

জোজো বলল, "আমি অদৃশ্য হয়ে গেলাম !"

সন্তু, "যাঃ, তা কখনও হয় নাকি ?"

জোজো বলল, "তোরা বিশ্বাস করিস না। বলবি, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এখনও কত কী ঘটে যাচ্ছে, যার কোনও ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। আমি সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগলাম।"

সন্তু বলল, "উড়তে লাগলি, মানে ঘুড়ির মতন ?"

জোজো বলল, "ঘুড়ি কেন হবে ? আমায় কেউ সুতো বেঁধে রাখেনি। পাখির মতন আমি যেদিকে খুশি উড়ে বেড়াচ্ছিলাম।"

সন্তু বলল, "তারপর আমরা যে তোর কত খোঁজ করেছিলাম, তুই সব দেখতে পেয়েছিলি ?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ। সব দেখতে পাচ্ছিলাম।"

সন্তু বলল, "দেখতে পেয়েও তুই আমাদের সঙ্গে কথা বলিসনি কেন ?"

জোজো বলল, "বাঃ, অদৃশ্য হলে তো শরীরটাই থাকে না। মুখও থাকে না। মুখ না থাকলে কথা বলব কী করে ?"

সন্তু বলল, "মুখ না থাকলে তো চোখও থাকবে না। তা বলে তুই দেখতে পেলি কী করে ?"

কামাল হেসে ফেলতেই কাকাবাবু বললেন, "এই সন্তু, তুই বাধা দিচ্ছিস কেন, ওকে সবটা বলতে দে ! হ্যাঁ জোজো, বলো, তারপর কী হল ?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "অদৃশ্য হলে শরীর থাকে না, শুধু প্রাণটা থাকে। তাতে সব শোনা যায়, দেখা যায়, কিন্তু কথা বলা যায় না। সেইরকম উড়তে-উড়তে হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। মাঠের মধ্যে একটা বেশ বড় আর উঁচু রথ দাঁড়িয়ে আছে, সেটাও অদৃশ্য !"

কামাল জিজ্ঞেস করল, "রথ অদৃশ্য মানে ?"

জোজো বলল, "অদৃশ্য মানে অদৃশ্য ! অন্য কেউ সেটা দেখতে পাচ্ছে না। কেউ পাশ দিয়ে গেলে সেটার সঙ্গে ধাক্কাও লাগছে না। তখন আমি বুঝলাম, ওটা রথ নয়, একটা মহাকাশ রকেট, অন্য গ্রহ থেকে এসেছে। তার মানে

বাইরে থেকে এরকম অনেক রকেট পৃথিবীতে আসে, অদৃশ্য হয়ে থাকে বলে আমরা কেউ টের পাই না। ওই ম্যাজিশিয়ানটা তো অন্য গ্রহের প্রাণী, মানুষ নয়, ইচ্ছেমতন মানুষের রূপ ধরতে পারে। রাত্তিরবেলা সেই ম্যাজিশিয়ান আর তার সহকারীও অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেই রকেটে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও।"

সন্তু আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু বললেন, "চুপ ! বলো জোজো, দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে।"

জোজো বলল, "তারপর অন্য একটা গ্রহে পৌঁছে গেলাম।"

এবার কাকাবাবু নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন লাগল ?"

জোজো বলল, "অদৃশ্য রকেটের যে কী দারুণ স্পিড হয়, আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। এই যে আমেরিকানরা 'পাথফাইন্ডার' নামে একটা রকেট পাঠিয়েছে মঙ্গল গ্রহের দিকে, সেটা পৌঁছতে সাত মাস সময় লাগবে। এই রকেটটা পৌঁছে গেল সাত ঘণ্টায়। কিংবা আট ঘণ্টাও হতে পারে, আমার হাতে তো ঘড়ি ছিল না। মাঝখানে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। আমাদের চাঁদের পাশ দিয়ে সাত করে চলে গেল, এটা বেশ মনে আছে।"

কামাল জিজ্ঞেস করল, "সেটা কোন গ্রহ ?"

জোজো বলল, "তা ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো মঙ্গল গ্রহ হবে, সেটাই তো সবচেয়ে কাছে। আসলে ব্যাপার কী, এই যে মঙ্গল গ্রহ, বৃহস্পতি বা শনি, এই গ্রহদের আমরা নাম দিয়েছি, আমাদের দেওয়া এই নাম তো ওরা জানে না। ওরা অন্য নাম দিয়েছে। ওটা যদি মঙ্গল গ্রহ হয়, সেটার নাম ওরা দিয়েছে ককেটু।"

হেসে ফেলতে গিয়েও চেপে গিয়ে সন্তু বলল, "ককেটু ? বেশ নাম।"

জোজো বলল, "এই যে আমরা আমাদের গ্রহের নাম দিয়েছি পৃথিবী, সেটা তো ওরা জানে না। ওরা পৃথিবীকে বলে গিংগিল !"

কাকাবাবু নিজেই হাসতে-হাসতে বললেন, "গিংগিল, বাঃ এটাও বেশ ভাল নাম। তারপর তোমার ককেটু কেমন লাগল ?"

জোজো বলল, "যেই ওখানে পৌঁছলাম, অমনই অদৃশ্য থেকে দৃশ্য হয়ে গেলাম। মানে শরীরটা ফিরে এল। আর শরীরটা ফিরে আসামাত্র খিদে পেয়ে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "প্লেনে যাওয়ার সময় যেমন কিছু খেতে দেয়, তেমনই রকেটে কিছু খাবারদাবার দেয়নি ?"

জোজো বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বলল, "আবার ভুল করছেন, কাকাবাবু। অদৃশ্য অবস্থায় মুখই তো থাকে না, তখন খিদে পেলেও কিছু খাওয়ার উপায় নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই তো, ঠিকই ! আমারই ভুল। ওরা খেতে দিল ?

কী খেতে দিল ?”

জোজো বলল, “ভাত খায় না। ভাত কাকে বলে জানেই না। রুটিও চেনে না। চাওমিন খায়, অনেকটা চাওমিনের মতন আর কী! তার সঙ্গে একটা মাংস মিশিয়ে দেয়, সেটা কীসের মাংস ঠিক বুঝতে পারিনি। ইমপোর্ট করে আনে। মানে, অন্য গ্রহ থেকে নিয়ে আসে। চমৎকার খেতে, মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। ওদের সব শহর মাটির নীচে। ওপরটা তো খুব গরম। মাটির নীচে বেশ ঠাণ্ডা। ওখানকার প্রাণীরা খুব উন্নত, সায়েন্সের আবিষ্কারে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। যাতায়াতের অনেক সুবিধে। আমাদের এই যে মোটরগাড়ি, বাস, ট্রেন, এসব কিছু নেই। প্রত্যেকে হাতের সঙ্গে দুটো ডানা লাগিয়ে নেয়, তাতে যন্ত্র ফিট করা আছে, সাঁ করে উড়ে যাওয়া যায়। সবাই উড়ে বেড়ায়, কোনও অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার চান্স নেই, কী সুন্দর দেখায়, মনে হয়, সবাই যেন দেবদূত। আমি যখন উড়তাম, আমাকেও নিশ্চয়ই দেবদূত বলেই মনে হত!”

সন্তু বলল, “ছবি তুলে আনিসনি ? ইস!”

জোজো বলল, “ওখানে আমার বেশ ভাল লাগছিল। প্রাণীগুলো খুব ভদ্র। কেউ খারাপ ব্যবহার করে না। তাই আমি ওখানে থেকে গেলাম!”

সন্তু বলল, “থেকে গেলি কী রে ? আমরা তো তোকে পেলাম এখানকার একটা দ্বীপে।”

জোজো বলল, “হ্যাঁ, বলছি, বলছি। থেকেই গেলাম, মানে কয়েকটা দিন। তারপর একটু একঘেয়ে লাগতে লাগল। ওরা তো তরকারি, শাকসবজি খায় না। আমার বেগুনভাজার জন্য মন কেমন করত। খালি মনে হত, কতদিন বেগুনভাজা খাইনি। আর একটা মুশকিল, ওরা নুন খেতে জানে না। সব খাবার আলুনি। সে কি বেশিদিন খাওয়া যায় ? আমাকে পৃথিবী থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বললে কিন্তু ওরা রাজি হয় না। একটা ভূমিকম্পে ওদের অনেক লোক মারা গেছে বলে ওরা অন্য গ্রহ থেকে লোক ধরে নিয়ে যায়। তখন আর আমি কী করি, একদিন চুপিচুপি ওদের একটি রকেট হাইজ্যাক করলাম। তা ছাড়া ওদের কথাবার্তা শুনে আন্দাজ করেছিলাম যে, ওরা গিংগিল গ্রহ থেকে কয়েক লক্ষ মানুষকে ধরে নিয়ে যাবে। তা ওরা পারে। ওদের অস্ত্রশস্ত্র আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, ওরা লড়াই করতে চাইলে পৃথিবীর লোক পারবে না, হেরে যাবে। তাই আমার মনে হল, তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে সাবধান করে দেওয়া দরকার। দুটো লোক একটা রকেটের মধ্যে বসে কীসব করছিল, আমি ক্যারাটের প্যাঁচে তাদের কাবু করে ফেলে দিলাম নীচে। তারপর রকেটটা নিয়ে সোজা একেবারে আকাশে। ওই রকেট চালানো খুব সোজা, সব প্রোগ্রাম করা থাকে, পরদায় ফুটে ওঠে মহাকাশের ম্যাপ, তাই পৃথিবী খুঁজে পেতে দেরি হল না। জানিস সন্তু, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর চাইনিজ ওয়াল

দেখা যায়, আইফেল টাওয়ার দেখা যায়, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, আমাদের তাজমহলও দেখা যায়। মুশকিল হল, ল্যান্ড করব কোথায়, কীভাবে ল্যান্ড করব, সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। রকেটের মধ্যে ঢোকামাত্র আমি আবার অদৃশ্য, তার মানে শরীরটা নেই। এটা ওরা ভাল বুদ্ধি বার করেছে, অদৃশ্য হয়ে থাকলে জবরজং পোশাক পরতে হয় না, অক্সিজেনেরও সমস্যা নেই। পৃথিবীতে ফিরে শরীরটা আবার ফিরে পাব কি না সেটাও ভাবছিলাম। ল্যান্ড করার উপায় না পেয়ে পড়লাম এসে সমুদ্রে। রকেটটা চুরমার হয়ে গেল, আমি একটু আগে লাফিয়ে পড়েছিলাম বলে আমার লাগেনি। জলে ভাসতে-ভাসতে হাতে চিমটি কেটে দেখলাম লাগছে কি না। এত জোর চিমটি কেটেছি যে, নিজেই উঃ করে উঠেছি। তার মানে শরীরটা ফিরে এসেছে। ব্যস, তারপর আর কী, সমুদ্রে সাঁতার কেটে, থুড়ি, ঠিক সাঁতরে নয়, রকেটের একটা ভাঙা টুকরোয় চেপে পৌঁছে গেলাম একটা দ্বীপে। সেখানে একটা সাদা বাড়ি ছিল, ঢুকে পড়লাম তার মধ্যে। সেখানে তোদের সঙ্গে দেখা হল!"

সবাই কয়েক মুহূর্ত চুপ। কামাল এরকম গল্প বলতে কাউকে আগে দেখেনি, জোজোকেও সে চেনে না। সে আর কথা বলতেও ভুলে গিয়ে হাঁ করে শুনছিল। সন্তু জোজোর কোল থেকে বইটা নিয়ে নাম দেখল। এইচ জি ওয়েল্‌স-এর লেখা 'ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস'। সন্তু জোজোর চোখের দিকে চেয়ে দু'বার মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "জোজো, তুই আমাকে আর কাকাবাবুকে কী যে বিপদে ফেলেছিলি, সেসব তোর মনে নেই?"

এই প্রথম জোজো হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "তোদের বিপদে ফেলেছি? সে কী! তোর কথা আলাদা। কিন্তু কাকাবাবুকে আমি ইচ্ছে করে বিপদে ফেলব, তা কখনও হতে পারে? অসম্ভব! কী হয়েছিল বল তো?"

কাকাবাবু বললেন, "আহা, ওসব কথা এখন থাক। এতক্ষণ জোজোর ব্রেন ওভারটাইম খেটেছে, ওকে এখন একটু বিশ্রাম করতে দে।"

কামাল এবার ধাতস্থ হয়ে বলল, "যা বলেছেন! সমস্ত ব্যাপারটাই এখন ধাঁধার মতন। আচ্ছা কাকাবাবু, আপনার ব্যাপারটাও পুরোটা শোনা হয়নি। আপনাকে সমুদ্রে ফেলে দিল, সেখান থেকে বাঁচলেন কী করে? সেটাও কি মিরাক্‌ল?"

কাকাবাবু হেসে মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন, "সেসব কিছু নয়। একটা ভাগ্যের ব্যাপার আছে বোধ হয়। আমার বাঁচার কথা ছিল না। খোঁড়া মানুষ, প্যান্ট-কোট-জুতো-মোজা পরা। তার ওপর আবার অন্ধকার, কোনদিকে যাচ্ছি বোঝার উপায় নেই, এই অবস্থায় কতক্ষণ সাঁতরে বাঁচা যায়? একটা লঞ্চ আমার কাছ দিয়ে চলে গেল, আমাকে দেখতে পেল না। তখনই বুঝলাম আর আমার বাঁচার আশা নেই। তার একটু পরেই সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল, আর পারছি না, সমুদ্রের নীচে গিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছে, চিরঘুম যাকে বলে। আমি

চিত হয়ে ভাসছিলাম তো, হাত-পা চালানো বন্ধ করে দিতেই শরীরটা সোজা হয়ে ডুবতে লাগল..."

থেমে গিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কী হল বলো তো ?"

কামাল বলল, "কোনও ফেরেশতা এসে আপনাকে বাঁচাল ?"

কাকাবাবু বললেন, "বিপদের সময় যে বাঁচায়, তাকেই দেবদূত মনে হয়। তখনও সেরকম কেউ আসেনি। এর পর যা হল, সেটাই মিরাক্‌ল বলতে পারো। শরীরটা সোজা হওয়ার পরই পায়ে কী যেন ঠেকল। প্রথমে মনে হল, হাঙর কিংবা তিমি নাকি ? তা হলেই তো গেছি ! তারপর বুঝলাম, মাটি ! আমার পায়ের নীচে মাটি ! সেখানে পানি বেশি না। সমুদ্রের মাঝে-মাঝে এরকম চড়া পড়ে। আস্তে-আস্তে সেখানে একটা দ্বীপ হয়ে যায়। জোয়ারের টানে আমি একটা চড়ায় এসে ঠেকেছি। সেখানে আমার বুকজল মাত্র। দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর ঘুমোনো হল না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেটে গেল সারারাত। ভেবে দ্যাখ দৃশ্যটা, চারপাশে সমুদ্র, তার মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সকালের দিকে ভাটা শুরু হতে পানি আরও কমে গেল। একটু বেশি বেলা হওয়ার পর একটা ভটভটি নৌকো তুলে নিল আমায়।"

কামাল জিজ্ঞেস করল, "অদ্ভুত আপনার ভাগ্য। তারপর কী করলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ভাবলাম, একা-একা ওই দ্বীপে ফিরে গিয়ে কী করব ? রিভলভারটাও তো নেই। ওখানে অনেক লোক, আমাকেও লোকজন সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ভটভটিটা আমাকে কক্সবাজার পৌঁছে দিল। সেখানে থানায় গিয়ে সাহায্য চাইলাম, তারা তো আমার কথা বিশ্বাসই করতে চায় না। প্রথমে আমাকে পাগল ভেবে হাসছিল। আমার ক্রাচ নেই, লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল, তাতে হাস্যকর দেখায় ঠিকই। সেদিনটা আবার শুক্রবার, শুক্রবার ছুটির দিন এ-দেশের সব দোকানপাট বন্ধ থাকে। ক্রাচ পাব কোথায় ? একটা লোককে ধরে বাঁশ দিয়ে কোনওরকমে একটা ক্রাচ বানিয়ে নিলাম। তারপর ঢাকায় সিরাজুল চৌধুরীকে ফোন করলাম, তিনি সব শুনে থানাকে নির্দেশ দিলেন আমাকে সাহায্য করার জন্য। তাও থানার অফিসার বলে যে একজন মন্ত্রী এসেছেন শহরে, পুলিশরা সবাই ব্যস্ত। ব্যাপারটার গুরুত্বই বুঝতে পারছে না। এত মানুষের জীবন বিপন্ন ! যাই হোক, অনেক বুঝিয়ে চারজন পুলিশ পেয়েছিলাম, আর একটা ভাঙা লঞ্চ !"

কামাল বলল, "আপনি যে ওদের বলেছিলেন, আর একটা আর্মির জাহাজ পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে একটু পরেই আসছে, সেটা গুল ?"

কাকাবাবু সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, "মাঝে-মাঝে ওরকম গুল মারতেই হয় ! কোথায় আর্মি ? তারা আমার কথা শুনবে কেন ? আমি বিদেশি না ? যাই হোক, কাজ তো উদ্ধার হয়ে গেল ! ওই মাস্টার লোকটা পাগল হলেও অন্যদিকে বুদ্ধি আছে। কীরকম একটা বোমা বানিয়েছে, যা দিয়ে

মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান করে রাখা যায় ! ওটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।”

তারপর জোজোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, “জোজো, তোমাদের উদ্ধার করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে কে জানো ? অনেকেই সাহায্য করেছে, যেমন ধরো কামাল, সে যদি আমাদের নিয়ে না যেত, আমরা নিজেরা অতদূরে যেতে পারতাম না। সে যথেষ্ট সাহসও দেখিয়েছে। তারপর স্পিডবোট চালক আলি, সে আমাদের দ্বীপটা চিনিয়েছে। আমাদের জন্য সে বিপদেও পড়েছিল। এবারে আমি বিশেষ কিছু করিনি, কিন্তু সন্তু, সন্তু যদি ঠিক সময় গুলি না করত, তা হলে ওই লোকটা তলোয়ারের এক কোপে আমার মুণ্ডুটা কেটে দিত। মুণ্ডু না থাকলে কতরকম অসুবিধে বলো তো ! আমার মুণ্ডুটা না থাকলে ওই মাস্টারটার ঘোরও কেটে যেত, সে তখন আবার নিজ মূর্তি ধারণ করত। সন্তু খুব জোর বাঁচিয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে একটি মেয়ে। তার নাম অলি। ভালনাম রূপকথা। সেরকম মেয়ে দেখা যায় না, অপূর্ব মেয়ে ! কলকাতায় গিয়ে আলাপ করিয়ে দেব।”

কাকাবাবুর চোখে ভেসে উঠল অলির কান্না-ভেজা মুখ। এর পরে একবার তাকে কোথাও নিয়ে যেতে হবে, তিনি কথা দিয়েছেন !

গ্রন্থ পরিচয়

আগুন পাখির রহস্য । প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৪
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । পৃ. ১১৯ । মূল্য ৩০·০০
উৎসর্গ : অভিরূপকে ।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ।

কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি । প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫ ।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । পৃ. ১৬০ । মূল্য ৪০·০০
উৎসর্গ : জয়া বসু-কে স্নেহের উপহার ।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ।

সন্তু কোথায়, কাকাবাবু কোথায় । প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৬ ।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । পৃ. ১৬৮ । মূল্য ৫০·০০
উৎসর্গ : সুতীর্থ (ঘুচু) সিংহ-কে ।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কাকাবাবুর প্রথম অভিযান । প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৭ ।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । পৃ. ১৬০ । মূল্য ৫০·০০
উৎসর্গ : স্নেহের রোরো অর্থাৎ রোহিতাশ্বকে ।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ।

জোজো অদৃশ্য । প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮ ।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । পৃ. ১৭৬ । মূল্য ৫০·০০
উৎসর্গ : ছোট্ট দীয়া/অর্থাৎ অমৃতা মুখোপাধ্যায়কে/বড় হয়ে পড়বার জন্য ।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ।

9 788172 157586